মাওলানা সাঈদী
রচনাবলী
২

মাওলানা সাঈদী রচনাবলী

২

প্রকাশক

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক

প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৭১১২৭৬৪৭৯

মওলানা সাঈদী রচনাবলী- ২

প্রকাশক ঃ	রাফীক বিন সাঈদী ম্যানেজিং ডিরেক্টর গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্ক ৬৬ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ মোবাইল ঃ ০১৭১১২৭৬৪৭৯
অনুলেখক ঃ	আব্দুস সালাম মিতুল
প্রথম প্রকাশ ঃ	অগাষ্ট-২০০৮
কম্পিউটার কম্পোজ ঃ	নাবিল কম্পিউটার ৫৩/২ সোনালীবাগ, বড়মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩১৪৫৪১, ০১৭১-৪৩৮৮২৫৪
প্রচ্ছদ ঃ	মশিউর রহমান
মুদ্রণ ঃ	আল আকাবা প্রিন্টার্স ৩৬ শিরিশ দাস লেন, বাংলাবাজার-ঢাকা-১১০০
শুভেচ্ছা বিনিময় ঃ	৩০০ টাকা মাত্র।

Maulana Sayedee Rachonabolee-2nd Part, Co-operated by Rafeeq bin Sayedee. Managing Director of Global publishing Network, Copyist : Abdus Salam Mitul. Published by Global publishing Network, Dhaka. 1st Edition: August 2008. Price: 300 TK, Only in BD. 12 Doller in USA. 8 Pound in UK.

وَ لَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

কখনো একে অপরের প্রতি মমতা ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা কে কি কাজ করো, তার সবকিছুই আল্লাহ তা'য়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। (সূরা বাকারা-২৩৭)
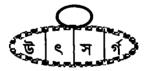
জীবনের দুর্গম পথ চলায় যাঁর ছবর ও শোকর আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে, সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নিজ কাঁধে নিয়ে আমাকে খানিকটা নিশ্চিন্তে দাওয়াতী কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন

আমার জীবন সঙ্গিনী

মুহ্তারামা সালেহা সাঈদীকে ....

গ্লোবাল পাবলিশিং এর প্রকাশিত বিশ্বের অগণন মানুষের প্রাণপ্রিয় মুফাস্সীর **মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী** কর্তৃক রচিত বর্তমান শতাব্দীর বিজ্ঞান ভিত্তিক তাফসীর ও অন্যান্য গবেষণাধর্মী গ্রন্থের কয়েকটি।

১। তাফসীরে সাঈদী- সূরা ফাতিহা
২। তাফসীরে সাঈদী সূরা আসর
৩। তাফসীরে সাঈদী সূরা লূকমান
৪। তাফসীরে সাঈদী আমপারা
৫। বিষয়ভিত্তিক তাফসীরুল কোরআন ১ ও ২
৬। মহিলা সমাবেশে প্রশ্নের জবাবে ১ ও ২
৭। আমি কেন জামায়াতে ইসলামী করি
৮। আল কোরআনের দৃষ্টিতে ইবাদাতের সঠিক অর্থ
৯। আলকোরআনের দৃষ্টিতে মহাকাশ ও বিজ্ঞান
১০। আল্লামা সাঈদী রচনাবলী ১,২ ও ৩
১১। মানবতার মুক্তিসনদ মহাগ্রন্থ আল কোরআন
১২। দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ধৈর্য্যের অপরিহার্যতা
১৩। আল কোরআনের মানদণ্ডে সফলতা ও ব্যর্থতা
১৪। আল্লাহ মৃতদেহ নিয়ে কি করবেন?
১৫। হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
১৬। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম
১৭। দ্বীনে হক এর দাওয়াত না দেয়ার পরিণতি
১৮। চরিত্র গঠনে নামাজের অবদান
১৯। কাদিয়ানীরা কেনো মুসলিম নয়?
২০। দেখে এলাম অবিশ্বাসীদের করুণ পরিণতি
২১। শিশু-কিশোরদের প্রশ্নের জবাবে
২২। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) মোনাজাত
২৩। জান্নাত লাভের সহজ আমল
২৪। পবিত্র কোরআনের মুজিজা
২৫। আল্লাহ কোথায় আছেন?
২৬। আখিরাতের জীবন চিত্র
২৭। শিশুর প্রশিক্ষণ পদ্ধতি
২৮। ঈমানের অগ্নিপরিক্ষা
২৯। নীল দরিয়ার দেশে
৩০। ফিক্হুল হাদীস

অন্যান্য লেখকের

পবিত্র নগরী মক্কা প্রবাসী লেখিকা উম্মে হাবীবা রুমা কর্তৃক রচিত

১। প্রিয় রাসূল (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন
২। পবিত্র রমজানে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়
৩। জিয়ারতে মক্কা- মদীনা
ও
কোরআন- হাদীসের দোয়া

আব্দুস সালাম মিতুল কর্তৃক রচিত

৪। বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ **আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর অবদান**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الاِنْسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

প্রকাশকের কথা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলীশানে শতকোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, যিনি একান্তই দয়া করে মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের জীবন বিধান হিসাবে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। অসংখ্য দরুদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদুত সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব বিশ্বনবী **হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের** প্রতি, যাঁর মাধ্যমে দিশেহারা মানবতা পেয়েছে সঠিক পথের দিশা। চির অবহেলিতা নারী জাতি পেয়েছে তাদের ন্যায্য অধিকার। যিনি বর্ণ-বৈষম্য দূরীকরণের পথিকৃৎ, শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়েছেন, এক কথায় অদ্বিতীয় সফল রাষ্ট্র নায়ক ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হিসেবে সমগ্র বিশ্বে তিনি অতুলনীয়।

আজকের পৃথিবী ও তার অধিবাসীরা যদি সত্যকার অর্থে শান্তি পেতে চায়, ভীতিহীন নিরাপত্তাপূর্ণ, ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত বিশ্ব দেখতে চায় তাহলে মানব রচিত সকল মতবাদ দু'পায়ে দলে ফিরে আসতে হবে রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিথ পথে। বিগত অর্ধ শতাব্দী ধরে এ পথের বিজ্ঞানভিত্তিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের মাধ্যমে জন সমক্ষে সার্থকভাবে যাঁরা ফুটিয়ে তুলেছেন আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই অন্যতম।

আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী মুক্তি পাগল জনতার কাছে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি প্রতিষ্ঠান। সমগ্র বিশ্বে যাঁরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে একটি শান্তিময় পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন দেখেন তাঁদের অনেকের নিকট সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি। আল্লাহর কোরআনের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মুসলিম বিশ্বের গন্ডী অতিক্রম করে অমুসলিম বিশ্ব তথা পাশ্চাত্য জগতেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তিনি আল কোরআনের খাদেম ও অসাধারণ বাগ্মী হিসেবে এ দেশের সকল স্তরের মানুষের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত।

এদেশের মুসলমানদের জন্য তাঁর দ্বীনি খেদমত গণমানুষের মনের মনিকোঠায় দীর্ঘকাল জাগরুক থাকবে ইনশাআল্লাহ্। বাংলাদেশের মুসলমানদের চরম দুর্দিনে

তিনি মহাগ্রন্থ আল কোরআনের বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পবিত্র কোরআনের সে আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিলো আশাহত দিশাহারা জাতি। বাংলাদেশে আল কোরআনের রাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি যে জাগরণ সৃষ্টি করেছেন- আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌, এমন কোনো শক্তির অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, সে ইসলামী জাগরণকে অবদমিত করতে পারে। জনপ্রিয়তার যে কোনো মানদন্ডে উত্তীর্ণ আল্লামা সাঈদী গোটা জাতির কাছে যেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। আমরা মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য, ঈমান দীপ্ত দীর্ঘ জীবন এবং মানসিক স্বস্তি কামনা করি।

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সবকটি মহাদেশের বহুসংখ্যক দেশেই অডিও, ভিডিও, সিডি, ভিসিডি, ডিভিডি, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তাঁর আকর্ষণীয় কণ্ঠ যেমন ধ্বনিত হচ্ছে তেমনি ওয়েবসাইটেও পঠিত হচ্ছে তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী গ্রন্থসমূহ। তাঁর রচিত গবেষণাধর্মী ছোট-বড় গ্রন্থের সংখ্যা বর্তমানে ষাটের উর্ধ্বে। তাঁর কোরআন-হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য শুনে দেশ- বিদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাধিক অমুসলিম ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। যাঁদের মধ্যে আমেরিকার নিউইয়র্কের এ্যাটর্নি অব ল' যোশেফ গ্রোয়ে অন্যতম।

বহু সংখ্যক নাস্তিক ও চরম ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থী তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত পবিত্র কোরআনের তাফসীর শুনে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছেন। বিভিন্ন বয়সের অসংখ্য বিভ্রান্ত নারী-পুরুষ সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন। যারা নামাযের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতো, জীবনে কখনো মসজিদ মুখী হতেন না, তাঁরা নিয়মিত নামায আদায় করছেন। পবিত্র কোরআন যারা পাঠ করতে জানতেন না, আরবী অক্ষর যাদের কাছে বিরক্তি সৃষ্টি করতো, তাঁরা কষ্ট স্বীকার করে আরবী ভাষায় কোরআন পাঠের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

তাঁর মাহফিল শোনার পূর্বে এদেশের জনগণের কাছে এ কথা অজানা ছিল যে, ওয়াজ-তাফসীর আধুনিক বিজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি শিল্পসৌকর্য বা ওয়াজ-বক্তৃতা একটি মনোমুগ্ধকর আর্ট। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর কণ্ঠসৌকর্য দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিভিত্তিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, বক্তৃতা একটি শিল্প বা একটি চমৎকার আর্ট। তিনি ওয়াজের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছেন তা অকল্পনীয়। বর্তমানে শুধু ওয়াজের মাহফিলেই নয়–প্রতি জুম্‌য়া'বারে সম্মানিত খতিব সাহেবগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনাও হয় অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। আল্লামা সাঈদী যে ধারায় এবং যে বিপ্লবী চেতনা নিয়ে বক্তৃতা করেন, বর্তমানেও বহুসংখ্যক সম্মানিত ওয়ায়েজীন ও

খতিবগণ সে চেতনা তাঁদের বক্তৃতায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। আল্লাহর দ্বীনকে সহজবোধ্য করার জন্য নিঃসন্দেহে এ পদ্ধতি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এক বড় নিয়ামত। কারণ আধুনিক শিক্ষিত শ্রোতাবৃন্দের রুচিরও পরিবর্তন এসেছে, তারা আগের মতো শুধু কিচ্ছা-কাহিনী নির্ভর ওয়াজ শুনতে চান না, তাঁরা চান কোরআর-হাদীস সমৃদ্ধ ও জীবন সম্পৃক্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তি নির্ভর আলোচনা। সে ক্ষেত্রে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

শহর নগর বন্দর অতিক্রম করে বাংলার নিভৃত পল্লীর জীর্ণ কুটিরেও আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ অনুরণিত হচ্ছে। তাঁর কণ্ঠ নিসৃত পবিত্র কোরআনের শব্দাবলীর ঐন্দ্রজালিক সুর মানুষকে এমনভাবে তাফসীর মাহফিলের দিকে টেনে নিয়ে আসে, যেমন চম্বুক টেনে নিয়ে আসে লৌহ খন্ডকে। তিনি শুধু সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিমাত্র নন, তিনি একটি বিশাল প্রতিষ্ঠান। তাঁকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে বহুমাত্রিক পরিবেশ। তাঁকে কেন্দ্র করেই জনতার সাগরে জেগে ওঠে ঊর্মিমালা। মুসলিম নামক ঘুমন্ত নরশার্দুলদের ঘুম ভাঙ্গানোর অন্যতম হাতিয়ার আল্লামা সাঈদী কর্তৃক পরিবেশিত কোরআন তাফসীর। আল হাম্‌দুলিল্লাহ্‌- এটি মহান আল্লাহর কোরআনের অন্যতম মুজিযা। আল্লাহ তা'য়ালা ঘূণে ধরা সমাজ তথা শির্‌ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মিল্লাতকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগ- জামানায় সময়ের ব্যবধানে তাঁর একনিষ্ঠ গোলামদের মধ্য থেকে কাউকে না কাউকে এ বিষয়ে সুযোগ দিয়ে ধন্য করেন।

১৯৭১ সন পরবর্তী বাংলার অন্ধকার অমানিশায় আল্লামা সাঈদী কোরআনের প্রদীপ জ্বালাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। নিজ প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকে সেই থেকে অদ্যাবধি পবিত্র কোরআনের রঙে রাঙিয়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা তিনি চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশে ও বিদেশে ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে তিনি নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আল্লাহর কোরআনের সৈনিক বেরিয়ে আসছে। অমুসলিম দেশসমূহেও তিনি ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেসব প্রতিষ্ঠান থেকে মহাসত্যের আলো কুফুরীর অন্ধকারে নিমজ্জিত অমুসলিম জাতির ভেতরে ছড়িয়ে পড়ছে।

অমিত সম্ভাবনাময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মন্ডিত বাংলাদেশ, গোড়া থেকেই দেশটি ছিলো সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদীদের কু-নজরে। ইউরোপ- আমেরিকার প্রচেষ্টা দেশটিকে গোলাম বানানোর, রাশিয়ার প্রচেষ্টা ছিলো এদেশের মানুষকে নাস্তিকে পরিণত করার আর ভারত এদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ বানানোর নিত্য- নতুন চক্রান্ত

ষড়যন্ত্রে কখনো বিরতি দেয়নি। দেশ ও জাতিসত্তা বিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের বহুমুখী চক্রান্তে যখন হারিয়ে যাচ্ছিলো মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ডুবে যাচ্ছিলো তারা শির্ক- বিদয়াত ও কুসংস্কারের অন্ধকার গহ্বরে।

পুজিবাদ, নাস্তিক্যবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ, শির্ক ও বিদয়াতের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো বাতাসে উপমহাদেশে মুসলিম উম্মাহ্ এ ঝড়ো বাতাসের প্রচন্ডতায় যেনো ঈমানী তথা ইসলামী চেতনা না হারায় সে লক্ষ্যে তৎকালীন ওলামা- মাশায়েখ ও প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদগণ তাঁদের ক্ষুরধার লিখনী, যুক্তি-নির্ভর শানিত বক্তব্য ও যৌক্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী চেতনাকে মুসলিম উম্মাহ্র হৃদয় কোটরে জীবিত রাখার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছেন। চরম প্রতিকুল পরিবেশে ভারতীয় উপমহাদেশে যে কয়জন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ফাঁসির রশিকে ফুলের মালা হিসেবে মনে করে দিশাহারা জাতিকে কোরআন- হাদীস ও বিজ্ঞানভিত্তিক সাহসী বক্তব্য এবং লেখনীর মাধ্যমে পথের দিশা দেখিয়েছেন, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসীম অনুগ্রহে আল্লামা সাঈদী তাঁদেরই একজন।

তাঁর সাহসী কণ্ঠস্বর বন্ধ করে দেয়ার জন্যে স্বৈরশাসকরা কিছু দিনের জন্য তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলো, ৮০'র দশকে দেশব্যাপী অসংখ্য হরতাল ও অগণিত বার ১৪৪ ধারা জারি করেছিলো। আল্লামা সাঈদীর তাফসীর মাহ্ফিল বন্ধের অপচেষ্টায় ষড়যন্ত্রকারীরা মাত্র এক বছরেই ৫৬ বার হরতাল করেছিলো। পক্ষান্তরে কোরআন প্রেমিক অগণিত নারী-পুরুষ ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি হরতাল এবং ১৪৪ ধারা কোথাও কার্যকর হতে দেয়নি। দেশবাসী সাক্ষী, নির্ধারিত সকল তাফসীর মাহ্ফিল ১০০% সফল হয়েছে। কোনো একক ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত বার ব্যর্থ হরতালের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

গন্তব্যে তাঁর যাত্রা পথে বহু সংখ্যক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। তাফসীর মাহফিলে তিনি পবিত্র কোরআনের তাফসীর পেশ করার জন্যে ঢাকা থেকে আকাশ পথে সিলেট গিয়েছেন, কিন্তু তাঁকে বিমান থেকে নামতে না দিয়েই ঢাকায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। সর্বোপরি আমাদের জানা মতে এ পর্যন্ত দেশের পাঁচটি স্থানে বিভিন্ন সময় তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেয়ার নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রও করা হয়েছিলো। মাহফিলে তাফসীর পেশ করা অবস্থায় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়া হয়েছে। কিন্তু মহান রাহ্মানুর রাহীম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম অফুরন্ত দয়া ও গণমানুষের হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসায় তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ অবস্থায় এখনো আমাদের মাঝে পবিত্র কোরআনের সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অবদান রেখে যাচ্ছেন-

আল হাম্‌দু লিল্লাহ্‌। যদিও দেশে জরুরী অবস্থার কারণে তিনি তাফসীর মাহফিলে বক্তব্য রাখতে পারছেন না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ ঝঙ্কৃত হচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে আর তাঁর ক্ষুরধার কলম ছুটে চলেছে অবিরাম গতিতে।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, নমরুদ যেখানে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলার চেষ্টা করেছে ইবরাহীম (আঃ) সেখানে আবির্ভূত হয়ে নমরুদের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই ফেরাউন জনগণের ওপরে খড়গ হস্ত হয়েছে সেখানেই মূসা (আঃ) গর্জে উঠে তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছেন। যেখানেই আবু জেহেল- আবু লাহাবরা ইসলামের বিরুদ্ধে ফণা বিস্তার করার চেষ্টা করেছে সেখানেই আবু বকর-ওমর (রাঃ) সে ফণা দলিত মথিত করেছেন– এটাই চিরন্তন ইতিহাস।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় এ জাতি নিজের স্বকীয় আদর্শের ভিত্তিতে একটি সুন্দর, সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিল। শাহাদাতের স্বপ্ন বুকে ধারণ করে মহান আল্লাহর পবিত্র নামে মরণ-পণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু জাতির কুসুমাস্তীর্ণ পথ ষড়যন্ত্রের দানব সৃষ্ট প্রবল ভূমিকম্পে নিষ্ঠুরভাবে ধ্বসে পড়লো। গোটা জাতি যেন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢেকে গেল। মহাঅমানিশা নেমে এলো জাতীয় জীবনে। কোথাও সামান্যতম আলোর রেখাটুকু বাকি রইলো না। জাতীয় জীবনের স্বপ্ন স্বৈরাচারের উদ্ভট নানাবিধ চেতনার পদতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়লো। ব্রাহ্মণ্যবাদ বাংলার মুসলিম তরুণ-যুবকদের সমগ্র বোধশক্তির ওপরে, ইসলামী সংস্কৃতির পরিবর্তে বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার আস্তরণে চিরতরে মহাবিস্মৃতির কৃষ্ণকালো অন্ধকারের যবনিকা টেনে দেয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলো। জাতীয় জীবনের যেখানে শুরু সেখানেই নামিয়ে দেয়া হলো অভিশাপের সর্বগ্রাসী অনল প্রবাহ। ইতিহাস সাক্ষী, দেশের সেই ক্রান্তিলগ্নে তওহীদী জনতার বিপ্লবী কণ্ঠস্বর হিসেবে আল্লামা সাঈদী অকুতোভয়ে সিংহ গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিরাশার সাগরে নিমজ্জিত ও হতাশাগ্রস্ত জাতিকে শুনিয়েছিলেন আশার বাণী। সাহসী আঙ্গুল তুলে দেখিয়েছিলেন তৎকালীন নিন্দিত বিশ্বের নন্দিত গন্তব্য।

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অমোঘ অলংঘনিয় নিয়মে আল্লামা সাঈদী একদিন অবশ্য অবশ্যই চিরকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে হারিয়ে যাবেন- এ সত্যের মৃত্যু নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও লিখনী যেনো সহসাই হারিয়ে না যায় এ জন্যে গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে আমরা নিয়েছি কতিপয় সাহসী পদক্ষেপ। এ পর্যন্ত আমরা তাঁর লিখিত দুই সহাস্রাধিক পৃষ্ঠা সমৃদ্ধ চার খন্ড তাফসীরে সাঈদীসহ

বিভিন্ন বিষয়ে অর্ধশত ছোট-বড় গ্রন্থ প্রকাশ করেছি। এ ছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে সুলিখিত তাঁর রচনাবলী আমরা গ্রন্থাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। উদ্যোগ নিয়েছি ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বাংলাভাষী মুসলমান নর-নারী বিশ্বের যেখানেই থাকুন, তাঁরা যেনো আল্লামা সাঈদীর কণ্ঠ নিঃসৃত তাফসীর শুনতে পারেন এবং তাঁর লেখা গ্রন্থসমূহ পড়তে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা Islam.Net.bd উক্ত উদ্যোগের অংশ হিসেবে দ্বিতীয় বারের মতো পুস্তক, পুস্তিকা, ম্যাগাজিন ও জাতীয় পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাধর্মী মূল্যবান লেখনীর সমন্বয়ে **মাওলানা সাঈদী রচনাবলী-২** নামে প্রকাশ করা হলো। বক্ষমান গ্রন্থে তাঁর রচিত যে সকল পুস্তক-পুস্তিকা ও লেখনীর সমন্বয় ঘটেছে তার শিরোণাম নিম্নরূপঃ-

১। সম্মানিত আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

২। সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

৩। নারী অধিকার সনদ
প্রেক্ষিতঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

৪। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ও আমাদের সংবিধান

৫। ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতাঃ একটি পর্যালোচনা

৬। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী
কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে

৭। দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি

৮। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্কটের নেপথ্যে

৯। ২৮শে অক্টোবর ২০০৬
ইতিহাসে মানবিক বিপর্যয়ের এক কালো অধ্যায়

১০। কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

গ্লোবাল পাবলিশিং নেটওয়ার্কের পক্ষে

বিনয়াবনত

আব্দুস সালাম মিতুল

পৃষ্ঠা আলোচিত বিষয়

সম্মানিত আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا–

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আলে ইমরান-১০৩)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَلاَ تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا، اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ–

তোমরা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি খতম হয়ে যাবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো; অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা আল আনফাল-৪৬)

এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, বিশ্বজুড়ে আজো মুসলিম সমাজে সততা, স্বচ্ছতা, সম্প্রীতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভালোবাসা, একে অপরের প্রতি কর্তব্যবোধ, মায়া-মমতা, সহানুভূতি, আমানতদারী, দ্বীনদারী, আল্লাহভীতিসহ মৌলিক মানবিক গুণাবলী যতটুকুন অবশিষ্ট রয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনি সংগঠনের অবদান। তবুও হাতী যেমন তার চক্ষু ক্ষুদ্র হবার কারণে তার দেহের আকার ও শক্তি-মত্তা বুঝতে সক্ষম হয় না, তদ্রুপ দেশের সম্মানীত আলেম সমাজ নানাবিধ সঙ্কীর্ণতার কারণে জনগণের ওপর তাঁদের প্রভাব মর্যাদা কত গভীরে তা সকলে সমভাবে অনুধাবন করতে পারেন না। কলসী কখনো খালি থাকেনা, হয় পানি নয়তো বাতাস। ঠিক একইভাবে জনগণের নেতৃত্বের আসন কখনো শূন্য থাকে না, হয় সৎ-যোগ্য, না হয় অসৎ অযোগ্য কেউ তো বসবেই। দুর্ভাগ্য জাতির জন্য তখনই হয় যখন ইমাম নিজস্থান ছেড়ে মুক্তাদীর কাতারে দাঁড়ায় আর সুযোগ বুঝে ইমামতের জন্য অযোগ্য কোনো মুক্তাদী ইমামতের শূন্য জায়গা পূর্ণ করে।

বর্তমান সময়ে আলেম সমাজের একটি বিরাট অংশ নিজেদের স্বর্ণালী ইতিহাস ভুলে গিয়ে আত্মবিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে 'ছামানান কালীলা'য় পরিতুষ্ট হচ্ছেন এবং জাতির প্রতি নিজেদের দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলতে বসেছেন। মাদ্রাসায় শিক্ষকতা, মসজিদে ইমামত, জানাযা বা বিবাহ পড়ানো, অথবা ওয়াজ-নসীহত, আলেম সমাজের দায়িত্ব কি এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ? অপ্রিয় হলেও এ বিষয়ে কিছু বাস্তব কথা আজ আমাকে বলতেই হবে।

দেশের ওলামা হাযারাত নিজেদেরকে একটি নির্দিষ্ট গন্ডীর মধ্যে সীমিত করার সুযোগে দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, শিল্পনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি এক কথায় মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিশাল অঙ্গন ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীদের দখলে চলে গিয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রেই দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে। এ সকল ক্ষেত্রে তাদের একচেটিয়া রাজত্ব এবং ক্ষেত্র বিশেষে দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকজন এবং বামপন্থীগণ আলেম সমাজের কোরআন-হাদীস ভিত্তিক স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষেত্রেও অযাচিত হস্তক্ষেপ করছে। আর এ কারণেই দেশের জনগণকে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তাবীজ, দোয়া, জানাযা, মাসলা-মাসায়েল এবং বিবাহ-তালাকের বিষয়ে তারা হুজুরদের স্বরণাপন্ন হয় আর জীবনের বিশাল অঙ্গন পরিচালনার জন্য ফাসিক-ফুজ্জার ও ইসলামের চরম শত্রুদের দ্বারস্থ হতে হয়। প্রশ্ন হলো, এ ক্ষেত্রে কি আলেম সমাজের কোনোই দায়িত্ব নেই?

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সমকালীন লোকজন এসে যদি জিজ্ঞাসা করতেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমি হৃদরোগে আক্রান্ত, আমি শ্বাস কষ্টের রোগী, আমার মাথায় প্রচন্ড যন্ত্রণা হচ্ছে, আমার পেট খারাপ, আমার দেহে ঘা-পাচ্ড়া হয়েছে, আমি জ্বরে আক্রান্ত, আমার বিয়ের প্রয়োজন, আমি বিয়ে করেছি কিন্তু সন্তান হচ্ছে না, আমি ও আমার স্ত্রী ফর্সা, কিন্তু আমাদের সন্তান কেনো কালো বর্ণের হলো? আমার জমির উর্বরতা নষ্ট হয়েছে, ফসল হচ্ছে না, আমার ক্ষেতের ফসল পোকায় আক্রান্ত, খেজুর গাছে মড়ক লেগেছে, আমার পশুগুলো রোগাক্রান্ত, বৃষ্টির অভাবে ফসল হচ্ছে না, ঘী বা মধুর মধ্যে ইঁদুর পড়েছে, এখন কি করবো? এ ধরণের অসংখ্য পার্থিব সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন যদি সাহাবায়ে কেরাম নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখে উত্থাপন করে সমাধান চাইতেন, তাহলে তিনি কি তাঁদেরকে এ কথা বলতেন যে, 'আমি আল্লাহর নবী, ওযু-গোসল, পাক-পবিত্রতা, নামাজ-রোজা, হজ্জ কালেমা, বিয়ে-তালাক, মৃত্যু ও কবরের আযাব, আখিরাত, জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদি বিষয় ব্যতীত পার্থিব বিষয়ে আমার কাছে কেনো জানতে চাচ্ছো, এসবের আমি কি জানি?'

অথচ দূর-দূরান্ত থেকে আগত ও উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম এ ধরণের অগণিত পার্থিব বিষয়াদিও নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উত্থাপন করেছেন এবং তিনি এগুলোর সমাধানও দিয়েছেন, নেতিবাচক জবাব কখনো দেননি। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক জবাবই তিনি দিতেন। 'মাথার যন্ত্রণা থেকে শুরু করে যুদ্ধ পরিচালনা, রান্না ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা' এমন কোনো বিষয় উত্থাপিত হয়েছে বা এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার সমাধান তিনি দেননি?

ওলামায়ে কেরাম তো নায়েবে রাসূল, লোকজন তাদের কাছে শুধু তাবীজ আর ঝাড়-ফুঁকের জন্যে কেনো আসবে? মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিন্যাস পদ্ধতি, ভ্রূণের ক্রমবিকাশ, কম্পিউটার ব্রাউজিং, ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েব সাইট, ভূমিকম্প, ভূমিধ্বস, পাহাড়, মাটির স্তর, পানির স্তর, বায়ু স্তর, ছায়া, আলো-আঁধার, সৌরজগৎ, বিগ-ব্যাং, বিগ-ক্র্যাঞ্চ, আলোক বৎসর, মিল্‌কিওয়ে, গ্যালাক্সি, এন্টিমিউটানেজিক আমব্রেলা, কসমিং ষ্ট্রীং, এসটিরয়েড বেল্ট, ব্লাকহোল, ওজন স্তর, টাইম জিরো, প্লাঙ্ক টাইম, প্রাইমোরডিয়াল ফায়ারবল, মহাশূন্য পরিচালনা পদ্ধতি, সাত রংয়ের সমাহার তথা রংধনু রহস্য, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ কি, সুদ মুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি কিভাবে সম্ভব? অন-লাইন সিস্টেম কি? ইসলামী রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? ইসলামী রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কি হবে? ইসলামী রাষ্ট্রে ভিন্নধর্মাবলম্বী নাগরিকগণ কেমন অধিকার ভোগ করবেন? নারী, শিশু, কিশোর, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শ্রমিক-মালিক, মেহনতী জনতা এদের কি অধিকার দিয়েছে ইসলাম?

এসব মৌলিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশ্ন আলেম সমাজের কাছে কেনো করা হয় না? এর কারণ কি? আর যদি কেউ এসব প্রশ্ন করেই বসে তাহলে ক'জন এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক সঠিক জবাব দিতে সক্ষম হবেন?

আমি মনে করি মাদ্রাসার সিলেবাস ভুক্ত কতকগুলো কিতাব অধ্যয়ন করে কয়েকখানা সার্টিফিকেট সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। সেই সাথে প্রয়োজন জ্ঞানের সকল শাখায় বিচরণের উচ্চাকাংখা এবং তার বাস্তবায়ন। তাহলেই সমাজ ও রাষ্ট্রকে ওলামাদের পক্ষ থেকে বাস্তবমুখী জীবনধর্মী কিছু অবদান রাখা সম্ভব হবে– যা করেছিলেন আমাদের অতীতের বিশ্ব বিখ্যাত ওলামায়ে কেরাম, মুহাদ্দেসীন, মুফাচ্ছেরীণ, মুফাক্‌কেরীণ, সাল্‌ফে সালেহীন, আকাবেরে দ্বীন ও বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদগণ। তাঁরা মানুষের সার্বিক সংশোধন-সংস্কারের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন, দেশ-বিদেশ সফর করেছেন, হিজরত করেছেন ও জেল জুলুম সহ্য করেছেন। ইসলাম আক্রান্ত হতে পারে, এমন সকল দর্রজায় কলমের তরবারী হাতে নিয়ে তাঁরা অহর্নিশ ঈমান ও আকীদার ঘর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহারা দিয়েছেন। এমনকি ফাঁসির মঞ্চে আরোহন করতেও দ্বিধা করেননি। তবুও বাতিলের সাথে অসম্মানজনক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেননি এবং স্বার্থের বিনিময়ে মাথানত করেননি।

জাতির চরম দুর্ভাগ্য, সেই জগৎ বিখ্যাত ওলামাদের উত্তরসুরীরা আজ শতধা বিভক্ত বিচ্ছিন্ন। তাদের কেউ ছুটছেন ক্যামেরা নিয়ে মাজারে, কেউ ছুটছেন জশ্‌নে জুলুশের পতাকা হাতে বাজারে, কেউ মিলাদ, কেউ শবে-বরাত, কেউ গোল টুপী, কেউ লম্বা টুপী, কারো জামার কোণা ফাঁড়া, কারো পাঞ্জাবীর পার্শ্ব জোড়া, কেউ কওমী, কেউ বা আলীয়া। সবমিলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে খা-লিয়া।

'রুহামাউ বাইনা হুম' (পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রবণ মানসিকতা) এর পরিবর্তে 'আশিদ্দাউ বাইনা হুম' (পরস্পরের প্রতি কঠোর মনোভাব) বহুল ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর এই সুযোগে সুচতুর ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীরা বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্যে, গানে-নাটকে, যাত্রা-থিয়েটারে, টিভি চ্যানেলে, সাইবার ক্যাফে ওয়েব সাইটে, ইন্টারনেটে, পত্র-পত্রিকায় সবশেষে মোবাইলের ফ্রী টক-টাইমের মাধ্যমে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশের লক্ষ-কোটি যুবক-যুবতীদেরকে অবৈধ প্রেম, লিভ-টুগেদার ও সমকামীতার মতো ঘৃণ্য কাজের প্রতি আকৃষ্ট করছে এবং হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান যার যার নিজস্ব ধর্মে বিশ্বাসী থেকেই নারী-পুরুষ বিয়ের নামে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলছে এবং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

ফলে ইসলামের পুত-পবিত্র আদর্শ ছেড়ে দেশের ভবিষ্যৎ জেনারেশন হ্যামীলনের বংশী বাদকের ঐন্দ্রজালিক সুরে ছুটে চলছে নিশ্চিত পতন সাগরের দিকে। যার তুলনা চলে সাড়ে সাত'শ বছর স্পেনে মুসলিম শাসনের করুণ পরিণতির সাথে। এ অবস্থা আর দীর্ঘ দিন চলতে দেয়া যায় না। দেশের চৌদ্দ কোটি মুসলমানদের ভাগ্য দ্বীনি ধ্যান-ধারণা বিবর্জিত ইসলাম বিদ্বেষী চরম বদ্ কিস্মত বামদের হাতে তুলে দেয়া যায় না। বামদের হতভাগ্য বললাম এই কারণে, এদের মা-বাবা এদের নাম রেখেছিলেন সুন্দর সুন্দর মুসলমানী নাম। কিন্তু এরা এতই কপাল পোড়া যে ধর্মে বিশ্বাস করে না, ধর্মকে মনে করে আফিম, ফলে নামাজ আদায় করে না, ধনাঢ্য কিন্তু হজ্জ করে না, যাকাত ও দান-সাদকার ব্যাপারে অকল্পনীয় বখিল। এরা আল্লাহ-রাসূল, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে আস্থা রাখে না। নবী-রাসূলদের পরিবর্তে কালমার্কস, লেনিন, মাও এদের কাছে অধিকতর শ্রদ্ধেয় এবং আলেম-ওলামা এদের জানের দুশমন। ইসলামী সংগঠনের নাম শুনলে এদের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যায়।

ইসলামকে তারা সাম্প্রদায়িক ধর্ম বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। যে কারণে বামপন্থীদের মানসিক অবস্থা এমন যে, দুর্যোগ পূর্ণ আবহাওয়ার কারণে অমুসলিমদের উপাসনালয় অথবা তাদের বাসগৃহের ওপর গাছ থেকে যদি একটি আমও ছিঁড়ে পড়ে তাও বামদের কলিজায় আঘাত হানে এবং এতেও তারা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ বা ষড়যন্ত্র খুঁজে পায়। অথচ মুসলিম নামের কলঙ্ক সালমান রুশদী যখন মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে স্যাটানিক ভার্সেস বলে বা রুশদীর বশংবদ কুলাঙ্গার দাউদ হায়দার অথবা বিকৃত মস্তিষ্ক তাসলিমারা ইসলাম, আল্লাহ-রাসূল ও পবিত্র কোরআন-হাদীস নিয়ে চরম ধৃষ্টতা ও বেয়াদবী পূর্ণ আপত্তিকর কথা লিখে তখন এই বাম গোষ্ঠীরা একেবারেই বোবা-বধির ও অন্ধ হয়ে যান। এমনকি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ

কার্টুন ছাপা হলেও বামরা টু-শব্দটিও উচ্চারণ করেন না। বামপন্থীদের নিকট এসব বিষয় হলো মুক্তচিন্তা ও বাক স্বাধীনতা। মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে নিজ ধর্মের প্রতি এমন নির্লজ্জ অবজ্ঞা ও অবহেলা অমুসলিমদেরকেও অবাক করে।

বামপন্থীদের বর্তমান টর্গেট দেশ থেকে যে কোনো মূল্যে ইসলাম বিদায় করো, জান দিয়ে হলেও ইসলাম ঠেকাও। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত পৃথিবীর তৃতিয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে এমন সুস্পষ্ট দাবী তোলার সাহস তাদের নেই বলেই একটু কায়দা করে তারা মিডিয়ায় শ্লোগান তুলছে 'দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে'।

পনের কোটি মানব অধ্যুষিত বাংলাদেশে ভাড়ায় খাটা লোক বাদে সমগ্র দেশব্যাপী পাঁচ হাজার কর্মীও যাদের নেই তারাই চায় জনমত তাদের ইচ্ছে মতো নিয়ন্ত্রণ করতে– এ যেনো কুঁজো ব্যক্তির চিৎ হয়ে শোয়ার খাহেশ।

ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার করুণায় টিকে থাকা নেতা সর্বস্ব দল বামপন্থীদের জেনে রাখা ভালো, ইসলামকে অহেতুক ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক জীবন ব্যবস্থা নয়, ইসলাম সার্বজনীন, উদার ও পরধর্ম সহনশীল এক মহাপবিত্র জীবনাদর্শের নাম। সুতরাং লেলিন-মাওয়ের চশমা দিয়ে ইসলামকে না দেখে কোরআন-হাদীস দিয়ে ইসলামকে জানুন, নিজ ধর্ম প্রিয় ইসলামকে জীবনের চেয়ে ভালোবাসতে ও অনুশীলন করতে শিখুন। তাতে নিজেরও কল্যাণ হবে দেশ ও জাতিরও কল্যাণ হবে।

আর দেশের সম্মানীত আলেম সমাজের কাছে আবেদন, টিভি পর্দায় বামদের টক-শো দেখে এবং পত্রিকায় তাদের ফিচার পড়ে বিভ্রান্ত না হয়ে জনগণের সামনে পরগাছা এ বামদের মুখোশ উন্মোচনে ঐক্যবদ্ধ সাহসী ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসা এই মুহূর্তে ঈমানের শ্রেষ্ঠ দাবী। এ ব্যাপারে সামান্যতম গাফলতী হবে দেশ ও জাতির জন্য চরম আত্মঘাতী। আজ থেকে সকল মসজিদের মেম্বার থেকে শুরু করে দেশের সর্বত্র ওলামাদের পক্ষ থেকে বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান ওঠা উচিত, 'প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হবেনা বরং ধর্মহীন রাজনীতি চিরতরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে'।

যাই হোক, আমি নিজেকে তেমন কোনো যোগ্য আলেম মনে করি না। তাই ওলামায়ে কেরামকে উপদেশ দেয়ার 'গোস্তাখী' আমি কখনো করতে চাই না। আমি যা করছি তা হচ্ছে, তাঁদের ভুলে যাওয়া ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তাঁদের কেউ কেউ পরিস্থিতির কারণে হতাশা ও হীনমন্যতায় ভুগছেন, কেউ কেউ নিজের অজান্তে ফরজ ফেলে মুস্তাহাবের পেছনে ছুটছেন, এ সকল বিষয়গুলো তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরা, এ থেকে বেশী কিছু নয়।

কেউ আধা বেহুঁশ হয়ে পড়লে যেমন তার চোখের ওপর পানির ছিটা দিলে সম্বিৎ ফিরে পায় ঠিক তেমনি ওলামায়ে কেরামের অর্ধঘুমন্ত চিন্তা-চেতনার ওপর সামান্য পানির ছিটা মারার 'বেয়াদবি' করছি মাত্র। আশা করি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং ধৈর্য ধারণ করে আমার মতো অযোগ্য লোকের লেখা এ প্রবন্ধের সবটুকু পড়বেন।

আমার দৃষ্টিতে আলেম সমাজ হলেন প্রবহমান স্রোতস্বিনী নদীর মতো, যার গতি কখনো রুদ্ধ হবে না। তাঁরা যেখানেই যাবেন সেখানেই জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হিসেবে আবির্ভূত হবেন। চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে চারদিকের পরিবেশ আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলবেন। কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাঁরা কাংখিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছেন না। অথচ এক সময় তাঁরা প্রবল স্রোতে পৃথিবীময় প্রবাহিত হয়ে দুনিয়ার শুষ্ক মরুপ্রান্তর সিক্ত করে নব সৃষ্টিতে উপকরণ যুগিয়েছেন। সেই প্রবহমান স্রোতস্বিনী সহসা যেনো নিশ্চল নিথর উপত্যকায় এসে গতিরুদ্ধ হয়ে অতি ক্ষুদ্র সরোবরে পরিণত হতে চলেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্ যখন চিন্তা, গবেষণা ও নিত্য-নতুন আবিষ্কারের পথ পরিহার করে ভোগ-বিলাসের দিকে মনোযোগী হলো, তখনই পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ক্রমশ সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে এক সময় তা প্রত্যেকটি জনপদের রান্নাঘর থেকে শাসনদন্ড পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলো। ইসলামের স্বর্ণযুগে নেতৃত্ব ছিলো আলেম সমাজেরই হাতে। নেতৃত্বের আসন থেকে তাঁরা ছিটকে পড়ে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখলেন অপরিচিত এক পরিবেশ। এই অপরিচিত পরিবেশের ঘৃণ্য অন্ধকার মুসলিম উম্মাহর প্রত্যেকটি নাগরিককেই কম-বেশী ছেয়ে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যের এই অন্ধকার পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং মুসলিম উম্মাহ্কে অন্ধকার পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামকে আঁক্ড়ে ধরার জন্যে করুণ স্বরে আর্তনাদ করতে থাকলেন। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ তাদের কথার প্রতি সামান্যতম কর্ণপাতও করলো না। কারণ দুষিত পানি ততক্ষণে অনেক দূর প্লাবিত করে ফেলেছে। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে সবসময় প্রাণবন্ত, গতিশীল, জ্ঞানদীপ্ত ও কর্মচঞ্চল সভ্যতাই অনুসরণ করে থাকে। নিশ্চল, অথর্ব, অনড়, অবিচল, জরাজীর্ণ ও অনগ্রসর সভ্যতার অনুসরণ করে না।

ইসলাম সর্বযুগেই প্রাণচঞ্চল, কর্মমুখর ও জ্ঞানদীপ্ত জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রাণ-চঞ্চলতা নির্ভর করে চিন্তা, গবেষণা, নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও মৌলিক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যুগোপযোগী নতুন নীতিমালা প্রণয়নের ওপর। এখানেই আলেম সমাজের ছিলো সীমাহীন ব্যর্থতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন প্রভাব বিস্তার করছিলো, তখন তাদের সচেতন ভূমিকা পালন করা প্রয়োজন ছিলো। মানবতা বিধ্বংসী পাশ্চাত্য সভ্যতার নীতি ও ভিত্তিমূলকে সঠিকভবে উপলব্ধি করা

এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহ পরিভ্রমণ করে এর মৌলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ছিলো আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সম্মানিত আলেম সমাজের উচিত ছিলো, প্রভাব বিস্তারকারী ও কার্যকর যে সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বাস্তব প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ ক্রমশ বৈষয়িক উন্নতি করছে, গবেষণা শক্তি প্রয়োগ করে সেগুলোকে নিজেরা আয়ত্ব করা এবং ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে মুসলিম উম্মাহ্কে শিক্ষা দেয়া এবং সমাজ ও জাতীয় জীবনে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা। যদি এই প্রক্রিয়া অতীতে অবলম্বন করা হতো এবং বর্তমানেও যদি করা হয়, তাহলে কয়েক শতাব্দীর নিষ্ক্রিয়তাজনিত ক্ষতি ইনশাআল্লাহ পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই সাথে ইসলামও একটি গতিশীল, প্রাণবন্ত, প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সভ্যতা হিসেবে পৃথিবীর মানুষের কাছে পুনরায় নিজের গর্বিত অবয়ব উন্মুক্ত করতে পারবে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলিম-অমুসলিম প্রত্যেক দেশেই পাশ্চাত্যের জড়বাদ আর বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপর ভিত্তি করে ওঠা কর্মমুখর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রত্যেকটি শিক্ষাঙ্গনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে ইসলামের প্রেমিকগণ কোরআন হাদীসের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এ সকল মাদ্রাসায় উন্নত নৈতিকতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে বটে, কিন্তু বাস্তব জীবন ও কর্মের সাথে এ শিক্ষার কোনো সাদৃশ্য নেই। ফলে এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে সকল লোকজন শিক্ষিত হয়ে বের হচ্ছেন, তারা জাতিকে নেতৃত্ব দেয়া ও দেশ পরিচালনায় বহুলাংশে অনুপোযোগী হিসেবে পরিগণিত হচ্ছেন। আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় যারা শিক্ষিত হচ্ছেন, তারাই জাতিকে নেতৃত্ব দেয়ার ও দেশ পরিচালনার যোগ্য হচ্ছেন বটে, তবে তা সততা ও স্বচ্ছতার দিক থেকে অধিকাংশই শূন্য। এ ক্ষেত্রে বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসা শিক্ষক পরিষদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফসল ফাযিল কামিলের ডিগ্রী ও মাস্টার্সের সমমান বাস্তবায়ন জাতিকে কিছুটা হলেও আশান্বিত করেছে।

অন্য দিকে সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেম সমাজ ইসলামের প্রকৃত প্রাণচেতনা থেকে দূরে সরে রয়েছেন। তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, একে তাঁরা চিন্তা-গবেষণায় প্রয়োগ করছেন না। যে বুদ্ধিমত্তা ও কর্মশক্তি রয়েছে, তা তাঁরা ব্যবহার করছেন না বিধায় বুদ্ধি ও কর্মের ওপরে জড়তা চেপে বসেছে। আল্লাহর নাযিল করা কিতাব ও নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শিক ও বাস্তব হিদায়াত থেকে ইসলামের সনাতন ও প্রাণচঞ্চল গতিশীল নীতিমালা প্রণয়ন করে যুগের পরিবর্তিত অবস্থার সাথে প্রয়োগ করার কোনো চেষ্টা তাঁরা অনেকেই করছেন না। কেউ করার চেষ্টা করলেও প্রাচীন ধ্যান-ধারণাপন্থী আলেম সমাজ একজোট হয়ে তাদের বিরোধিতা করছেন।

আর ঠিক এ কারণেই বর্তমানে আলেম সমাজের পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র সাফল্যজনক নেতৃত্ব দান করা সম্ভব হচ্ছে না। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কর্মসাধনার ক্ষেত্রে এমন বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যে, অতীতের গবেষণালব্ধ জ্ঞানগর্ভ কিতাব দ্বারা এই পরিবর্তনকে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল করা কঠিন ব্যাপার। শতাব্দীকালের পুঞ্জিভূত আবরণ ভেদ করে সমাধান বের করে আনা কেবলমাত্র কোরআন-হাদীসের আলোকে ইজতিহাদের মাধ্যমেই সম্ভব এবং এটা তখনই সম্ভব হবে, যখন আলেম সমাজ নিজেরা উদ্যোগী হয়ে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিজেদেরকে কোরআন-হাদীসভিত্তিক গবেষণায় নিয়োজিত করবেন। প্রথমে রোগীর রোগ অনুধাবন করতে হবে, তারপর যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে। অতীতে জ্বর হলে কুইনাইন দেয়া হতো, এখন কুইনাইনের স্থলে এন্টিবায়োটিক স্থান দখল করেছে– এ কথা মনে রাখতে হবে।

সম্মানিত আলেম সমাজ! এ কথা অবশ্যই ধ্রুব সত্য যে, বর্তমান বিশ্বে যে হিংসাত্মক যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে, আমার মতে তা পারমাণবিক যুদ্ধের চাইতেও মারাত্মক। কারণ আসলে এটি হচ্ছে War of Civilization সভ্যতার যুদ্ধ তথা ইসলামী আদর্শ মূলোৎপাটনের যুদ্ধ। এ কথা সত্য যে, আমাদের আলেম সমাজ পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে সূচনালগ্ন থেকেই প্রাণান্তকর যুদ্ধ করে আসছেন। কিন্তু নতুন এই মহাবিপদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ হাতে গোণা কয়েকজন ব্যতীত অধিকাংশ আলেম সমাজের কাছে অজানা। মনে রাখতে হবে, ইসলাম সর্বকালে সর্বযুগেই সবথেকে বেশী আধুনিক এবং এই আধুনিকতাকে গ্রহণযোগ্য যুক্তির মাধ্যমে মানুষের সম্মুখে লেখনী ও নতুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। একশ্রেণীর আলেমগণ ইসলামের শিক্ষা ও তার বিধি-ব্যবস্থা প্রচার করার জন্যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তা আধুনিক শিক্ষিত লোকজনকে ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটানোর পরিবর্তে উল্টো বরং তাদের মনে ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করছে। এসব আলেমদের বক্তৃতা ও রচিত গ্রন্থসমূহ কোনো অমুসলিম শুনলে এবং পড়লে ইসলামের প্রতি সামান্যতম আকর্ষণও বোধ করবে না।

মনে রাখতে হবে, মরচে ধরা হাতিয়ার দিয়ে আধুনিক অস্ত্রের মোকাবেলা যেমন করা যাবে না, তেমনি শুধু সেকেলে কল্প-কাহিনী সর্বস্ব ওয়াজ-নসিহত দিয়েও যুগের গতিকে পরিবর্তন করা যাবে না। ইসলামের সর্বাধুনিক রূপ-সৌন্দর্যের ওপর কালের যে আস্তরণ পড়েছে, সে আস্তরণ পরিষ্কার করে ইসলামের প্রকৃত রূপ-সৌন্দর্য বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিজ্ঞানভিত্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে। এ জন্যে নিজেদেরকে চিন্তা-গবেষণায় নিয়োজিত করতে হবে, পাশ্চাত্য সভ্যতার

বুনিয়াদ ও এর দুর্বলতাসমূহ জানতে হবে। অর্জন করতে হবে যুক্তিশক্তি, বুদ্ধিমত্তা, ভাষাশক্তি, শব্দ চয়নশক্তি, প্রয়োগ পদ্ধতি এবং অনুধাবন করতে হবে যথাযথ ক্ষেত্র।

মহান আল্লাহ তা'য়ালার শোকর আদায় করছি এ জন্যে যে, পরিবেশ প্রভাবের মোকাবেলা ও স্থান-কালের পরিবর্তন থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'য়ালা মুসলিম উম্মাহ্কে দু'টি অতুলনীয় নিয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। এর একটি হলো, নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনাদর্শ তথা সীরাত মোবারক, যা প্রত্যেকটি দ্বন্দ্ব ও সঙ্কটে এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে অত্যন্ত সহজভাবে মোকাবেলা করতে সক্ষম। তাঁর মহান শিক্ষার মধ্যে প্রত্যেক যুগের সমস্যা সমাধানের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বিদ্যমান।

আর দ্বিতীয়টি হলো, মহান আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং ইসলামের জীবন্ত আদর্শকে উজ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যেক শতাব্দীতে মুসলিম উম্মাহ্র জন্যে এমন সকল সংস্কারক পাঠাচ্ছেন, যা পূর্ববর্তীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান-ভান্ডার পরবর্তীদের জন্যে স্থানান্তর হচ্ছে এবং নিত্য-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারের মাধ্যমে ইসলামের নীতিসমূহ যুগোপযোগী করে উম্মাহ্র সম্মুখে যৌক্তিক বক্তব্য ও লেখনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করছেন। আর এভাবেই সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মুসলিম উম্মাহ্ই ইসলামী আদর্শকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে 'সন্তান-প্রসবিনী' হিসেবে ইতিহাসে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা অন্য কোনো সম্প্রদায় বা আদর্শের অনুসারীগণ করতে পারেনি। ফলে অন্যান্য আদর্শগুলো যেখানে মৌলিকত্ব হারিয়ে পৃথিবীতে বিকৃত অবস্থায় অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। সেক্ষেত্রে ইসলামই একমাত্র বিশ্ব জুড়ে অগ্রসরমান জীবন্ত আদর্শ হিসেবে আজো স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আলেম সমাজকে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক যুগেই ঈমানদারগণ জ্ঞানের দিক থেকে পরিপক্ক অবস্থায় বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন, অন্য দিকে লাত ও মানাত যেমন যুবক তেমনি তার অনুসারীগণও ধ্বংসাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বুদ্ধিতে অপরিপক্ক যুবকই রয়ে গেছে। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শক্তি প্রত্যেক যুগেই নতুন অবয়বে যুবক-রূপে আবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু শয়তানী বুদ্ধিতে পরিপক্ক যুবক লাত-মানাত কোনো যুগেই জ্ঞান-বৃদ্ধ ঈমানদারদের ওপর বিজয়ী হতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ।

মনে রাখতে হবে, অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় বর্তমান সময় মুসলিম উম্মাহ সবথেকে বেশী ভয়াবহ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী। মুসলিম উম্মাহ্ বর্তমানে এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এই উম্মাহ্র কল্যাণে যে কোনো পদক্ষেপই বাধামুক্ত হবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। মহান আল্লাহর প্রতি নির্ভর করে প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলা করার জন্যে মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে

হবে। আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে, নবী-রাসূলগণ, সাহাবায়ে কেরাম এবং তৎপরবর্তী যুগের চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ কেউ-ই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিয়মতান্ত্রিক পথ পরিহার করে অনিয়মতান্ত্রিক পথে সামান্যতমও অগ্রসর হননি।

বর্তমানে অনেকেই অবচেতনভাবেই দুশমন কর্তৃক উৎসাহিত হয়ে অনিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করে মুসলিম উম্মাহ্‌র অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছেন। ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণ প্রচেষ্টার কর্মকান্ডে কারো মধ্যে যদি সামান্য অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের গন্ধ পাওয়া যায়, তাহলে স্পষ্ট বুঝতে হবে, এরা ইসলামের দুশমনদের দ্বারা পরিচালিত এবং এদেরকে ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে সোপর্দ করতে হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় আমাদের দেশে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার নামে আব্দুর রহমান এবং বাংলাভাই জেএমবি গঠন করে ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করেছে, বিগত এক'শ বছরেও ইয়াহূদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের এত বড় ক্ষতি করতে পারেনি। ইসলামে ষড়যন্ত্র, উগ্রতা, সাম্প্রদায়িকতা, অসহিষ্ণুতা ও সন্ত্রাসের কোনো স্থান নেই। এসব বিভ্রান্ত লোকজনের অপতৎপরতা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বহু পিছিয়ে দিয়েছে।

আবার কে বা কারা রাজধানী ঢাকাসহ মফস্বল শহরের দেয়ালগুলো দখল করে তাতে লিখছে, 'মহিলাদের মসজিদে যাওয়া হারাম, মহিলাদের ঈদের জামায়াতে যাওয়া হারাম, টেলিভিশনে আলেমদের প্রোগ্রাম করা হারাম, নির্বাচন হারাম, ভোট হারাম'। এ মূর্খ জাহিলদের জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন ভোট-নির্বাচন হারাম হলে সরকার পরিবর্তনের উপায় কি?

মূলতঃ এ নির্বোধেরা এসব শ্লোগানের মাধ্যমে একদিকে তারা সন্ত্রাসবাদকেই উস্‌কে দিচ্ছে এবং অন্যদিকে মহিলাদেরকে ইসলামের দেয়া অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাই কোরআন-সুন্নাহর আলোকে দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে ঠান্ডা মাথায় একশ' বছর অপেক্ষা করতে হবে; তবুও কোনো অবস্থায়ই উগ্রপন্থা তথা সন্ত্রাসী তৎপরতাকে বিন্দুমাত্র সমর্থন দেয়া যাবে না এবং মহিলাদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকার প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হতে হবে।

সম্মানিত আলেম সমাজ! পৃথিবীতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যত সম্পদ দান করেছেন, তার অধিকাংশ সম্পদই মুসলিম ভূ-খন্ডে রয়েছে। তৈল ও গ্যাস সম্পদসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের অধিকাংশই রয়েছে মুসলিম ভূ-খন্ডে। বিপুল সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য থাকার পরও এ পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্‌ বিশ্বব্যাপী প্রচার মাধ্যম গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে ইসলামের দুশমনগণ শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলিম ও ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরণের মিথ্যা প্রচার করে মানুষের মনে ইসলাম ও

মুসলিম সম্পর্কে এক ধরণের কল্পিত আতঙ্ক (Panic) সৃষ্টি করেছে। ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ আর মুসলিম মানেই সন্ত্রাসী, এই ধারণা তারা পৃথিবীব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করছে।

আমরা যে দেশে এবং এলাকায় বাস করি, সে দেশে ও এলাকায় অবশ্যই অমুসলিম নাগরিক রয়েছেন। আলেম সমাজ প্রত্যেক ধর্মের পাদ্রী ও পুরোহিত এবং বিশিষ্ট লোকদের দাওয়াত দিয়ে গোল টেবিলে আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নিজেরা কিছু অর্থের ব্যবস্থা করে টিভি চ্যানেল এক ঘন্টার জন্য ভাড়া নিয়ে সেখানেও উন্মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। অমুসলিম নেতৃবৃন্দকে মুক্ত মনে ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়ে উদ্ভূত প্রশ্নের যুক্তি সম্মত জবাব দিয়ে তাদের মন থেকে ইসলাম সম্পর্কিত সংশয়-সন্দেহ দূর করার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ইসলামে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাসবাদের গন্ধও নেই এবং মুসলমানরাই যে পৃথিবীতে সবথেকে সহনশীল, ধৈর্যশীল, পরোপকারী, অন্যের কল্যাণকামী, শান্তিকামী, সত্যবাদী, ইনসাফকারী, আমানতদার এবং পরধর্ম সহিষ্ণু জাতি ইত্যাদি বিষয়সমূহ গোল টেবিল আলোচনায় কোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তুলে ধরতে হবে। মুসলিম শাসকদের স্বর্ণালী শাসন সম্পর্কে জানাতে হবে। তাহলে সাধারণ অমুসলিমদের কাছে প্রচার মাধ্যমের মিথ্যা প্রচারণা স্পষ্ট হয়ে যাবে। তাঁরা মুসলমানদের কাছাকাছি আসবেন এবং ইসলামকে জানার চেষ্টা করবেন।

আমি অনেক অমুসলিমদের সাথে কথা বলে অনুভব করেছি, ইসলামে বহু বিবাহ, তালাক ব্যবস্থা, নারীর অধিকার এবং পর্দা প্রথার ব্যাপারে সঠিক তত্ত্ব না জানার কারণে তারা সন্দেহ-সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন। পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক তত্ত্ব জানাতে হবে। নিজ স্ত্রীকে রেখে অন্যের স্ত্রী ও পর নারীদের নিয়ে ক্লাবে, হোটেলে ফুর্তি করতে যাওয়া উত্তম, না প্রয়োজনে একের অধিক বিয়ে করা উত্তম? পর নারীর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করা পাশ্চাত্যের জনগণও অনুচিত বলে মনে করে তা আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টনের সাথে মনিকার সম্পর্কের বিষয়টিই বড় প্রমাণ। তাদের ধর্মে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকলে ক্লিন্টন-মনিকার বিষয়টি দুনিয়া জুড়ে নিন্দিত হতো না।

ইসলাম একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে বাধ্য করা দূরে থাক বরং নিরুৎসাহিত করেছে। পরিস্থিতি বাধ্য করলে এবং কারো একান্ত প্রয়োজন হলে পরনারীর দিকে হাত না বাড়িয়ে বা জেনা-ব্যভিচারের মতো ঘৃণ্য পথে না গিয়ে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

সৃষ্টিগতভাবে মানুষ নানা স্বভাব-প্রকৃতির হয়ে থাকে। কারো মন-মানসিকতা হয়

কোমল প্রকৃতির আবার কারো তা কঠোর প্রকৃতির। দাম্পত্য বা পারিবারিক জীবনে স্ত্রী বা স্বামী ক্ষেত্র বিশেষে কেউ একজন কঠোর প্রকৃতির হতে পারে। কারো শারীরিক অক্ষমতাও থাকতে পারে বা বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হবার পরেও রোগের কারণে শারীরিক অক্ষমতা দেখা দিতে পারে। আবার উভয়ের কেউ একজন স্বভাবের দিক দিয়ে অবাধ্য, ইসলামী শরীয়াত লংঘনকারী, চরিত্রহীন, অত্যাচারী ও নির্যাতকও হতে পারে। এ অবস্থা থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই ইসলামে তালাক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

তবে এ বিষয়টি স্মরণে রাখতে হবে ইসলাম এই বিষয়টি মানব সম্প্রদায়ের কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হালাল কাজের মধ্যে মহান আল্লাহর কাছে আকাশের নীচে ও যমীনের বুকে তালাক এবং ভিক্ষাবৃত্তির মতো ঘৃণ্য কাজ আর দ্বিতীয়টি নেই। শেষ পর্যায় পর্যন্ত তালাকের বিষয়টি এড়িয়ে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা সমাধানের যখন সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন বঞ্চিতজনের অধিকার প্রদান এবং নির্যাতনের কবল থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই তালাক গ্রহণের বিষয়টি সম্মুখে আনা হয়েছে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কারো একজনের শারীরিক অক্ষমতা মেনে নিয়ে কেউ যদি দাম্পত্য জীবনের বন্ধন অটুট রাখতে চায়, এ ব্যাপারেও যেমন ইসলাম উৎসাহিত করেছে, তেমিন বন্ধন ছিন্ন করারও সুযোগ রেখেছে। দাম্পত্য জীবনে নির্যাতকের প্রতি ইসলাম যেমন নিন্দার তীর ছুড়ে পরকালীন শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছে, তেমনি নির্যাতকের কবল থেকে মুক্তি লাভের স্বাধীনতাও দিয়েছে।

হিন্দু এবং খৃষ্টধর্মে তালাক ব্যবস্থা নেই। স্বামী-স্ত্রীর কেউ একজন শারীরিকভাবে অক্ষম হলে বা উভয়ের কেউ একজন নির্যাতক হলেও এই করুণ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের কোনো ব্যবস্থা এসব ধর্মে রাখা হয়নি।

বিধবা বিবাহ ধর্মীয়ভাবে হিন্দুদের মধ্যে নিষিদ্ধ। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ আন্দোলন করে সতীদাহ প্রথা আইনগতভাবে নিষিদ্ধ ও বিধবা বিবাহ বৈধ করেছেন। খুবই মানবতাবাদী কাজ করেছেন তাঁরা। স্বামী মারা গেলে বিধবাগণ বিয়ে করতে পারবে না বিধায় তাদেরকে জীবত অবস্থায় মৃত স্বামীর চিতায় উঠিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করা হবে, এই প্রথাটি ছিলো খুবই নিষ্ঠুর প্রথা। একজন বিধবা নারীও তো মানুষ এবং মানুষের মৌলিক সকল চাহিদা তার মধ্যে রয়েছে। একজন নারীর মৌলিক চাহিদাকে নিষ্ঠুরভাবে গলা টিপে হত্যা করার মতো জঘন্য কাজ আর কিছুই নেই। সক্ষম পুরুষের যেমন নারীসঙ্গ প্রয়োজন, তেমনি সক্ষম সুস্থ নারীরও পুরুষসঙ্গ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন অস্বীকার করে নারীকে মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য করা নিতান্তই অমানবিক কাজ।

নারী সম্পর্কে অমুসলিমদের জানাতে হবে, ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে তিনগুণ বেশী মর্যাদা দিয়েছে। পৃথিবীর কোনো কোনো ধর্ম নারীকে 'মানুষ' হিসেবে গণ্য করে না এবং তাদের কোনো অধিকারও স্বীকার করে না। পিতৃ বা স্বামী-সন্তানের ধন-সম্পত্তিতে নারীর কোনো অধিকার নেই। ইসলাম এই অধিকার দিয়ে সম্মান-মর্যাদার উচ্চ আসনে আসীন করেছে। নারীর জন্যে পৃথক কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে উপার্জনের অধিকার দিয়েছে। শিক্ষা গ্রহণ করা বা জ্ঞান অর্জন শুধুমাত্র পুরুষের প্রতি ইসলাম ফরজ করেনি, নারীর প্রতিও ফরজ করেছে। নারী যদি জ্ঞানী, রুচিবান, ভদ্র, নম্র, বিনয়ী, সহিষ্ণু ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত না হয়, তাহলে সে সন্তানকে উত্তম গুণাবলী শিক্ষা দিবে কিভাবে? বলাবাহুল্য শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত উত্তম গুণাবলী শেখা যায় না।

লোহা এবং স্বর্ণ দুটোই ধাতু। একটি ধাতু সংরক্ষণে প্রহরা বা যত্নের প্রয়োজন হয় না। বড় বড় ইমারত নির্মাণের জন্যে বা অন্যান্য কাজে প্রচুর লোহা প্রয়োজন হয়। এসব লোহা ক্রয় করে আলমারী বা সিন্দুকে অথবা ব্যাংকের লকারে কেউ রাখে না। কিন্তু স্বর্ণের পরিমাণ কম বেশী যাই-ই হোক না কেনো, তা সিন্দুকে বা আলমারীতে রেখে তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়। পরিমাণে বেশী হলে ব্যাংকের লকারে রাখা হয়। এ জন্যেই রাখা হয় যে, স্বর্ণ মূল্যবান ধাতু। অযত্নে অবহেলায় রাখলে তা চুরি হয়ে যাবে।

তেমনি নারীও পুরুষের তুলনায় সৃষ্টিগতভাবে মর্যাদাসম্পন্ন ও মূল্যবান। মানব বংশ বৃদ্ধিকরণে এবং সন্তান-সন্ততি লালন-পালনে পুরুষের তুলনায় নারীর অবদান বেশী। পুরুষের কাছে নারীকে আকর্ষণীয়ভাবে সৃষ্টি করে নারীকে পুরুষের জন্যে অনুপ্রেরণা দায়িনী বানানো হয়েছে। একজন পুরুষ যখন জীবন সঙ্গিনী হিসেবে একজন নারীকে বিয়ে করে, তখন সে পুরুষ অবচেতনভাবেই সংসার সাজানোর কাজে একমাত্র নারীর জন্যেই অনুপ্রাণিত হয়। পৃথিবীর সকল কঠিন কাজের দায়ভার থেকে নারীকে মুক্তি দিয়েছে ইসলাম। নারী ও পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সৃষ্টিগতভাবেই আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আকর্ষণই পারিবারিক জীবনের দৃঢ় বন্ধনের মূল ভিত্তি।

নারী ও পুরুষের পরস্পরিক অবাধ মেলামেশা পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তিকে বিনষ্ট করে জীবনকে বিষিয়ে তোলে এবং পরিশেষে পরিবার ভেঙ্গে যাওয়া থেকে শুরু করে অন্যান্য মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দেয়। পারিবারিক অশান্তি মানসিক অশান্তির কারণ এবং এই অশান্তিই স্বামী-স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে আত্মহননের পথে এগিয়ে দেয়। পরিবারে শান্তি না থাকলে সন্তান-সন্ততিও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এর বাস্তব প্রমাণ বহন

করছে বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকার দেশসমূহ। সেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কারণে পারিবারিক বন্ধন বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। মুসলিম দেশসমূহেও যেসব পরিবারে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা রয়েছে, সেসব পরিবারে তালাকের আধিক্য দেখা দিয়েছে।

পবিত্র কোরআন-হাদীসে অমুসলিমদের উপাস্য দেব-দেবী সম্পর্কে কটুক্তি করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাদের ধর্মীয় ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, তাদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফ করার আদেশ দেয়া হয়েছে, এ সকল বিষয় অমুসলিমদের সাথে গোল টেবিল আলোচনায় আমাদের আলেম সমাজ তুলে ধরতে পারেন। আর এই দায়িত্ব পালন করার জন্যে প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করা প্রয়োজন।

আজকের এ [illegible] আমি এ কথা স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেছি যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠা ব্যতীরেকে বিশ্বে শান্তি রক্ষা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই সার্বজনীন ইসলামের ধারে কাছে যাতে মানুষ না আসতে পারে, তজ্জন্য ইসলাম বিদ্বেষীরা সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোল-টেবিল বৈঠক, কবিতা-সাহিত্য, সংস্কৃতি, গান-বাজনা, নাটক সিনেমা, এনজিও, পত্র-পত্রিকা, যাত্রা-থিয়েটার, টিভি চ্যানেলসহ বহুবিধ মাধ্যম অবলম্বন করেছে।

সমাজকে ধর্মচ্যুত অর্থাৎ ইসলাম থেকে নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, শিশু-কিশোর নির্বিশেষে গুষ্ঠি শুদ্ধ সবাইকে বের করে আনার জন্য রাতদিন পরিশ্রম করছে। প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে, সময় ব্যয় করছে এবং সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এরা ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধে প্রচার মাধ্যমগুলোয় নির্লজ্জ মিথ্যাচার করেই যাচ্ছে। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে একই ভাঙ্গা রেকর্ড 'হিজ মাস্টার ভয়েজ' জাতিকে শোনাচ্ছে। প্রয়োজনে জেল-জরিমানারও ঝুঁকি নিচ্ছে। গোটা মস্তিষ্ক জুড়ে তাদের চিন্তা-চেতনা 'যেভাবেই হোক রাষ্ট্রকে ইসলাম মুক্ত করো, যতো প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে ইসলাম আছে, যতো সংগঠন ইসলামপন্থী আর দেশ বিখ্যাত ইসলামী ব্যক্তিত্ব যাঁরা রয়েছেন, তাদের বদনাম করো, তাদেরকে জনসম্মুখে হেয়-প্রতিপন্ন ও নিন্দনীয় করো'।

মজার ব্যাপার হলো, এসব ঘৃণিত কাজ কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান করছে না, বিপুল অর্থের বিনিময়ে এ ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নামানো হয়েছে মুসলিম নামধারী অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক, কবি-সাহিত্যিক, কলামিষ্ট, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এমনকি পরিচিত আলেম বা পীরের সন্তানদেরকেও। ইসলাম বিদায় হোক, মুসলমান ঈমান হারাক, দেশ ধ্বংস হোক, মুসলিম যুবক-যুবতী জাহান্নামে যাক এতে এদের কিছুই আসে যায় না। এদের লালসার দৃষ্টি শুধু অর্থের দিকে।

পৃথিবীতে কোনো ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে

এত লেখালেখি এবং এতটা বিষোদ্গার করে না, যতটা আলোচনা সমালোচনা ও বিদ্বেষপূর্ণ মিথ্যা লেখালেখি করে আমাদের দেশের মুসলমান নামধারী কুলাঙ্গারেরা ইসলাম, ইসলামী সংগঠন ও ইসলামী ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধে।

এসব ব্যাপারে দেশের আলেম সমাজকে আরো সচেতন হতে হবে। ইসলামের ছদ্মাবরণে অথবা প্রকাশ্যে কারা ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা করছে; আর ইসলামের জন্য কারা নিবেদিত, কারা সততা-স্বচ্ছতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ তাদেরকে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং ঈমানী জযবা নিয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হতে হবে। দেশ এখন 'নো-রিটার্ণ পয়েন্ট'-এ অবস্থান করছে। হয় ফুলের বাগান না হয় গোরস্থান। আপনি কোনটি চান? সিদ্ধান্ত নেয়ার এখনই সময়।

সম্মানিত আলেম সমাজ! আপনারা দেশটিকে দুর্নীতি মুক্ত পরিবেশে শান্তি, স্বস্থি, উন্নতি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে চান এটাই আমার বিশ্বাস। এ জন্যে যা যা করণীয় তা হচ্ছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى، وَلاَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ–

তোমরা (শুধু) নেক কাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারেই একে অপরের সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে (কখনো) একে অপরের সহযোগিতা করো না। (সূরা মায়িদা– ২)

এই আয়াতের মর্মানুযায়ী সরকার কর্তৃক গৃহীত সৎ কাজ ও সৎকর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্ব-স্ব অবস্থানে থেকে যতটা সম্ভব জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতা করা এবং অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা উচিত। যেমন বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান, এ কাজে প্রত্যেকেরই উচিত যার যার অবস্থানে থেকে দুর্নীতি ও চিহ্নিত দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা।

জ্ঞানের পরিধি পড়া-শোনার মাধ্যমে আরো শানিত করতে হবে, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে এবং বুদ্ধি দীপ্ত চোখ-কান খোলা রেখে ইসলামের বন্ধু ও দুশমন চিনতে হবে। ইসলাম মৌলবাদ নয়, সাম্প্রদায়িক নয়, জঙ্গীবাদ নয়, উগ্রপন্থী নয়– বরং ইসলাম জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে দল-মত সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সার্বজনীন জীবনাদর্শ এ কথা বিজ্ঞান সম্মত যুক্তির মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষিতদের বোঝাতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সেকুলারপন্থী, পাশ্চাত্যপন্থী, শাসকশ্রেণী, রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ এসব এলিট শ্রেণীর সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপে অংশ নিতে হবে এবং তাদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

পৃথিবীর অর্ধেক জনশক্তি নারী। পৃথিবীর কোনো ধর্ম বা মতাদর্শ নারীকে অতটা মর্যাদা দেয়নি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যতটা মর্যাদা ও অধিকার ইসলাম নারীদেরকে দিয়েছে বিষয়গুলো নারীদের জানাতে হবে। পর্দার বিষয়টিও তাদেরকে ব্যাখ্যা সহকারে বোঝাতে হবে। পর্দা প্রগতির অন্তরায় নয়, এটা নারীর সম্ভ্রম রক্ষায় আল্লাহ প্রদত্ত হাতিয়ার। বোরকা, হিজাব, নিকাব নারীর পবিত্র সৌন্দর্য বর্দ্ধক ফ্যাশনও বটে। এ বিষয়গুলো নারীদেরকে বোঝাতে হবে এবং পর্দা সহকারে মসজিদ- ঈদগাহে পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের সম্মানজনক অধিকার দিতে হবে। মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আলেম সমাজের দায়িত্ব সর্বাধিক।

জীবন পরিচালনায় ইসলাম যেখানে যতটা সহজ নীতি অবলম্বন করেছে ইজতিহাদের নামে তা কঠিন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর আদৌ পসন্দনীয় নয়। এ বিষয়ে কোরআনুল কারীমের কয়েকটি আয়াত লক্ষ্য করুন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ–

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের (জীবন) সহজ করে দিতে চান তিনি তোমাদের (জীবন) জটিল করতে চান না। (সূরা বাকারা-১৮৫)

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ، وَخُلِقَ الاِنْسَانُ ضَعِيْفًا–

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান (কারণ) মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সূরা নিসা-২৮)

مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ–

আল্লাহ তা'য়ালা কখনো তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না। (সূরা মায়িদা-৬)

ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ–

এটা তোমাদের রব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সহজকরণ (যা তোমাদের জন্য তাঁর) বিশেষ অনুগ্রহ। (সূরা বাকারা-১৭৮)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا–

আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাউকে তার শক্তি- সার্মর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। (সূরা বাকারা-২৮৬)

যে কোনো ইমারতের দীর্ঘ স্থায়ীত্ব নির্ভর করে তার ফাউন্ডেশনের মজবুতির ওপরে,

ঠিক তেমনি মুসলিম জাতির মর্যাদার সাথে টিকে থাকা এবং দুনিয়া আখিরাতের সাফল্য নির্ভর করে তার তাওহীদ ভিত্তিক নির্ভেজাল ঈমানের ওপরে। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আলেম সমাজকে তাওহীদ, শিরক্ ও বিদয়াত সম্পর্কিত নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলো ব্যাপক অধ্যয়ন করতে হবে এবং জাতিকে সতর্ক করতে হবে।

আমিরুল মুমিনীন হযরত উমার ফারুক (রাঃ) বলেছেন, 'জামায়াত বদ্ধ জীবন ছাড়া ইসলাম চলে না (স্থবিরতা এসে যায়)।' সুতরাং ইসলামের গতিশীলতার জন্য এবং নিজের অর্জিত ইল্‌ম ও আল্লাহ প্রদত্ত মেধা, প্রজ্ঞার উত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেকে শরীক করতে হবে।

সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের স্থায়ী দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে এখানে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়া সত্বেও এখানকার অধিকাংশ মুসলিম নর-নারীর নিকট তাওহীদের ধারণা সুস্পষ্ট নয় বলে এখানে সওয়াবের নিয়তেও শির্‌ক বিদয়াত চালু রয়েছে।

মসজিদের নগরী ঢাকা ভাস্কর্যের নামে মূর্তির নগরীতে পরিণত হচ্ছে। সংস্কৃতির নামে অশ্লীলতা বেহায়াপনার চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে গেছে।

তাসাউফের নামে একশ্রেণীর লোকজন আল্লাহর দ্বীনকে বিকৃত করছে এবং এ মহান বিষয়টিকে ব্যবসার মাধ্যমে পরিণত করছে। আর এরই মাঝে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নামের পরজীবী ও প্রতিবেশী দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে নিয়োজিত রাজনীতিকরা বিভিন্ন চেতনার নামে ইসলাম ও রাজনীতিকে পৃথক করে ধর্মনিরপেক্ষতার কুফ্‌রী ট্যাপলেট গেলানোর চেষ্টা করছে।

আরেক শ্রেণীর টক্‌শোজীবীরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দখল করে তরুণ প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছে, 'ইসলামে রাজনীতি নেই, ইসলামে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, শ্রমিকের অধিকার ও সংখ্যা লঘুদের অধিকার নেই। ইসলাম সেকেলে, মানুষকে পেছনের দিকে নিয়ে যায়, ইসলামে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ নেই, ইসলাম যুক্তি নির্ভর নয়, বিশ্বাস নির্ভর ধর্ম। ইসলামের ইতিহাস মারামারি কাটাকাটি আর রক্তারক্তির ইতিহাস। ইসলাম জিহাদের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ সমর্থন করে। মাদ্রাসা গুলোয় জঙ্গীবাদের ট্রেনিং দেয়া হয়।'

অহরহ ইসলামের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যাচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে চলছে। এ ধরণের শয়তানী বক্তব্যের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ওলামায়ে কেরামকে এগিয়ে আসতে হবে। কোরআন- হাদীস ও আধুনিক জ্ঞান- বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে বক্তব্যকে

যুক্তি ভিত্তিক শানিত করে ইসলাম বিদ্বেষিদের সার্থক মোকাবেলা করতে হবে ও ওলামা সমাজকে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, জুম্‌আর খুত্‌বা ও বৈঠকি আলোচনায় তাদের ইসলাম বিরোধী বক্তব্যের জবাব দিতে হবে যোগ্যতার সাথে, উত্তম নসীহতের মাধ্যমে।

দাওয়াত দেয়ার সঠিক পদ্ধতি

ইসলামী জীবন ব্যবস্থা একান্ত অনুগ্রহ করে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানব জাতির প্রতি দান করেছেন এবং এ জীবন ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে কিভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে এবং আহ্বানকারীর নিজস্ব ভাষার ধরণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি কেমন হবে, তাও আল্লাহ তা'য়ালাই শিখিয়ে দিয়েছেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ–

হে নবী! আপনি আপনার মালিকের পথে মানুষদের প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করুন, কখনো তর্কে যেতে হলে আপনি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করুন যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা। আপনার মালিক এটা ভালো করেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথগামী হয়ে গেছে, আবার যে ব্যক্তি হেদায়াতের পথে রয়েছে তিনি তার সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত আছেন। (সূরা নাহল-১২৫)

পবিত্র কোরআনের সূরা আন্ নাহ্‌লের উল্লেখিত আয়াতে ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আহ্বানের জন্য মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে পদ্ধতি অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছেন, তা শুধু মাত্র নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিই প্রযোজ্য নয়, বরং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেকটি সচেতন মুসলিম নর-নারীর প্রতি প্রযোজ্য। মানুষকে ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি আহ্বান জানানোর মহান দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অর্পিত এবং এটি একটি ফরজ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব কতদিন, কত মাস, কত বছর বা কত যুগব্যাপী পালন করতে হবে তা উল্লেখিত আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেয়া না হলেও যে মহামানবের প্রতি উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিলো, তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম উক্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন জীবনের শেষ মূহর্ত পর্যন্ত। সুতরাং যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিত থাকা পর্যন্ত দ্বীনের প্রতি আহ্বানের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আর এ দায়িত্বকেই ইসলামী শরীয়াতের পরিভাষায় বলা হয়েছে 'দাওয়াতে দ্বীন' বা দ্বীনের প্রতি আহ্বান।

প্রত্যেক নবী-রাসূল তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি অর্পিত মৌলিক দায়িত্ব বা কাজই ছিলো 'ইক্বামাতে দ্বীন' তথা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করা বা ইসলামী জীবন বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। আর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সূচনামূলক কাজের নামই হলো 'দাওয়াতে দ্বীন' বা দ্বীনের প্রতি আহ্বান। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সাঃ) কে বিশ্বনবী ও সর্বশেষ নবী- রাসূল হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের তুলনায় তাঁর দায়িত্বের গুরুত্ব ও পরিধি ছিলো সর্বাধিক। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর মাধ্যমেই কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে একটি পূর্ণাঙ্গ উম্মাতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন এবং নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের পরে দাওয়াতে দ্বীনের দায়িত্ব এই উম্মাতের প্রতি অর্পিত হয়েছে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর ধারক- বাহক তথা আলেম সমাজের দায়িত্ব এ ব্যাপারে সর্বাধিক। তাঁরা প্রত্যেক দেশ, জাতি-গোষ্ঠী এবং ভাষাভাষীর কাছে দ্বীনের দাওয়াত নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী পৌঁছে দিবেন তথা মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাবেন। এই আহ্বানের ধরণ শুধু মৌখিক আহ্বানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সূরা নাহ্লের উল্লেখিত আয়াতের প্রথম শব্দটি হলো اُدْعُ 'উদ'উ' অর্থাৎ আহ্বান করো। এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ এবং এ শব্দটি ব্যবহার করে দ্বীনের দাওয়াত দানকারীর জন্য দাওয়াত প্রদানের ব্যাপক ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং দাওয়াত প্রদানের শরীয়াত সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ কথা, কাজ, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, আচার- আচরণ, ব্যবহার, বক্তৃতা, লেখনী ইত্যাদীর মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের সৌন্দর্য্য তুলে ধরে মানুষকে এর প্রতি আকৃষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এই প্রচেষ্টা সমগ্র জীবন ব্যাপী জারী রাখারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সূরা নাহ্লের উল্লেখিত আয়াতে بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ 'বিল হিক্মাতে ওয়াল মাও ই'যাতিল হাসানাহ্' অর্থাৎ 'প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা।' এ বাক্যটিও এমনএকটি ব্যাপক অর্থবোধক বাক্য যে, এর সহজে পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ মানব স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বনে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করতে হবে। এক কথায় নবী করীম (সাঃ) দাওয়াতের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। জীবনের সকল দিক প্রয়োগ করে দাওয়াত প্রদানের ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) যে ধৈর্য্য, বিনয়, আবেগ, দরদ, পরিশ্রম, নিঃস্বার্থতা, একাগ্রতা, ভাষা ও বলার ক্ষেত্রে বাগ্মিতা, ভালোবাসা ইত্যাদি প্রদর্শন করে দাওয়াতের কাজ করেছেন, সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হবে।

তরুণ-যুবকদের প্রতি দৃষ্টি দিন

সম্মানিত আলেম সমাজ! নবী করীম (সাঃ) তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী যে পদ্ধতিতে দাওয়াতে দ্বীনের কাজ করেছেন, এর সমগ্র বিষয়টি সম্মুখে রাখলে কতক বিষয় স্পষ্ট অনুভব করা যায় তাহলো, তাঁর আকর্ষণীয় বাচন ভঙ্গী, অব্যর্থ যুক্তি, বাগ্মিতা, অন্যের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালোবাসা প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমেই তিনি প্রতিপক্ষের চিন্তাধারায় বিপ্লব সাধন করেছিলেন। লক্ষ্য করুন, 'সা-বিকুনাল আওয়ালীন' তথা প্রাথমিক যুগে সেই অগ্নিঝরা কঠিন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের বয়সের বিষয়টি চিন্তা করুন। সকলেরই বয়স একমাত্র খাদিজা (রাঃ) ব্যতীত সকলেরই বয়স ছিলো চল্লিশের নীচে। হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন মাত্র আট বছরের শিশু। হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন ৩৭ বছরের যুবক। হযরত উমার (রাঃ) ছিলেন ২৬ বছর বসের পরিপূর্ণ যুবক। হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন ২২ বছরের যুবক। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) ছিলেন ১৭ বছরের তরুণ। হযরত জায়েদ বিন হারেসা (রাঃ) ছিলেন ২২ বছরের যুবক। হযরত যুবাইর বিন আওয়াম (রাঃ) ছিলেন ১৮ বছরের তরুণ। হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) ছিলেন ১৭ বছরের তরুণ। এভাবে অন্যান্যদের মধ্যে কেউ ছিলেন কিশোর, কেউ ছিলেন তরুণ কেউ বা ছিলেন যুবক। অন্য দিকে ইসলামের সাথে যারা বিরোধিতা করেছে, তাদের সকলেরই বয়স ছিলো চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে। যেমনঃ উৎবা, শাইবা, মুগীরা, আবু জাহ্ল, আবু সুফিয়ান প্রমুখ।

নবী করীম (সাঃ) শিশু, কিশোর, তরুণ ও যুবকদের প্রাণভরে ভালোবাসতেন। তিনি যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য মদীনার প্রবেশ পথের দু'পাশে কিশোর তরুণরা দাঁড়িয়ে গেলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে বাহন থেকে নেমে কিশোর-তরুণদের মাথায় হাত মোবারক রেখে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়ে পবিত্র মুখে হাসি ফুটিয়ে পরম মমতাভরে জানতে চাইলেন, 'তোমরা কি আমাকে ভালোবাসবে?' কিশোর তরুণরা অসীম শ্রদ্ধাভরে জবাব দিয়েছিলো, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! শুধু ভালোবাসা! প্রয়োজনে আমরা আপনার জন্যে আমাদের প্রাণ উৎসর্গ করবো।'

এটি শুধু সেই কিশোর- তরুণদের মুখের কথাই ছিলো না, বদর ওহূদের রণপ্রান্তরে তাঁরা শাহাদাতবরণ করে রাসূলের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণও দিয়েছিলেন। তরুণ যুবকদের রক্তই হলো ইসলামের ফাউন্ডেশন, তাঁদের অসীম ত্যাগের বিনিময়েই ইসলাম বিজয়ীর আসন অলঙ্কৃত করেছে। আর ঠিক এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) কিশোর, তরুণ ও যুবকদের প্রাণভরে ভালোবাসতেন। এক সমাবেশে নবী করীম

(সাঃ) বক্তব্য রাখছেন, তরুণ সাহাবী হযরত জারীর (রাঃ) এক কোণে দাঁড়িয়ে বক্তব্য শুনছেন এবং খেজুর খাচ্ছেন। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) দৃষ্টি মোবারক তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হলো। তিনি নিজের পবিত্র চাদরটি হযরত জারীর (রাঃ) এর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন, 'জারীর তুমি দাঁড়িয়ে আছো কেনো, এই নাও আমার চাদরের ওপর তুমি বসো।' হযরত জারীর দু'হাতে পবিত্র চাদর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, বারবার চাদরে চুমো দিলেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়লো, তিনি কান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক! আল্লাহ্ তা'য়ালা আপনার মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করে দিন, আপনি আমাকে সম্মানিত করেছেন। আমি কি পারি আপনার চাদরের ওপর বসতে!'

দাওয়াতে দ্বীনের কাজে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক অবলম্বিত মায়া-মমতা ও ভালোবাসার কারণেই কিশোর, তরুণ ও যুবকরা তাঁর জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করতে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্তও দেখুন, তরুণ যুবকরাই ইক্বামাতে দ্বীন তথা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজের প্রিয় জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। এ জন্যে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের সাথে গভীর মায়া-মমতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে এবং দক্ষতার সাথে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি দাওয়াত যিনি দেবেন, তিনি যে বিষয়ে অন্য মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন, সে বিষয়ে তাকে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং মানুষকে আহ্বান জানাতে হবে বুদ্ধিমত্তার সাথে ও সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে। শ্রুতি মধুর ভাষায়, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাওয়াত দিতে হবে।

যাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, দাওয়াত দানকারী সর্বপ্রথমে তার মন-মানসিকতার প্রতি দৃষ্টি দেবেন এবং দাওয়াত দানকারীকে একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। রোগী কোন্ রোগে আক্রান্ত, তা যদি ডাক্তার সঠিকভাবে বুঝতে ব্যর্থ হন, তাহলে তার যাবতীয় চিকিৎসাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, কোন প্রক্রিয়ায় দাওয়াত দিলে সেই ব্যক্তি দ্বীনের কথাগুলো চম্বুকের মতোই গ্রহণ করবে এবং তার ভেতরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলতে হবে। যারা ওয়াজ-বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদেরকেও লক্ষ্য রাখতে হবে-তার সামনে শ্রোতাদের ধরন কেমন। তিনি কোন্ ধরনের শ্রোতাদের সামনে কথা বলছেন, তা অনুধাবন করতে হবে। কারণ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা বোকামী বৈ আর কিছু নয়।

শ্রোতা কোন্ ধরনের কথা ধারন করার উপযুক্ত, তার মন-মানসিকতা কথা শোনার অনুকূলে রয়েছে কিনা, তা অনুধাবন করে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। মানুষ কেউ-ই সমস্যা মুক্ত নয়, সর্বোত্তম কথাও সমস্যার ভারে ভারাক্রান্ত মানুষের মনে বিরক্তি সৃষ্টি করে। কিন্তু তার বাহ্যিক প্রকাশ না ঘটিয়ে ভদ্রতার খাতিরে কথা শুনতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু তার মনে ভিন্ন চিন্তার ঝড় বইতে থাকে। দাওয়াত দানকারীর কথার প্রতি সে মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হয়। এ জন্যে দাওয়াত দেয়ার জন্য উপযুক্ত সময় নির্ধারণ করতে হবে। মানুষ ক্ষুধার্ত রয়েছে, রোগ যন্ত্রণায় অস্থির, জরুরী কোনো সমস্যায় নিপতিত হয়ে কোথাও তার যাওয়া প্রয়োজন, এসব দিকে দৃষ্টি রেখে সঠিক সময় নির্ধারণ করে দাওয়াত পেশ করতে হবে। অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় দাওয়াত দিলে তা কার্যকর হবে, সেই অবস্থার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে দাওয়াতী কাজ করতে হবে।

দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে জটিল কোনো বিষয়ের অবতারণা করা যাবে না এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক বা কথা এড়িয়ে যেতে হবে। শ্রোতা যদি অনুভব করে যে, লোকটি তার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করছে, তাহলে তার মনে দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে। সুতরাং এমন কোনো আচরণ বা কথা বলা যাবে না, যা শ্রোতাকে দাওয়াত গ্রহণের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতা এ কথাই যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, লোকটি প্রকৃতপক্ষেই আমার প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আন্তরিক। 'আমাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে পরিচালিত করার জন্য লোকটি আন্তরিকতার সাথেই আমাকে দাওয়াত দিচ্ছে, লোকটি সত্যিকার অর্থেই আমার কল্যাণকামী'-দাওয়াত দানকারী সম্পর্কে শ্রোতার মনে উক্ত ধারণা সৃষ্টি হলে দাওয়াতী কাজে অতি সহজেই সফলতা অর্জন করা যায়।

ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে কাউকে বাহ্যিকভাবে কাঙ্খিত পথে সাময়িকের জন্যে আনা গেলেও তা স্থায়ী হয় না। আর আদর্শিক ক্ষেত্রে তো এটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আদর্শের প্রতি কাউকে আকৃষ্ট করতে হলে উক্ত আদর্শের বাস্তব নমুনা যেমন দাওয়াত দানকারীকে স্বয়ং হতে হয় এবং আহ্বানের ভাষা হতে হবে হৃদয়স্পর্শী। দেখুন ফিরআউনের মতো একজন দাম্ভিক, অহঙ্কারী, অত্যাচারী জালিমের নিকট দাওয়াত দেয়ার কি সুন্দর মমতা জড়ানো হৃদয়স্পর্শী বাক্য হযরত মূসা (আঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা শিখিয়ে দিলেন-

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى، فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰى اَنْ

تَزَكّٰى، وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى-

যাও ফিরআউনের কাছে, কারণ সে বিদ্রোহ করেছে। তাকে জিজ্ঞেস করো, তুমি কি ঈমান এনে পবিত্র হতে চাও? তাকে এও বলো, আমি তোমাকে তোমার মালিকের কাছে পৌঁছার একটা পথ দেখাতে পারি, এতে তুমি হয়তো তাঁকে ভয় করবে। (সূরা নাযিয়াত- ১৭-১৯)

হযরত মূসা (আঃ) ফিরআউনকে ভয়-ভীতি বা হুমকি প্রদর্শন করেননি, মমতা জড়ানো ভাষায় বলেছেন, 'তুমি যদি নিজেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করতে চাও তাহলে তোমাকে আমি এমন একটি পথের সন্ধান দিতে পারবো, যে পথ তোমাকে তোমার মালিকের কাছে নিয়ে যাবে, তুমি তাঁর প্রিয় পাত্রে পরিণত হতে পারবে।' ঠিক একইভাবে হযরত নূহ (আঃ)ও চরম অবাধ্যতা ও নোংরামীতে নিমজ্জিত তাঁর জাতিকে দিনে-রাতে, গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহর পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ)ও তাঁর পিতাকে গভীর মমতায় ডাক দিয়ে বলেছেন, 'আমার আব্বাজান, আমার কাছে সত্য এসেছে, আপনি তা গ্রহন করে নিজেকে সত্য পথের অনুসারী বানিয়ে নিন।' হযরত ইউসুফ (আঃ)ও কারাগারে বন্দী অবস্থায় অন্যান্য বন্দীদের এভাবে আহ্বান জানিয়েছেন, 'হে আমার কারাগারের বন্ধুরা!' হযরত লূকমান (আঃ)ও তাঁর সন্তানকে 'এই ছেলে, আমার সন্তান' এভাবে আহ্বান না করে বলেছেন, 'হে আমার কলিজার টুকরা, নয়নের নিধি' অর্থাৎ তিনি 'ইয়া ইবনী' শব্দ ব্যবহার না করে 'ইয়া বুনাই-ইয়া' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

এভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজ নিজ জাতিকে যে ভাষায় এবং ভঙ্গিতে আহ্বান করেছেন, এর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে- তাঁরা সর্বোত্তম নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আম্বিয়ায়ে কেরামের আহ্বানের ধরন পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করে পরবর্তী কালের 'দা'য়ী'দেরকে শিক্ষা দিয়েছেন, কিভাবে কোন্ পদ্ধতি এবং কোন্ ধরনের শব্দ চয়ন করে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতে হবে।

সর্বোৎকৃষ্ট পন্থায় বিতর্ক করা

মহান আল্লাহর পথের দিকে যিনি মানুষকে আহ্বান জানাবেন, তাঁকে লক্ষ্য রাখতে হবে শ্রোতার ব্যক্তিত্বে, আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, এমন কোনো কথা বলা যাবে না এবং এমন কোনো বিষয়েরও অবতারণা করা যাবে না। দাওয়াত দেয়ার, বলার ও উপস্থাপনের ধরন হতে হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, যেন শ্রোতা অতি সহজেই আহ্বানকারীর দিকে আকৃষ্ট হয়। এটা একটি সাধারণ বিষয় যে, মিষ্টভাষী ও বিনম্র

লোকদের প্রতি অন্যান্য লোকজন সহজেই আকৃষ্ট হয়। দাওয়াত দানকারীকে এসব বিষয় ভালোভাবে আয়ত্ব করতে হবে। শ্রোতা যে ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত, সেই ভ্রান্তি দূর করার জন্য সরাসরি আঘাত করা যাবে না। যুক্তি ও প্রমাণের মাধ্যমে শ্রোতার মনে এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে, সত্যই তিনি ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। দাওয়াত দানকারী যখন এ কথা অনুভব করবেন, শ্রোতা অযথা বিতর্ক সৃষ্টির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, তখনই কথা বাড়ানোর সুযোগ না দিয়ে সর্বোত্তম পন্থায় তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

যার কাছে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, সে ব্যক্তি যদি ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত করার মতো কোনো কথা বলে, তাহলে দাওয়াত দানকারীকে অসীম ধৈর্যের সাথে তার মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিপক্ষ যতো অপসন্দনীয় ও বিরক্তি সৃষ্টিকারী কথাই উচ্চারণ করুক না কোনো, এর মোকাবেলা সর্বোত্তম কথার মাধ্যমে করতে হবে। মন্দের জবাবে মন্দ বা নোংরামীর জবাব নোংরামী দিয়ে দেয়া নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের নীতির বিপরীত কাজ। ধীর স্থির মস্তিষ্কে ঠান্ডা মাথায় প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলতে হবে এবং তার খারাপ আচরণের অনুরূপ খারাপ আচরণ করা যাবে না। যার কাছে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে, তার আচরণ আর দাওয়াত দানকারীর আচরণ যদি সমমানের হয়, তাহলে দাওয়াতের কাজ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে। দাওয়াত দানকারীকে যে কেনো ধরনের অশোভন আচরণ সর্বোত্তম ভদ্রতা প্রদর্শনের মাধ্যমে এড়িয়ে যেতে হবে। কোরআন এভাবে শিক্ষা দিচ্ছে–

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ–

এসব লোকদের অশোভন আচরণকে ভদ্রভাবে উপেক্ষা করে যাও। (সূরা হিজর-৮৫)

দাওয়াতের ময়দানে শয়তান সবথেকে বেশী সক্রিয় থাকে। একজন লোক যখন ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে, তখন শয়তানের অনুচরের সংখ্যা হ্রাস পায়। আর মানুষ যেন কোনো ভাবেই সত্য গ্রহণ করার সুযোগ না পায়, শয়তান এদিকেই অধিক তৎপর থাকে। এ জন্য দাওয়াত দানকারীকে সতর্ক থাকতে হবে, তিনি যাকে দাওয়াত দিচ্ছেন, কোনোক্রমেই যেন তার সাথে কোনো একটি দিক দিয়েও তিক্ততার সৃষ্টি না হয়। শ্রোতার কথায় অনেক সময় মন-মানসিকতা উত্তপ্ত হয়ে উঠবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসীম ধৈর্য ধারন করতে হবে। দাওয়াত দানকারীকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শয়তান তার প্রতি আক্রমণ চালাচ্ছে এবং তাকে মহান আল্লাহর দরবারে আশ্রয় কামনা করতে হবে।

আল কোরআনের দাওয়াত দানকারীকে সর্বক্ষেত্রে কোরআনের যুক্তিকে ব্যবহার

করতে হবে এবং শ্রোতাকে কোরআনের দিকে আকৃষ্ট করতে হবে। এ ব্যাপারে হাদীসে স্পষ্ট দিক নির্দেশনা এসেছে এভাবে যে–

مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا اِلَيْهِ هُدِىَ اِلَى صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ–

এই কোরআন থেকে যে লোক কথা বলে, সে সত্য কথা বলে। যে এর ওপর আমল করবে, সে প্রতিদান লাভ করবে। যে এর সাহায্যে বিচার-মীমাংসা করবে, সে ন্যায় বিচার করবে। যে এর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সে সহজ-সরল পথের দিকে আহ্বান জানিয়েছে।' (তিরমিযী)

অর্থাৎ কথা বলার ক্ষেত্রে যারা কোরআন থেকে যুক্তি পেশ করে কথা বলে, তাদের কথার মধ্যেই সত্যতা বিদ্যমান থাকে। জীবনের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রে যারা কোরআনের নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে, মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে যারা কোরআনের দেয়া রায় অনুসারে বিচার ফায়সালা করে, তাদের বিচারই ন্যায় বিচার হয়ে থাকে। আর কোরআন নির্দেশিত পথের দিকে যারা আহ্বান করে, তারাই সবথেকে সত্য-সুন্দর ও কল্যাণময় পথের দিকে আহ্বান করে।

দাওয়াতে দ্বীনের গুরুত্ব

দাওয়াতে দ্বীন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর গুরুত্ব এত বেশী যে, পৃথিবীতে মানব সভ্যতার সূচনা লগ্ন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষকে আদালতে আখিরাতে প্রশ্ন করা হবে, তাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পৌছে ছিলো কিনা। আল্লাহ তা'য়ালা সমগ্র মানব মন্ডলীর কাছ থেকে এ সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন এবং সকল নবী-রাসূলকেই এ কঠিন প্রশ্নের জবাবদীহীতার জন্য কাঠগড়ায় দাঁড় করাবেন। সকলকেই প্রশ্ন করা হবে, তাঁরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন কিনা। কারণ নবুয়াত ও রেসালাতের মূল দায়িত্বই হলো দাওয়াতে দ্বীন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ، وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَه–

হে রাসূল! যা কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আপনি অন্যের কাছে

পৌঁছে দিন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি তো মানুষদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিলেন না। (সূরা মায়িদা- ৬৭)

দ্বাওয়াতে দ্বীন তথা ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানোর কাজটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই কাজের স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর কাছে নবী-রাসূল বা দা'য়ী প্রেরণ করেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ–

প্রত্যেক জাতির জন্য একজন পথ প্রদর্শক রয়েছে। (সূরা রা'দ-৭)

নবী করীম (সাঃ) বিদায় হজ্জে সমবেত অগণিত জনতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো, আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছি?' লক্ষাধিক কণ্ঠে জবাব এসেছিলো, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি অবশ্যই তা আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।' এ সময় নবী করীম (সাঃ) আকাশের দিকে শাহাদাত আঙ্গুল তুলে ধরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থেকো।' শুধু তাই নয়, রাসূল (সাঃ) উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে আমার উপস্থিত সাহাবীরা! তোমরা আমার অনুপস্থিত উম্মাতের নিকট আমার পয়গাম পৌঁছে দিবে।' (আহ্মাদ, তিরমিযী)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই তা অপরের নিকট পৌঁছিয়েছে। কারণ অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিক রক্ষণাবেক্ষণকারী বা জ্ঞানী হয়ে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

নবী করীম (সাঃ) এর এ নির্দেশ পালন করার লক্ষ্যে নিজের স্ত্রী, সন্তান-সন্তুতি, সহায়-সম্পত্তি এমনকি নিজের মাতৃভূমি ত্যাগ করে লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। সাহাবায়ে কেরামের ইতিহাস যারা সংরক্ষণ করেছেন এবং তাঁদের জীবনধারা নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তাঁরা মন্তব্য করেছেন, প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীর মধ্যে আরব উপদ্বীপের মাটীর নীচে ২০ হাজার সাহাবীর কবর রয়েছে কিনা সন্দেহ। এর স্পষ্ট অর্থ হলো, নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত তথা দাওয়াতে দ্বীনের কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম সকল কিছুর মায়া-মমতা ত্যাগ করে এই কঠিন দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে পৃথিবীর দিক্ দিগন্তে

ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আর ঠিক এ কারণেই আমরা বর্তমানে পৃথিবীর যে প্রান্তেই যাই না কোনো, তাওহীদের পবিত্র ধ্বনি আযানের শব্দ শুনতে পাই। ডঃ আল্লামা ইকবাল (রাহঃ) বলেছেন–

মাগরিবকি ওঁয়াদিওমে গুঁজি আযাঁ হামারি
থামথা নাথা কিসি সে সাইলে রঁওয়া হামারা।

পশ্চিমের দিক-দিগন্তে আমরা আযানের ধ্বনি পৌঁছেছি, অপ্রতিহত বেগবান বন্যার মতো আমাদের গতি বেগ কেউ রুদ্ধ করতে পারেনি।

সম্মানিত আলেম সমাজ! মানব জাতির প্রতি সাহাবায়ে কেরামের অবদান অনন্য, অতুলীয় এবং অনস্বীকার্য। তাঁদের অসীম এবং বর্ণনাহীন ত্যাগের বিনিময়েই বর্তমানে মানব সম্প্রদায়ের একটি বিরাট অংশ 'আল্লাহ' নামটি উচ্চারণের সুযোগ পেয়েছে। নতুবা আজ আমরা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে নিজের প্রবৃত্তিসহ প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তু এবং ক্ষুদ্র একটি প্রাণীকেও নিজের ইলাহ বানিয়ে পূজা করতাম। তাঁরা লোমহর্ষক যন্ত্রণা সহ্য করে দ্বীনের অনিবার্ণ আলো সর্বত্র প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন বলেই আমরা সেই আলোয় আলোকিত হয়ে মহান মালিক আল্লাহ তা'য়ালাকে একটু হলেও চিনার সুযোগ লাভ করেছি এবং তাঁর গোলামী করার চেষ্টা করছি। আমাদের এই চেষ্টা শুধুমাত্র নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না, কারণ পবিত্র কোরআনে আমাদের লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰه–

তোমরাই হচ্ছো দুনিয়ার সর্বোত্তম জাতি, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উত্থান, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর পুরোপুরি ঈমান আনবে। (সূরা আলে ইমরাণ- ১১০)

আরেক আয়াতে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ–

তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা মানুষকে কল্যাণের

দিকে ডাকবে, সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে, আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে তাদের বিরত রাখবে, যারা এই কাজ করবে তারাই সাফল্য মন্ডিত হবে। (সূরা আলে ইমরাণ-১০৪)

আল্লাহ্ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী-রাসূলকেই যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, তাঁরা সে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। নবী রাসূলদের দাওয়াত যারা কবুল করে ধন্য হয়েছেন, তাঁদেরকে তাঁরা একতাবদ্ধ করে একটি সংগঠিত শক্তিতে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ তাঁদেরকে একই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করেছেন এবং সেই সংগঠিত শক্তিকে 'দাওয়াতে দ্বীন'-এর প্রচার ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করেছেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁর মক্কার জীবনে এ দাওয়াত দিয়েছেন। যেসব মহান ব্যক্তি তাঁর দাওয়াত কবুল করেছেন তিনি তাঁদেরকে একত্রিত করে ইসলামী জীবন বিধানের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। মক্কায় এর প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্র অনুকূল না হবার কারণে তিনি তাঁদেরকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করেছেন। সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করার ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের নিয়ে মহান আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই গোটা পৃথিবীর মানবমন্ডলীকে 'দাওয়াতে দ্বীন' এর দিকে আহ্বান জানানো এবং এর ভিত্তিতে তাদের জীবনকে রঙিন করা।

এই পথে যারা বাধা দিয়েছে এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সহজ-সরল কথায় যারা পথ থেকে সরে দাঁড়ায়নি, তিনি তাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত শক্তি প্রয়োগ করে পথ থেকে সেই বাধা অপসারিত করে 'দাওয়াতে দ্বীন'-এর প্রচার ও প্রসারের পথ নিষ্কন্টক করেছেন। এই কাজ নির্জনে একাকী, শুধুমাত্র মসজিদ, খান্‌কাহ্ বা মাদ্রাসার চার দেয়ালে নিজেদেরকে বন্দী রেখে করা সম্ভব নয়। এ জন্য একটি সংগঠনের পতাকাতলে একতাবদ্ধ হয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালিত করতে হয়। মানুষকে সৎকাজের আদেশ দিতে হবে তথা এর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে তথা বাতিলের মূলোৎপাটন করতে হবে।

পবিত্র কোরআনের ভাষ্য অনুযায়ী মানবমন্ডলীর ভেতরে এমন একটি দলের অস্তিত্ব অবশ্যই থাকতে হবে, যে দল পৃথিবীর মানুষকে যা সুন্দর-শুভ, কল্যাণ-মঙ্গল ও ভালোর দিকে আহ্বান জানাবে। শুধু আহ্বানই জানাবে না, যা কিছু ভালো-সৎকাজ, তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে নির্দেশ প্রদান করবে এবং যা কিছু অসুন্দর, অশুভ, অকল্যাণকর ও মন্দ, তা থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। আদেশ দেয়া ও আদেশ বাস্তবায়ন করার কাজ এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখার কাজ অনুরোধ ও উপদেশের

মাধ্যমে পৃথিবীতে কখনো হয়নি। ওয়াজ-নসিহত বা তাবিজ-কবজের মাধ্যমেও মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রেখে ভালো কাজে নিয়োজিত করা যায়নি। অথবা ভালো কাজ ও মন্দ কাজের তালিকা সম্বলিত বই-পুস্তক পাঠ করিয়েও মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা যায়নি।

ক্ষেতে আগাছা জন্ম নেয়ার পরে ক্ষেতের মালিক যদি ক্ষেতের পাশে সুন্দর আসন বিছিয়ে তার ওপর কোনো হুজুর সাহেবকে বসিয়ে আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে সুরেলা কণ্ঠে ওয়াজ-নসিহত করে, আগাছা দূর হবে না। অথবা আগাছা দূর করার উদ্দেশ্যে হুজুর সাহেবের কাছ থেকে কয়েক ড্রাম পানি পড়ে এনে ক্ষেতে ঢেলে দিলেও আগাছা দূর না হয়ে আরো বৃদ্ধি পাবে। দেশের যাবতীয় বাহিনীকে সমবেত করে তাদের অস্ত্রসমূহ আগাছার দিকে তাক্ করে হুমকি প্রদর্শন করলেও আগাছা দূর হবে না। আগাছা দূর করতে হলে শক্ত হাতে আগাছা দূরীকরণের অস্ত্র ধরে ক্ষেতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তখন সুফল পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আইন প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবলমাত্র সৎকাজসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে এবং সকল প্রকার অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা যেতে পারে।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ব্যতীত উল্লেখিত সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার মহান আল্লাহর এই আদেশ বাস্তবায়ন করা যায় না। আর রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আল্লাহভীরু লোকদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন দাঁড় করাতে হবে এবং সেই সংগঠনকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর আদেশ বাস্তবায়ন করতে হবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এই কাজটিই সম্পাদনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাঁকে অধিষ্ঠিত করে তাঁর বিধানসমূহ বাস্তবায়ন করিয়েছিলেন। পৃথিবীর মানুষকে সত্য পথপ্রদর্শনের লক্ষ্যে, তাদেরকে যাবতীয় জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্ত করতে হলে অবশ্যই নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে হবে। নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে না পারলে 'দাওয়াতে দ্বীন'-এর দায়িত্ব পালন করা যাবে না। আর এসবের মূলে রয়েছে একতাবদ্ধ হওয়া–নিজেদেরকে সংগঠিত করে একটি সংগঠনের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে 'দাওয়াতে দ্বীন'-এর তৎপরতা চালাতে হবে। হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে–

عَنِ الْحَارِثِ الاَشْعَرِىْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ وَاللّٰهُ اَمَرَنِى بِهِنَّ

الْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، وَاَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَدْرَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ اِلاَّ اَنْ يُّرَاجِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَىءِ جَهَنَّمَ وَاِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ– (رواه مسند احمد والترمذى)

হযরত হ[illegible] [illegible]'আরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি কাজের আদেশ দিচ্ছি। যা আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাকে আদেশ করেছেন– সে কাজগুলো হলো, জামায়াতবদ্ধ (সাংগঠনিক) জীবন, (নেতার) আদেশ শ্রবণে (অনুসরণে) প্রস্তুত থাকা ও (সংগঠনের নিয়ম-কানুন) মেনে চলা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা এবং নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি জামায়াত (সংগঠন) থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রশি তার গলদেশ থেকে খুলে ফেললো– যতক্ষণ না সে পুনরায় জামায়াতের (সংগঠনের) মধ্যে শামিল হবে। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়াত যুগের কোনো মতবাদ ও আদর্শের দিকে (লোকদের) আহ্বান জানাবে, সে জাহান্নামের ইন্ধন হবে, যদিও সে রোযা রাখে, নামাজ আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে মনে করে। (তিরমিযী)

'দাওয়াতে দ্বীন এবং ইক্বামাতে দ্বীন'-এর প্রচার ও প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই মানব গোষ্ঠীর ভেতর থেকে মুসলমানদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে– এ কথা আমাদেরকে স্মরণে রাখতে হবে। সেই সাথে এ কথাও স্মরণে রাখতে হবে, কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের যে দায়িত্ব নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি অর্পিত হয়েছিলো তার ইন্তেকালের পরে এ দায়িত্ব পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্যই মুসলিম উম্মাহ্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছে ।

দাওয়াতে দ্বীন তথা আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান জানানোর কাজটির গুরুত্ব এবং এর ব্যাপকতা যে কত গভীর তা সূরা নাহ্লের ১২৫ নং আয়াতে বর্ণিত 'তোমার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো' বাক্যটির প্রতি দৃষ্টি দিলেই অনুভব করা যায়। আল্লাহর প্রতি আহ্বানের এ দায়িত্ব পালনের পথে বাধা দেয়ার ইখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। আহ্বানকারী স্বাধীনভাবে গঠনমূলক পন্থায় দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে বিচরণ করতে পারেন এবং এ ব্যাপারে

'দা'য়ীর' পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে। এই স্বাধীনতায় যারা হস্তক্ষেপ করবে তারা অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রু হিসেবেই চিহ্নিত হবে।

দাওয়াতের মূল লক্ষ্য আল্লাহর দাসত্ব

নবী করীম (সাঃ) তদানীন্তন সমাজে বিরাজিত অগণিত সমস্যার কোনো একটি সমস্যাকে চিহ্নিত করে তা সমাধানের লক্ষ্যে সমাজের মানুষকে আহ্বান জানাননি বা এ লক্ষ্যে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করে সমস্যাভিত্তিক কোনো আন্দোলন গড়ে তোলেননি। কারণ সমস্যাভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করা সহজ হলেও সমস্যা দূর করা সম্ভব হয় না, বরং একটি সমস্যা দূর হলেও অগণিত সমস্যা শাখা-প্রশাখাসহ্ বিস্তার লাভ করে। তদানীন্তন সমাজে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চারিত্রিক, নেতৃত্বসহ্ অগণিত সমস্যা অত্যন্ত প্রকট ছিলো। এসব কোনো একটি বিশেষ সমস্যার দিকে নবী করীম (সাঃ) অঙ্গুলী নির্দেশ করেননি। কারণ তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন, মানবীয় চিন্তাধারায় পরিচালিত সমাজ ও রাষ্ট্রে এসব সমস্যার উদ্ভব ঘটাই স্বাভাবিক এবং মানবীয় চিন্তাধারার মাধ্যমে এর সাময়িক একটি সমাধান করা সম্ভব হলেও সমস্যার মূলোৎপাটন কখনোই সম্ভব নয়। সকল সমস্যার মূল সমস্যা হলো মনগড়া অগণিত কাল্পনিক শক্তির দাসত্ব করা। আর সকল সমস্যার সমাধান হলো কেবলমাত্র সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে একমাত্র ইলাহ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাঁরই দাসত্ব করা। এ জন্যেই নবী করীম (সাঃ)সহ সকল নবী-রাসূল সমাজে প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আহ্বান না জানিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীর দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন।

মহান আল্লাহর প্রতি আহ্বানের বিষয়টিও অনুরূপ। সূরা নাহ্লের ১২৫ নং আয়াতে বিষয়ভিত্তিক বা নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানোর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস, উন্নত চরিত্র গঠন, প্রশংসনীয় গুণ-বৈশিষ্ট্য অর্জন ইত্যাদি কোনো একটি দিকের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানাতে বলা হয়নি। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ। 'ইলা সাবীলে রাব্বিকা' অর্থাৎ আপনার রব্ এর প্রতি। এই বাক্যে দুটো শব্দের প্রতি লক্ষ্য করুন, এর একটি سَبِيْل 'সাবীল' অপরটি হলো رَبّ 'রব'। অর্থাৎ প্রতিপালকের দিকে বা প্রতিপালক কর্তৃক প্রদর্শিত পথের দিকে– এক কথায় প্রতিপালক কর্তৃক অবতীর্ণ জীবন বিধানের দিকে। খন্ডিত বিষয়ের প্রতি আহ্বান না জানিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন

বিধানের দিকে আহ্বান জানানোর নির্দেশ এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যে, এ জীবন বিধানে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার

সম্মানিত আলেম সমাজ! বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ, কম্পিউটার এক বিশাল জগৎ। এ দ্বারা মানব সভ্যতা যেমন উপকৃত হচ্ছে তেমনি কিশোর, কিশোরী, তরুণ-তরুণী ও যুবক- যুবতীরা দ্বীন- ঈমান ও নৈতিক চরিত্র হারাচ্ছে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের চরিত্র ধ্বংস করার জন্যে সমকামিতা, পরকীয়া, লিভটুগেদার তথা অবাধ যৌনতায় উৎসাহিত করছে। আল্লাহ- রাসূল, কোরআন- হাদীস ও ইসলামী আকীদা- বিশ্বাস নিয়ে কটুক্তি এবং বিভ্রান্তিকর মিথ্যা তথ্য দিয়ে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইট ইত্যাদি ব্যবহারকারীদের ইসলাম বিদ্বেষী বানানোর ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং ওলামাদেরকেও বিজ্ঞানের উল্লেখিত আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন ও ব্যবহার শিখে ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। সেই সাথে আলেম সমাজকে চলমান রাজনীতি ও বিশ্বের রাজনীতির গতি- প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা অর্জনের জন্য প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকা পাঠ ও রেডিও টিভির সংবাদ শুনতে হবে এবং নিজেদের মধ্যে তা পর্যালোচনা করতে হবে। দেশী- বিদেশী ইসলাম বিরোধী শক্তির পদক্ষেপ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। ইসলামের দুশমনরা ইসলামের লেবাস পরিধান করে ওলামা সমাজের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদেরকে ব্যবহার করার অপকৌশল গ্রহণ করেছে। দুশমনদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলেম সমাজকে সম্পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, শয়তান যদি ভালো কাজও করে তবুও বুঝতে হবে এর পেছনে রয়েছে মারাত্মক ষড়যন্ত্র।

আলেম সমাজকে নিজেদের আমল- আখলাক ঠিক রাখতে হবে। কথাবার্তায় নমনীয়তা ও কোমলভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'হাসি মুখে কথা বলাও সাদকার সমান সওয়াব।' পরাস্পরিক লেনদেন, অন্যের অধিকার আদায়, অন্যের প্রয়োজনের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান, নিজে ত্যাগ স্বীকার করে অন্যের প্রয়োজন পূরণ ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সকল দিকে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে সকলের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে। সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে উত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।

বিশেষ করে কিশোর, তরুণ ও যুবকদের সাথে শ্রেণী অনুযায়ী স্নেহদাতা পিতৃসুলভ আচরণ বা বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে নিজেদেরকে তাদের হিতাকাঙ্খী ও কল্যাণকামী হিসেবে তাদের সাথে মিশতে হবে। ইসলামের দুশমনরা আলেম সমাজ সম্পর্কে তরুণ যুবকদের মনে যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে, তরুণ- যুবকদের সাথে মিশে তাদের ভুল ধারণা দূর করতে হবে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ইসলাম বিদ্বেষীরা আলেম সমাজ সম্পর্কে যে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে যাচ্ছে, তা দূর করে তাদের মনে নিজের শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠার জন্যে নিজের আশেপাশে অবস্থানরত ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে।

তরুণ- যুবকদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, তাদের সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে দরদী মনোভাব নিয়ে তা সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহমূলক প্রশ্ন সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে প্রশ্নসমূহ জেনে যুক্তিভিত্তিক জবাব দিয়ে ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে। তাদের কাছে ইসলামকে অত্যন্ত সহজভাবে উপস্থাপন করতেহ হবে। মনে রাখতে হবে, তরুণ যুবকরাই ইসলামের চালিকা শক্তি। নবী করীম (সাঃ) তরুণ- যুবকদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং তাদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতেন। তরুণ- যুবকদেরকে ব্যাপকহারে দ্বীনি আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করতে না পারলে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে না। বর্তমান যুগের তরুণ- যুবকদের রোগের ধরণ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে রোগ আরোগ্যকারীর ভূমিকায় ওলামা সামাজকে অবতীর্ণ হতে হবে।

আলেমদের কর্ম পরিধি বাড়াতে হবে

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আলেম সমাজকে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে হবে। মায়ের জাতি নারীদেরকে বর্তমানে নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, কর্মক্ষেত্রে তাঁরা নানা ধরণের নির্যাতন ভোগসহ শোষিত হচ্ছে। নারীর সমস্যার ধরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করে আল্লাহ প্রদত্ত তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে আলেম সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। যৌতুকের কারণে নারীরা সবথেকে বেশী নির্যাতিতা হচ্ছে। ঘৃণ্য এই যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে আলেম সমাজকে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। নারী মায়ের জাতি এবং মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের জান্নাত- এ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে তরুণ- যুবক তথা পুরুষের মনোজগতে নারীর প্রতি সম্মানের অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে।

মা সুশিক্ষিতা হলে তাঁর কোলে প্রতিপালিত সন্তানও সুনাগরিক হিসেবে দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে। এ জন্যে কন্যা সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যে অভিভাবকদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। জুম্‌আর জামায়াতে, তারাবীর জামায়াতে ও ঈদের জামায়াতে পর্যায়ক্রমে মহিলারা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে ওলামাদের কার্য্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এ ব্যাপারে মহিলাদের পর্দা সহকারে নিরাপদ যাতায়াতের প্রতি লক্ষ্য রেখে কার্য্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আলেম সমাজকে সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধুমাত্র মসজিদ- মাদ্রাসা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে চলবে না। নিজ নিজ এলাকার মাদ্রাসা- মসজিদ, স্কুল- কলেজসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট কমিটি, ঈদাগাহ্ কমিটি, গোরস্থান কমিটি, পাঠাগার ও সমাজ কল্যাণ কমিটি এবং স্থানীয় বিচার- সালিসীসহ জনকল্যাণের সকল শাখায় আলেম সমাজকে অবশ্যই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। সমাজের এসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে আলেম- ওলামাগণ যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারলে দুষ্ট প্রকৃতির জাহিলদের শোষণ নির্যাতন ও মামলা- হামলা থেকে সমাজের নিরীহ অধিবাসীরা রক্ষা পাবে।

নির্বাচন ও আলেম সমাজ

স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সকল নির্বাচনে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে হবে। পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সামান্য স্বার্থোদ্ধারের লক্ষ্যে বা কারো ভয়ে বা আত্মীয়তার কারণে কোনো ফাসিক, ফুজ্জার, মুনাফিক বা মুমিনের ছদ্মবেশী ইসলামের দুশমনকে প্রকৃত পক্ষে কোনো আলেম নির্বাচনের সময় সমর্থন দিতে পারে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্পষ্ট নির্দেশ–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا اٰبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَاءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الاِيْمَانِ، وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُلٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ–

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, যদি তোমাদের পিতা ও ভাই কখনো ঈমানের ওপর কুফরীকেই বেশী ভালোবাসে, তাহলে তোমরা এমন লোকদের কখনো বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তোমাদের মধ্যে যারা এ (ধরনের) লোকদের (নিজেদের) বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে, তারা হচ্ছে (সুস্পষ্ট) যালিম। (সূরা তাওবা- ২৩)

যখন কোনো আলেম বা পরহেজগার ব্যক্তি পার্থিব স্বার্থের কারণে বা আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে যালিম, ফাসিক, মুনাফিক, ধর্মনিরপেক্ষ, পাপাচারী, লোভী, দুর্নীতিবাজ, পরসম্পদ আত্মসাৎকারী, মদ্যপ, ব্যভিচারী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বা সন্ত্রাসী প্রকৃতির লোকদেরকে নির্বাচনকালে সমর্থন দেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই আলেম বা পরহেজগার লোকদের প্রতি সমাজের মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি হয়, তারা অর্থলোভী দালাল ও ঘৃণার পাত্র হিসেবে লোকজনের কাছে পরিচিতি লাভ করে। এই ধরণের লোকজনের জন্যে আখিরাতের চূড়ান্ত শাস্তি মহান আল্লাহ তা'য়ালা রিজার্ভ করে রেখেছেন।

সম্মানিত আলেম সমাজ! ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রতিনিধিত্বমূলক নির্বাচনে ভোট একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ আমানত। ইসলামের অপছন্দনীয় ক্ষেত্রে অপাত্রে এই আমানত অর্পণ করলে তা খেয়ানতের শামিল এবং আমানতের খেয়ানতকারী মুনাফিকের দলে শামিল হয়। দেশের মানুষ যেনো আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ মেনে ভোট নামক আমানতকে সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োগ করতে পারে, যে কোনো মূল্যে ওলামায়ে কেরামকে সে ভূমিকা পালন করতে হবে এবং এই ভূমিকা পালন করা ঈমানী দায়িত্ব তথা বড় ধরণের জিহাদ।

আরেকটি জরুরী বিষয় এখানে উল্লেখ করতে চাই। তাহলো, আলেম সমাজ ময়দানে জনগণের সম্মুখে যে কথাগুলো বলবেন, তার বাস্তব নমুনা নিজেদেরকে পেশ করতে হবে। কথা এবং কাজে সাদৃশ্য থাকতে হবে। সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলতে হবে এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বৃদ্ধির যতগুলো পথ নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন, সাধ্যানুযায়ী সে পথের অনুসরণ করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের ময়দানে সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য প্রয়োজন, তাঁর সাহায্য- সহযোগিতা ব্যতীত এ ময়দানে সফলতা অর্জন করা যাবে না। এ জন্যে নিজেদেরকে আল্লাহর সাহায্যের হকদার হিসেবে গড়তে হবে। বিশেষ করে শেষ রাতে নির্জনে মহান আল্লাহর দরবারে ধর্ণা দিতে হবে। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের মাধ্যমে কোরআনের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে। প্রকাশ্যে যেমন আল্লাহকে ভয় করতে হবে, তেমিন গোপনে নির্জনে একাকী অবস্থায়ও আল্লাহকে ভয় করতে হবে। মনে রাখতে হবে, নির্জনে একাকী যে সব কাজ করা হয়, তার সাক্ষী থাকেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এবং আদালতে আখিরাতে সেসব কাজের বিচার স্বয়ং তিনিই করবেন।

আলেম সমাজকে অন্যের কাছে হাত পাতা থেকে বিরত থাকতে হবে তথা কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাবলম্বী হতে হবে। জীবিকা নির্বাহের জন্যে চাকরী, ব্যবসা বা অন্য যে কোনো স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে হবে। জনগণের দেয়া হাদীয়া- তোহ্ফা, তাবিজ- তুমার, মিলাদ, ওয়াজ ও নানা ধরণের খতম পড়াকে জীবিকা অর্জনের মাধ্যম বানানো ওলামা সমাজের জন্য কোনোক্রমেই সম্মানজনক নয়। মহান আল্লাহ্ প্রেরিত অসংখ্য সম্মানিত নবী-রাসূলগণের একজনও উম্মতের হাদীয়া- তোহ্ফা নির্ভর ছিলেন না। প্রত্যেক যুগের নবী-রাসূলই জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করতেন এবং তাঁদের অনুসারীগণও কাজ করে খেতেন। তাঁরা কেউই পরনির্ভরশীল ছিলেন না। আলেম সমাজকে এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হবে।

নবী-রাসূলগণের মধ্যে কেউ লৌহ শিল্পী ছিলেন, কেউ বস্ত্র শিল্পী ছিলেন, কেউ কৃষিজীবি ছিলেন, কেউ ছিলেন পশু পালনকারী। মক্কা থেকে সাহাবায়ে কেরাম যখন মদীনায় হিজরত করলেন, নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে মদীনার আনসার সাহাবায়ে কেরামের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। আনসার সাহাবায়ে কেরাম হিজরতকারী ভাইদেরকে নানা সুযোগ- সুবিধা দেয়ার জন্য এতই উদগ্রীব ছিলেন যে, কোনো কোনো আনসার সাহাবী নিজেদের অর্থ- সম্পদ দুই ভাগ করে এক ভাগ হিজরতকারী ভাইকে দিতে চেয়েছেন, এমনকি যাঁর দুইজন স্ত্রী ছিলো একজনকে তালাক দিয়ে হিজরতকারী ভাইয়ের সাথে বিয়েও দিতে চেয়েছেন। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টি হয়েছিলো যে, তাঁরা মদীনার আনসার ভাইদের দেয়া সুযোগ- সুবিধা গ্রহণ করে কর্মহীন অলসভাবে বসে না থেকে ব্যবসা বা কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করেছেন। সুতরাং আলেম সমাজকে অবশ্য অবশ্যই নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের আলোয় আলোকিত হয়ে আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে এবং নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মেধা ও কায়িক শ্রম দিয়ে জীবিকা অর্জন করে সমাজে সম্মানের আসন অলঙ্কৃত করতে হবে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন করে দায়ী' ইলাল্লাহ্র ভূমিকায় নিজেদের যোগ্য করে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন, আমীন- ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

সন্ত্রাসবাদ

বর্তমান পৃথিবীতে এমন একটি দেশ নেই, যে দেশ এবং দেশের জনগণ সন্ত্রাস নামক দানবের আতঙ্কে আতঙ্কিত নয়। প্রত্যেকটি দেশেই সন্ত্রাস ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হচ্ছে। সন্ত্রাস নামক দানবের ভীতিকর পদচারণা কম-বেশী পৃথিবীর প্রত্যেক জনপদেই অনুভূত হচ্ছে। পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ প্রতিহিংসা চরিতার্থের পর্যায়ে উপনীত হয়ে যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস বিস্তৃত হচ্ছে, তেমনি নানা মতবাদ মতাদর্শে বিশ্বাসী এক শ্রেণীর লোকজন সাংগঠনিকভাবে রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সংঘটিত করছে। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মানুষ যেমন নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছে, তেমনি সামষ্টিকভাবেও মানুষ নিরাপত্তাহীনতার শিকার। নির্বিঘ্নে শঙ্কামুক্ত পরিবেশে কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মানুষ একত্রিত হতে আতঙ্কবোধ করছে।

কর্মস্থল, ভ্রমণস্থান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সভা-সমাবেশ, দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরে যাতায়াতের বাহন, বিপনী কেন্দ্র ও চিত্ত বিনোদনের কেন্দ্রসমূহ এবং অন্যান্য জনসমাগমের স্থানসহ এমন একটি স্থানও নেই, যেখানে মানুষ সন্ত্রাস আতঙ্কে তাড়িত হচ্ছে না। ভ্রান্ত বিশ্বাস ও উগ্র মতবাদ-মতাদর্শের অনুসারীরা সরকারী স্থাপনা, ধর্মীয়স্থান, বিদেশী দুতাবাস, সচিবালয়, রাজনৈতিক কার্যালয়, বিচারালয়, রেলওয়ে স্টেশন, বিমান বন্দর, শপিং সেন্টার, গ্যাস ও তৈল ক্ষেত্র ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ এবং জনসমাগমস্থল লক্ষ্য করে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড পরিচালিত করে ব্যাপক প্রাণহানী এবং মূল্যবান সম্পদের ক্ষতি করছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় নাইজেরিয়ায় আমেরিকান দুতাবাসে, ভারতের পার্লামেন্ট ভবনসহ বিভিন্ন স্থানে, আমেরিকার টুইন টাওয়ারে, বৃটেনের পাতাল রেলে, তুরস্কের বিভিন্ন বিপনী কেন্দ্রে, ফ্রান্সের রেলওয়ে স্টেশনে, জর্ডানের পাঁচ তারকা হোটেলে, পাকিস্তানের ধর্মীয় উপাসনালয়সহ বিভিন্ন স্থানে, সউদী আরবের বিভিন্ন স্থানে, মিশরে শপিং সেন্টারে, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ইরাক, ইরান ও আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানে, বাংলাদেশে আদালতে, ধর্মীয় উপাসনালয়ে, রাজনৈতিক কার্যালয় এবং সমাবেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে অগণিত মানুষ হত্যা করা হয়েছে, মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করা হয়েছে ও অসংখ্য মানুষকে চিরতরে পঙ্গু বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

সন্ত্রাসী ঘটনার মাধ্যমেই এশিয়া মহাদেশে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউল হক, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বে-নজির ভুট্টো ও ইরানের পার্লামেন্টে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী রেজাই, কয়েকজন মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের সদস্যসহ ৮০ জনকে। এ ছাড়া গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিয়ে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতাকে ইরানে হত্যা করা হয়েছে। ফিলিপাইনের

জননন্দিত প্রেসিডেন্ট বেনিনগো একুইনোকেও সন্ত্রাসীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। শ্রীলঙ্কার জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট রানা সিংহে প্রেমাদাসাকে প্রাণ দিতে হয়েছে বোমাবাজদের হাতে। লেবাননের সাবেক প্রেসিডেন্ট রফিক হারিরীকেও সন্ত্রাসীদের হাতেই প্রাণ দিতে হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিষফোড়া ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রবিনও সন্ত্রাসী ইয়াহূদী তরুণের হাতে নিহত হয়েছেন। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট রিগ্যানও সন্ত্রাসী কর্তৃক গুলীবিদ্ধ হয়েছিলেন।

ভারতের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্য স্বাধীনতা বা স্বাধিকার আন্দোলন করছে। পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায়ও স্বাধীন খালিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। এর নেতৃত্ব দিতে থাকে আকালী দলের মাধ্যমে শিখ নেতা হরচান্দ সিং লাঙ্গোয়াল ও সুরজিত সিং বার্ণালা। শিখদের স্বাধীনতা আন্দোলন দমিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সান্ত জর্নাল সিং ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে পাল্টা উপদল সৃষ্টি করা হয়। ভারত সরকার এই উপদলকে অর্থ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে সাহায্য করে। এমনকি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদেরকে হত্যা করার জন্য এদেরকে অস্ত্র দিয়েও সজ্জিত করে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'।

কিন্তু শিখদের উপদলের নেতা সান্ত জর্নাল সিং এতটাই বেপরোয়া হয়ে ওঠে যে, শিখদের পবিত্র স্থান অমৃতস্বরের 'স্বর্ণ' মন্দিরকে কেন্দ্র করে তারা এক বিশাল সন্ত্রাসী বাহিনী গঠন করে এবং সারা ভারতব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতে থাকে। এদেরকে যে ভারত সরকার সৃষ্টি করেছিলো, তারাই অবশেষে কমান্ডো বাহিনী পাঠিয়ে 'স্বর্ণ' মন্দিরের অভ্যন্তরেই দলবলসহ সান্ত জর্নাল সিংকে হত্যা করে। এরই পরিণতিতে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেও শিখদেরই হাতে প্রাণ হারাতে হয়।

শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর শাসনামলেই শ্রীলঙ্কার তামিল গেরিলাদের প্রতি সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া হয় এবং ভারতের অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তামিল গেরিলারা গোটা শ্রীলঙ্কা জুড়ে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর বড় পুত্র রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হবার পরে তিনি যখন শ্রীলঙ্কায় রাষ্ট্রীয় সফরে যান, তখন গার্ড অব অর্নার গ্রহণকালে এক সৈনিক তার মাথা লক্ষ্য করে রাইফেলের ব্যাটন দিয়ে আঘাত করে। সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেও সেই তামিল গেরিলাদের হাতেই শেষ পর্যন্ত তিনিও তার মায়ের অনুরূপ পরিণতি ভোগ করেন। সন্ত্রাস নামক যে দানবকে ইন্দিরা-রাজিব গান্ধী দুধ কলা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করেছিলেন, সেই দানবের ছোবলেই মাতা-পুত্রকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। ভারতের জনক বলে খ্যাত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে প্রথমে ১৯৩৪ সালে ২৫শে জুন পুনে শহরে রেল স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়বার ১৯৪৬ সালে ঐ একই পদ্ধতিতে জুন মাসে হত্যার চেষ্টা করা

হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারী তৃতীয়বার হত্যার চেষ্টা করে মদনলাল নামক এক সন্ত্রাসী। এর মাত্র ১০ দিন পরে ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম গডসে নামক এক সন্ত্রাসীর হাতে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানও সন্ত্রাসীদের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের অন্যতম ঘৃণ্য নীতি হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে নানা ধরনের উপদল সৃষ্টি করে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে অস্থির করে রাখা। ১৯৭১ সালের বহু পূর্ব থেকেই ভারত আওয়ামী লীগকে সার্বিক সহযোগিতা দিয়ে হৃষ্টপুষ্ট করতে থাকে। ৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী পরাজয়ের দ্বার প্রান্তে উপনীত হলো, আওয়ামী লীগ কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশে সরকার গঠনের সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারত সরকার অত্যন্ত গোপনে দেরাডুনে আরেকটি উপদল গঠন করে। এদেরকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষিত করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে। এরা নানা ধরনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অবশেষে ঐ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের দাবিদার দলের নেতৃত্বেই সন্ত্রাসী কায়দায় ভারতের কূটনীতিক সমর দাসকে অপহরণ করার চেষ্টা করা হয়।

অনুরূপভাবে পরাশক্তি আমেরিকা সউদী আরবের সরকারকে অস্থির রাখার লক্ষ্যে সউদী ধনকুবের ওসামা বিন লাদেনকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। লাদেন পরিবারের সাথে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশ এবং তার পিতা সিনিয়র বুশের সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো এবং তাদের মধ্যে শত মিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক সম্পর্কও ছিলো। লাদেনকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে আমেরিকা সৃষ্টি করলো আল কায়েদা সংগঠন। এরপর তাদেরকে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে সউদী সরকারকে অস্থির করে তোলা হলো। এক পর্যায়ে তাদের মাধ্যমে পবিত্র কা'বাঘরও দখল করিয়ে পবিত্র স্থানে রক্তপাত ঘটানো হলো।

তৎকালীন পরাশক্তি অখন্ড রাশিয়া আফগানিস্থান দখল করার পরে বিন লাদেনকে আমেরিকা প্রচুর সামরিক সরঞ্জামে সজ্জিত করে আফগানিস্থানে টেনে এনে রুশ বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড় করালো। রুশ বাহিনী আফগানিস্থান ত্যাগ করার পরে আমেরিকা ও বিন লাদেনের 'মধুচন্দ্রিমায়' ফাটল ধরলো এবং লাদেনকে উপলক্ষ্য করেই আফগানিস্থান ও ইরাকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে দেশ দুটো দখল করে অগণিত মুসলমানকে হত্যা করলো। সেই হত্যার ধারাবাহিকতায় এখনও প্রতিদিন সে দেশ দুটোয় প্রাণহানী ঘটছে। আমেরিকা বিন লাদেন অধ্যায়ের যবনিকা এখানেই ঘটায়নি, নিজেদের স্বার্থে সৃষ্টি আল কায়েদাকে উপলক্ষ্য করে ইরান, সিরিয়া ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটানোর পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই চূড়ান্ত করে এনেছে।

পরাশক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের স্বার্থে সৃষ্ট নানা ধরনের জঙ্গী সংগঠনকে অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। বর্তমানে এই সন্ত্রাস এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনেই চরম এক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। শান্তিপ্রিয় মানুষের মন থেকে মুছে গিয়েছে স্বস্তি ও নিরাপত্তাবোধ, সে স্থান দখল করেছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর যেখানেই সন্ত্রাসী তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে, সেখানেই মুসলমানদের সাথে এই ঘৃণ্য কর্মের যোগসুত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রচার মাধ্যমে সিন্ডিকেট সংবাদে একমাত্র মুসলমানদের দিকেই আঙ্গুল তুলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, মুসলমানরাই এই সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়েছে। শুধু তাই নয়, মুসলমানদের নামের সাথে সাথে সন্ত্রাসের প্রতি অসহিষ্ণু সর্বোত্তম জীবন বিধান পবিত্র ইসলামের নাম যুক্ত করে বলা হচ্ছে, ইসলামী উগ্রবাদী ও ইসলামী মৌলবাদীরাই সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। এভাবে সর্বত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরকে হেয়-প্রতিপন্ন করার অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কিন্তু কেনো এই সন্ত্রাস, কি এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, প্রকৃত সন্ত্রাসী কারা, জঙ্গীবাদী দল কারা সৃষ্টি করছে, ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাসী তৎপরতায় মুসলিম নামধারী লোকদেরকে কেনো ব্যবহার করা হচ্ছে, সন্ত্রাসের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব কেনোই বা ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে, এসব বিষয় সম্পর্কে প্রত্যেক সচেতন মানুষেরই স্পষ্ট ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। আশা করি পরবর্তী ইতিহাস ভিত্তিক তাত্ত্বিক আলোচনা পাঠ করলে সকলের কাছেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাম-মুসলমান বনাম সন্ত্রাসবাদ

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আইন অনুসরণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের পদ্ধতি দিয়েছেন। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য সমগ্র সৃষ্টির জন্য তাঁর আইন পালন বাধ্যতামূলক করেছেন। চিন্তাবিদগণ সাধারণ দৃষ্টিতে যা বুঝেন তা হলো, তিনি যদি অন্যান্য সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর আইন অনুসরণ বাধ্যতামূলক না করতেন, তাহলে মানুষসহ সমগ্র সৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হতো। যেমন মহাশূন্যে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নিহারীকাপুঞ্জ, ব্লাকহোল ও অন্যান্য যা কিছুই রয়েছে, এসব কিছুর পরিভ্রমণের জন্য গতিপথ বা পরিভ্রমণের পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, এসব পথে ওগুলো চলতে বাধ্য। ওসব সৃষ্টিসমূহের পরিভ্রমণের পথে আল্লাহ তা'য়ালা যদি স্বাধীনতা দিতেন, তাহলে পরিভ্রমণের পথে একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ ছিলো অবশ্যম্ভাবী এবং সেগুলো স্বয়ং যেমন ধ্বংস হতো তেমনি অন্যান্য সৃষ্টির জন্যও মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতো।

অপরদিকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আইন পালনের ক্ষেত্রে একমাত্র মানুষকেই স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং সতর্ক করে দিয়ে পবিত্র কোরআনে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, 'আলো-অন্ধকারের পথ বা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেয়া হয়েছে।' কেউ ইচ্ছে করলে আলোর পথ বা সত্যপথ অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে, এ স্বাধীনতা যেমন মানুষের রয়েছে তেমনি সে অন্ধকার পথ অনুসরণ করে পৃথিবী ও আখিরাতে নিজেকে ধ্বংসও করে দিতে পারে, এ স্বাধীনতাও মানুষের রয়েছে। একই সাথে মহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে মানব মন্ডলীকে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, 'ইসলামই মানুষের জন্য একমাত্র মনোনীত জীবন ব্যবস্থা।'

সমগ্র সৃষ্টি জগতের মালিক এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো আদর্শ কেউ যদি অনুসরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে পৃথিবী ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করবে, শান্তি, স্বস্তি ও সার্বিক নিরাপত্তার লক্ষ্যে তার জন্য আল্লাহর বিধান অনুসরণ করা অবশ্যই বাধ্যতামূলক। আল্লাহর বিধান অনুসরণ না করে কেউ যদি নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবি করে, আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তার সে দাবির কানাকড়িরও মূল্য নেই। কারণ 'মুসলিম ও ইসলাম' এই শব্দ দুটো একটির সাথে আরেকটি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, পরস্পর সম্পূরক এবং অবিচ্ছিন্ন। এই শব্দ দুটোর মূলেই নিহিত রয়েছে মানুষের জন্য শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নতি, প্রগতি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিভীষিকামুক্ত শঙ্কাহীন এক উন্নত জীবন-যাপনের পরিবেশ।

'ছিলমুন' শব্দ থেকে 'ইসলাম' শব্দের উৎপত্তি এবং এর অর্থ হলো শান্তি। আর মুসলিম শব্দের অর্থ 'আত্মসমর্পণকারী'। আল্লাহ তা'য়ালা মানবমন্ডলীর শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, উন্নতি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও শঙ্কামুক্ত নিরাপত্তাপূর্ণ যে বিধানাবলী দান করেছেন, এর সমষ্টির নামই হলো ইসলাম এবং এই বিধানাবলীর নিকট যে মানুষ আত্মসমর্পণ করেছে বা নিঃশর্তে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিয়ে অনুসরণ করেছে, সে-ই হলো মুসলমান।

সহজ কথায় সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিপরীতে শান্তি, স্বস্তি, উন্নতি ও নিরাপত্তা দানের নিশ্চয়তামূলক বিধানের নিকট যে মানুষ তার সমগ্র সত্তাকে সমর্পণ করেছে, সেই হলো মুসলমান। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তির হাত ও মুখের কথা থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি মুসলমান নয়।'

যে আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের নিরাপত্তার প্রতীক ও শান্তির নিশ্চয়তামূলক জীবন বিধান ইসলামকেই মানুষের জন্য একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করেছেন, সেই আল্লাহ তা'য়ালার নিরানব্বইটি নামের মধ্যে গুণবাচক নামসমূহের একটি নাম হলো

'সালাম' অর্থাৎ শান্তিদাতা। অপরদিকে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে 'সালাম' নামের অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনের সূরা আম্বিয়ায় ঘোষণা করেছেন, 'হে নবী! আপনাকে আমি সমগ্র জগতের জন্য করুণার প্রতীক হিসেবেই প্রেরণ করেছি।'

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা বিশ্বনবী (সাঃ) কে 'করুণার প্রতীক তথা নবীয়ে রহমত' উপাধি দান করেছেন। তাহলে বিষয়টি এভাবেই স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, 'শান্তিদাতা' সালাম আল্লাহ তা'য়ালা সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গীবাদের বিপরীতে 'শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা, সুখ-সমৃদ্ধি, উন্নতি-প্রগতি ও শঙ্কামুক্ত জীবন বিধান শান্তির আদর্শ ইসলামকে' করুণার মূর্তপ্রতীক নবীয়ে রহমতের কাছে প্রেরণ করেছেন এবং তিনি এ সর্বোত্তম আদর্শ পৃথিবীতে বাস্তবায়ন করেও দেখিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'য়ালা নবী-রাসূলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামায শেষ করার আদেশও দিয়েছেন শান্তি কামনা করার মাধ্যমে। অর্থাৎ নামাযের শেষ বৈঠকে 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ্' মুখে উচ্চারণ করেই নামায শেষ করতে হবে। নামায শেষ করেই নবী করীম (সাঃ) প্রথমে যে দোয়া করতেন সে দোয়ার অর্থ হলো, 'হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় আর তোমার নিকট থেকেই শান্তির আগমন, তুমি কল্যাণময়, হে মর্যাদাবান-কল্যাণময়! তোমার কাছেই আমি শান্তির শেষ আশ্রয়স্থল জান্নাত কামনা করছি।' আল্লাহর রাসূলের শিখানো এই দোয়া অধিকাংশ আলেমগণ নামায শেষ করেই তিলাওয়াত করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে যারা এই দোয়া মুখস্থ করেছেন তারাও করে থাকেন।

এরপর মুসলমানদের পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হলেও শান্তি কামনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ আচ্ছালামু আলাইকুম, 'তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক' প্রথমে বলে তারপর অন্যান্য কুশলাদি জানতে হবে। পৃথিবীতে মানব শিশু আগমন করার সাথে সাথে তাকে সালাম জানাতে হবে, শিশুর বাকশক্তি নেই, সে জবাব দিতে পারবে না তবুও তাকে সালাম জানাতে হবে অর্থাৎ তার জন্য শান্তি কামনা করতে হবে। মানুষ ইন্তেকাল করলে জানাযা আদায় করার সকল দোয়াসমূহেও মৃতের জন্য শান্তি কামনা করতে হয় এবং জানাযা শেষও করতে হয় 'আচ্ছালামু আলাইকুম ওয়ারাহ্মাতুল্লাহ' বলে অর্থাৎ শান্তি কামনা করে। মুসলমানদের কবর দেখলেই বা জিয়ারত করার সময়ও প্রথমে কবরবাসীকে সালাম জানাতে হয় এবং কবর জিয়ারতের অন্যান্য সকল দোয়ার মধ্যেও শান্তি কামনা করা হয়।

মুসলিম মিল্লাতের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম স্বয়ং কা'বাস্থান-দোয়া কবুলের স্থানে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন–

اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا–

ইবরাহীম যখন বলেছিলো, হে মালিক! এ শহরকে তুমি শান্তি ও নিরাপত্তার শহর বানিয়ে দাও। (সূরা বাকারা-১২৬)

যে জাতির পিতা স্বয়ং সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, সেই জাতি কি সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদে নিজেদেরকে জড়াতে পারে? ইসলাম মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সহজ-সরল শান্তির পথ কামনা করতে শিক্ষা দিয়েছে। নামায আদায়কারী ব্যক্তিগণ প্রত্যেক দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে বারবার সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করে থাকেন। এই সূরার মাধ্যমে তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করতে থাকেন–

اِهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيْمَ –

তুমি আমাদের সরল ও অবিচল পথটি দেখিয়ে দাও। (সূরা ফাতিহা)

যে মুসলমান প্রত্যেক দিন ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাত নামাযেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে ৩২ বার মহান আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে আবেদন করছে, 'আমাদেরকে সহজ সরল পথ দেখাও।' সেই মুসলমানের পক্ষে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী তৎপরতার পথে অগ্রসর হওয়া কি সম্ভব? প্রকৃত মুসলমানদের সাথে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের ঐ দূরত্ব রয়েছে, যে দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে রয়েছে। ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, তারা না জেনে অথবা ইসলামের দুশমনদের হাতের পুতুল হিসেবেই চালাচ্ছে। বলা বাহুল্য, ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বদনাম করার লক্ষ্যেই শত্রুপক্ষ মুসলিম নামধারী এসব লোককে ব্যবহার করছে।

ইসলামের ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর প্রত্যেক পরিসরে ও মুসলিম জীবনের সূচনা এবং সমাপ্তি তথা দুনিয়া-আখিরাতের সবস্থানে শুধু শান্তি কামনা ও প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে, সেই ইসলামে সন্ত্রাসবাদ আর জঙ্গীবাদের গন্ধ অনুসন্ধান করা, 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে মানুষ হত্যা করা, দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করা একমাত্র মূর্খ, জাহিল, জ্ঞানপাপী, ইসলাম-মুসলমান ও দেশের শত্রুদেরই কাজ হতে পারে। আর যারা নিজেকে মুসলমান দাবি করে ইসলামের নামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের পথ অনুসরণ করে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, তারা স্পষ্টই ভ্রান্ত পথের অনুসারী এবং এ পথ গিয়েছে জাহান্নামে। বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এসব লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوْا فِيْ الاَرْضِ قَالُوْا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ۔

তাদেরকে যখনই বলা হয়েছে, 'তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না' তখনই তারা বলেছে, 'আমরা তো সংশোধনকারী মাত্র।' (সূরা বাকারা-১১)

সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদ নির্ভর পথ অনুসরণ করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মানুষ হত্যাকারীদের যখন বলা হচ্ছে, 'তোমরা কেনো এই বিপর্যয় সৃষ্টি করছো, তারা জবাব দিচ্ছে, 'আমরা আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য এই কাজ করেছি। অর্থাৎ অশান্তি সৃষ্টিকারী অন্য সকল আইন বাতিল করে আল্লাহর শান্তিময় আইন কায়েম করার লক্ষ্যেই এসব কাজ করছি।'

এসব মূর্খ-জাহিলরাই যে প্রকৃত অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, এই চেতনাই এদের মধ্যে নেই। এসব চেতনাহীন দুষ্কৃতিকারীদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلاَ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لاَّ يَشْعُرُوْنَ–

সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় সৃষ্টিকারী, কিন্তু এর কোনো চেতনাই তাদের নেই। (সূরা বাকারা-১২)

ইসলামের দুশমন কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে বোমাবাজ মানুষ হত্যাকারী সন্ত্রাসীরা ইসলামের নামে দেশে যে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে এবং নিজেকে যে নবীর উম্মত তথা অনুসারী হিসেবে দাবি করছে, সেই নবীয়ে রহমত সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, 'রাসূলের জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।' 'নিশ্চয়ই তুমি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।' 'তুমিই সবথেকে সহজ-সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।'

যে মহামানবকে স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালা 'সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ও করুণার মূর্ত প্রতীক' হিসেবে সনদ দিয়েছেন, সেই মহামানবের অনুসারী হিসেবে নিজেকে দাবি করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে অন্য মানুষকে ও নিজেকে হত্যা করে 'জান্নাতে যাবার' প্রলোভন যারা দেখাচ্ছে, তাদের পরিচয়, তারা ইসলাম-মুসলমান, দেশ-জাতি ও সমগ্র মানবতার দুশমন। সচেতন মহলের চোখগুলোকে সিসি টিভিতে পরিণত করে এদেরকে ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে তুলে দিতে হবে এবং এদের ওপর কোরআন ঘোষিত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সাথে সম্পর্কিত সর্বোচ্চ দন্ড প্রয়োগ করাই বর্তমানে সময়ের দাবি।

রোযা ও পূজার দেশে সন্ত্রাসী সৃষ্টির কৌশল

আল্লাহর আইন চালুর নামে যেসব মুসলিম নামধারী কিশোর, তরুণ ও যুবকদের ব্যবহার করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে এরা প্রায় সকলেই হতদরিদ্র পরিবারের মূর্খ, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, কর্মহীন-বেকার, ভবঘুরে,

হতাশাগ্রস্ত, অর্থলোভী এবং বুদ্ধি-বিবেচনাহীন সদস্য। এদের কাছে অর্থই মূখ্য বিষয়। ইসলাম-মুসলমান, দেশ-জাতি ও মানবতার দুশমনরা এসব মোটা মাথার লোকদেরই রিক্রুট করে আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এসব লোকের মাধ্যমে তাদের পরিবারকে কিছু অর্থ সরবরাহ করে পরিবারের অন্য সকল সদস্যকে বুঝানো হয়েছে যে, তারা বেশ লাভজনক কর্মেই জড়িত রয়েছে। এরপর এসব লোকদেরকে ক্রমশ নিজ পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্য সকল সদস্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে সন্ত্রাসের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে 'পেশাধারী সম্মোহনকারী' আমদানী করে এদেরকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, এদের মধ্যে থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহের মৃত্যু ঘটিয়ে হৃদয়কে করা হয়েছে মায়া-মমতাশূন্য। পিতামাতা, ভাইবোন দূরে থাক– নিজ জীবনের প্রতিও এমন বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করা হয়েছে যে, 'নিজ জীবনকে নিজের কাছেই এক দুর্বহ বোঝা' এই অনুভূতি এদের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। 'জীবন নামক দুর্বহ এই বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে বেহেশ্তে যাবার সবথেকে সহজ পদ্ধতি হলো আল্লাহর আইন চালু'র জন্য অন্য মানুষ ও নিজেকে হত্যা করা।' কোরআন-হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত বুদ্ধি-বিবেচনাহীন জাহিল এসব লোকদেরকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজ, দেশ ও জাতির প্রতি বিদ্রোহী করে গড়া হয়েছে। সুস্থ চিন্তার পরিবর্তে এদের মাথায় প্রবেশ করানো হয়েছে অসুস্থ চিন্তা। অর্থাৎ এরা জীবন সম্পর্কে হতাশা ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া লোক। এসব লোকদের প্রতি আমাদের করুণা হয়।

গোয়েন্দাদের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এসব লোক দীর্ঘ দিন যাবৎ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে, কেউ কেউ বছরে মাত্র দু'একবার এসে পিতামাতা বা পরিবারের অন্য সদস্যদেরকে কিছু টাকা দিয়েই আবার নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদেরকে নিজ পরিবার, সমাজ ও দেশের আনুগত্য না করে একমাত্র নেতার আনুগত্যের মধ্যেই মুক্তি, এই ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। সম্মোহনের মাধ্যমে মন-মস্তিষ্ক সমাজ-সংসারের চেতনাশূন্য করে 'আল্লাহর আইন চালু'র মায়াজালে বন্দী করা হয়েছে। ফলে এসব লোকের পরিবারের অন্য সদস্যগণও এসব লোকদের প্রতি প্রায় মায়া-মমতা শূন্য হয়ে পড়েছে। এর প্রমাণ হিসেবে গোয়েন্দা সূত্রে পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আত্মঘাতী এসব লোকের মরদেহ তাদের পরিবারের কেউ-ই গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ ও এদের সম্পর্কে কিছু শুনতেও তারা অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে।

এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংসার, সমাজ ও দেশের প্রতি বিরাগ ভাজন করে এসব

লোকদের মাধ্যম্যে নিকটতম ও দূরতম ঐসব প্রতিবেশী দেশই শান্তির দেশ– বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ অস্থির করে তুলে দুনিয়ার সম্মুখে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবে বাংলাদেশকে চিহ্নিত করে আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল ভূমি, এখানে মুসলমানদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ শান্তির সাথে বসবাস ও নির্বিঘ্নে আনন্দ চিত্তে শঙ্কামুক্ত মনে ধর্ম পালন করছে। মুসলমানদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র মাস– রমজান মাসেও অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বাংলাদেশে পূজা-পার্বন অনুষ্ঠিত হয়। এদেশে মসজিদ মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করছে এবং উভয়স্থানে একই সময়ে যার যার ধর্ম সে সে পালন করছে। একই অফিসে পাশাপাশি টেবিলে বসে চাকরী করছে, পরস্পরের বাড়িতে দাওয়াত খাচ্ছে, একে অপরের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে, এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হবার পরও মুমূর্ষ রোগীকে নিজের দেহের রক্ত দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করছে।

বাংলাদেশের উন্নতি, অগ্রগতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উদার গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ যাদের কাছে অসহ্য, ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গভঙ্গের ব্যাপারে যারা বিরোধিতা করেছে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শেষেই এদেশের কলকারখানার যন্ত্রপাতি লুট করেছে, যারা ১৯৪৭ সালের ভৌগলিক সীমারেখা মানতে নারাজ এবং বাংলাদেশী নয়– বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী, মঙ্গল প্রদীপ ও রাখিবন্ধন সংস্কৃতির অনুসারী, বাংলাদেশের প্রতি যারা বন্ধুত্বের প্রশ্নে উত্তীর্ণ নয় এবং সাম্প্রদায়িক দুষ্টক্ষতে আক্রান্ত হবার কারণে যারা দুনিয়াব্যাপী বদনাম অর্জন করেছে, তারাই তাদের গোয়েন্দা সংস্থা ও এদেশীয় তল্পীবাহকদের মাধম্যে বাংলাদেশে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী লোকদের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এ দেশকে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নত করার অপচেষ্টা করছে কিনা, এ প্রশ্ন সচেতন মহলের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

আল্লাহর আইন– বৃটিশ ও পাকিস্তান যুগ

বৃটিশরা এদেশকে প্রায় দুইশত বছরব্যাপী শাসন করেছে। এরপর ২৪ বছর বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে পরিচিত ছিলো। তখন তো কেউ-ই 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে এদেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদী কর্মকান্ডের মাধ্যমে বিপর্যয় সৃষ্টি করেনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান করে নিলো, একের পর এক সরকার পরিবর্তন হলো, দীর্ঘ এ সময়েও কেউ উক্ত দাবি তুলে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেনি।

১৯৯৬ সালের পরে এদেশের শাসন ক্ষমতায় যারা এলেন, তাদের শাসনামলে

১৯৯৯ সালের ৬ই মার্চ যশোরে উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালিয়ে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, একই সালের ৮ই অক্টোবর খুলনায় কাদিয়ানীদের উপাসনালয়ে বোমা নিক্ষেপ করে ৮ জনকে হত্যা করা হলো এবং ফরিদপুর জেলার এক মাজারে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ৪ জনকে, ২০০১ সালের ২০শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন মাঠে কমিউনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা করে হত্যা করা হলো ৭ জনকে এবং একই সময়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখেও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, ২০০১ সালের ১৪ই এপ্রিল- পহেলা বৈশাখে ঢাকার রমনা বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা করে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, ২০০১ সালের জুন মাসের ৩ তারিখে গোপালগঞ্জের বানিয়ারচরের একটি গীর্জায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ১০ জনকে হত্যা করা হলো, একই সালের ১৫ই জুন নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ২২ জনকে, ২৩সে সেপ্টেম্বর বাগেরহাটের মোল্লার হাটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যা করা হলো ৮ জনকে, ২৬শে সেপ্টেম্বর সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো ৪ জনকে।

অর্থাৎ ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০১ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোমা নিক্ষেপ করে অনেক মানুষ হত্যা করা হলো, চিরতরে পঙ্গু করে দেয়া হলো কয়েক শত মানুষকে এবং কয়েক কোটি টাকার সম্পদ বিনষ্ট করা হলো। এসব বোমাবাজি যেখানে যেখানে ঘটলো, সেখানে কোথাও 'আল্লাহর আইন চালু'র দাবি তুলে বোমা নিক্ষেপ করেছে বলে শোনা যায়নি এবং 'আল্লাহর আইন চালু'র পক্ষে কোনো সংগঠনের লিফলেটও পাওয়া যায়নি। এ সময়ে বাংলাদেশের কোনো একটি আদালতের বিচারককেও হুমকি দিয়ে কেউ-ই কোনো চিঠি দিলো না, আদালতেও কেউ বোমা নিক্ষেপ করলো না এবং আত্মঘাতী কোনো লোকেরও সন্ধান পাওয়া গেলো না। বাংলাদেশকে 'অকার্যকর ও ব্যর্থরাষ্ট্র' হিসেবেও কোনো মহল থেকে চিহ্নিত করার চেষ্টা পরিলক্ষিত হলো না। বিচারকের মাথায় লাঠি মারার হুমকি দেয়ার পরও কেউ-ই আদালতে সুয়েমোটা মামলা করলো না।

২০০১ সালের পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনে ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী চারদলীয় জোট বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসীন হলো। ইতোপূর্বে যেখানে কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে ইসলামপন্থীদের অমর্যাদা করা হয়েছে, খুনের অভিযোগে শায়খুল হাদীসের মতো সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ আলেমকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয়েছে, মসজিদ-মাদ্রাসা বন্ধ করা হয়েছে, অগণিত আলেম-ওলামাকে গ্রেফতার করে জেলখানা পরিপূর্ণ করা হয়েছে, সেখানে পহেলা অক্টোবরের নির্বাচনের পরে আলেম-ওলামাগণ সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছেন, প্রচার

মাধ্যমে তাঁরা বক্তব্য রাখার ও সরকারী অনুষ্ঠানে দাওয়াত পাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও এমপিগণ আলেমদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সরকার গুরুত্ব দিয়েছে ও সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে, বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই যখন দেশের বাস্তব অবস্থা, ঠিক তখনই এই সরকারের শেষ বছরে হঠাৎ করে নানা ধরনের ভুঁইফোড় সংগঠনের নাম দিয়ে 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী বোমাবাজদের মাধ্যমে দেশে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির অপচেষ্টা করা হচ্ছে এবং সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলাও দায়ের করা হয়েছে।

ইসলামের নাম শুনলেই যাদের গাত্রদাহ শুরু হয় এবং আলেম দেখলেই যাদের নাকে কয়েকটি ভাঁজ দেখা দেয়, কুকুরের মাথায় টুপি পরিয়ে যারা ইসলামকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, মাদ্রাসাকে যারা মৌলবাদী ও সন্ত্রাসীদের আখড়া বলে চিহ্নিত করে, সংবিধানের শুরু থেকে যারা বিস্‌মিল্লাহ্‌ মুছে দেয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম থেকে যারা কোরআনের আয়াত মুছে দেয়, নাস্তিক-মুরতাদদের যারা পরম হিতৈষী-বন্ধু এবং আলেমদেরকে শত্রু মনে করে, চারদলীয় জোটকে ক্ষমতায় যাবার প্রধান বাধা মনে করে যারা জোট ভাঙ্গার ষড়যন্ত্রে ব্যর্থ হয়ে প্রকাশ্যে দাবি তোলে, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ার লক্ষ্যে যারা আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়, 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে আত্মঘাতী বোমাবাজ তাদেরই তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি ও পরিচালিত হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্ন বর্তমানে সচেতন মহলের মনে সৃষ্টি হয়েছে।

মূলধারার ইসলামী দল বনাম সন্ত্রাসবাদ

বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ স্থান করে নেয়ার পরপরই এদেশে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামী দলগুলো পরিবর্তিত পরিবেশে আন্দোলনের সূচনা করেছে এবং এখন পর্যন্তও তারা আন্দোলন-সংগ্রাম করে যাচ্ছে। ইসলামী দলগুলো পাকিস্তান শাসনামলেও প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে এবং জাতীয় সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছে। বাংলাদেশেও দেশ ও জাতির সঙ্কটকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এসব দল গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছে। সূচনালগ্ন থেকেই মূলধারার ইসলামী দল সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত গণতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করে আসছে। কখনো এ দল অনিয়মতান্ত্রিক পন্থা, ষড়যন্ত্র বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে বলে কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না। এ দলের অনেক নেতা-কর্মীকে অন্যান্য দলের লোকজন অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা

করেছে, চিরতরে পঙ্গু করে দিয়েছে অনেককে। কিন্তু মূলধারার ইসলামী দল কখনো প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে অন্য দলের নেতা-কর্মীর কোনো ক্ষতি করেছে বলেও কেউ প্রমাণ দিতে পারবে না।

ইসলামী আন্দোলন এ দেশে অসংখ্য সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এবং এসব সাহিত্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। তাদের সাহিত্যে এমন একটি শব্দও নেই, যা মানুষকে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদে মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এমন একটি লাইনও ইসলামী আন্দোলনের সাহিত্যে অনুসন্ধান করে পাওয়া যাবে না। বরং দলের নেতা-কর্মীগণ সমাজ ও দেশে শান্তির পক্ষে সবসময়ই সোচ্চার রয়েছে এবং সাধারণ মানুষের সেবায় নিজদেরকে নিয়োজিত রেখেছে। এ লক্ষ্যে তারা দেশব্যাপী নানা ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সেবা করে আসছে।

বর্তমানে যাদেরকে আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নামিয়ে দেয়া হয়েছে, মূলধারার ইসলামী দলগুলোর সাথে এদের দূরতম সম্পর্ক নেই। ইসলামী আন্দোলন যারা করে তারা সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তকে মহান আল্লাহর নে'মাত বলেই মনে করে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করে। কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু সময় পেলেই এরা কোরআন-হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যসহ অন্যান্য সাহিত্য অধ্যয়ন করে। দেশ-বিদেশের সংবাদ জানার চেষ্টা করে এবং নিয়মিত পত্রিকা পাঠ করে। যেসব লোককে ইসলামের নামে বোমা হামলার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, পত্র-পত্রিকার সংবাদ অনুসারে এদেরকে কোনো ধরনের সংবাদ শুনতে দেয়া হয়না, পত্রিকা পড়তে দেয়া হয় না এবং নিজেদের সৃষ্ট বলয়ের বাইরে এদেরকে আসতেও দেয়া হয়না। এসব লোকের মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইসলাম ও মূলধারার ইসলামী দলকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। আর এ কাজে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শে বিশ্বাসী রাম-বামপন্থীদেরকেই সবথেকে বেশী তৎপর দেখা যাচ্ছে।

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ দমনে ইসলাম

সন্ত্রাসী তৎপরতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি প্রতিভাত হয়, তাহলো বিশেষ কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই সন্ত্রাসবাদ এবং জঙ্গীবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। বিশেষ কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠা, দলের প্রাধান্য বিস্তার, নির্বাচনে আসন দখল, ক্ষমতা দখল ইত্যাদি কারণে অনেকেই সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতা পরিচালিত করেছে, এ ইতিহাস সচেতন মহলের সম্মুখে রয়েছে। ইয়াহূদীরা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারা দুনিয়াব্যাপী নানা ধরনের তৎপরতা সুদূর অতিত

থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত চালিয়ে আসছে। মাওবাদ ও লেলিনবাদের অনুসারীরা নানা পদ্ধতিতে সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা পৃথিবীর দেশে দেশে পরিচালিত করছে। ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের সময় একশ্রেণীর মুশরিকরা সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা চালিয়েছে, তারা অস্ত্রাগার লুণ্ঠনসহ বোমাবাজী করে মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

কোনো কোনো বাম রাজনৈতিক আদর্শের নেতৃবৃন্দ 'ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে আসে' এ শ্লোগান তুলে সন্ত্রাস ও জঙ্গী তৎপরতাকে উৎসাহিত করেছে। কিন্তু ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলনের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ও জঙ্গী তৎপরতা এই আন্দোলনের ইতিহাসে অনুপস্থিত। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কেউ ইসলামী তৎপরতার মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গী মনোভাবের সামান্যতম গন্ধও খুঁজে পাবে না। কারণ এই আদর্শ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করেছেন, পৃথিবী থেকে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও অন্যান্য অশান্তি দূরিভূত করার লক্ষ্যেই এই আদর্শের আগমন। প্রত্যেক নবী-রাসূলও পরিচালিত হয়েছেন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক। সুতরাং ইসলাম সম্পর্কে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের প্রশ্ন ওঠাই অবান্তর।

ইসলামী আদর্শ প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই আদর্শের অনুপম গুণ বৈশিষ্ট্যের কারণে। চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর ও কল্যাণধর্মী সৌন্দর্যের কারণেই মানুষ ইসলামী আদর্শের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছে। ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে হবে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে দূরে থাক- কোনো একজন নবী-রাসূলকেও পদ্ধতি নির্ণয়ের স্বাধীনতা দেয়া হয়নি। এ পদ্ধতি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে শিখিয়েছেন। ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা শিখাচ্ছেন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ-

(হে নবী) তুমি তোমার মালিকের পথে মানুষদের প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান করো, কখনো তর্কে যেতে হলে তুমি এমন এক পদ্ধতিতে যুক্তিতর্ক করো যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট পন্থা। (সূরা নাহল-১২৫)

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করতে গিয়ে জুলুম-অত্যাচার এলে প্রতিবাদে কারো প্রতি জুলুম-অত্যাচারও করা যাবে না, মন্দের জবাব মন্দ দিয়ে নয়- ভালো দিয়ে দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلاَّ بِاللّٰهِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلاَ تَكُ فِىْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ-

(হে নবী,) তুমি নির্যাতন নিপীড়নে ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য সম্ভব হবে শুধু আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্য দিয়েই, এদের আচরণের ওপর দুঃখ করো না, এরা যেসব ষড়যন্ত্র করে চলেছে তাতে তুমি মনোক্ষুন্ন হয়ো না। (সূরা নহল-১২৭)

ইসলামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআন যত কথা বলেছে, তা এখানে উল্লেখ করতে গেলে এ পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা যে পদ্ধতি শিখিয়েছেন, এর মধ্যে কোথাও কি সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের গন্ধ পাওয়া যাবে? ইসলাম সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও পৈশাচিক নীতিকে ঘৃণা করে এবং এসব কিছুর বিরুদ্ধেই ইসলাম জিহাদ ঘোষণা করেছে। পৃথিবী থেকে এসব অনাচার উৎখাত করার জন্য মানুষের প্রতি বারবার আহ্বান জানিয়েছে ইসলাম।

আল্লাহর আইন চালু করার ধুয়া তুলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শিখানো পদ্ধতি পরিহার করে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মাধ্যমে যারা পৃথিবীতে দাঙ্গা, অশান্তি, জনমনে ভীতি, আতঙ্ক ও বিপর্যয় সৃষ্টি করছে, তাদের সম্পর্কে ইসলামের স্পষ্ট নির্দেশ হচ্ছে–

اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرْضِ-ذلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ-

যারা আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আল্লাহর যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির অপচেষ্টা করে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদের হত্যা করা হবে কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ করা হবে, অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে ফেলা হবে, কিংবা দেশ থেকে তাদের নির্বাসিত করা হবে; এই অপমানজনক শাস্তি তাদের দুনিয়ার জীবনের জন্যে, তাছাড়া পরকালে তাদের জন্যে ভয়াবহ আযাব তো রয়েছেই। (সূরা মায়িদা-৩৩)

জনমনে আতঙ্ক বা ভীতি সৃষ্টি হতে পারে, ইসলাম এ ধরনের কোনো কর্ম বা আচরণ করতেও কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি

বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কারো হাতে উলঙ্গ (খাপমুক্ত) তরবারী বের করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আরেক হাদীসে তিনি কারো প্রতি অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে কথা বলতেও নিষেধ করেছেন। এমন পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হারাম করা হয়েছে, যে পরিবেশ নিশ্চিত রক্তক্ষয়ী পরিণতিবরণ করবে। তিনি বলেছেন-

لاَيُشِيْرُ اَحَدُكُمْ اِلى اَخِيْهِ بِالسِّلاَحِ-فَاِنَّه لاَيَدْرِىْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِه ضَيَقَعُ فِىْ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ-

তোমাদের কেউ যেনো তার ভাইয়ের প্রতি অস্ত্রের মাধ্যমে ইশারা না করে, কারণ শয়তান কখন তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিবে এবং সে জাহান্নামের গর্তে পতিত হবে, তা সে অনুভবও করতে পারবে না। (বোখারী-মুসলিম)

مَنْ اَشَارَ اِلى اَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَاِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُه حَتّى يَنْتَهِىْ وَاِنْ كَانَ اَخَاهُ لِاَبِيْهِ وَاُمِّه-

যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রতি কোনো অস্ত্রের মাধ্যমে ইশারা করে তখন ফেরেশ্‌তারা তার ওপর অভিশাপ করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয়। যদিও তার আপন ভাই-ই হোক না কেনো। (মুসলিম)

لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يُّرَدِّعَ مُسْلِمًا-

কোনো মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় আরেকজন মুসলমানকে ভয় দেখানো।

এটাই ইসলাম। উন্মুক্ত তরবারী বা অন্য কোনো অস্ত্র দেখলে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হতে পারে, ইসলাম এটাও বরদাস্‌ত করে না। জনমানসে শান্তির জোয়ার প্রবাহিত করার জন্যই ইসলামের আগমন। যারা জনজীবনে অশান্তি সৃষ্টি করবে, সূরা মায়িদার উক্ত আয়াতে তাদের ব্যাপারে ইসলাম কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছে। ফিত্‌না-ফাসাদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে ইসলাম কঠোরভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। ফিত্‌না সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা সূরা বাকারায় বলেছেন-

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ-

ফিতনা-ফাসাদ দাঙ্গা-হাঙ্গামা নরহত্যার চাইতেও বড় অপরাধ। (সূরা বাকারা-১৯১)

সুতরাং ইসলামে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদের গন্ধ থাকা দূরে থাক, ইসলামের সাথে এসবের দূরতম সম্পর্কও নেই। নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ইতিহাসের সবথেকে বর্বর নির্যাতন সহ্য করেছেন। যখন তাঁরা নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তখন তাঁরা কি সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে ইসলামের দুশমনদের হত্যা করতে পারতেন না? জঙ্গী তৎপরতা প্রদর্শন করে প্রতিপক্ষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারতেন না? বরং তাঁরা অমানবিক নির্যাতন সহ্য করে মৃত্যুকেই বরন করেছেন, তবুও অনিয়মতান্ত্রিক পথ, সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করেননি বা কোনো ধরনের বক্র চিন্তাও করেননি।

মদীনায় হিজরত করার পরে নবী করীম (সাঃ) ও মুসলমানরা তখন বিপুল শক্তির অধিকারী। মক্কা থেকে শত্রুপক্ষের লোকজন মাঝে মধ্যে চুপিসারে এসে মদীনার ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট করতো এবং বৃক্ষ ধ্বংস করে দিতো। প্রতিশোধ হিসেবে মুসলমানরাও গোপনে মক্কায় গিয়ে ফসল আর বৃক্ষ ধ্বংস করে দিতে পারতো। মদীনার পাশ দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাওয়া ব্যতীত মক্কার কাফিরদের দ্বিতীয় কোনো পথ ছিলো না। অত্যাচারিত মুসলমানরা এসব শত্রুপক্ষ ব্যবসায়ীদের জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারতেন। হোদায়বিয়ার সন্ধিতে উল্লেখ করা হয়েছিলো, মক্কা থেকে কোনো মুসলমান মদীনায় এলে তাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হবে, আর মদীনা থেকে কোনো মুসলমান মক্কায় গেলে তাকে ফেরৎ পাঠানো হবে না। নবী করীম (সাঃ) সন্ধি-শর্তের এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গুপ্তচর হিসেবে মদীনার মুসলমানদেরকে মক্কায় পাঠিয়ে শত্রুদের ক্ষতি করতে পারতেন না? কিন্তু তিনি এসব চিন্তাও করেননি। ইসলাম সাম্য-মৈত্রীর আদর্শ, সেই ইসলাম কোনোভাবেই সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদ বরদাস্ত করবে না।

মক্কা বিজয়ের পরে ঐ লোকগুলো আল্লাহর রাসূল ও মুসলমানদের কাছে করুণার পাত্রে পরিণত হলো, যারা লোমহর্ষক নির্যাতনের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করেছে, বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দিয়েছে। অবশেষে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে। সেই লোকগুলো যখন মুসলমানদের সম্মুখে এসেছে, মুসলমানরা ইচ্ছে করলে কি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন না? প্রতিশোধ গ্রহণ করা দূরে থাক– নবীয়ে রহমত সকলকে ক্ষমা করে দিলেন। সেই ইসলাম কি আল্লাহর আইন চালুর নামে মানুষ হত্যা, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ বা বোমাবাজি সমর্থন করতে পারে?

মানুষ সামান্যতম অসুবিধা ভোগ করুক, এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ ইসলামের কাছে মানুষের সম্মান-মর্যাদা অনেক উচ্চে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ

الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি, স্থলে ও সমুদ্রে আমি ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং তাদের পবিত্র (জিনিসসমূহ দিয়ে) আমি রিয্ক দান করেছি, অতপর আমি অন্য যতো কিছু সৃষ্টি করেছি তার অধিকাংশের ওপরই আমি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে মানুষের সম্মান-মর্যাদা অনেক বেশী এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহর কাছের ফেরেশ্তাদের তুলনায়ও অনেক বেশী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম সাথে নিয়ে মদীনায় এক স্থানে বসে রয়েছেন, তখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে আসীন। তিনি দেখতে পেলেন, একটি লাশ দাফন করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। লাশ তাঁর সম্মুখ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে। তিনি দ্রুত দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁকে দাঁড়াতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামও দাঁড়ালেন। একজন সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ লাশ তো একজন ইয়াহূদীর! নবীয়ে রহমত বললেন, কেনো, ইয়াহূদী কি মানুষ নয়!

এই মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা অন্য সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, পৃথিবীতে চলাচলের বাহন দিয়েছেন এবং তাদের জীবন-ধারণের উপকরণ দান করেছেন। আল্লাহর রাসূল মানুষের প্রতি অসীম সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আর সেই মানুষকেই আল্লাহর আইন চালুর নামে বোমাবাজি, সন্ত্রাস আর জঙ্গী তৎপরতা চালিয়ে হত্যা করা কি ইসলাম সমর্থন করতে পারে?

বিবাহিত মানুষ জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হলে ইসলাম তার শাস্তি স্বরূপ মৃত্যুদন্ড দিয়েছে। আর অবিবাহিত মানুষ এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হলে বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিয়েছে। কারণ একজন অবিবাহিত মানুষ যৌবনের উদগ্র কামনা তাড়িত হয়ে এ কাজ করতে পারে। মানব প্রকৃতির চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখেই ইসলাম বিভিন্ন অপরাধের দন্ড নির্ধারিত করেছে। মানব প্রকৃতি ও চাহিদার এতটা গভীরে যে ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে দন্ডবিধি হ্রাস করেছে, সেই ইসলাম কি সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের সমর্থক হতে পারে?

শক্তি প্রয়োগে আদর্শ প্রতিষ্ঠা

ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্র বা দলীয় শক্তি প্রয়োগ করে কোনো কোনো আদর্শ দেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শাস্তির ভয়ে প্রকাশ্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে মানুষ সে আদর্শের অনুসরণ করেছে আর আড়ালে প্রকাশ করেছে অন্তরের ঘৃণা। অনেক রাজা-বাদশাহই এ ধরনের হঠকারিতামূলক কাজ করেছেন। তারা যে বোধ-বিশ্বাস

অন্তরে লালন করতেন, তাই জোরপূর্বক জাতির ওপর আইন প্রয়োগ করে চাপিয়ে দিতেন। বিংশ শতাব্দীর ঊষালগ্নেও আমরা দেখতে পেয়েছি, ইয়াহূদী সন্তান কার্লমার্কস সৃষ্ট সমাজতন্ত্র নামক আদর্শও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়ার নির্মম-নিষ্ঠুর কার্যক্রম।

কিন্তু যারা এই অবাস্তব পদ্ধতি প্রয়োগ করে আদর্শ টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়েছে, তারা এ কথা ভুলে গিয়েছে যে, বিশ্বাস হলো মানুষের মনের সাথে সম্পৃক্ত। শক্তি প্রয়োগে কোনো বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করা যায় বা কিছু সময়ের জন্য পালন করানোও যায় কিন্তু হৃদয়-মনে তা প্রতিষ্ঠিত করা যায়না। মানুষ তো পরম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নিষ্ঠার সাথে সেই আদর্শই অনুসরণ করে, যারা তা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে। যে আদর্শের শিকড় হৃদয়-গভীরে প্রোথিত, তাই মানুষের বাহ্যিক অবয়বে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে।

সম্রাট অশোক, সম্রাট আকবর, হালাকু খান, চেঙ্গিশ খান শক্তি প্রয়োগ করে কত নিয়ম-নীতি চালু করেছিলেন, এসবের কোনো অস্তিত্বও নেই। নিকট অতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাদের প্রচলিত নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা তো দূরে থাক, তাদের বিশাল বিশাল মূর্তিগুলোর গলায় শিকল লাগিয়ে টেনে নামানো হয়েছে। শক্তি প্রয়োগ করে, লোভ-লালসা দেখিয়ে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে আদর্শ অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং এর স্থায়িত্ব নেই-ক্ষণস্থায়ী। সামান্য কিছু কালের ব্যবধানে এর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে।

পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই হলো ব্যতিক্রম সেই আদর্শ, যা লোভ-লালসা দেখিয়ে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা করে অথবা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচার-প্রসার করা হয়নি। ইসলামী আদর্শের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনুপম গুণ-বৈশিষ্ট্য, নবী-রাসূলদের আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণ এবং সাহাবায়ে কেরামের আচরিত তুলনাহীন গুণাবলীর প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম কবুল করেছে। আর এভাবেই ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে। সুতরাং সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা করে জঙ্গী পন্থায় যারা আল্লাহর আইন চালু করার চিন্তা করে, তাদের বোঝা উচিত এ পথ ইসলামের নয় এবং এই পথ অবলম্বন করে মানুষের মনে আল্লাহর আইনের প্রতি সম্মানবোধ, শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সৃষ্টি করা যাবে না।

ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুর ঢাল চুরির ঘটনা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছেন। তাঁর ঢাল চুরি করলো একজন ইয়াহূদী। তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের পদে আসীন। রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে ইয়াহূদীকে চরম শাস্তি দিয়েই তো ঢালটি উদ্ধার করতে পারতেন কিন্তু ইসলামী শিক্ষা তাঁকে সে পথে অগ্রসর হতে না দিয়ে আদালতে বিচারকের কাছে পাঠিয়েছে। আদালত সাক্ষী গ্রহণযোগ্য না

হবার কারণে ইয়াহূদীর পক্ষে আর ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধান হযরত আলীর বিপক্ষে রায় দিয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান আদালতের রায় মেনে নিয়ে বাড়ির দিকে ফিরছেন। পথিমধ্যে সেই ইয়াহূদী ছুটে এসে হযরত আলীকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল কণ্ঠে বলছে, যাদের আদর্শ এত সুন্দর মানুষ সৃষ্টি করেছে, আমি সেই আদর্শ গ্রহণ করে মুসলমান হলাম। এই নিন আপনার ঢাল, এটি আমিই চুরি করেছিলাম।' ইসলাম এভাবেই প্রসারিত হয়েছে, শক্তি প্রয়োগে অবশ্যই নয়।

নিয়মতান্ত্রিক পন্থা- আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার পথ

আল্লাহর আইন কিভাবে কোন্ পদ্ধতিতে চালু করতে হবে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিভাবে করতে হবে, এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করার অধিকার সাধারণ কোনো মানুষের ওপর অর্পণ করা হয়নি। মহান আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কিভাবে করতে হবে, তা বাস্তবে দেখিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সূচনা করলেন, তখন মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিরত থাকার শর্তে আল্লাহর রাসূলের হাতে মক্কার সামগ্রিক ক্ষমতা তুলে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলো। তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আল্লাহর নবী সামগ্রিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে আল্লাহর আইন চালু করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি।

কারণ, আল্লাহর আইন যাদের মাধ্যমে চালু করা হবে এবং সে আইন যারা বাস্তবে প্রয়োগ করবে, সেই লোকগুলো তখন পর্যন্ত তৈরী হয়নি। আল্লাহর আইন চালু করার পূর্বেই সেই আইনের ভিত্তিতে একদল মানুষকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং বাস্তব জীবনে সে মানুষগুলো আল্লাহর আইন অনুসরণ করবে। আল্লাহর আইনের প্রতি এসব লোকের অন্তরে বিদ্যমান থাকবে সর্বোচ্চ সম্মানবোধ এবং এই আইনের প্রতি অন্তরে থাকবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এ ভালোবাসাকে স্থান দিতে হবে সকল কিছুর ঊর্ধ্বে। এই আইন পালনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার প্রস্তুতি থাকতে হবে। এই ত্যাগ স্বীকারও সে বাধ্য হয়ে করবে না, আল্লাহর আইনের প্রতি গভীর মমতার কারণেই আন্তরিকভাবে ত্যাগ করবে। দীর্ঘ প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে এই ধরনের লোক সর্বপ্রথম তৈরী করতে হবে।

এই ধরনের লোক নবী করীম (সাঃ) এর কাছে আকাশ থেকে অবতীর্ণ করা হয়নি। তিনি যে সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই সমাজের যেসব লোকজন লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করে রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই আল্লাহর বিধানের জীবন্তরূপে পরিণত হয়েছিলেন। মক্কায় ১৩ বছর

আন্দোলন করে আল্লাহর নবী ৩১৩ জন সেই ধরনের মানুষ প্রস্তুত করলেন। কিন্তু আল্লাহর আইন চালু করার মতো জনসমর্থন মক্কায় পাওয়া গেলো না। সুতরাং সেখানে আল্লাহর আইন চালু করা গেলো না।

আল্লাহর রাসূল মক্কায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেই ৩১৩ জন প্রাণ উৎসর্গকারী লোকদের মাধ্যমে সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদী পন্থায় জনমনে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করেননি। এসব লোকদের মাধ্যমে তিনি আল্লাহর আইনের বিপক্ষে অবস্থানকারী মক্কার লোকদের হত্যাও করাননি।

আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টির জন্য পূর্ব থেকেই মদীনায় দাওয়াতী কাজ চলছিলো এবং সেখানে জনমত তৈরী হলো। নবী করীম (সাঃ) ক্রমশ তৈরী লোকগুলো মদীনায় পাঠিয়ে সেখানের লোকদের মন-মানসিকতা বুঝে তাদের সাথে নিজেদের একাকার করে দেয়ার ব্যবস্থা করলেন। মদীনায় জনমত তৈরী হয়েছে, তবুও তিনি মক্কায় তৈরী করা সকল লোকগুলো নিয়ে তিনি একই সাথে একই দিনে মদীনায় হিজরত করেই সেখানে আল্লাহর আইন চালু করেননি।

দীর্ঘ পরিকল্পনার ভিত্তিতে তিনি তৈরী করা লোকগুলোকে আস্তে আস্তে সেখানে পাঠিয়েছেন। যেনো মক্কার এসব লোকগুলো মদীনার লোকদের সাথে মেলামেশা করে তাদের মন জয় করতে পারে এবং সেখানের পরিবেশের সাথে নিজেদের একাকার করে দিতে পারে। কারণ আল্লাহর আইন চালু করতে হবে মক্কায় তৈরী এসব লোকদের মাধ্যমেই, মদীনার প্রশিক্ষণহীন সদ্য মুসলমানদের মাধ্যমে নয়। আবার মদীনার লোকগুলো মক্কার লোকদের নেতৃত্ব মেনে নিবে কিনা, সে প্রশ্নও সম্মুখে ছিলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পন্থায় মক্কায় তৈরী করা লোকগুলোকে ধীরে ধীরে মদীনায় প্রেরণ করে সবশেষে স্বয়ং তিনি প্রধান সহচর হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সাথে নিয়ে মদীনায় গমন করলেন। মদীনায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়েই তিনি আল্লাহর দেয়া সকল আইন একযোগে চালু করেননি। তিনি ধারাবাহিকভাবে আল্লাহর আইন চালু করতে থাকলেন। একটি করে আইন চালু করেছেন, সে আইনের প্রতি মানুষের মনে শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করেছেন, আইন মানার মানসিকতা প্রস্তুত করেছেন, তারপর আরেকটি আইন চালু করেছেন। দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তিনি মহান আল্লাহর দেয়া পরিপূর্ণ আইন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করেছেন।

আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া নেই, আন্দোলন-সংগ্রাম নেই, দাওয়াতী কাজ নেই, হঠাৎ করে আদালতে উপস্থিত হয়ে বোমা মেরে বিচারক হত্যা করে বলা হচ্ছে, 'আল্লাহর আইন চালু করার জন্য বোমা মেরে সওয়াবের কাজ করেছি, বিচারককে হত্যা করতে গিয়ে যদি নিজে নিহত হই তাহলে শহীদ হয়ে

জান্নাতে যাবো।' এটাই যদি জান্নাত লাভের ফর্মূলা হতো, তাহলে প্রত্যেক সাহাবা সে যুগের বিচারকদের হত্যা করেই জান্নাতে যাবার পথ সুগম করতেন। অবর্ণনীয় নির্যাতন ভোগ, সম্পদ ও প্রাণের কোরবানী দিতেন না।

নবী করীম (সাঃ) মক্কায় আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে লোক তৈরী করতে থাকলেন, কয়েকজন লোক যখন তৈরী হলো, সেই লোকদের তিনি মদীনায় প্রেরণ করে জনমত গঠনের কাজে নিয়োজিত করলেন। জনমত গঠনের এই প্রক্রিয়াকে বর্তমানে আমরা আধুনিক গণতন্ত্রের ভাষায় 'ভোট গ্রহণ পদ্ধতি' বলতে পারি। মদীনায় ভোট গ্রহণ করা হলো এবং জনরায় এলো আল্লাহর আইনের পক্ষে। মদীনার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ আল্লাহর আইনের পক্ষে ভোট প্রদান করলেন। এরপর সেখানে আল্লাহর আইন জারী হলো।

আল্লাহর আইন চালু করার লক্ষ্যে নবী করীম (সাঃ) যেভাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন করেছেন এবং যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, সেটাই অভ্রান্ত পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রথমে ওহীভিত্তিক প্রশিক্ষণের ভিত্তিতে একদল লোক তৈরী করতে হবে। দ্বিতীয়ত আল্লাহর আইনের পক্ষে জনমত গঠন করতে হবে। এই দুটো পন্থা ব্যতীত আল্লাহর আইন চালু করার বিকল্প পথের শিক্ষা কেউ যদি দেয়, তাহলে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে হবে, এসব লোক আল্লাহ, রাসূল ও ইসলামের কঠিন দুশমন। এরা আল্লাহর আইন চালুর নামে ইসলামকে হেয়-প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়ার পথ সৃষ্টি করছে।

আল্লাহর আইন চালু করার মন্ত্রে দিক্ষিত করে বোমা হামলার কাজে যেসব অপরিপক্ক অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত কিশোর-তরুণ ও কর্মহীন বেকার যুবকদের অর্থের বিনিময়ে ব্যবহার করা হচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে না, ইসলাম, মুসলিম মিল্লাত, দেশ ও জাতির কত বড় সর্বনাশের কাজে তাদেরকে ব্যবহার করা করছে। এসব বিষয় বুঝার মতো শিক্ষা এরা পায়নি এবং সে ধরনের মন-মানসিকতাও এদের সৃষ্টি হয়নি। শত্রুপক্ষ এসব স্থুল বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্থবির চিন্তার অধিকারী লোকদেরই বোমা হামলার কাজে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছে।

আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি

আমরা ইতোপূর্বেই পবিত্র কোরআন-সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের কর্ম পদ্ধতি থেকে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিভাবে কোন্ পদ্ধতি অনুসারে আল্লাহর আইন তথা ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রদর্শিত পথ ও পদ্ধতি ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ ও পদ্ধতি যারা অবলম্বন করবে, সে পদ্ধতি ভ্রান্ত এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির পথ। আল্লাহ তা'য়ালা দেশ ও সমাজের সাথে

নিরাপত্তাবোধ যুক্ত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। বোমাবাজি তথা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়টিকে ইসলাম, মুসলিম, দেশ ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টা চলছে। এই কাজ যারা করছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِه، وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الاَضِ، اُولٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ–

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আল্লাহ তা'য়ালা যেসব সম্পর্কের ভিত মযবুত করতে বলেছেন তা তারা ছিন্ন করে, সর্বোপরি যমীনে অহেতুক বিপর্যয় সৃষ্টি করে, এরাই হচ্ছে আসল ক্ষতিগ্রস্ত। (সূরা বাকারা-২৭)

দেশ ও সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে জান্নাতে লাভের আশা করা চরম মূর্খতা বৈ আর কিছু নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এসব লোক ক্ষতিগ্রস্ত অর্থাৎ তারা অবশ্যই জাহান্নামে যাবে। আল্লাহর আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাসী তৎপরতায় অন্য যেসব লোকদের ব্যবহার করছে, ব্যবহৃত লোকগুলো হঠাৎ করেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করছে না। দিনের পর দিন প্রশিক্ষণ দিয়ে এদের মন-মস্তিষ্কে এ কথা দৃঢ়মূল করে দেয়া হয়েছে যে, 'এ পথ কল্যাণের পথ এবং আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য এই পথ অবলম্বন করেছি' এবং প্রশিক্ষণের সময় কোরআন-হাদীসে উল্লেখিত জিহাদ সম্পর্কিত কথাগুলোর ভুল ব্যাখ্যাও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়েই এবং আল্লাহকে সাক্ষী করেই মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত লোকদের বুঝানো হয়েছে যে, 'আমরা আল্লাহর আইন চালু করার স্বার্থেই এসব কাজ করতে বাধ্য হচ্ছি।' এই শ্রেণীর লোকদের বক্তব্য শুনে বা এদের লেখা বই পড়ে, সন্ত্রাসের কাজে মাঠ পর্যায়ে ব্যবহৃত লোকগুলো ধারণা করছে যে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এটিই সঠিক পথ।' এই শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُه فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِه–وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ–

মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যার কথা এই পার্থিব জীবনে তোমাদের খুবই ভালোলাগে এবং নিজের 'উদ্দেশ্য' সৎ হবার ব্যাপারে সে বারবার আল্লাহকে সাক্ষী বানায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সত্যের সাংঘাতিক শত্রু। (সূরা বাকারা-২০৪)

আল্লাহর আইন চালুর নাম করে জনমনে সন্ত্রাস আর আতঙ্ক সৃষ্টি করার অর্থ হলো প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী দল সম্পর্কে মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করা। এসব

সন্ত্রাসী কাজের মূল লক্ষ্যই হলো, মানুষকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে বিমুখ রাখা এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠাকামী দলকে মানুষ যেনো ঘৃণা করে সেই ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা। অর্থাৎ মানুষ যেনো প্রকৃত সত্যের পথে অগ্রসর হতে না পারে এবং কুফুরীর মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। সুতরাং ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাস করছে, তারা অবশ্যই ইসলামের বিপরীত পথে অগ্রসর হচ্ছে এবং অন্য মানুষকেও ভুল পথে পরিচালিত করছে। আল্লাহ্ তা'য়ালা এসব লোকদের পরিণতি সম্পর্কে বলেন–

اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ–

যারা নিজেরাই কুফুরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়েছে তাদেরকে আমি আযাবের পর আযাব দেবো, এটা হচ্ছে তাদের সেই অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টির শাস্তি, যা তারা দুনিয়ায় করে এসেছে। (সূরা নাহ্ল-৮৮)

জাতীয় জীবনে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, এ ধরনের যে কোনো কাজ করা হারাম এবং এসব কাজ যারা করে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদেরকে 'বিপর্যয় সৃষ্টিকারী' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন–

وَيَسْعَوْنَ فِى الاَرْضِ فَسَادًا، وَاللّٰهُ لاَيُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ–

এরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টির চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আদৌ পসন্দ করেন না। (সূরা মায়িদা-৬৪)

পবিত্র কোরআনে একাধিকবার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী তথা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ইসলাম তার সূচনালগ্ন থেকেই সোচ্চার এবং প্রত্যেক নবী-রাসূলই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সন্ত্রাস উৎখাত করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়েছেন এবং প্রত্যেক যুগেই হক্কানী আলেম-ওলামায়ে কেরামও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। বর্তমানেও দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে, আল্লাহর আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি। আর প্রচার মাধ্যমই হতে পারে এ কাজে সবথেকে সহজ ব্যবহার যোগ্য হাতিয়ার।

বোমা হামলা- প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই সন্ত্রাসী মন-মানসিকতাসম্পন্ন নাগরিক রয়েছে এবং তারা কোনো না কোনো কারণে সুযোগ পেলেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ড করে থাকে।

বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয় এবং এসব সন্ত্রাসীদের শাস্তি দেয়ার দন্ডবিধিও অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু বাংলাদেশে 'আল্লাহর আইন চালুর' নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার বিষয়টি বর্তমানে যেভাবে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে, ইতোপূর্বে এ ধরনের শ্লোগানও শোনা যায়নি এবং আল্লাহর আইন চালুর নাম করে কেউ সন্ত্রাসও করেনি। ইসলামের কথা বলে যেসব সংগঠন সন্ত্রাস আর জঙ্গীবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, যেমন হরকাতুল জিহাদ, জুমরাতুল মাসাকীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা জেএমবি, আল্লাহর দল ইত্যাদি। এসব ভুঁইফোড় সংগঠনের নামও ইতোপূর্বে শোনা যায়নি।

উল্লেখিত সংগঠনসমূহের মূল নেতৃত্বে কে আছেন এবং তাদের উপদেষ্টা ও কর্মপরিষদে কারা আছেন, তাদের ইসলামী জ্ঞান কতটুকু, শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, সামাজিক অবস্থান কার কোন্ ধরনের, জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি কোন্ পর্যায়ের, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং দল পরিচালনায় অর্থের উৎসই বা কি, এসব ব্যাপারে জাতি সম্পূর্ণ অন্ধকারে রয়েছে।

তবে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে যতদূর জানা যায় যে, দেশে ১৯৯০ সাল থেকে এ ধরনের বেশ কিছু সংগঠনের জন্ম হয়েছে। ব্যক্তি কেন্দ্রিক এসব সংগঠন একত্রিত হয়ে ১৯৯৮ সালে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিহাদে লিপ্ত হবার জন্য একই প্লাটফর্মে কাজ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরা ক্রমাগত ১০ বছর একই সাথে কাজ করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। নিজেদের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সারাদেশে সন্ত্রাসী রিক্রুটমেন্ট ও সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে। অপরিচিত এসব সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করে অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অপরিপক্ক কিশোর, তরুণ ও বেকার যুবকদের অর্থের প্রলোভন দিয়ে আর ইসলামের কথা বলে বোমা বহন, বিস্ফোরণ ও বানানোর প্রশিক্ষণ দেয়।

এমনভাবে লোকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডার দল গণহত্যা, গুপ্তহত্যা, বোমা হামলাসহ অন্যান্য অস্ত্র পরিচালনায় দক্ষ এবং এরা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তেও সক্ষম। ইতোমধ্যে তারা তাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার প্রমাণও দিয়েছে। ধর্মের নামে বোমা সন্ত্রাসে নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারে বর্তমানে যাদের নাম পত্র-পত্রিকায় বারবার লেখা হচ্ছে, সেই লোকগুলো অতিতে পুলিশ, বিডিআর বা সামরিক বাহিনীতে কোনো সময় কর্মরত ছিলো বলে এ পর্যন্তও জানা যায়নি। এখানে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, এসব লোকগুলো বোমা বানানো থেকে শুরু করে নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার বিধি শিখলো কোত্থেকে? সামরিক কায়দায় এদের প্রশিক্ষণ দিলো কে? এসব সরঞ্জামই বা তারা কোত্থেকে যোগাড় করছে এবং যোগানদাতা কে?

আরেকটি বিষয় লক্ষ্যনীয়, দেশের অভ্যন্তরে যখনই এ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটছে, সাথে সাথে প্রতিবেশী একটি দেশের টিভি চ্যানেল, অন্যান্য সংবাদ মাধ্যম, বাংলাদেশে অবস্থিত সে দেশের রাষ্ট্রদূত এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো কোনো ধরনের তদন্ত ব্যতীতই একযোগে কোরাস কণ্ঠে ঘোষণা করছে, 'এই সন্ত্রাসী কর্ম করা হয়েছে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে এবং এর সাথে যারা জড়িত, তারা সকলেই ইসলামপন্থী।'

ইতোপূর্বে বাংলাদেশে যখন ধর্মনিরপেক্ষ একটি দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলো, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কিছু সময়ের সফরে বাংলাদেশে এসেছিলেন। নিজ দেশের সম্মান-মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে সে সময় রাষ্ট্রীয়ভাবে মৌলবাদ, জঙ্গীবাদ ও ধর্মীয় সন্ত্রাস সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মনে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলো যে, তিনি তার সফরসূচী পরিবর্তন করে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলেন। রাষ্ট্রীয় খরচে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মীয় উগ্রবাদ ও জঙ্গীবাদের উত্থান সম্পর্কে ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেও তৎকালীন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার আমেরিকার প্রেসিডেন্টসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের উপহার দিয়ে অনুগ্রহ কুড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, ঐ ধর্মনিরপেক্ষ দল যখন ক্ষমতায় ছিলো, তখন থেকেই বাংলাদেশে ধর্মের নামে বোমাবাজির সূচনা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ দলের বলয়ভুক্ত বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি-সাহিত্যিক, গবেষক, প্রবন্ধকার, চলচ্চিত্রকার লোকজন সম্মিলিতভাবে 'বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গীবাদের উত্থান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ক্ষত-বিক্ষত বাংলাদেশ, বাংলাদেশে ধর্মীয় অসহিষ্ণু পরিবেশ' ইত্যাদি ধরনের প্রবন্ধ, বই ও ছবি নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার কাছে পাঠিয়ে ছিলো।

এর বেশ কিছুদিন পরে 'বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ' নামক একটি সংস্থার উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হলো। আলোচনা সভার মূখ্য বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হলো, 'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ ও দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা।'

দেশ-বিদেশের অনেক পন্ডিত যোগ দিয়েছিলেন, বাংলাদেশেরও এমন কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব উক্ত আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে দাওয়াত পেয়েছিলেন, যারা নামায আদায় করেন। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আলোচনা সভায় আলোচকদের মধ্যে অনেকেই 'ধর্মীয় জঙ্গীবাদ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সরাসরি ইসলামকে আঘাত করে বক্তব্য দিতে থাকেন। এমনকি জার্মানির এক অখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিচিত প্রফেসর উপাধি ব্যবহারকারী হ্যান্স কিপেনবার্গ নামক লোকটি 'সন্ত্রাসই ইবাদত এবং

১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসীদের ধর্মগ্রন্থ' শীর্ষক একটি কুৎসিত-পদবাচ্য প্রবন্ধ উক্ত সেমিনারে পাঠ করে। এই লোকটি পবিত্র কোরআনের জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত উদ্ধৃত করে ও কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ কথাই বুঝানোর চেষ্টা করেছিলো যে, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড মুসলমানদের কাছে আল্লাহর ইবাদাত করার সমতুল্য এবং ১১ই সেপ্টেম্বরে আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে যারা অগণিত মানুষ হত্যা করলো, তারা সকলেই মুসলমান এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনই তাদেরকে এই জঘন্য কাজে উৎসাহিত করেছে। শুধু তাই নয়, বদ্ধ উন্মাদ ঐ ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেছিলো এই বলে যে, 'মুসলমানদের ধর্মনেতা মুহাম্মাদ (সাঃ) এক যুদ্ধবাজ ছিলেন।'

অবশ্য তার বিদ্বেষ প্রসূত অসভ্য বক্তব্যের প্রতিবাদও দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে করেছিলেন আলোচনা সভায় উপস্থিত বিচারপতি মোস্তফা কামাল সাহেব। যে বাংলাদেশ পৃথিবীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল ভূমি ও পরধর্ম-পরমত সহিষ্ণু হিসেবে সারা দুনিয়ায় পরিচিত, যে দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানির চিহ্ন নেই, সকল ধর্মের লোকজন পরস্পর আপন আত্মীয়ের ন্যায় বসবাস করে, একে অপরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়, পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় চলে, পাশাপাশি ব্যবসা ও অন্যান্য কর্ম করে, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও সরকারী ক্ষেত্রে, কোথাও চাকরীর ব্যাপারে জাতি-ধর্মের কোনো পার্থক্য নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, উক্ত সেমিনারের আয়োজন মুসলিম প্রধান এবং ধর্মভীরু হিসেবে পরিচিত সেই বাংলাদেশে কেনো করা হলো?

এর আয়োজন তো করা প্রয়োজন ছিলো ইউরোপ-আমেরিকার কোনো দেশে। যেখানে পাসপোর্টে বা পরিচয় পত্রে মুসলিম নাম দেখলেই তাদের চেহরায় এক অবিমিশ্র ঘৃণা পরিলক্ষিত হয়। গায়ের রঙ কালো হবার কারণে যেখানে নিজ দেশের মানুষকেই হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র গায়ের রঙ কালো হবার কারণে যারা সরকারী চাকরী, অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজ দেশে তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেও মর্যাদা পায় না। বর্ণবাদের আগুনে যে ইউরোপ-আমেরিকা জ্বলছে, যেখানে মুসলিম নারীর হিজাব ব্যবহারের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, সেখানেই তো উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা উচিত ছিলো!

যে ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে বাল্মিকি মুনির কল্পনার নায়ক রামের জন্মস্থানের অজুহাতে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির বানানো হয়, অসংখ্য মসজিদকে যেখানে কয়লার গুদাম, হোটেল, পানশালা ইত্যাদিতে পরিণত করা হয়েছে, মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, কোর্টের মাধ্যমে আইন পাস করে যেখানে আযান বন্ধ করা হয়েছে, গরু যবেহ বন্ধ করা হয়েছে, শিক্ষালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করে

মুসলমানদের খারাপভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, প্রত্যেক দিন যেখানে ভিন্ন ধর্মের নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হচ্ছে, ধন-সম্পদ, ব্যবসা-বানিজ্য ধ্বংস করে পথের কাঙালে পরিণত করা হচ্ছে, সেখানেই তো উক্ত সেমিনারের আয়োজন করা প্রয়োজন ছিলো!

এরপর আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, ২০০৪ সালের ২১শে অগাষ্ট ঢাকায় ভারত ঘেষা হিসেবে পরিচিত ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মুখে এক সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের উপস্থিতিতে বোমা হামলার ঘটনায় ২২ জন মানুষ নিহত হলো, আহত হলো অনেকে। উক্ত বোমা হামলার ঘটনা যারা ঘটিয়েছিলো, তাদের অনেকে এ পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে। গ্রেফতারকৃত লোকগুলো সকলেই জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছে, তাদের প্রতি নিষেধ ছিলো, বোমা যেনো কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে ছিলো, সেখানে নিক্ষেপ করা না হয়। ইতোপূর্বে ১৯৯৯ সালে ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী কর্তৃক যশোরে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা হামলা হলো তখনই যখন নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নেমে গেলো। এ ঘটনায়ও ১০ জন নিহত হলো, আহত হলো অনেকে।

২০০১ সালের ২০শে জানুয়ারী ঢাকার পল্টন ময়দানে কমুনিষ্ট পার্টির সমাবেশে বোমা হামলা চালিয়ে হত্যা করা হলো ৭ জনকে, কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সামান্য আঘাতও পেলেন না। ২০০১ সালের ১৪ই এপ্রিল পহেলা বৈশাখে ঢাকার রমনা বটমূলে নাস্তিক্যবাদী সংগঠন ছায়ানটের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সরে যাবার সাথে সাথেই বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ১০ জন। এ ঘটনা ঘটার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে শ্লোগান সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুনসহ রাস্তায় মিছিল করা হলো। প্রশ্ন জাগে, এতদ্রুত কিভাবে ব্যানার ও ফেস্টুন লেখা হলো?

২০০১ সালের ১৫ই জুন ঢাকা নারায়নগঞ্জে আওয়ামী লীগের জেলা কার্যালয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্যের উপস্থিতিতে বোমার বিস্ফোরণ ঘটলো, নিহত হলো ২২ জন। উপস্থিত ধর্মনিরপেক্ষ দলটির সংসদ সদস্য অক্ষত রইলেন। একই সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর বাগেরহাট জেলার মোল্লারহাটে আওয়ামী লীগের সমাবেশে বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ৮ জন, নেতৃবৃন্দ সামান্য আঘাতও পেলেন না। এই ঘটনার মাত্র তিনদিন পর ২৬শে সেপ্টেম্বর সিলেট-সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের সমাবেশে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ মঞ্চ থেকে নেমে যাবার সাথে সাথে বোমা হামলা হলো, নিহত হলো ৪ জন। সেই জেলাতেই ধর্মনিরপেক্ষ দলের একজন সংসদ সদস্যের বাড়িতে বোমা প্রস্তুতকালে বিস্ফোরণ ঘটে নিহত হলো ২ জন। ধর্মনিরপেক্ষ দলের একজন কেন্দ্রীয় নেতা সিলেট-হবিগঞ্জে বোমা হামলায় নিহত হয়েছে বটে, কিন্তু দলের কাছে তার গুরুত্ব ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছিলো বলে রাজনীতি বিশ্লেষকগণ বলেছেন এবং

বোমায় আহত হবার পরে তাকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য এমন প্রক্রিয়ায় ঢাকা আনা হয়েছিলো যে, পথেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাকে ঢাকায় আনার প্রক্রিয়াটি এখন পর্যন্ত প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে যখন এ ধরনের বোমা হামলার ঘটনা একের পর ঘটতে লাগলো, তখন হঠাৎ করেই প্রতিবেশী দেশ থেকে আওয়াজ উঠলো, 'বাংলাদেশ জঙ্গীবাদী অধ্যুষিত একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র।'

এই আওয়াজ উঠলো তখনই, যখন 'ফরেন পলিসি' নামক একটি সাময়িকী আমেরিকায় প্রকাশ হচ্ছিলো। উক্ত সাময়িকীতে 'ব্যর্থ রাষ্ট্রের সূচক' শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। সেখানে ব্যর্থ রাষ্ট্রের ও অস্থিতিশীল রাষ্ট্রের যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, এর মধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মুসলিম দেশসহ বাংলাদেশের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর হিসাব অনুসারে বর্তমান পৃথিবীতে ব্যর্থ রাষ্ট্রের সংখ্যা ২০টি। সাময়িকীতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেসব রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, জনসেবা দিতে পারেনা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনা, কালোবাজারি রোধ করতে পারেনা, নিরাপত্তা দিতে পারেনা এবং জনগণের বিক্ষোভ মোকাবেলা করতে পারে না, এগুলোই হলো ব্যর্থ বা অকার্যকর রাষ্ট্র।

ব্যর্থ রাষ্ট্র সম্পর্কে বর্তমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। জাতিসংঘের মহাসচিবও বলেছেন, 'ব্যর্থ রাষ্ট্রকে অস্বীকার করলে তা এক সময় আমাদের কামড়াতে আসবে।'

মূল বিষয় হলো, রাষ্ট্র হিসেবে কোনো দেশ ব্যর্থ হলে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বতন্ত্র অবয়বে ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বসহ পৃথকভাবে টিকে থাকতে পারেনা। সুতরাং বাংলাদেশকে যদি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করা যায়, তাহলে এ দেশটি পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ হিসেবে টিকে থাকার অধিকার হারাবে এবং অন্য কোনো শক্তিশালী দেশের কলোনী হিসেবে ব্যবহৃত হবে। প্রশ্ন জাগে, এ দেশকে ব্যর্থ ও কার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করার জন্যই কি বোমা হামলাসহ অন্যান্য অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে?

সকল প্রশ্নের একটিই জবাব

ওপরে প্রশ্নাকারে আমরা যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছি এবং যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, এর জবাব পাবার জন্য আমাদেরকে একটু পেছনের ইতিহাসে যেতে হবে। ভদ্রলোক সামুয়েল পি হান্টিংটন নামেই পৃথিবীর সচেতন মহলের কাছে পরিচিতি লাভ করেছেন। তিনি আমেরিকার বিখ্যাত হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্র

বিজ্ঞানের প্রফেসর। জিমি কার্টার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে উক্ত ভদ্রলোক আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে নিরাপত্তা পরিকল্পনার পরিচালক এবং আমেরিকান পলিটিক্যাল সাইন্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এই ভদ্রলোকই আমেরিকার 'ফরেন পলিসি' নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও কো-এডিটর এবং আমেরিকার রাষ্ট্র পরিচালকদের কাছে তিনি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের পথপ্রদর্শক হিসেবে গণ্য করা হয়।

উক্ত ভদ্রলোকের লেখা The Clash of Civilization and the Remaking of World Order নামক বইটি ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয় এবং সারা দুনিয়ার চিন্তাবিদ মহলে বইটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা ভাষায় উক্ত বইটির নামকরণ করা যায়, 'সভ্যতার সংঘাত ও পৃথিবীর পুনর্গঠন'। এই বইটি সম্পর্কে আমেরিকার বিখ্যাত ইয়াহূদী সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেন্‌রী কিসিঞ্জার, অন্যান্য ইয়াহূদী নেতৃবৃন্দ ও ইয়াহূদী প্রভাবিত পত্রিকাগুলো প্রশংসার স্রোত প্রবাহিত করেছে। এই বইটি নাকি আমেরিকায় জাতিয় পর্যায়ে সর্বাধিক বিক্রিত বই। বইটিতে তিনি আমেরিকা ও ইসলাম সম্পর্কে যা লিখেছেন এবং অমুসলিমদের যে পরামর্শ দিয়েছেন, তার মূল কথাগুলো নীচে উল্লেখ করছি।

'ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র আমেরিকার সুযোগ্য নেতৃত্বে বর্তমানে সারা বিশ্বে সার্বজনীন সম্মান-মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী আমেরিকাই পাশ্চাত্য সভ্যতার নেতৃত্ব দিচ্ছে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা দুনিয়ার সকল জাতির কাছে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করে এক বিশ্বরূপ ধারণ করেছে। অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এই সভ্যতা বর্তমানে সারা দুনিয়ার ওপর বিজয়ী হয়েছে এবং সকলেই এর দ্বারা প্রভাবিত। সমাজতন্ত্রের পতনের পরে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্র সারা দুনিয়ায় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম, ইসলামী দল ও সংগঠনসমূহ যে গতিতে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য একমাত্র মারাত্মক হুমকি বিশেষ। পাশ্চাত্যের নেতৃত্বে নতুন বিশ্ব গড়ার পথে ইসলামই একমাত্র শক্তি, যা পাশ্চাত্যের গতি পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। সমাজতন্ত্র ছিলো একটি সাময়িক সমস্যা বিশেষ। এখন তা শেষ, কিন্তু ইসলাম গত ১৫০০ শত বছরব্যাপী স্বকীয় শক্তিতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত রয়েছে। সভ্যতার দ্বন্দ্বে ইসলাম বেশ শক্তিশালী বলেই প্রমাণ হচ্ছে। আর পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়িয়ে এর সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টির ক্ষমতা একমাত্র ইসলামের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সুতরাং নতুনভাবে যারা দুনিয়াকে গড়তে আগ্রহী, তাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে এবং ইসলামের উত্থানকে যে কোনো প্রকারে প্রতিহত করার পরিকল্পনা এখনই গ্রহণ করতে হবে।'

ইয়াহূদী প্রভাবিত উক্ত লোকটির পরিকল্পনা অনুসারে অমুসলিম দুনিয়া বহুপূর্ব থেকেই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করেছে এবং এরই বাস্তব প্রমাণ হিসেবে আমরা ইসলামী বিশ্বে বর্তমানে যা ঘটছে তা দেখতে পাচ্ছি। পরিকল্পনা অনুসারে প্রত্যেকটি মুসলিম দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে উন্নয়ন ব্যহত করা হচ্ছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পরনির্ভরশীল করে রাখা হয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী মুসলিম দেশগুলোকে উচ্চমূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম দেশসমূহের নিজস্ব স্বাধীনতা নেই, তাদের উৎপাদিত অস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য করা হচ্ছে। অমুসলিম দেশ পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হচ্ছে এতে কেনো আপত্তি নেই, মুসলিম দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হতে দেয়া হবে না বলে হুঙ্কার ছাড়া হচ্ছে।

ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আর এ লক্ষ্যেই হারজেগোভিনা-বসনিয়ায় নির্মম গণহত্যা অনুষ্ঠিত করে অগণিত মুসলিম হত্যা করা হয়েছে। ইসরাঈলকে পারমাণবিক অস্ত্র ভান্ডারসহ মুসলমানদের কলিজার ওপর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলিম বিশ্বে সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী ছিলো ইরাক। সেদেশের মাথা মোটা শাসকের মাধ্যমে কুয়েত দখল করানো হলো। তারপর কুয়েত উদ্ধারের নামে উড়ে এসে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হলো। এসব কিছুই করা হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে।

মুসলিম দেশসমূহে নানা মতবাদ-মতাদর্শের রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ দলকে সর্বোতভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। আফ্রিকান মুসলিম দেশ আলজেরিয়ায় নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলামপন্থী দল বিজয়ী হলো, কিন্তু ক্ষমতায় বসার পূর্বেই বদিয়াফ নামক এক জালিমকে ২৬ বছর পর ইঁদুরের গর্ত থেকে বের করে এনে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে ইসলামের উত্থান রোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তুরস্কের মুসলমানদের ওপরও খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ইরান, সিরিয়া ও মিশরকেও হুমকির মুখে রাখা হয়েছে।

উপমহাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে আফগানিস্থান ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এক ক্রীতদাসকে বসানো হয়েছে। ভারতের সাথে ইসরাঈলের গাঁট ছড়া বেঁধে দিয়ে ভারতকে দক্ষিণ এশিয়ার পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনী ও কাশ্মিরী মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে 'সন্ত্রাসবাদ' নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার লক্ষ্যে

বহুপূর্ব থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ বলয়ভুক্ত লোক তৈরী করে তাদেরকে নানা সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ দলকে সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেও যখন বাংলাদেশে ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধ করা যাচ্ছে না, তখন 'আল্লাহর আইন চালুর' নামে শুরু করা হয়েছে বোমাবাজি। এসব কিছুর একমাত্র লক্ষ্য, ইসলামী পুনর্জাগরণ রোধ করা।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, বাংলাদেশের সকল ইসলামী দল অবশ্যই আল্লাহর আইন চায় এবং এ লক্ষ্যেই তারা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদর্শিত নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আন্দোলন, সংগ্রাম করছে। কিন্তু এই আন্দোলন-সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে কোনো একটি ইসলামী দলও সন্ত্রাসী কোনো কর্মের সাথে জড়িত হয়েছে, এমন প্রমাণ কেউ কি উপস্থিত করতে পারবে?

পারবে না জেনেই ইসলামী লেবাসধারী লোকদের ভাড়া করে 'আল্লাহর আইন চালু'র শ্লোগান দিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং দোষ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে প্রকৃত ইসলামী দলগুলোর ঘাড়ে। ভারতের সাথে ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল সামরিক চুক্তিসহ নানা ধরনের সহযোগিতা চুক্তি করেছে এবং বর্তমানে বহু সংখ্যক ইয়াহূদী বিশেষজ্ঞ নানা ধরনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে ভারতে অবস্থান করছে। সংখ্যালঘু ইয়াহূদীদের পক্ষে দুনিয়াব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করা সম্ভব নয় বিধায় তারা কৌশলের মাধ্যমে খৃষ্টান ও মুশরিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মূল লক্ষ্য অর্জন করার চেষ্টা করছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তারা মক্কার মুশরিক ও মদীনার মুনাফিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে।

সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদী কর্মকান্ড ঘটিয়ে বাংলাদেশকে ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে সামরিক আগ্রাসনের মাধ্যমে এ দেশকে দখল করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হচ্ছে। আসমুদ্র হিমাচল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভিলাসী ভারত কোনো দিনই প্রতিবেশী হিসেবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কোনো দেশকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিবে না। ভারতীয় কংগ্রেসের এক সময়ের সভাপতি মরহুম মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব রচিত 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রীডম' নামক গ্রন্থে তিনি এ ব্যাপারে ভারতের মনোভাব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। সুতরাং আল্লাহর আইন চালুর নামে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের জনপ্রিয় দাবিকে সন্ত্রাসের মোড়কে আবৃত করে বিতর্কিত করা তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফসল।

ইসলাম ও ধর্মান্ধতা

পৃথিবীতে ইসলামই হলো একমাত্র-কেবলমাত্র সেই মতবাদ-মতাদর্শ ও জীবন ব্যবস্থা, যে জীবন ব্যবস্থায় অসহনশীলতা, অসহিষ্ণুতা, গোড়ামী, মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ইত্যাদির কোনো স্থান নেই। যেসব উপকরণে মানুষ অসহিষ্ণু ও উগ্র হয়ে ওঠে, গোড়ামী করে ও এক সময় মানুষকে পরমত অসহিষ্ণু করে তোলে। এবং পরিশেষে তা সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের আকার ধারণ করে সেসব ঘৃণ্য উপকরণ ইসলামে নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা ইসলাম সম্পর্কে বলেন–

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، دِيْنًا قِيَمًا–

(হে রাসূল!) বলো, আমার মালিক নিঃসন্দেহেই আমাকে সঠিক-নির্ভুল পথ দেখিয়েছেন, সম্পূর্ণ ও সর্বতোভাবে নির্ভুল দ্বীন, এর মধ্যে বক্রতার কোনো স্থান নেই। (সূরা আনআম-১৬১)

ইসলাম মানুষের অসাধ্য, মানুষের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদার বিপরীত বা মানব স্বভাবের বিপরীত একটি নিয়ম-নীতি বা বিধানও মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। বরং ইসলাম ঘোষণা করেছে–

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا–

আল্লাহ তা'য়ালা কখনো কাউকেই তার শক্তি-সামর্থের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেননা। (সূরা বাকারা-২৮৬)

আত্মার মুক্তি-পরকালের মুক্তির নামে মানব স্বভাবের বিপরীত বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করা, আল্লাহর সৃষ্ট বিভিন্ন জিনিসের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা তথা আত্ম নির্যাতনের পথ থেকে মানুষকে ইসলামই ফিরিয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন–

لَارَهْبَانِيَةَ فِى الاِسْلاَمِ–

ইসলামে বৈরাগ্যবাদ নেই। (মুসনাদে আহ্‌মাদ)

কিছু সংখ্যক মানুষ আত্মার মুক্তির নামে এমনভাবে আত্মনির্যাতন করে যে, হালাল খাদ্য গ্রহণ করা থেকে তারা বিরত থাকে। এই ধরনের ধর্মান্ধতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বারবার প্রশ্নের আকারে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ তা'য়ালা যা হালাল করেছেন, এদের ওপরে কে তা হারাম করলো?' আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَ تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوْا، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ–

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমাদের জন্যে যে পবিত্র জিনিসগুলো হালাল করে দিয়েছেন, তোমরা সেগুলো নিজেদের জন্যে হারাম করে নিয়ো না, আর কখনো সীমালংঘন করো না। অবশ্যই আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের অপসন্দ করেন। (সূরা মায়িদা-৮৭)

ইসলামে ধর্মান্ধতা নেই, রয়েছে উদারতা ও নমনীয়তা। এ জন্যেই ইসলামকে বলা হয়েছে 'স্বভাব ধর্ম।' মানুষের স্বভাবের বিপরীত একটি রীতিও ইসলামে নেই। একজন সাহাবী অন্যদের লক্ষ্য করে নিজের সম্পর্কে বলছিলেন, আমি সারা জীবন রাতে না ঘুমিয়ে নামায আদায় করবো। আরেকজন বললেন, আমি সারা জীবন রোযা পালন করবো। কখনো রোযা ভাঙবো না। আরেকজন বললেন, আমি কখনোই বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবো না। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এসব কথা শুনতে পেয়ে ঐ লোকদের বললেন, আল্লাহ্র নামের শপথ! আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহ্কে অনেক বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু এরপরও আমার জীবনধারা এই যে, আমি রোযাও পালন করি এবং ভেঙেও ফেলি। রাতে নামাযও আদায় করি এবং নিদ্রাও উপভোগ করি। নারীদের বিয়েও করি। আমার এই জীবনধারা যার পসন্দ নয়, তার সাথে আমার কোনোই সম্পর্ক নেই। (বুখারী-মুসলিম)

ইসলাম ধর্মান্ধতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং ক্ষণকালের জন্যেও তা বরদাস্ত করেনি। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لاَتُشَدِّدُوْا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ–

নিজেদের ওপর কঠোরতা করো না, অন্যথায় আল্লাহ্ই তোমাদের ওপর কঠোরতা করবেন। (আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, সাবধান! দ্বীনে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ তোমাদের পূর্ববর্তীরা দ্বীনে বাড়াবাড়ি করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। (নাসাঈ)

মানুষের জন্য ইসলাম কত সুন্দর ও সহজ বিধান দিয়েছে। রোগগ্রস্ত কোনো মানুষ পানি দিয়ে অযু করলে যদি রোগ বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে অথবা এমন স্থান যেখানে পানি পাওয়া যাচ্ছে না, এ অবস্থায় আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন মাটি দিয়ে

তায়াম্মুম করতে। রোগীর ও মুসাফিরের জন্য রোজা ফরজ করা হয়নি। পূর্ণ বয়স্কা নারীর প্রত্যেক মাসে যে ঋতুচক্র হয়, এ অবস্থায় অন্যান্য ধর্ম তাকে চরম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এমনকি সেই নারীকে পৃথিবীর মাটিও স্পর্শ করতে না দিয়ে উঁচু স্থানে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। সে নারী পৃথিবীর মাটিতে চলাফেরা করলে পৃথিবী নাকি অপবিত্র হয়ে যাবে। অথচ নবী করীম (সাঃ) এর স্ত্রীগণ এ অবস্থায় উপনীত হলে তিনি তাঁদের কোলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়েছেন। স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য সংগত কারণেই স্ত্রী এ অবস্থায় উপনীত হলে তাদের সাথে যৌন মিলন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলাম সেই মুসলমান তৈরী করেছে, অমুসলিমদের হাতে পানি পান করলে, তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করে আহার করলে যাদের 'জাত' যায় না। অমুসলিমদের পবিত্র কাপড় পরিধান করে, তাদের বাড়িতে পবিত্র স্থানে নামায আদায় করলেও মুসলমানদের 'জাত' যায় না। মুসলমানদের মসজিদে যে কোনো ধর্মের লোক পবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করলেও মসজিদ অপবিত্র হয় না। পবিত্র কোরআন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য, শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যে অবশ্যই নয়। কোরআন নিজের সম্পর্কে নিজেই ঘোষণা করেছে, 'হুদাল্লিন্ নাস' এটি মানুষের জন্য হিদায়াত।

প্রতিবেশী দেশে হিন্দু হয়েও নিজেদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার পায় না এবং নিজের ধর্মগ্রন্থও স্পর্শ করতে পারে না। থাইল্যান্ডের রাজকুমারী মহাচক্রী শিরিনধর্ণ জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত অর্থাৎ কুটনৈতিক মর্যাদার অধিকারী। বিশ্বব্যাপী শান্তির জন্যে কাজ করার কারণে তাকে ইন্দিরা গান্ধী পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে সে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্যে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজকুমারীকে জাতিসংঘ ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সফরে পাঠিয়েছিলো। সারা ভারতব্যাপী বহু বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। অধিকাংশ বৌদ্ধ মন্দিরের পরিচালক মন্ডলী হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক। রাজকুমারী মহাচক্রী শিরিণধর্ণ ভারতের পুরী এলাকায় কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির পরিদর্শনে গেলে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাকে 'বিদেশী' আখ্যায়িত করে মন্দিরে প্রবেশে বাধা দেয়। এরপর তিনি উড়িষ্যার রাজধানী ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দির 'লিঙ্গরাজ' পরিদর্শনে যান। সেখানেও তাকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। রাজকুমারী স্বয়ং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মীয় 'সংস্কৃত এবং পালি' ভাষায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একজন বিশেষজ্ঞ। ধর্মগ্রন্থের ভাষায় বিশেষজ্ঞ এবং স্বয়ং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও তাকে মন্দির পরিদর্শন করতে দেয়া হয়নি। বিষয়টি ২৫ নভেম্বরের প্রায় সকল পত্রিকাতেই ছাপা হয়েছিলো।

জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দুতের সাথে এই ধরনের আচরণ যদি বাংলাদেশে করা হতো, তাহলে এদেশের ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এবং তাদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বীরা বাংলাদেশকে 'জঙ্গীবাদ ও মৌলবাদীদের অভয়ারণ্য' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রচার করতো। এমনকি স্বয়ং জাতিসংঘও হয়ত এ দেশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতো। ভারত যেহেতু অমুসলিম রাষ্ট্র, সেহেতু উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতকে সামান্য বিব্রতবোধও হতে হয়নি এবং বিষয়টি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে প্রচারও করা হয়নি।

ইসলাম এ ধরনের ঘৃণ্য কার্যকলাপ মোটেও বরদাস্ত করে না এবং কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা গোড়ামীকে প্রশ্রয় দেয়না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ، قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ–

আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, কারণ সত্য এখানে মিথ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। (সূরা বাকারা-২৫৬)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো মুসলমান যদি কোনো অমুসলিমের প্রতি অবিচার করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি স্বয়ং ঐ অমুসলিমের পক্ষে আর মুসলিমের বিপক্ষে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবো।

পবিত্র কোরআন ও হত্যাকান্ড

আল্লাহর আইন চালু করার নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে এবং জঙ্গী কায়দায় মানুষ হত্যা করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ সম্পর্কে 'অকার্যকর, ব্যর্থরাষ্ট্র, মৌলবাদ ও জঙ্গীবাদীদের আস্তান, উগ্রপন্থীদের অভয়ারণ্য, সাম্প্রদায়িক দেশ' ইত্যাদি ধরনের অপপ্রচার করে থাকে, তাদের হাতের পুতুল হিসেবেই বোমা মেরে মানুষ হত্যা করছে। এসব লোকদের অবস্থা মহাকবি আল্লামা ইকবাল (রাহঃ)-এর ভাষায়–

উনহিকা মাহফিল সাঁওয়ার তা হুঁ, চেরাগ মেরি হ্যায় রাত উনকি
উনহিকা মাত্লব কাহ্রাহা হুঁ, জবাঁ মেরী হ্যায় বাত্ উনকি।

অর্থাৎ এই অনুষ্ঠান আমার নয় অন্যজনের আর অন্যজনের রাতের অন্ধকার দূর করার জন্য আমি আমার প্রদীপ জ্বালাই। অন্যজনের উদ্দেশ্য ও কথা প্রকাশ করার জন্য আমি আমার জিহ্বা ব্যবহার করি।

ইসলামের নামে যারা বোমাবাজি করে মানুষ হত্যা, দেশে অরাজকতা, বিপর্যয় ও জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে, তাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে যে শিকার করা হচ্ছে, এ বিষয়টি তারা অনুভব করতে পারছে না। স্থবির চিন্তা-চেতনাসম্পন্ন ও স্থুল বুদ্ধির অধিকারী এসব লোক কিছু বিনিময়ের আশায় অথবা সওয়াবের নিয়তে সন্ত্রাসী

কর্মকান্ডে নিজেরা ব্যবহৃত হচ্ছে। নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করা ইসলাম ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে এবং এ জঘন্য কাজটি যে কতটা ভয়াবহ, মহান আল্লাহ তা এভাবে উল্লেখ করেছেন–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا ۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا، وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا–

(বৈধ কারণ ব্যতীত) কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, সে যেনো সমস্ত মানুষকেই হত্যা করলো। আর যদি কেউ কাউকে জীবন দান করে, তবে সে যেনো সমস্ত মানুষকেই জীবন দান করলো। (সূরা মায়িদা-৩২)

পৃথিবীতে মানব জাতির সংরক্ষণ ও স্থায়িত্ব নির্ভর করে একটি বিষয়ের ওপর যে, প্রত্যেক মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় অন্য মানুষের প্রতি সম্মান-মর্যাদাবোধ থাকবে, অন্যের জীবন রক্ষা ও স্থিতির ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং অন্যের জন্যে পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। কেউ যেনো নিরাপত্তাহীন হয়ে না পড়ে এবং আতঙ্কিত না হয়, সে ব্যাপারে পূর্ণ দৃষ্টি রাখবে।

যে ব্যক্তি সন্ত্রাসের মাধ্যমে একজন মানুষকে হত্যা করে, সে কেবল একজন মানুষকেই হত্যা করে না, বরং একজন মানুষকে হত্যা করে সে এ কথাই প্রমাণ করে যে, তার মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনায় পৃথিবীর অন্য মানুষের প্রতি সামান্যতম সম্মান-মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির চিহ্নমাত্র নেই। এ কারণে সেই হত্যাকারী ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবতার শত্রু হিসেবেই বিবেচিত হয়। কারণ, এই ধরনের ব্যক্তি যে দোষে আক্রান্ত, অন্যান্য মানুষের মধ্যে সেই দোষের বিস্তৃতি ঘটলে মানব জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবার প্রশ্ন দেখা দিবে।

অপরদিকে যে ব্যক্তি অন্যের জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করে, তাকে নিরাপত্তা, অভয়, শান্তি-স্বস্তি দান করে এবং শঙ্কামুক্ত পরিবেশের নিশ্চয়তা দেয়, সে ব্যক্তি প্রকৃতই মানুষের বন্ধু। কারণ এই ধরনের উত্তম গুণ-বৈশিষ্ট্যই ইসলাম মানুষের মধ্যে কামনা করে এবং এই গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই মানব মন্ডলীর স্থিতি, সুরক্ষা, শান্তি-শৃঙ্খলা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে।

পৃথিবীতে মানুষ হত্যার সূচনা হয়েছে হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের এক পুত্র থেকে। একভাই আরেক ভাইকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছিলো এবং এ কারণেই সে প্রথম মানুষ হত্যাকারী হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত সারা দুনিয়ার মানুষের ঘৃণা কুড়াবে। পবিত্র কোরআনে এই ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, হিংসার বশবর্তী হয়ে প্রথমজন যখন দ্বিতীয়জনকে হুমকি দিয়ে বলেছিলো, 'আমি তোমাকে হত্যা

করবো।' দ্বিতীয়জন বলেছিলো, তুমি যদি হত্যার উদ্দেশ্যে আমার ওপর হাত উঠাও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার ওপর হাত উঠাবো না। কারণ আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

দ্বিতীয়জনের কথার অর্থ হলো, 'তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য সঙ্কল্প গ্রহণ করে থাকো, করতে পারো। এটা আমি জানার পরও আমি তোমাকে প্রথমেই হত্যা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবো না।' সূরা মায়িদার ২৭ থেকে ৩১ নম্বর আয়াতে এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয় জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, হত্যাকারীর সম্মুখে নিজেকে স্বেচ্ছায় সোপর্দ করা, সন্ত্রাসী-জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা অথবা আত্মরক্ষার চেষ্টা না করা শান্তি প্রিয় মানুষের কাজ নয় বা সওয়াবের কাজও নয়। যদি কোনো ব্যক্তি জানতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি তাকে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে এবং সময়-সুযোগ এলে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে সে যদি হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণকারী ব্যক্তিকে প্রথমেই হত্যা না করে, তাহলে সে সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও যদি না করে, তাহলে তো সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেকে জালিমের হাতে সোপর্দ করলো। এ জন্যই হযরত আদম (আঃ) -এর পুত্রদের মধ্যে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণকারী এক পুত্রকে আরেক পুত্র বলেছিলো–

اِنِّـــىْ اُرِيْدُ اَنْ تَبُــوْءَ بِاِثْمِىْ وَاِثْمِكَ فَــتَكُوْنَ مِنْ اَصْـحٰبِ النَّارِ، وَذٰلِكَ جَزٰؤُ الظّٰلِمِيْنَ–

আমি চাই, আমার এবং তোমার নিজের পাপ তুমি একাই নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও ও জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে থাকো, জালিমদের জুলুমের এটাই উপযুক্ত স্থান। (সূরা মায়িদা-২৯)

অর্থাৎ আমি জানলাম যে, তুমি আমাকে হত্যার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছো। কিন্তু এ কথা জেনেই আমি তোমাকে হত্যা করে আল্লাহর কাছে প্রথম হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে জাহান্নামে যেতে ইচ্ছুক নই। হত্যাকান্ডের মতো জঘন্য কর্ম করে জাহান্নামে যাবার ইচ্ছে থাকলে তুমিই এই অপকর্ম করে জাহান্নামে নিজের বাসস্থান তৈরী করো। আর খুনী জালিমদের জন্য জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।

মানুষ হত্যা করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, শাহাদাতের মর্যাদা অর্জন করে জান্নাতে যাওয়া যাবে, মূর্খ-অশিক্ষিত লোকদের এই ধারণা যারা দিয়েছে– তারা অবশ্যই সমগ্র মানবতার দুশমন এবং এসব লোকের ঠিকানা জাহান্নাম। অকারণে মানুষকে হত্যা করা, দেশ ও সমাজে বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, সন্ত্রাস, বিপর্যয় সৃষ্টি করে

মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত করা এবং জনজীবন বিপর্যস্ত করার অর্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবার অনুরূপ অপরাধ। আর এই অপরাধে অপরাধিদের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه وَيَسْعَوْنَ فِىْ الاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْا اَوْ يُصَلَّبُوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلاَفٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الاَرْضِ، ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ–

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি এই যে, হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। তাদের এই লাঞ্ছনা ও অপমান হবে এই দুনিয়ায়, কিন্তু পরকালে তাদের জন্য এটা অপেক্ষাও কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। (সূরা মায়িদা-৩৩)

হযরত আদম (আঃ) এর পুত্রের হাতে প্রথম নররক্ত প্রবাহিত হয় এবং এ কারণেই পৃথিবীতে যত হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে, সকল হত্যাকান্ড সংক্রান্ত পাপের একটি অংশ সে নিজে মাথায় বহন করে জাহান্নামে যাবে। নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'যখনই কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তখনই এর পাপের একটি অংশ প্রথম হত্যাকারী আদম (আঃ) এর পুত্রের ওপর বর্তাবে। কারণ সেই সর্বপ্রথম মানুষ হত্যার সূচনা করেছে।' (বোখারী-মুসলিম)

জেনে বুঝে ঠান্ডা মাথায় ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কেউ কোনো মুমিনকে হত্যা করে, তাহলে তাকে অবশ্যই জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর কোরআন ঘোষণা করছে–

مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُه جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه وَاَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيْمًا–

যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে জেনে বুঝে হত্যা করবে, তার শাস্তি হচ্ছে জাহান্নাম। সেখানে সে চিরদিন থাকবে। তার ওপর আল্লাহর গযব ও অভিশাপ এবং আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। (সূরা নিসা-৯৩)

কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী একমাত্র বৈধ কারণ ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করতে পারবে না এবং কেউ যদি তা করে, তাহলে অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا، يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُهَانًا–

তারা [illegible] ীত আর কোনো মাবুদকে ডাকে না, আল্লাহ যে প্রাণকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে যে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, এসব যে-ই করে সে তার গোনাহের শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার জন্য এ শাস্তি আরো বাড়িয়ে দেয়া হবে, সেখানে সে অপমানিত হয়ে চিরকাল থাকবে। (সূরা ফোরকান-৬৮-৬৯)

মানুষের ইতিহাসে এই মানুষই দারিদ্রতার ভয়ে এবং অন্যান্য কারণে নিজ সন্তানকেও হত্যা করতো। নবী করীম (সাঃ) যখন ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করলেন, তখন পর্যন্তও এই অমানবিক প্রথা সে সমাজে চালু ছিলো। এই জঘন্য ও নিষ্ঠুর কাজ থেকে ইসলামই মানুষকে বিরত করেছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلاَقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ، اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيْرًا–

তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না। আমি যেমন তাদের রিযক দান করি তেমনি তোমাদেরও রিযক দান করি। তাদের হত্যা করা অবশ্যই একটি মহাপাপ। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩১)

وَلاَ تَقْتُلُوْا اَوْلاَدَكُمْ مِّنْ اِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ وَلاَ–

দারিদ্রের আশঙ্কায় কখনো তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, কেননা আমিই তোমাদের ও তাদের উভয়েরই আহার যোগাই। (সূরা আনআম-১৫১)

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

হাদীসে নববী ও হত্যাকান্ড

নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী হিসেবে দাবি করে অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করার মতো কাজে নিজেকে জড়িত করা আত্মপ্রতারণা বৈ আর কিছুই নয়। অকারণে একজন মানুষকে হত্যা করা সারা দুনিয়া মুহূর্তে ধ্বংস করে দেয়ার থেকেও ভয়াবহ অপরাধ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَزَوَلُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلى اللّٰهِ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنُ بِغَيْرٍ حَقّ الْمُؤْمِنُ اَكْرَمَ عَلى اللّٰهِ مِنَ الْمَلَئِكَةِ الَّذِيْنَ عِنْدَه–

মুমিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট অবস্থানকারী ফেরেশ্তাদের চাইতেও সম্মানিত। অন্য কোনো মুমিন ব্যক্তির রক্তের বিনিময় ব্যতীত তাকে হত্যা করা অপেক্ষা দুনিয়াটা ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহর নিকট অনেক সহজ।

আল্লাহর আইন চালুর ধুয়া তুলে বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করা হচ্ছে যে, 'আমি সওয়াবের কাজ করেছি এবং সঠিক পথেই আছি।' এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করে এবং আত্মতৃপ্তি বোধ করে যে, সে সঠিক পথের ওপর রয়েছে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তার কোনো ইবাদাত এবং দান-সাদকা গ্রহণ করবেন না। (আবু দাউদ)

হযত আবু মূসা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, প্রতিদিন প্রতুষ্যে শয়তান তার সহকর্মীদের বিভিন্ন কাজ দিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং বলে, যে আজ কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে অপদস্থ করতে পারবে তাকে আমি সম্মানের মুকুট পরিধান করাবো। তারপর শয়তানদের মধ্য থেকে কেউ এসে বলে, আমি আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। এ কথা শুনে ইবলিস জবাব দেয়, তুমি তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারনি, কারণ তারা পুনরায় কাউকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করবে। আরেকজন এসে জানায়, আমি সন্তানের মাধ্যমে পিতামাতার সাথে রূঢ় আচরণ করিয়েছি। জবাবে ইবলিস বলে, এটা তেমন কোনো কাজই নয়, ঐ সন্তান ক্ষমা চেয়ে পিতামাতার আনুগত্য করবে। ইবলিসের কোনো সহকর্মী এসে জানায়, আমি অমুক ব্যক্তির দ্বারা আল্লাহর সাথে শিরক করিয়েছি। ইবলিস শয়তান তখন বেশ খুশী হয়ে বলে, তুমি কাজের মতো একটি কাজ করেছো, এটা উত্তম কাজ। কেউ যখন এসে জানায়, আমি অমুক ব্যক্তির মাধ্যমে হত্যাকান্ড ঘটিয়েছি। ইবলিস শয়তান মহাখুশী হয়ে তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি খুবই ভালো কাজ করেছো, তুমি আমার প্রিয়পাত্র।

ইচ্ছাকৃতভাবে যারা মানুষ হত্যা করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّغْفِرَهُ اِلاَّ الرَّجُلُ يَمُوْتُ مُشْرِكًا اَوِالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا–

সমস্ত গোনাহ্ আশা করা যায় আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে মুশরিক অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে এবং ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। (আবু দাউদ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, আল্লাহ তা'য়ালা সব ধরনের গোনাহ্ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে কাফির অবস্থায় ইন্তেকাল করবে অথবা ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, আল্লাহ এসব লোককে ক্ষমা করবেন না।

হযরত বুরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُّسْلِمٍ–

একজন মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট অধিকতর ভয়াবহ সারা দুনিয়া ধ্বংস হবার চেয়েও। (মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যদি আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীরা একজন মুমিন ব্যক্তির হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সকলকে অধোমুখী করে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।' আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন–

اَوَّلُ مَايَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِى الدِّمَاءِ–

কিয়ামতের দিনে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম যে বিচার করা হবে, তা তাদের মধ্যে সংঘটিত রক্তপাত ও হত্যার বিচার। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আবু বাকরাহ্ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যদি সকল আসমানের ও যমীনের অধিবাসী একত্রিত হয়ে কোনো মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহলে আল্লাহ তাদের সকলকে তাদের মুখের ওপর উপুড় করে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অতি সহজ, একজন মুসলিম ব্যক্তি

হত্যার চেয়ে। অর্থাৎ একজন মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ। এ ধরনের অনেকগুলো হাদীস ইমাম মুনজীরী (রাহঃ) তাঁর রচিত তারগীব ও তারহীব নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। অন্যায়ভাবে যারা মানুষ হত্যা করে, নবী করীম (সাঃ) তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্যে বের হয়ে আমার উম্মতের সৎ ও অসৎ লোক তথা নির্বিশেষ সকলকে হত্যা করতে থাকবে, সে আমার উম্মতের মধ্য গণ্য নয়। আর আমিও তাদের মধ্যে গণ্য নই। (মুসলিম)

যে ব্যক্তি মানুষ হত্যা করবে, এই হত্যাকান্ড হাশরের ময়দানে বিচার শেষে তার আর জান্নাতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। (বোখারী)

বোমা মেরে সন্ত্রাস সৃষ্টি ও মানুষ হত্যা করে শহীদ হয়ে জান্নাতে যেতে চাওয়া যারা শিখিয়েছে, জান্নাত তো দূরে থাক, তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। যদিও জান্নাতের ঘ্রাণ কয়েক হাজার মাইল দূর থেকেও অনুভব করা যাবে। ভুল পথে আন্দোলন করে, গুপ্তহত্যা, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার মধ্যে জান্নাত নেই। দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাধ্যমে মহান আল্লাহর গোলামী, অন্যের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান-সম্ভ্রমের নিরাপত্তা দেয়ার মধ্যেই রয়েছে জান্নাত।

নবী করীম (সাঃ) ৯ই জিলহজ বিদায় হজের ভাষণে উপস্থিত জনমন্ডলীকে প্রশ্ন করতে থাকেন, তোমরা কি জানো, আজকের দিনটি কোন্ দিন? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, আজকের দিন কোরবানীর দিন নয় কি? উপস্থিত লোকজন বললেন, জ্বি, আজ কোরবানীর দিন। এরপর তিনি প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ মাস? সাহাবায়ে কেরাম জবাবে বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর নবী বললেন, এটা কি হজের মাস নয়? জনমন্ডলীর মধ্য থেকে জবাব এলো, জ্বি, এটা হজের মাস।

নবী করীম (সাঃ) পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এটা কোন্ শহর? উপস্থিত লোকজন বললো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। আল্লাহর হাবিব বললেন, এটা কি নিরাপত্তা ও সম্মানের শহর নয়? সাহাবায়ে কেরাম জানালেন, বললেন, জ্বি, এটা নিরাপত্তা ও সম্মানের শহর। এবার নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, এই দিনে, এই মাসে ও এই শহরে যেভাবে তোমাদের পরস্পরের প্রতি একে অপরের প্রাণ, ধন-সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা, সম্ভ্রম হারাম তেমনিভাবে আজ থেকে তোমাদের একে অপরের প্রাণ, সম্পদ, সম্মান-মর্যাদা বিনষ্ট করা হারাম। যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের মালিকের সান্নিধ্যে পৌছে যাও। আমার বিদায়ের পরে তোমরা কাফির হয়ে একে অপরকে হত্যাকান্ডে লিপ্ত হয়ো না। (বোখারী, মুসলিম)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, যে লোক আমাদের ওপর অস্ত্র উঠাবে সে আমাদের মধ্যে গণ্য নয়। (বোখারী মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন–

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ–

মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেয়া সীমালংঘনমূলক কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফুরী কাজ। (মুসলিম)

কেউ যদি কোনো মুসলমানকে গালি দেয়, তাহলে ফাসিক হয়ে যাবে আর যদি হত্যা করে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেছেন, আল্লাহর নবী বলেন, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা ঘৃণার পাত্র হলো তিন ধরনের লোক। (১) হারাম শরীফে অনধিকার চর্চাকারী বা অন্যায়কারী। (২) ইসলামের মধ্যে জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতি অনুসন্ধানকারী। (৩) অন্যায়ভাবে কোনো মানুষের রক্ত প্রবাহকারী। অর্থাৎ মানুষ হত্যাকারী। (বোখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা সাত ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে মুক্ত থাকবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, সেই সাত ধরনের কাজগুলো কী কী? আল্লাহর রাসূল বললেন, আল্লাহর সাথে শির্ক করা। যাদু করা। কোনো মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা– যা আল্লাহ হারাম করেছেন। সুদ খাওয়া। ইয়াতীমের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা। জিহাদের ময়দান থেকে ভয়ে পালিয়ে আসা। সতী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। (বোখারী)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, তোমরা আমার হাতে হাত রেখে এই শর্তের ওপর বাইয়াত করো যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না। ব্যভিচার করবে না। চুরি করবে না। অন্যায়ভাবে কোনো জীবন হত্যা করবে না– যা আল্লাহ হারাম করেছেন। তোমাদের যে কেউ এসব শর্ত পূর্ণ করবে, তার সওয়াব আল্লাহ দিবেন। আর তোমাদের কেউ যদি এ ধরনের অন্যায় কাজ করে বসে, তাহলে তাকে দুনিয়াতে বিনিময় হিসেবে বদলা নেয়া হবে। তবে এ বদলা তার গোনাহ মাফের কারণ হবে। আর কেউ যদি এ ধরনের কাজ করে এবং আল্লাহ গোপন রাখেন, (যদি প্রকাশ হয়ে না পড়ে) তাহলে বিচার আল্লাহর কাছে। তিনি তাকে ক্ষমাও করতে পারেন আবার শাস্তিও দিতে পারেন। (মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন–

لَايَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِيْ نَسْحَةٍ مِّنْ دِيْنِه مَالَمْ يَصُبْ دَمًا حَرَامًا–

মুমিন ব্যক্তি সবসময় তার দ্বীনের প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান করবে (দ্বীনের সীমারেখার মধ্যে জীবন-যাপন করবে) যতক্ষণ না হারাম নরহত্যার অপরাধ করে। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, দুইজন মুসলমানের একজন যখন অপর মুসলমানের প্রতি অস্ত্র ধারণ করে তখন তারা দুইজনই জাহান্নামের প্রান্তে পৌছে যায়। এরপর একজন যখন অপরজনকে হত্যা করে, তখন দুইজনই জাহান্নামে যায়। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে ব্যক্তি হত্যাকারী সে তো জাহান্নামে যাবে, এটা বুঝলাম কিন্তু নিহত ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি বুঝলাম না। আল্লাহর নবী বললেন–

اِنَّـه اَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِه–

সেও তো তার সাথীকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলো। (বোখার, মুসলিম)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুনের ঘটনা দেখলে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ হত্যাকান্ডে বাধা না দিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে, তার সম্পর্কে বলেছেন–

لَايَقِفَنَّ اَحَدُكُمْ مُوْقِفًا يُقْتَلُ فِيْهِ رَجُلٌ ظُلْمًا فَاِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَه وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ–

যেখানে কোনে ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, সেখানে যেনো কেউ উপস্থিত না থাকে। কারণ এ হত্যাকান্ডের সময় যে ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে এবং আক্রান্ত ব্যক্তিকে রক্ষা করার চেষ্টা করবে না, তার ওপরও অভিশাপ অবতীর্ণ হবে। (বায়হাকী)

অর্থাৎ অবৈধ রক্তপাত তথা হত্যাকান্ডে লিপ্ত হলে সে ব্যক্তি আর মুসলিম সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। কোরআন-হাদীসে মানুষ হত্যা সম্পর্কিত বহু সতর্কবাণী রয়েছে। এসব সতর্কবাণী উপেক্ষা করে সওয়াবের নিয়তে মানুষ হত্যা করা আর আল্লাহর দ্বীনের সাথে প্রহসন করা একই কথা। এ ধরনের কাজ যারা করছে তারা অবশ্যই যালিম এবং কোরআন-হাদীসের আইন অনুযায়ী এসব যালিমদের প্রকাশ্যে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করা একান্তই প্রয়োজন। যেনো শাস্তির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে আর কেউ কারো প্ররোচনায় ভুল পথে অগ্রসর না হয়।

ইসলাম ও সুইসাইড স্কোয়াড

বর্তমান পৃথিবীতে মুমূর্ষ রোগীকে বাঁচানোর জন্য বিজ্ঞানীগণ নানা ধরনের প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং এসব ব্যবহার করে মানুষকে বাঁচানোর জন্য কতই না প্রচেষ্টা। কারণ জীবনের মূল্যের কোনো তুলনাই নেই, জীবন বড়ই মূল্যবান। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে মর্যাদাসম্পন্ন করেছেন, এই মানুষ অন্যকে যেমন অন্যায়ভাবে হত্যা করার ইখতিয়ার রাখে না তেমনি সে নিজেকেও হত্যা করতে পারে না। অন্য মানুষকে হত্যা করা যেমন শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং বড় ধরনের গোনাহ্, অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করাও মারাত্মক গোনাহ্ ও অপরাধ। মানুষ স্বয়ং তার প্রাণের মালিক নয় এবং এই প্রাণকে সে নিজের ইচ্ছানুযায়ী শেষ করে দিতে পারে না। শুধুতাই নয়, নিজের প্রাণকে সে অনুপযোগী কোনো কাজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখে না।

এই পৃথিবী মানুষের জন্য এক পরীক্ষা ক্ষেত্র এবং এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'য়ালা যেমনভাবেই পরীক্ষা গ্রহণ করুন না কেনো, সেভাবেই মানুষকে পরীক্ষা দিয়ে যেতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেমন নিজের ইচ্ছামাফিক প্রশ্নপত্র তৈরী করে পরীক্ষা দেয়া যায় না, অনুরূপভাবে এই পৃথিবীতেও আল্লাহর পরীক্ষায় ইচ্ছে অনুযায়ী অংশগ্রহন বা বিরত থাকা যাবে না। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে মানুষের যে জীবনকাল নির্ধারণ করেছেন, তা নিজের ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহারও করা যাবে না। পরীক্ষা ক্ষেত্র এই পৃথিবী থেকে নিজেকে ইচ্ছে অনুযায়ী সরিয়ে ফেলাও যাবে না এবং এই অধিকার কোনো মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা দেননি।

মানুষ লাঞ্ছনামূলক অবস্থায় নিপতিত হয়ে বা অন্য কোনো মনোকষ্টের কারণে লাঞ্ছনামূলক অবস্থা বা কষ্টের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্যই আত্মহত্যা করে। অথচ সে এ কথা ভুলে যায় যে, সামান্য কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার আশায় আত্মহত্যা করছে, অথচ আত্মহত্যা করে সে ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যেই নিজেকে নিক্ষেপ করছে। যে কষ্টের কোনো তুলনাই এই পৃথিবীতে হয় না। আত্মহত্যা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ–

কোনো জীবনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, যা আল্লাহ তা'য়ালা হারাম করেছেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-৩৩)

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

আত্মহত্যাকারী অবশ্যই জাহান্নামে যাবে এতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যায়ভাবে অন্যকে হত্যা করলে যেমন জাহান্নামে যেতে হবে, অনুরূপভাবে নিজেকে যারা হত্যা করবে, তাদেরকেও জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا، وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ عُدْوَنًا وَّظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا–

তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করো না। কারণ আল্লাহ তো তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান। যে কেউই বাড়াবাড়ি ও যুলুম করতে গিয়ে এই হত্যার কাজ করে, অচিরেই আমি তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবো। (সূরা নিসা-২৯-৩০)

আত্মহত্যাকারীর জন্য জান্নাত হারাম। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

كَانَ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ م بِه جَرْحٌ فَجَزَعَ فَاَخَذَ سِكِّيْنًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ فَمَارَقَا الدَّمُ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ اللّٰهُ– بَادَرَنِىْ عَبْدِىْ بِنَفْسِه فَحَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ–

তোমাদের পূর্বে গত হওয়া মানুষদের মধ্যে একজন ছিলো, সে আহত হলো এবং যন্ত্রণায় বিচলিত হয়ে উঠলো। এ অবস্থায় সে ছুরি ব্যবহার করে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেললো। হাত কাটার ফলে এত বেশী রক্তক্ষরণ হলো যে, এতে তার মৃত্যু ঘটলো। আল্লাহ তা'য়ালা উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে খুবই তাড়াহুড়া করেছে। এ কারণে আমি তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। (বোখারী-মুসলিম)

আরেক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

مَنْ تَرَدّٰى مَنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَه فَهُوَ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدّٰى فِيْهَا خَالِدًا مُخْلَدًا فِيْهَا اَبَدًا وَمَنْ تَحَسّٰى سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَه فَسَمُّه فِىْ يَدِه يَتَحَسَّاهُ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخْلَدًا فِيْهَا اَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ

نَفْسَه بِحَدِيْدَةٍ فَحَدِيْدَتُه فِىْ يَدِه يَتَوَجَّاهُ بِهَا فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدًا مُخَلَّدًا فِيْهَا اَبَدًا–

যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে চিরদিনই পড়ে থাকবে। কখনোই সেখান থেকে মুক্তি পাবে না। যে লোক বিষ পান করে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকালই নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কোনো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামে চিরকাল ধরে সেই অস্ত্র দিয়েই নিজেকে আঘাত করতে থাকবে। (বোখারী-মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) আত্মহত্যাকারীর জানাযা আদায় করেননি। তিনি একাধিকবার সতর্ক করেছেন যে, আত্মহত্যা করে যে পদ্ধতিতে নিজেকে হত্যা করবে, আখিরাতের ময়দানে বিচার শেষে উক্ত ব্যক্তি সেই পদ্ধতিতেই নিজেকে হত্যা করার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে নিজেকে কখনো সেদিন হত্যা করতে পারবে না। শুধু কষ্টই ভোগ করবে।

সুতরাং, আল্লাহর আইন চালু করার নামে ইসলামের শত্রু কর্তৃক গঠিত 'সুইসাইড স্কোয়াড'এর সদস্যদের তালিকায় যারা নিজেদের নাম লিখিয়েছে, তারা জাহান্নামীদের তালিকায় নিজেদের নাম লিখিয়েছে। সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করা বা এর সদস্য হওয়ার অনুমতি কি ইসলাম দিয়েছে? সারা দেশের সম্মানিত আলেম-ওলামা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন, যারা বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার লক্ষ্যে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করেছে এবং যারা এর সদস্য হয়েছে, তারা উভয়েই জাহান্নামী এবং বোমা মেরে কাউকে হত্যা করতে গিয়ে যে ব্যক্তি নিজেকে হত্যা করছে সেও জাহান্নামী।

ইসলাম ও মৃত্যুদন্ড

ইসলামে মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। কিন্তু এ বিধানও সততা, ন্যায়পরায়নতা, ইনসাফ, নিরাপত্তা, মানবতা, সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণের লক্ষ্যেই। একশ্রেণীর লোকজন মৃত্যুদন্ডের বিরোধিতা করে বলে থাকে যে, 'মৃত্যুদন্ডের বিধান মানবাধিকারের পরিপন্থী।' মানবাধিকারের এসব প্রবক্তারা নিজেদের দেশেও মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে এবং অপরাধীকে কয়েক শত বছরের কারাদন্ডের আদেশ দিয়ে থাকে। তাদের কারাদন্ডের বিধান দেখলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, একজন মানুষ জীবিত থাকে কত বছর? মৃত্যুদন্ডের যারা বিরোধিতা করে থাকে, তারাই

অসহায় কারাবন্দীদের সাথে হিংস্র পশুর চেয়েও জঘন্য আচরণ করে থাকে। গুয়ান্তানামো বে, আফগানিস্থান ও ইরাকের আবু গারিব কারাগারে তারা কতটা জঘন্য ঘটনা ঘটিয়েছে, তা প্রচার মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ দেখে শিউরে উঠেছে। সাম্প্রতিককালে শোনা যাচ্ছে, ইউরোপের কোথাও কোথাও মানবাধিকারের প্রবক্তাদের গোপন কারাগার রয়েছে।

মানুষের প্রাণ মহান আল্লাহ তা'য়ালা বিশেভাবে সম্মানিত করেছেন। এ প্রাণকে ধ্বংস করা যাবে না, তবে সত্য ও ইনসাফের প্রয়োজনে ধ্বংস করা যেতে পারে। প্রশ্ন হলো, সত্য ও ইনসাফের কোন্ অর্থ প্রযোজ্য হলে প্রাণ ধ্বংস তথা মৃত্যুদন্ড প্রযোজ্য হতে পারে? এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَلاَ تَقْتُلُوْا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ–

আল্লাহ তা'য়ালা যে জীবনকে তোমাদের জন্য মর্যাদাবান করেছেন, তা যথার্থ কারণ ব্যতীত হত্যা করো না। (সূরা আনআম-১৫১)

সত্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে মৃত্যুদন্ড প্রয়োগের জন্য পাঁচটি মূলনীতি দেয়া হয়েছে। এই পাঁচটি মূলনীতির আওতায় কোনো মানুষ যদি এসে যায়, তাহলে তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া যেতে পারে। মূলনীতিগুলো ঃ–

(১) কোনো ব্যক্তি যদি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্বক হত্যার অপরাধ করে এবং সে কারণে উক্ত হত্যাকারীর ওপর বিনিময় গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।

(২) ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে কেউ যদি বাধা সৃষ্টি করে এবং তার সাথে যুদ্ধ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে। এ অবস্থায় যুদ্ধে তাকে হত্যা করা ব্যতীত কোনো উপায় না থাকে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যদি ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে জঙ্গীপন্থা অবলম্বন, সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি, জনজীবনে আতঙ্ক-অশান্তি সৃষ্টি করে এবং ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার পতন ঘটানোর চেষ্টা করে।

(৪) বিবাহিত ব্যক্তি যদি যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে বলে প্রমাণ হয়।

(৫) কোনো ব্যক্তি যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।

ইসলাম যেসব দন্ডবিধি ঘোষণা করেছে, তা একক কোনো ব্যক্তি প্রয়োগ করতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্র আইন-আদালতের মাধ্যম দন্ডবিধি প্রয়োগ করবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আব্দুর রহিমের ভাই, পিতা বা সন্তানকে আব্দুর রাজ্জাক হত্যা করলো। আব্দুর রহিমের এ ক্ষমতা নেই যে, সে তৎক্ষনাত আব্দুর রাজ্জাককে হত্যা করবে। আব্দুর

রহিম যদি হত্যাকারীকে ক্ষমা না করে ও রক্তের বিনিময় মূল্যও গ্রহণ করতে রাজি না হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত আব্দুর রাজ্জাককে মৃত্যুদন্ড দিবে ও কার্যকর করবে। দেশের জনগনের এ অধিকার নেই যে, তারা আইন নিজের হাতে তুলে নিবে। সাধারণ মানুষ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়, তাহলে তো দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি হবে। ইসলাম কাউকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার সুযোগ দেয় না।

যে কয়টি কারণে ইসলামে মৃত্যুদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে, এই বিধানও কার্যকর করা হবে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে। আদালত রায় দিবে এবং সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ব্যক্তির মাধ্যমে রায় কার্যকর হবে।

বর্তমানে যারা ইসলামের নামে বোমা সন্ত্রাস করছে, তারা মূলত এদেশে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার পথে চরম বাধাই সৃষ্টি করছে। এরা দেশের উন্নয়ন ব্যহত করছে, বিদেশী বিনিয়োগ বন্ধ করার চেষ্টা করছে, নাগরিক জীবন নিরাপত্তাহীন করছে এবং নাগরিক জীবনে ভয়-ভীতি, শঙ্কা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়ে যে অপরাধ করছে তাতে করে ইসলামের মৃত্যুদন্ডের বিধান তাদের প্রতিই প্রযোজ্য।

সন্ত্রাসবাদের জনক

পৃথিবীতে পরিকল্পনা ভিত্তিক সংগঠিত সন্ত্রাসী তৎপরতা কবে কোথায় কোন্ দেশে সর্বপ্রথম সংঘটিত হয়েছিলো এবং কোন্ শ্রেণীর লোকজন সন্ত্রাস নামক ভয়াবহ দানবের পিঠে সওয়ার হয়ে মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলো, এ সম্পর্কে সন্ত্রাস বিশারদগণই অধিক অবগত আছেন। তবে মানব সভ্যতার বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত রয়েছেন এবং আধুনিক বিশ্বের চলমান ঘটনাবলীর প্রতি যারা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, তাদের কাছে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, বর্তমান পৃথিবীতে সন্ত্রাস নামক দানব কোন্ জাতির গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং কারা একে লালন-পালন করে বর্ধিত-কুৎসিত অবয়বে পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়েছে।

পবিত্র কোরআন ও ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এ কথা জানে যে, বনী ইসরাঈলী তথা ইয়াহূদী জাতিকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীর নেতৃত্বের আসনে আসীন করেছিলেন। কিন্তু তারা সেই নে'মাতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে অবহেলা-অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে থাকে। চরম পন্থা অবলম্বনকারী ইয়াহূদী জাতির অপকর্ম সীমা লংঘন করার পর আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে তাদের ওপর নেমে আসে অভিশাপ এবং এরপরই শুরু হয় তাদের অভিশপ্ত যাযাবরের জীবন। ইতিহাস কথা বলে। বিগত দুই হাজার বছর বা তারও অধিককাল ধরে তারা চরম অভিশপ্ত

জীবন-যাপন করে আসছে। তাদের এই ঘৃণ্য পরিণতি বরণ করার কথা ছিলো না, কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বার বার তাদের অপরাধ ক্ষমা করে অনুগৃহীত করেছেন এবং সহজ-সরল পথে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোকবর্তিকা স্বরূপ তাদের মধ্যে অসংখ নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন।

কিন্তু হতভাগা ইয়াহূদীরা বারবার আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে সকল সীমারেখা এমন উগ্রভাবে লঙ্ঘন করেছে, যা পৃথিবীর অন্য কোনো জাতির ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা জেনে বুঝে ঠান্ডা মাথায় নবী-রাসূলদের হত্যা করে পবিত্র নবী-রাসূলের কাটা মাথা প্লেটে সাজিয়ে বাঈজীর সম্মুখে উপহার দিয়েছে। এমন অভিশপ্ত ও নিকৃষ্টমনা জাতির জীবনে যদি ক্রমাগত বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় নেমে আসে, তাহলে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইয়াহূদীরা প্রথমে বাস করতো সিরিয়া ভূখন্ডে। অপকর্মের কারণে আমালিক সম্প্রদায় তাদেরকে সিরিয়া থেকে বিতাড়িত করলে তারা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেখানেও এই পথভ্রষ্টদের ওপরে নেমে এসেছিলো আরেক অভিশপ্ত শাসক ফিরআউনের নৃশংস নিরবচ্ছিন্ন নিগ্রহ। আল্লাহ তা'য়ালা একান্ত দয়া করে হযরত মূসা (আঃ) কে সেখানে প্রেরণ করলেন তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য।

মহান আল্লাহর সানুগ্রহ অভিপ্রায়ে হযরত মূসার নেতৃত্বে যখন অলৌকিকভাবে লোহিত সাগড় পাড়ি দিয়ে ইয়াহূদীরা স্বাধীন নিঃশ্বাস গ্রহণ করলো, তখন আবার তাদের মধ্যে অশুভ বিদ্রোহী স্বভাব ও ঘৃণ্য মনোবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মিসরের তীহ্ প্রান্তরে দীর্ঘ ৪০ বছর তারা উদভ্রান্তের মতো জীবন-যাপন করলো, এ অবস্থাতেও হযরত মূসা (আঃ) এর দোয়ার বরকতে তারা খাদ্য ও প্রখর সূর্যকিরণ থেকে মুক্ত ছিলো। কিন্তু মহান আল্লাহর এই নে'মাত ও হযরত মূসার কঠোর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে তারা পুনরায় জঘন্য কর্ম তৎপরতায় লিপ্ত হলো। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত মূসা তাদেরই আবাস ভূমি সিরিয়া পুনর্দখলের জন্য যখন তাদেরকে জিহাদের দিকে আহ্বান জানালেন, তখন তারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে আল্লাহর নবীকে জানিয়ে দিলো, 'তুমি আর তোমার আল্লাহ গিয়ে যুদ্ধ করো, আমরা পারবো না।'

চরম গর্হিত কর্মে লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী মনোভাবের কারণে পৃথিবীর প্রলয়কাল পর্যন্ত ইয়াহূদী জাতি অভিশাপের বোঝা বহন করে বেড়াবে। তাদের অবাধ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধ প্রবণতার কারণে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করেন। পবিত্র কোরআনে সূরা তওবায় মহান আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, তাঁর শাস্তি প্রদানের একটি নিয়ম হলো, তিনি কোনো

অবাধ্য জাতিকে শায়েস্তা করেন আরেকটি পরাক্রমশালী জাতিকে দিয়ে। পাপাচারে লিপ্ত অবাধ্য জাতিকে পরাক্রমশালী জাতির গোলামে পরিণত করে দেন। এই ধরণের শাস্তি অবাধ্য ইয়াহূদী জাতির ওপরে বারবার এসেছে এবং এখন পর্যন্ত তারা শান্তিতে নেই। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত তাদেরকে সজাগ-সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে এবং পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী কোথাও তারা স্বাধীনভাবে শান্তি ও স্বস্তির জীবন-যাপন করতে পারবে না।

ইতিহাসে দেখা যায় এই ইয়াহূদী জাতির অবাধ্যতা, সন্ত্রাসী তৎপরতা, বিশ্বাস ঘাতকতা ও অন্যান্য জঘন্য অপরাধের কারণে তাদের ওপরে বিভিন্ন জাতি বারবার আক্রমণ চালিয়ে ঘর-বাড়ি ছাড়া করেছে, তাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে, তাদের সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেছে। আশুরীয় বাদশাহ পিয়ার খৃষ্টপূর্ব ৭২৪ সালে ইসরাঈল রাজ্য আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করে। কয়েক হাজার ইয়াহূদীকে রশি দিয়ে বেঁধে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে। খৃষ্টপূর্ব ৫৬১ সালে ব্যাবিলনের শাসক বখত নেছার যেরুজালেম আক্রমণ করে গোটা শহর ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে। রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। তারপর ৭০ হাজার ইয়াহূদীকে বন্দী করে নিজের দেশে নিয়ে দাসে পরিণত করে। রোমান শাসকবৃন্দ ঈসায়ী ৭০ সালে ইয়াহূদী রাষ্ট্র আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে তীর, তরবারী, বর্শা ইত্যাদী দিয়ে হত্যা করে। সে সময়ে ইয়াহূদী রাজ্যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়। রোমানগণ পুনরায় ১৩২ সালে ফিলিস্তিন আক্রমণ করে হাজার হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করে, সহায়-সম্পদ ধ্বংস করে এবং তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়।

একাধিক বার ভিন্ন জাতির আক্রমণের ফলে, রোমানদের নির্যাতনে টিকতে না পেরে ইয়াহূদী জাতি পৃথিবীর দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এভাবে তারা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের দেশ বলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পৃথিবীর যেখানেই তারা আশ্রয় গ্রহণ করেছে, সেখানেই তারা আশ্রয়দাতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়েছে। ফলে সর্বত্রই তাদের ওপর নেমে এসেছে তাদের অশুভ কর্মের পরিণাম।

লোভের যতগুলো মানদন্ড আছে সমস্ত মানদন্ডেই উত্তীর্ণ হবে ইয়াহূদী জাতি। এদের অর্থ লোভ এতই প্রবল যে, ঘৃণ্য সূদ বৈধ করার জন্য তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ পরিবর্তন করে হারাম সূদকে হালাল বানিয়েছে। সূদী ব্যবসায় তাদের কলংক গোটা বিশ্ব জোড়া। অপরের অর্থ নিজের পকেটস্থ করার বৈধ-অবৈধ কলা-কৌশল তারা প্রয়োগ করে। এই জাতির রক্তে মিশ্রিত রয়েছে নিষ্ঠুরতা, লোভ, অমানবিকতা, হিংস্রতা,

বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী তৎপরতা। এসব কারণে পৃথিবীতে এরা কোথাও শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারেনি। সর্বত্রই তাদের প্রতি ঘৃণাভরে থু-থু নিক্ষেপ করা হয়েছে। বিতাড়িত হতে হয়েছে অথবা নির্মমভাবে নিহত হতে হয়েছে। বর্তমানের ইয়াহূদী রাষ্ট্রের প্রতি মুসলিম নামধারী শাসকদের মধ্যে যারা আমেরিকার লেজুর বৃত্তি করে, তারা সমর্থন দিতে বাধ্য হলেও সারা পৃথিবীর সাধারণ মুসলিম জনতা তাদেরকে ঘৃণা করে।

ইংল্যান্ড থেকে ১২৯০ সালে ইয়াহূদীদেরকে বিতাড়িত করা হয়। ফ্রান্স প্রথমে ১৩০৬ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। পুনরায় ১৩৯৪ সালে ফ্রান্স থেকে আবার তাদেরকে বিতাড়িত করা হয়। বেলজিয়াম ১৩৭০ সালে ইয়াহূদীদের বিতাড়িত করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ১৩৮০ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। হল্যান্ড ১৪৪৪ সালে তাদেরকে বিতাড়িত করতে বাধ্য হয়। ইটালী ১৫৪০ সালে তাদেরকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। জার্মানী ১৫৫১ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে।

রাশিয়া ১৫১০ সালে তাদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার পাইকারীভাবে ইয়াহূদীদেরকে হত্যা করে। এভাবে হত্যা, লাঞ্ছনা-অপমান, বিতাড়ন ও নির্বাসন ইত্যাদী দুর্ভোগের কাহিনীতে এই জাতির ইতিহাস কলংকিত। বিশ্বাসঘাতক এই ইয়াহূদী জাতির সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কারণে নবী করীম (সাঃ)ও মদীনা থেকে ইয়াহূদী জাতিকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরাই সেই সন্ত্রাসী জাতি, যারা মদীনা মুনাওয়ারায় রওজা মোবারক থেকে নবী করীম (সাঃ) এর দেহ মোবারক চুরি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে ধরা পড়ে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হয়েছিলো।

ইয়াহূদীদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থ 'তালমুদ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য কোনো মানুষের ধন-সম্পদের ওপরে মালিকানা থাকবে না। পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক ইয়াহূদীরা। ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য যে কোনো মানুষের ধন-সম্পদ ইয়াহূদীরা দখল করতে পারবে। ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য সকল মানুষের ধন-সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্যই খোদা তা'য়ালা ইয়াহূদীদের দুনিয়ায় মনোনীত করেছেন। ইয়াহূদীরাই সমস্ত মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কারণ ইয়াহূদী ব্যতীত অন্য সকল মানুষের মধ্যে পাপবোধ রয়েছে। খোদা তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য সকল মানুষকে সুদ ব্যতীত অর্থ ঋণ না দিতে, অর্থ ঋণ দিলে অবশ্যই সুদ আদায় করতে হবে।'

যাদের ধর্মগ্রন্থ এ ধরনের কদর্য শিক্ষা দেয়, তাদের স্বভাব-চরিত্র কতটা নোংরামীতে নিমজ্জিত হতে পারে এবং কোন্ ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালাতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

উদ্ভূত প্রশ্নের জবাব

ইয়াহূদীদের সমর্থক পাপাচারে লিপ্ত খৃষ্টশক্তির সহযোগিতা ব্যতীত তারা এক মূহূর্ত টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহর কোরআনে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে কোথাও তারা নিজেদের শক্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে শান্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। চিরকাল তারা অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। এখানে একটি প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, 'ইয়াহূদীরা তো রীতি মতো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের ওপরে হুমকির ছড়ি ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনের মুসলমানদেরকে প্রতিদিন পাখির মতো গুলী করে হত্যা করছে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, পৃথিবীর কোথাও এরা স্থায়ীভাবে অবস্থান করতে পারবে না!'

এই ইয়াহূদীরা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। সাম্রাজ্যবাদী ও আগ্রাসনমুখী মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রসমূহ ষড়যন্ত্র করে ইয়াহূদীদেরকে ফিলিস্তীনে একত্রিত করে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদসহ অন্যান্য সম্পদ কুক্ষিগত করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম দেশসমূহ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে বজায় রাখার লক্ষ্যে আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেন এবং তাদের সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ এই ঘৃণ্য কাজটি সম্পাদন করে। এসব রাষ্ট্র ইসরাঈলের যে কোনো মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের প্রতি বিশ্ব-জনমতের তোয়াক্কা না করে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

ইয়াহূদীরা তাদের নিজস্ব শক্তির ওপর নির্ভর করে একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করারও সমর্থ রাখে না। ওদের ওপর থেকে পশ্চিমা বিশ্ব সমর্থন প্রত্যাহার করার সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে ইয়াহূদীদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। সুতরাং ইসরাঈলী রাষ্ট্র ইয়াহূদীদের কোনো জাতীয় স্বাতন্ত্রের অভিব্যক্তি নয়। এটা পশ্চিমা বিশ্বের মুসলিম বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের অবৈধ ফসল। ইয়াহূদীদের রাষ্ট্র কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয়। পবিত্র কোরআনে সূরা ইমরানের ১১২ আয়াতে এ কথাও আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় বা কোনো মানুষের সাহায্যে ইয়াহূদীরা কোথাও প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সাময়িক এবং সেখানেও তারা শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না। সময়ের প্রত্যেক মুহূর্তে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবে, অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে ভিক্ষুকের মতো অপমান আর লাঞ্ছনার জীবন-যাপন করবে।

ইয়াহূদীদের নিজস্ব কোনো দেশ নেই, নিজের মতো স্বাধীনভাবে বসবাস করার মতো নেই কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্র। তাদের অখন্ডনীয় অভিশাপ, তারা চিরকালই গৃহহীন– শুধু গৃহহীনই নয়, যাযাবরদের মতো দেশে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছে কিন্তু কোথাও কখনো তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদাও পায়নি। নানা ধরনের জঘন্য পন্থায় তারা বেশ অর্থের মালিক হয়েছে, কিন্তু তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যথাসময়ে এমন নৃশংসভাবে নিহত ও বিতাড়িত হয়েছে, যা এক বিভৎস লোমহর্ষক ইতিহাস। এত ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও ভয়াবহ পরিণতি পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ললাটে জোটেনি।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা ও কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করে অনেকে বলে থাকে যে, ইয়াহূদীরা তো ইসরাঈল নামক একটি সুদৃঢ় স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা মারণাস্ত্রের ভান্ডার গড়ে তুলেছে সে দেশটি জাতিসংঘের সদস্য পদও অর্জন করেছে। তারা সাহসী যোদ্ধা, প্রবল প্রতিপক্ষকে তারা পরাস্ত করতে সক্ষম। বিশ্বাসঘাতক-সন্ত্রাসী ইয়াহূদীরা অভিশপ্ত এবং তারা কখনো স্বাধীন ভূখন্ডের মালিক হয়ে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে পারবে না– কোরআনের এই ঘোষণা বাস্তবতার বিপরীত।

বিগত কয়েক শতাব্দীর কণ্ঠলগ্ন চরম অভিশাপ থেকে তারা মুক্তি লাভ করেছে এবং তারা বর্তমানে এতটাই স্বাধীনতা অর্জন করেছে যে, ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রটি ক্ষুদ্র থেকে ক্রমশ বৃহত্তর হচ্ছে এবং প্রতাপশালী এই রাষ্ট্রের সীমানা ও জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উদ্বেগ উৎকণ্ঠাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক ইয়াহূদী বর্তমানে স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের গর্বিত নাগরিক। সারা পৃথিবীর অর্থনীতি, রাজনীতি, সংবাদ মাধ্যম তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। এমনকি বিশ্বের একক পরাশক্তি আমেরিকার মতো দেশের ক্ষমতার পালাবদলের চাবিকাঠিও তাদেরই হাতে।

বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত বিষয় অবশ্যই সত্য এবং এই বাস্তবতা বর্তমানে অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞায় ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের মধ্যে ব্যাপক গুরুতর অসংগতি বিদ্যমান। এ কথা আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য মুসলিম বিদ্বেষী রাষ্ট্রের গোপন মিলনাভিসার থেকে ভূমিষ্ঠ ইয়াহূদী রাষ্ট্রের নৈতিক ও ভৌগলিক অস্তিত্ব অত্যন্ত ভঙ্গুর-দুর্বল। অবৈধ এই রাষ্ট্রটি এতটাই দুর্বল যে, আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য ইসলাম বিদ্বেষী রাষ্ট্রসমূহের প্রণয়দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ামাত্র মুহূর্তকালের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব।

সুতরাং ইয়াহূদী জাতি অভিশাপমুক্ত হয়নি, বরং অভিশাপের বোঝা আরো অধিক দুর্বহ হয়ে চেপে বসেছে এবং অভিশাপের কৃষ্ণকালো প্রলঙ্করী ঘূর্ণি সৃষ্টিকারী মেঘ ইয়াহূদী জাতিকে পরিবেষ্টিত করেছে। ইয়াহূদীদের প্রাণের স্পন্দন তাদের বুকে নয়, তাদের প্রাণ স্পন্দন স্পন্দিত হচ্ছে আমেরিকার কৃপায় ওয়াশিংটনস্থ অফিসে অযত্নে রক্ষিত বিশেষ এক ফাইলে। এই ফাইলে আমেরিকা নিজেদের স্বার্থে ঘৃণাভরে আঙ্গুলের টোকা দেয় বলেই ইয়াহূদীদের বুকে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, আমেরিকা যখন এই ফাইলটি ঘৃণাভরে দূরে নিক্ষেপ করবে, তখন ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের বুকে আর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাবে না।

সচেতন [illegible] অবগত রয়েছেন যে, ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রকৃত অর্থে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়– বরং রাষ্ট্রের নামে এটি আমেরিকার একটি ভাঁড়ার ঘর ও ভাগাড় মাত্র। ইসরাঈল মানেই আমেরিকার জন্য অবাঞ্ছিত এক গলগ্রহ ঘৃণিত বোঝা। ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রকৃত অর্থেই যে স্বাধীন রাষ্ট্র নয় এবং ইয়াহূদীরা যে স্বাধীন নাগরিক নয়, তা সারা পৃথিবীবাসীর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বিগত পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে। ইরাক কুয়েত দখল করার পরে আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বুশের পিতা সাবেক প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ ইরাকের ওপর হামলা করলো, তখন ইরাক আত্মরক্ষার জন্য বেশ কয়েকটি স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের ওপর নিক্ষেপ করেছিলো।

কিন্তু পরাধীন ক্রীতদাস ইসরাঈলের পক্ষে আমেরিকার অনুমতি ব্যতীত এক রাউন্ড গাদা বন্দুকের গুলীও ইরাকের দিকে ছুড়তে পারেনি। ইসরাঈল যেনো ইরাকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, এ জন্য আমেরিকা ইসরাঈলকে আত্মরক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করে যুদ্ধের কৌশলগত কারণে এবং বিশ্বব্যাপী মুসলিম সেন্টিমেন্টের কথা বিবেচনা করে ইসরাঈলকে নীরবে-নিঃশব্দে স্কাডের আঘাত হজম করার নির্দেশ দিলো। পরাধীন ইসরাঈলও নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থে ক্রীতদাসের মতো বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে, অবনত মস্তকে আমেরিকার আদেশ পালন করলো।

উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় উক্ত ঘটনা থেকে সচেতন মহল স্পষ্ট বুঝে নিলো, ইসরাঈল প্রকৃত অর্থে আমেরিকারই একটি দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য মাত্র। পার্থক্য শুধু এখানে যে, ইসরাঈল নামক এই অঙ্গরাজ্যটিকে আমেরিকা স্বাধীনতার ছদ্ম পোষাকে সজ্জিত করে জীবন-মৃত্যুর কঠিন ঝুঁকির মুখে নিক্ষেপ করে যাবতীয় সুবিধা ভোগ করছে সে নিজে। যাবতীয় কষ্ট সহ্য করছে ইসরাঈল, বিশ্বব্যাপী নিন্দার তিলক পরছে সে, শান্তি প্রিয় মানুষের ঘৃণার লক্ষ্য স্থলে পরিণত হয়েছে সে, আর আমেরিকা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে ফায়দা আত্মসাৎ করছে। এই ফায়দার কারণেই

আমেরিকা কখনো ইসরাঈলের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরোধিতা করে না। আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষণে ইসরাঈল বিশ্বস্ত ভৃত্যের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করলেই প্রভু-ভৃত্যের এই মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরবে। এই ফাটল দৃশ্যমান হবার সাথে সাথেই ইসরাঈলের অস্তিত্বও অন্ধকার বিবরে প্রবেশ করবে।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করে থাকেন যে, ইসরাঈলের জনসংখ্যা ও ভৌগলিক পরিধি যতোই ক্ষুদ্র হোক না কেনো, আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে ইসরাঈল মারণাস্ত্রের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে তুলেছে, প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করেছে এক চৌকস সেনাবাহিনী। সুতরাং সেদিন বেশী দূরে নয় যে, ইসরাঈল নামক ইয়াহূদী রাষ্ট্রটি আমেরিকার দাসত্বের শৃঙ্খল চূর্ণ করে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

উল্লেখিত মন্তব্য যারা করেন, তারা এ কথা ভুলে যান যে, আমেরিকা ও ইসরাঈল এরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য স্বার্থবন্ধনে আপাতত বন্দী এবং স্বার্থের কারণেই তাদের প্রণয় আরো কিছুদিন অটুট রাখা প্রয়োজন। ইয়াহূদীদের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য, সংবাদ মাধ্যম, বিশাল ধনভান্ডার ও অন্যান্য সম্পদ প্রকৃতপক্ষে আমেরিকাই নানা কৌশলে ব্যবহার করছে। তেলসমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বুকের ওপর আমেরিকার যে একজন অতি বিশ্বস্ত প্রহরী মোতায়েন রাখা একান্ত প্রয়োজন, ক্রীতদাস ইসরাঈল সে কাজটিও পরম আনুগত্যের সাথে পালন করে যাচ্ছে। অপরদিকে ইয়াহূদীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে তারাও বাধ্য হয়ে খৃষ্টান আমেরিকার সাথে প্রেমের অভিনয় করে যাচ্ছে। কারণ চারদিক থেকে মুসলিম রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পেছন থেকে যদি আমেরিকা গোস্বা করে সরে যায়, তাহলে তাদের পরিণতি যে কত ভয়াবহ আকার ধারণ করবে, এ কথা তারা কল্পনা করেও নিদ্রার ঘোরে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে।

সুতরাং আমেরিকার সাথে ইসরাঈলের পক্ষে আনুগত্য পরায়ন ক্রীতদাসের অনুরূপ আচরণ করা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো পথ বর্তমানে খোলা নেই। আমেরিকা ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের সম্পর্ক দেখে যে কোনো বিশেষজ্ঞ কূটনীতিবিদই এ কথা স্পষ্ট ভাষায় বলবেন যে, এ দুটো দেশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে ব্যবহার করছে। এই ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা খুব দ্রতই শেষ হয়ে আসছে এবং ইসরাঈল ক্রমশ চরম এক ঝুঁকির দিকে ধাবিত হচ্ছে। এর কারণ হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যতোই স্বার্থান্ধ ও শক্তিশালীই হোক না কোনো এবং জাতিসংঘকে সে যতোই আনুগত্য পরায়ণ ভৃত্যে পরিণত করুক না কোনো, ইসরাঈলের সকল সন্ত্রাসী কার্যকলাপে সমর্থন দিতে গিয়ে সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক অবস্থান ও ভাবমর্যাদা মারত্মকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থান ও ভাবমর্যাদা পুনরায় উদ্ধার করা ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপায় নেই।

ইসরাঈলের ব্যাপারে আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি পূর্বে ঝাপসা থাকলেও বর্তমানে প্রায় স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিমুখী, দ্বৈত মানদন্ড ও পক্ষপাতমূলক পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে বছরের পর বছর ইসরাঈলের যাবতীয় সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সমর্থন দিয়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করা যায় না। স্বাধীনচেতা জনগণের চাপেই ইয়াহূদীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে আমেরিকা বাধ্য হবে এটা অবধারিত। এ বিষয়টি প্রত্যেক ইয়াহূদীও খুব ভালো করেই জানে এবং এ কারণেই তারা চরম এক উদ্বেগের মধ্যে সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত অবস্থান করছে। ঠিক এ কারণেই তারা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি চুক্তির জন্য আমেরিকার কাছে বারবার ধর্ণা দিচ্ছে। আর আমেরিকাও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো ও মিশরের সাথে ইসরাঈলকে জুড়ে দিয়ে কথিত শান্তিচুক্তি কার্যকর করার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করছে।

নতুন মিত্রের সন্ধানে সন্ত্রাসী জাতি

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ইয়াহূদী ও খৃষ্টান জাতি পরস্পর কখনো পরস্পরের বন্ধু ছিলো না। ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত রয়েছে যে, তারতালানুস নামক এক ইয়াহূদীই হযরত ঈসা (আঃ) কে ধরিয়ে দেয়ার জন্য উৎসাহভরে অগ্রসর হয়েছিলো। ইয়াহূদীরা সুযোগ বুঝে যেমন খৃষ্টানদের ওপর নৃশংস নির্যাতন চালিয়ে অগণিত খৃষ্টান হত্যা করেছে, অনুরূপভাবে খৃষ্টানরাও ইয়াহূদীদের পাইকারীভাবে হত্যা করেছে। খৃষ্টানরা যে যিশুখৃষ্টকে গড-এর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে, ইয়াহূদীরা তাকে 'জারজ' সন্তান বলে আখ্যায়িত করেছে। এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ এবং একে অপরের কঠিন দুশমন। ইসলাম ও মুসলমানদের কেন্দ্র করে এই পরস্পর বিরোধী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর প্রণয় দেখা গেলেও এদের অবস্থা পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَّقُلُوبُهُمْ شَتَّى–

তাদের নিজেদের পারস্পরিক শত্রুতা খুবই মারাত্মক, তুমি তো এদের মনে করো এরা ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু (মোটেও তা নয়,) এদের অন্তর হচ্ছে শতধা বিচ্ছিন্ন। (সূরা আল হাশর-১৪)

পৃথিবীর মানুষ ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল ও খৃষ্টান রাষ্ট্র আমেরিকাসহ অন্যদেরকে এক অবস্থানে দেখতে পারে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মন-মানসিকতায় শত যোজন ব্যবধান রয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেই এরা স্বমূর্তি ধারণ করে পরস্পরের

বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইয়াহূদী ইসরাঈল নিজেদের অতিত ইতিহাস সম্মুখে খোলা রেখেই ভবিষ্যৎ দিনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে। সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে অতিতে এদের সম্পর্ক কারো সাথেই স্থায়ী হয়নি এবং আমেরিকার সাথেও হবে না, এ কথা ইয়াহূদীরা মাথায় রেখে আমেরিকার সাথে বাহ্যিক সম্পর্কের বন্ধন অটুট রেখেই দ্বিতীয় নির্ভরযোগ্য বন্ধুর সাথে গভীর প্রণয় গড়ে তুলেছে।

ইয়াহূদীদের বিশ্বস্ত বন্ধু কে– এ বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সর্বপ্রথম আমাদের জানা প্রয়োজন মুসলমানদের কঠিন দুশমন কারা। তাহলেই ইয়াহূদীদের পরম বন্ধুর অবস্থান চিহ্নিত করা যাবে। মুসলমানদের কঠিন দুশমনদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا، وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّا نَصٰرٰى–

অবশ্যই তোমরা ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ব্যাপারে ইয়াহূদী ও মুশরিকদেরই বেশী কঠোর দেখতে পাবে, অপরদিকে মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তোমরা সেসব লোককে কিছুটা নিকটতর পাবে, যারা বলেছে আমরা খৃষ্টান। (সূরা আল মায়িদা-৮২)

খৃষ্টানরা অহী অবতীর্ণের ধারায় বিশ্বাসী এবং পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে সেই লোকদের প্রতি অধিক সহানুভূতিশীল হয়ে থাকে, যারা ধর্মের ব্যাপারে তাদের সাথে যতোই ভিন্ন মত পোষণ করুক না কেনো, কিন্তু মূলত তারা তাদেরই মতো আল্লাহ ও অহীর অবতরণধারাকে মেনে চলে। কিন্তু ইয়াহূদীরা হচ্ছে এক অদ্ভূত ধরনের আহলি কিতাব দাবিদার সম্প্রদায়। আল্লাহর একত্ববাদ-তাওহীদ ও বহুত্ববাদ তথা শিরকের পারস্পরিক যুদ্ধে ইয়াহূদীরা প্রকাশ্যে পৌত্তলিক তথা মুশরিকদের সমর্থন ও সাহায্য করেছে এবং আগামীতেও করবে। নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়াতের ব্যাপারে তারা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে এক জোট হয়েছিলো। এরপরেও এই ইয়াহূদীরা লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বলে থাকে যে আমরা আহলি কিতাব তথা আমরা আল্লাহ, নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব মেনে চলি।

পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অনুযায়ী মুসলমানদের প্রাণের কঠিন দুশমন হলো ইয়াহূদী ও মুশরিক সম্প্রদায়। অতিত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাও এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, এই দুটি সম্প্রদায়ের কারণেই মুসলমানরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। এই মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের কারণেই ভারতে দীর্ঘ ৮

শত বছরের মুসলিম শাসনের সমাপ্তি ঘটেছে এবং বাংলার স্বাধীনতা সূর্য দীর্ঘ ২ শত বছরের জন্য অস্তমিত হয়েছিলো। এদেরই ষড়যন্ত্রের কারণে দেশে দেশে মুসলমানরা একে অপরকে হত্যা করেছে।

খৃষ্টানদের ব্যাপারে ইয়াহূদীদের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ কারণেই তারা অত্যন্ত গোপনে পৌত্তলিক ভারতের সাথে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে সামরিক চুক্তিসহ নানা ধরনের গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ইসরাঈল আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘে ভারত যেনো ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এ ব্যাপারে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উদ্দেশ্যে হলো, ভারতকে ভেটো ক্ষমতার অধিকারী করে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর ওপর লাঠিয়াল বানানো। ধর্মীয় বিধানের দিক থেকেও ইয়াহূদীদের সাথে পৌত্তলিকদের অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে এবং এ দুটো ধর্মই হলো গোত্রীয় ধর্ম। ইয়াহূদী এবং পৌত্তলিক তথা মুশরিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে ধর্ম পরিবর্তন করে ইয়াহূদী বা পৌত্তলিক ধর্মভূক্ত হবার কোনো পথ খোলা নেই। এ কারণেই এরা পৃথিবীর অন্য মানুষকে নিজেদের মধ্যে গণ্য করতে পারে না।

সন্ত্রাসী জাতির ঘৃণ্য কৌশল

নিজেদের অপকর্মের কারণে পৃথিবীতে অন্যান্য সম্প্রদায় কর্তৃক নির্যাতিত ও বিভিন্ন দেশ থেকে বারবার বিতাড়িত হয়ে ইয়াহূদীরা প্রতিশোধ স্পৃহায় নানা ধরনের সন্ত্রাসী সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। এসব সংগঠনের মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ল্ড জায়নিষ্ট অরগানাইজেশন, ফ্রীম্যাসন, হেগনা, ইরগুন, জীউইস এজেন্সী, কাহাল, জামেয়া ইয়াহূদীয়া ইত্যাদি। এ ছাড়াও নামে-বেনামে নানা ধরনের ইয়াহূদী সংগঠন পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে সক্রিয় রয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আরো অধিক সংগঠন সৃষ্টি করা হচ্ছে। কতক সংগঠনের নাম এবং বাহ্যিক কার্যক্রম দেখলে মনে হবে এর সাথে ইয়াহূদীদের কোনোই সম্পর্ক নেই। যেমন মুসলিম, খৃষ্টান বা হিন্দু প্রধান দেশে সংশ্লিষ্ট দেশ ও ধর্মের খেদমতেই এসব সংগঠন কাজ করছে এবং এর সাথে যারা জড়িত, তারা সকলেই স্ব-স্ব ধর্মের অনুসারী। প্রকৃতপক্ষে এসব সংগঠনের মূল স্রষ্টা ইয়াহূদী এবং এদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তারা কাজ করছে।

ইয়াহূদীরা এসব সংগঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশের রাজনৈতিক স্রোতধারা নিজেদের স্বার্থের অনুকুলে প্রবাহিত করে থাকে। বিভিন্ন নামে ব্যাংক, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রচার মাধ্যমসমূহ নিজ স্বার্থের অনুকুলে রাখে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ইয়াহূদী স্বার্থের সমর্থক তৈরী করে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার

প্রত্যেক বিভাগে নিজেদের লোক তৈরী করে প্রয়োজন অনুযায়ী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো বা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে থাকে। নানা ধরনের এনজিও প্রতিষ্ঠিত করে সেবাধর্মী কাজের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করে। যেমন বাংলাদেশে একটি বিশাল এনজিও প্রকাশ্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সমর্থক এবং এরা প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষ দলটিকে যেমন অর্থ সাহায্য দেয় তেমনি তাদের সভা সমাবেশে লোক সমাগমের ব্যবস্থা করে থাকে।

এভাবে প্রত্যেকটি দেশের বিশেষ করে মুসলিম দেশসমূহের রাজনৈতিক অঙ্গন, শিক্ষাঙ্গন, শ্রমিক অঙ্গন, ধর্মীয় অঙ্গন, আইন-আদালত তথা বিচার বিভাগ, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রত্যেকটি বিভাগে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে নিজেদের মতাবলম্বী সৃষ্টি করে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের স্বার্থে ইয়াহূদীরা ব্যবহার করছে। ইয়াহূদীদের এসব সংগঠন প্রত্যেক দেশে সরকারের মধ্যে আরেকটি গোপন সরকার কায়েম করে দেশে নানা ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করে থাকে। নিজেদের স্বার্থে কোনো আঘাত এলেই এরা দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে, শ্রমিক বা রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিরতা সৃষ্টি, শিক্ষাঙ্গন বা পরিবহন সেক্টরে অরাজকতা সৃষ্টি করে দেশকে প্রায় অচল করে দেয়ার ব্যবস্থা করে।

নবী করীম (সাঃ) পৃথিবীতে জীবিত থাকাবস্থায় এরা মুসলিম দুনিয়ার কোনো ক্ষতি করতে সক্ষম হয়নি। কারণ এদের অপকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'য়ালা ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন। ওহীর ধারা চিরতরে বন্ধ হবার সাথে সাথে এই সন্ত্রাসী ইয়াহূদী গোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করতে থাকে। মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে ইসলামের নামে নানা ধরনের পথ ও মত এরাই সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করেছে এবং পরস্পরকে পরস্পরের প্রতি হিংস্র করে তুলে রক্তাক্ত পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ইসলামের তিনজন সম্মানিত খলীফার হত্যাকান্ড, সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ, কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা এবং মুসলমানদের মধ্যে শীয়া, সুন্নী, মুতাযিলা-খারেজীসহ নানা ধরনের উপদল এদেরই সৃষ্টি এবং এসব ঘটনাবলীর পেছনে ইয়াহূদীদের সন্ত্রাসী হাত সক্রিয় ছিলো।

বর্তমান পৃথিবীতে নানা ধরনের মতবাদ-মতাদর্শের জন্ম ইয়াহূদীরাই দিয়েছে। ঘৃণ্য পূজিবাদ ও সমাজতন্ত্র এদের গর্ভের ফসল। একটি মতবাদ আবিষ্কার করে মানুষকে তার অনুসারী বানালে পৃথিবীতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত থাকে না। কারণ, প্রতিপক্ষই যদি না

থাকে তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত হবে কার সাথে! এই পরিস্থিতি সন্ত্রাসী ইয়াহূদীদের কাম্য নয় বিধায় তারা পরস্পর বিপরীতমুখী কয়েকটি মতবাদ, মতাদর্শ ও চিন্তাধারা সৃষ্টি করে থাকে। যেনো এসব চিন্তাধারার অনুসারীরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজেদের শ্রম ও মেধা ব্যয় করার কাজে নিয়োজিত থাকে, আর এরই মধ্যে তারা ঘোলাপানিতে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করে। একই সাথে গোপনে দুটো দেশের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করে। এরপর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশ দুটোর মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে উভয়ের কাছে অস্ত্র ও নানা ধরনের প্রযুক্তি বিক্রি করা এবং নানা শর্তে চড়া সুদে অর্থ ধার দেয়া এদের ঘৃণ্য পেশা।

মারণাস্ত্র ও নানা মতবাদের সৃষ্টি

ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইয়াহূদীরা ইসলামের তিনজন সম্মানিত খলীফাকে হত্যা ও কারবালার হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটিয়ে ক্রমশ মুসলমানদেরকে ইসলামের গন্ডী থেকে সরিয়ে আনতে থাকে। এরপর রাজা-বাদশাহদের শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন করে এক পর্যায়ে মুসলমানদের মনে আল্লাহ্ ও রাসূল সম্পর্কিত ধারালো চেতনাকে ক্রমশ ভোঁতা চেতনায় পরিণত করে।

সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-ওলামাদের সমাজে অবহেলা ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত করে। সাধারণ মুসলমান ও অধিকাংশ নেতৃত্বের মধ্যে এমন নির্লিপ্ত মনোভাব এরা সৃষ্টি করে যে, শাসক গোষ্ঠী ইয়াহূদী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্রকাশ্যে কোরআন-সুন্নাহর বিপরীত কাজ করছে দেখেও কেউ-ই তার প্রতিবাদ পর্যন্ত করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। শাসক গোষ্ঠীকে ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত ও চরিত্রহীনতার পথে ঠেলে দিয়ে, চিত্ত বিনোদনের নামে আনন্দ-ফূর্তির নানা মাধ্যম আবিষ্কার করে সাধারণ মানুষকে এর মধ্যে মাতোয়ারা রেখে এরপর দেশে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থির সৃষ্টি করে ইয়াহূদীরা। তারপর নিজেরাই পরামর্শদাতা সেজে শাসক গোষ্ঠীকে তাদেরই আবিষ্কৃত ফর্মূলা গ্রহণ ও দেশের বুকে প্রয়োগ করতে বাধ্য করে। এসব প্রক্রিয়া একদিনে সম্পন্ন হয়নি, শতাব্দীর পর শতাব্দী সাধনা করে ইয়াহূদীরা এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে।

ইসলামের উত্থান রোধ করার জন্য এরা প্রথমে আবিষ্কার করলো পূজিবাদ। পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশ ও জাতির মধ্যে ঐ মতবাদের অনুসারী ও সমর্থকও সৃষ্টি করলো। কিন্তু সারা পৃথিবীব্যাপী সকল মানুষ একই ব্যবস্থার অধীনে থাকলে তো গোলযোগ সৃষ্টি হবে না এবং তাদের অশুভ উদ্দেশ্যও সফল হবে না। অতএব পূজিবাদের মোকাবেলায় সৃষ্টি করা হলো আরেকটি চরমপন্থী মতবাদ সমাজতন্ত্র।

কমুনিষ্ট আন্দোলনের মূলে যেসব লোকদের চিন্তাধারা সক্রিয় ছিলো তারা সকলেই ইয়াহূদী। সমাজতন্ত্রের জন্মদাতা কার্লমার্কস পিতামাতা উভয় দিক দিয়েই ছিলেন ইয়াহূদী। লেলিন, ট্রটস্কি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং তাদের স্ত্রীগণ সকলেই ছিলেন ইয়াহূদী সন্তান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরে পলাতক লেলিন তার ২ শত সাথীসহ গোপনে ট্রেনে জার্মান থেকে রাশিয়ায় প্রবেশ করে। তার সাথীদের মধ্যে ১২৬ জনই ছিলো ইয়াহূদী। লেলিন রাশিয়ায় প্রবেশ করার পরপরই ট্রটস্কিও ৩ শত ইয়াহূদীকে সাথে নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করেন।

ইয়াহূদীরাই রাশিয়ায় বসে জার সরকারকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ করেছিলো। তারা সেখানে এমন সন্ত্রাসের তান্ডব সৃষ্টি করেছিলো যে, জার পরিবারের একটি শিশুকেও জীবিত রাখেনি এবং বাড়ির পোষা কুকুরগুলোকেও হত্যা করেছিলো। এরপর রাশিয়ার শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক দিক ও বিভাগে ইয়াহূদীরা দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে আমেরিকার পূজিবাদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করার নাটক শুরু করে। আমেরিকার শাসনযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ইয়াহূদীদের পরামর্শে শাসকগোষ্ঠীও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকে। শুরু হয়ে যায় স্নায়ুযুদ্ধ। ইয়াহূদীরা এই নাটক সৃষ্টি করে শুরু করে নিত্য-নতুন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার ও ব্যবসা।

আমেরিকার বলয়ভুক্ত দেশগুলোও অস্ত্র ক্রয় করতে থাকে, অপরদিকে রাশিয়ার বলয়ভুক্ত দেশগুলোও অস্ত্র ক্রয় করতে থাকে। মদ, গান-বাজনা, নানা ধরনের অপ্রয়োজনীয় খেলা-ধূলা, মানুষকে বিমোহিত ও আচ্ছন্ন রাখার প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং চিন্তার জগতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টিকারী উপাদান ইয়াহূদীদেরই আবিষ্কার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতিকে ক্রমশ এসব উপদানের প্রতি আকৃষ্ট করে তারপর শুরু করে উক্ত উপাদানের ব্যবসা। আর এসব ব্যবসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার প্রয়োজনেই তারা বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, প্রতিরক্ষানীতি এবং অন্যান্য দিক ও বিভাগে নিজেদের লোক সৃষ্টি করেছে।

যেমন বাংলাদেশে সাম্প্রতিককালে যে ভয়াবহ বোমাবাজির সৃষ্টি হয়েছে, এ বিষয়টি এই গরীব দেশের অর্থনীতির ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে। যেসব সেক্টরে পূর্বে অর্থ ব্যায়ের কোনোই প্রয়োজন ছিলো না, সরকার বর্তমানে বাধ্য হয়েই সেসব খাতে অর্থ ব্যয় করছে। নিরাপত্তার সাথে যুক্ত যেসব সামগ্রী ইতোপূর্বে এ দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি এবং প্রয়োজনও ছিলো না, সেসব সামগ্রী আমদানী করতে হচ্ছে। বাংলাদেশে এই অবস্থা সৃষ্টি করে যেমন অর্থনৈতিকভাবে এদেশকে ইয়াহূদী পরিচালিত 'বিশ্বব্যাংক ও দাতা সংস্থার' করুণাপ্রার্থী বানানো হচ্ছে সেই

সাথে ইয়াহূদী বা তাদের প্রভাবান্বিত সংস্থা কর্তৃক আবিষ্কৃত ও নির্মিত নিরাপত্তা সামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়েছে। এভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে ইয়াহূদীরা এমন এক বলয় সৃষ্টি করেছে যে, এর বাইরে স্বাধীনভাবে কোনো জাতি নিজেদের যাবতীয় কিছু পরিচালনা করবে, সে ব্যবস্থার পথে এরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে তৎপর রয়েছে।

ভয়াবহ আনবিক বোমার জনকও ইয়াহূদী সন্তান মিঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমার নামক এক ব্যক্তি। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদেরই ষড়যন্ত্রের ফসল এবং এই যুদ্ধে তারা আমেরিকাকে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করে। তাদেরই আবিষ্কৃত আনবিক বোমা আমেরিকা নিক্ষেপ করে ১৯৪৫ সালে ৬ই আগষ্ট জাপানের শিল্প শহর হিরোশিমায় এবং ৯ই আগষ্ট নাগাসাকিতে। যে বৈমানিক বোমা নিক্ষেপ করেছিলো, তার ধারণাও ছিলো না বোমার ধ্বংস ক্ষমতা সম্পর্কে। বোমা নিক্ষেপ করার পরে নিচের দিকে তাকিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ দেখে উক্ত বৈমানিক ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলো এবং পরবর্তীতে সে যুদ্ধ করার উৎসাহই হারিয়ে ফেলেছিলো। ইয়াহূদী আবিষ্কৃত বোমায় যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বাতাসের মিশে গিয়েছে, মরণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিষ্ঠুর ট্রুম্যান আনন্দে আত্মহারা হয়ে আনবিক বোমার আবিষ্কারক ইয়াহূদী মিঃ জে রবার্ট ওপেনহাইমারকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে, 'আপনি আমার কাছে কি চান!'

সন্ত্রাসী ঘাতক ওপেনহাইমার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের চোখে চোখ রেখে আবেদন করেছিলো, আমার ইয়াহূদী জাতির জন্য ছোট্ট একখন্ড ভূমি।' পূর্ব থেকেই যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করাই ছিলো, এবার আমেরিকা ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনের মুসলমানদের ওপর হিংস্র দন্ত-নখর বিস্তার করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানদের বিতাড়িত করে সারা পৃথিবী থেকে ইয়াহূদী এনে ফিলিস্তিনে জড় করা হলো। ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে ইয়াহূদী নেতা বিন গুরিয়ান রাত ১২টা ১ মিনিটে যখন মুসলমানদের বুকের ওপর স্বাধীন ইসরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলো, তখন এর মাত্র ১০ মিনিট পরেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিলো। ইয়াহূদী কর্তৃক পরিচালিত রাশিয়াও স্বীকৃতি দিলো এবং ইয়াহূদী প্রভাবিত অন্যান্য সকল অমুসলিম দেশ স্বীকৃতি দিয়ে বিশ্ব সন্ত্রাসের জনক ইসরাঈলকে বৈধ করলো। এই ইয়াহূদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পরে এবং এখন পর্যন্ত কত লক্ষ্য মুসলমান যে ইয়াহূদীদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে, এর হিসাব বোধহয় ইয়াহূদী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদও দিতে পারবে না।

সমাজতন্ত্রের পতন ও সন্ত্রাসীদের নতুন কৌশল

ইয়াহূদীরা স্বয়ং অথবা খৃষ্টান ও মুশরিকদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পর্দার আড়াল থেকে পৃথিবীর দেশে দেশে নানা সঙ্কট সৃষ্টি করে এবং ত্রাণকর্তার ভূমিকায়ও তারাই অবতীর্ণ হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণ ও মুসলমানদের উত্থান রোধ করার জন্যই ইয়াহূদী ও মুশরিকদের এত আয়োজন এবং এ কাজে তারা অন্যান্য অমুসলিমদের কাছ থেকেও প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে আসছে। শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী (রাহঃ) ও ইরানের ইমাম খোমেনী সমাজতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'এই মতবাদটি এক সময় নিজ ঘরে আত্মহত্যা করবে এবং এর স্থান হবে যাদুঘরে।' রাশিয়ায় গর্বাচেভের শাসনামলে হলোও তাই।

অপরদিকে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ দেহ্লভী (রাহঃ), সাইয়্যেদ আহ্মাদ ব্রেলভী (রাহঃ), মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (রাহঃ), মাওলানা ইয়াহ্ইয়া আলী জৌনপুরী (রাহঃ), মাওলানা রশিদ আহ্মাদ গাঙ্গুহী (রাহঃ), মাওলানা কাশেম নানতুবী (রাহঃ), মাওলানা হোসাইন আহ্মাদ মাদানী (রাহঃ), মাওলানা শিবলী নোমানী (রাহঃ), মাওলানা সোলায়মান নদভী (রাহঃ), মাওলানা শওকত আলী (রাহঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ আলী (রাহঃ), জৌনপুরের পীর মাওলানা কারামত আলী (রাহঃ), ফুরফুরার পীর মাওলানা আবু বকর সিদ্দীক আল কুরাইশী (রাহঃ), হাজী শরীয়তুল্লাহ (রাহঃ), হাজী নেসার আলী তীতুমীর (রাহঃ), মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী (রাহঃ), সর্ষীনার পীর মাওলানা নেসার আহ্মাদ (রাহঃ), চরমোনাইর পীর মাওলানা ইস্হাক (রাহঃ), মাওলানা মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রাহঃ) ও মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহঃ)-সহ অন্যান্য ইসলামী চিন্তাবিদগণ অহিংস ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে যে মহান প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন, তা পূর্ণতার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিলো।

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নেই এর লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠলো। ভারতীয় উপমহাদেশে আল্লামা মওদুদী (রাহঃ) জামায়াতে ইসলামী ও মিশরসহ আরব দুনিয়ায় হাসান আল বান্না (রাহঃ) ইখওয়ানুল মুসলিমীন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে প্রবল বেগে বিশ্বব্যাপী ইসলামের সুমহান আদর্শিক দাওয়াত ছড়িয়ে দিলেন। এ দুটো অপ্রতিরোধ্য কাফেলা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের দুয়ারে পৌঁছে গেলো। সারা দুনিয়ায় অশান্তির আগুন জ্বলছে, মানুষ শান্তির আশায় দিগ্বিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে, তখনই এ দুটো সংগঠন শান্তি পিয়াসী মানুষের মনে আশার আলো

প্রজ্জ্বলিত করলো এবং মুসলিম-অমুসলিম সুধিবৃন্দ এই আন্দোলনের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হলেন। এই অবস্থা দেখে ইয়াহূদী ও মুশরিক সম্প্রদায়ের মাথায় যেন বজ্রপাত ঘটলো। তারা তড়িঘড়ি করে অন্যান্য অমুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে ইসলামের অগ্রযাত্রা রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় লক্ষ্য স্থির করলো।

নামমাত্র মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অধিকাংশ মুসলিম দেশের শাসকের আসনে বসিয়ে তাদেরই মাধ্যমে ইসলাম পন্থীদের ওপরে শুরু করা হলো অবর্ণনীয় লোমহর্ষক নির্যাতন। এক পর্যায়ে ইখাওয়ানুল মুসলিমীনের অসংখ্য নেতাকর্মীসহ হাসান আল বান্না (রাহঃ)-কে হত্যা করা হলো এবং মাওলানা মওদুদী (রাহঃ)-কে কারারুদ্ধ করে ফাঁসীতে ঝুলানোর আয়োজন করা হলো। মহান আল্লাহর মেহেরবাণী, ইসলামের দুশমনরা তাঁকে ফাঁসী দিতে পারেনি। সারা দুনিয়াব্যাপী অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে এবং পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত মুসলমানরা ইসলামের উদারতা, মহানুভবতা, মানবপ্রেম ও তার কল্যাণময় আদর্শ দেখে যেভাবে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে, তা উল্লেখিত যুগশ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদগণ এবং জামায়াতে ইসলামী ও ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টারই ফসল। এ কারণেই ইসলামী চিন্তাবিদগণ ও জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব ইসলামের দুশমনদের দৃষ্টিতে এক অসহ্য ব্যাপার।

ইতোমধ্যে রাশিয়ায় গর্বাচেভ প্রেসিডেন্ট থাকাকালেই সমাজতন্ত্র নিজ জন্মভূমিতে আত্মহত্যা করে যাদুঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। দুনিয়ায় একক পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো আমেরিকা ও ইয়াহূদী সৃষ্ট পূজিবাদ। ইতোপূর্বেই মানব প্রেমিক চিন্তাবিদগণ মানব রচিত সকল মতবাদ-মতাদর্শের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মানুষকে শান্তি দিতে তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বর্তমানেও পূজিবাদকে মোকাবেলা করার মতো কোনো আদর্শের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই এবং এর সম্মুখে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে পূজিবাদ নামক দানবের কবল থেকে মানবতাকে উদ্ধার করার ক্ষমতাও কোনো আদর্শের নেই।

পূজিবাদ নামক এই দানবের পরিচালকদের এ কথা ভালোভাবেই জানা রয়েছে যে, যে কোনো ধরনের মতবাদ-মতাদর্শের মোকাবেলা করতে পারে একমাত্র ইসলাম এবং পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহর বাণী, এ কথাও বর্তমান বিজ্ঞান প্রেমিক লোকদের কাছে বিজ্ঞানই প্রমাণ করে দিয়েছে। আল্লাহর কোরআনই শান্তির স্রোতধারা বইয়ে দিতে সক্ষম এবং এই কোরআন ব্যতীত বিশ্বমানবতার মুক্তির

দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা নেই, এ কথা বর্তমান পৃথিবীর চিন্তানায়কগণ প্রকৃতই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু ইয়াহূদী-মুশরিক ও তাদের দোসররা ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে দুনিয়াব্যাপী বিভ্রান্তি ছড়িয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা ভুলে গিয়েছে তাদেরই গুরু আব্রাহাম লিঙ্কনের সেই কথা, 'তুমি সব মানুষকে কিছু সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারো এবং কিছু মানুষকে সবসময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখা তোমার পক্ষে হয়ত সম্ভব, কিন্তু তুমি সব মানুষকে সব সময়ের জন্য বোকা বানিয়ে রাখতে পারো না।'

ইয়াহূদী সন্ত্রাসী ও ইসলামের অন্যান্য দুশমনদের সকল কৌশল ইনশাআল্লাহ্ ব্যর্থ হবে, তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র মানুষের সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ইসলাম পুনরায় তার নিজস্ব আলোয় দুনিয়া আলোকিত করে তুলবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। মানুষকে কিছু সময়ের জন্য তারা বোকা বানিয়ে অন্ধকারে রাখলেও এই অন্ধকারের পর্দা ছিন্ন করেই প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ্।

প্রথম কৌশল- দলাদলি সৃষ্টি

এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইয়াহূদীরা মুসলমানদের দুর্বল করার জন্য ইসলাম সম্পর্কে স্বয়ং মুসলমানদের মধ্যেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তাহলো কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইয়াহূদী ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করবে। তারা নিজেদের কথা ও কাজের মাধ্যমে সাধারণ মুসলমানদের কাছে একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে। এরপর মূল কাজ হবে কোরআন-সুন্নাহর ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে ইসলামের প্রতি বিরাগ ভাজন করা এবং সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে দল-উপদল সৃষ্টি করে পরস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া।

মুসলমানদের অসতর্কতার সুযোগে ইয়াহূদী সন্ত্রাসীরা এ কাজে যথেষ্ট সফলতার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ মুসলমান দূরে থাক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম হিসেবে যারা সাধারণ মুসলমানদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র, তাদের অজান্তেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের মধ্যেও পথ ও মতের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে সুকৌশলে আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করেছে। ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কাদরিয়া, জাহমিয়া, মু'তাযিলা, খাল্ক-ই কোরআন, ওয়াহ্দাতুল ওয়াজুদ ও সম্রাট আকবরের দ্বীনে ইলাহী ইয়াহূদী আর মুশরিকদের ষড়যন্ত্রের ফসল। শুধু তাই নয়,

খত্মে নবুওয়াতের মতো মীমাংসিত ও স্পর্শ কাতর বিষয়েও তারা বিতর্কের অবতারণা করিয়ে তাদের পোষ্য গোলামদের দিয়ে নবুওয়াতের দাবি করিয়েছে। সৃষ্টি করেছে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও বাহাইসহ অন্যান্য সম্প্রদায়কে।

মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তাদের এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপের মোকাবেলায় হক্কানী ওলামা-মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদারদের কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে অধিকাংশ মুসলিম দেশে এসব ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করিয়েছেন। ষড়যন্ত্র করে আলেম ওলামাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করলেও বর্তমানে ক্রমশ সে ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে এবং আলেম-ওলামা দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে ভূমিকা পালন করছেন।

দ্বিতীয় কৌশল- বিভ্রান্তি সৃষ্টি

এরপর তারা কৌশল অবলম্বন করলো পবিত্র কোরআন, নবী-রাসূল ও ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য অভিশপ্ত ইয়াহূদী গোষ্ঠী প্রথমে সওয়ার হলো বৃটেনের খৃষ্টানদের ঘাড়ে। সে সময় বৃটেন সারা দুনিয়া দখল করে কলোনী স্থাপন করেছে। ইয়াহূদীরা বৃটেনের মাধ্যমে মুসলিম দেশসমূহের শিক্ষানীতি ও শিক্ষার কারিকুলাম প্রণয়ন করলো। এই কারিকুলামে সুকৌশলে তারা কোরআন-হাদীস, নবী-রাসূল ও ইসলামের প্রতি সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবার মতো উপকরণ সাজালো। যেনো মুসলিম শিক্ষার্থীগণ শিক্ষাঙ্গন থেকেই নাস্তিক হয়ে বের হয় এবং অমুসলিমদের স্বার্থেই এসব শিক্ষিত মুসলমান (?) কাজ করে।

পবিত্র কোরআন, নবুওয়াত-রিসালাত সম্পর্কে ভিত্তিহীন প্রশ্ন তুলে নানা ধরনের কবিতা-সাহিত্য রচিত হলো। মানব সভ্যতায় মুসলমানদের যাবতীয় অবদান আড়াল করে রচিত হলো ইতিহাস। অমুসলিমদের অখ্যাত-অপরিচিত লোকদের বানানো হলো চিন্তানায়ক আর বিখ্যাত মুসলিম চিন্তানায়কদের নাম পর্যন্ত মুছে দেয়া হলো। একান্ত বাধ্য হয়ে যেসব মুসলিম মনীষীদের নাম ইতিহাসে লেখা হলো, সে নামও এমন বিকৃত করে লেখা হলো, তা পাঠ করলে সে ব্যক্তি মুসলিম না অমুসলিম বোঝার উপায় রইলো না।

কবিতা-সাহিত্যে, নভেল-নাটক, মূকাভিনয় ও চলচ্চিত্রে ইসলামকে উগ্র সন্ত্রাসী মতবাদ আর সাহাবায়ে কেরামকে রক্ত পিপাসু হিসেবে উপস্থাপন করা হলো। ইসলামের বিরুদ্ধে কার্টুনের নামে নানা ধরনের ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করা হলো। এমনকি মুসলিম নাম ব্যবহার করে ইসলাম দরদীর ছদ্মাবরণে নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরামের বিভ্রান্তিকর জীবনী লেখা হলো এবং পবিত্র কোরআন-হাদীসের মনগড়া

ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হলো। নিকট অতীতে সালমান রুশদী নামক জাহান্নামের এক কীটকে দিয়ে 'স্যাটানিক ভার্সেস' তারাই লিখিয়েছে। 'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ গোপন করে এর অর্থ করা হলো 'ধর্মযুদ্ধ' এবং জিহাদের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো যে, ইসলাম তরবারীর জোরে তথা শক্তি প্রয়োগ করে বিস্তার লাভ করেছে। ইসলাম ও মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে রক্তের গন্ধ আসে। ইসলামকে ইসলাম হিসেবে উল্লেখ না করে উল্লেখ করা হলো 'মোহামেডানিজম' বা মুহাম্মাদের মতবাদ। অর্থাৎ তারা এ কথাই বুঝাতে চাইলো যে, ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া আদর্শ নয়, এটা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর তৈরী তথা অন্যান্য মতবাদের মতো এটিও একটি মানব রচিত মতবাদ।

ইসলাম আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং পৃথিবীর প্রথম মানুষ প্রথম নবী-রাসূল হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের আগমন ঘটেছে। প্রত্যেক নবী-রাসূলের আদর্শই ছিলো ইসলাম। অথচ এরা প্রচার করে থাকে যে, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাঃ)। এভাবে নানা দিক থেকে ইয়াহূদী এবং তাদের দোসররা ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করলো।

তৃতীয় কৌশল- ইসলামপন্থীরা সন্ত্রাসী

ইসলামের বিরুদ্ধে দুশমনদের সকল কৌশল বর্তমানের মতো অতিতেও ব্যর্থ হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلاَّ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ–

এ মূর্খ লোকেরা তাদের মুখের এক ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর দ্বীনের মশাল নিভিয়ে দিতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর এ আলোর পূর্ণ বিকাশ ছাড়া অন্য কিছুই চান না, যদিও কাফিরদের কাছে এটা খুবই অপ্রীতিকর! (সূরা তওবা-৩২)

এ যাবৎ কাল দুশমনরা যত কৌশল অবলম্বন করেছিলো, তা ব্যর্থ হবার পরে তারা গত শতাব্দীর শেষলগ্ন থেকে নতুন এক কৌশল অবলম্বন করলো। মুসলিম নামধারী আল্লাহ ভীতিহীন লোভী, স্বার্থান্ধ, দুনিয়া পূজারী, স্থবির চিন্তার অধিকারী, অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, কোরআন-হাদীসের জ্ঞান বিবর্জিত, ইসলামের ইতিহাস অনভিজ্ঞ, ইসলামী দাওয়াত ও বিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞ, নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামদের আন্দোলনের ধারা পরিক্রমা সম্পর্কে অজ্ঞ লোকদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং ইসলামের দরদী সেজে ভুল বুঝানো শুরু করলো।

এসব লোকদের বুঝানো হয়, 'মুসলিম দেশগুলোয় যে পদ্ধতিতে সরকার পরিচালিত হচ্ছে তা হারাম। গনতন্ত্র, নির্বাচন, ভোট, ধর্মঘট, মিছিল-মিটিং ইত্যাদি হারাম। বিজ্ঞানের অবদানে যেসব প্রযুক্তি আবিষ্কার হয়েছে এসব ব্যবহার করাও হারাম। গনতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়ে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার কথা যারা বলে, তারা ভুল কথা বলে। নবী-রাসূলগণ এসব পদ্ধতি অবলম্বন করেননি। ইসলামের কথা বলার জন্য যারা ক্যামেরায় ছবি ধারণ করে এবং টিভি চ্যানেলে বক্তৃতা করে, তারা দুনিয়া পূজারী, এসব লোকদের পেছনে নামায আদায় করা হারাম। কারণ নবী-রাসূলগণ ক্যামেরায় ছবি তুলেননি এবং টিভি চ্যানেলে বক্তৃতাও করেননি। আদালতে বিচার কাজে মানুষের বানানো আইন প্রচলিত রয়েছে, যারা এই আইন দিয়ে বিচার করে তারা কাফির এবং এদেরকে হত্যা করতে হবে। এসব লোকদের হত্যা করলে আল্লাহ্ খুশী হবেন এবং খুব সহজেই জান্নাত পাওয়া যাবে। ইসলামের দুশমনদের হত্যা করতে হবে এবং এদের যাবতীয় সম্পদ ধ্বংস করে দিতে হবে। মুসলিম দেশের শাসকদের হত্যা করতে হবে, কারণ এরা ক্ষমতায় থেকে সুযোগ পেয়েও ইসলামী আইন চালু করছে না। এরা কাফিরের থেকেও নিকৃষ্ট। এসব লোকদের হত্যা করতে গিয়ে নিজে নিহত হলে আল্লাহর কাছে শহীদের মর্যাদা লাভ করা যাবে।'

উল্লেখিত কথাগুলো যাদের সম্মুখে বলা হয়, তারা অর্ধ শিক্ষিত-অশিক্ষিত হলেও মুসলমান। হৃদয়ে আল্লাহ্-রাসূলের প্রতি অসীম ভালোবাসা রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার, শহীদের মর্যাদা পাবার এবং অতি সহজেই জান্নাত লাভের সহজ পদ্ধতি সম্মুখে আসার সাথে সাথে এসব নির্বোধ লোকগুলো জান্ কোরবান করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

মুসলমানদের মধ্য থেকে উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের ব্যবহার করছে ইয়াহূদী মুশরিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। ক্ষেত্র বিশেষে স্বয়ং নিজেরাও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্রত্যক্ষভাবে করছে। এসব দাড়ি-টুপি পরিহিত লোক বা মাদ্রাসা পড়ুয়া লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর আইন বা বিধান কায়েমের ধুয়া তুলে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে তারা বর্তমানে তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে চায়।

(১) সন্ত্রাসী তৎপরতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবনে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে ইসলামপন্থী ও ধর্মভীরু মানুষের প্রতি সন্দেহ-সংশয় এবং ঘৃণা সৃষ্টি করা।

(২) নবী-রাসূলদের ধারা অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় যেসব ইসলামী দল আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আন্দোলন করছে, তাদের প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা সৃষ্টি,

ইসলামী দলের সাথে সাধারণ মানুষের দূরত্ব সৃষ্টি, সরকারকে ইসলামী দলগুলোর ওপর জুলুম-নির্যাতনে উৎসাহিত করা এবং ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া। (৩) ইসলামপন্থীদের প্রতি সন্দেহ-সংশয় ও ঘৃণা সৃষ্টি করে ইসলামের বিপরীত মতবাদ-মতাদর্শ বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষদের প্রতি সাধারণ মানুষকে সহানুভূতিশীল করে তোলা এবং তাদেরকেই মুসলিম দেশসমূহে ক্ষমতায় আসীন করা।

সন্ত্রাসী তৎপরতা- মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ

বর্তমান পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য কোনো সংবাদ মাধ্যম মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত নয়। কারণ ইতোপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, সন্ত্রাসী ইয়াহূদী গোষ্ঠী বহুপূর্ব থেকেই সারা পৃথিবীব্যাপী সংবাদ মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করে একযোগে সিন্ডিকেট সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এ কারণেই পৃথিবীর যেখানেই সন্ত্রাসী তৎপরতা ঘটছে, সাথে সাথে সমস্ত সংবাদ মাধ্যম একযোগে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করে সংবাদ প্রচার করছে। মহাসমুদ্রে এককোটা পানি নিক্ষেপ করলে তা যেমন মিশে যায়, তেমনি সিন্ডিকেট সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত ভিত্তিহীন মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদ করলেও তা কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে না। মুসলমানদের শক্তিশালী সংবাদ মাধ্যম থাকলে তার মাধ্যমে প্রতিবাদ করে সারা দুনিয়ার কাছে মুসলমানরা নির্দোষ-বিষয়টি তুলে ধরা যেতো।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ২০০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসের ১১ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপরে হামলা করে এর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মুসলমানদের ওপরে। এ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে পৃথিবীর ইসলামী আন্দোলনসমূহকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে ইয়াহূদী প্রভাবিত আমেরিকা আফগানিস্থানে হামলা করে সরকারকে উৎখাত করলো। সভ্য জগতের সমস্ত নিয়ম-নীতি পদদলিত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং ঈদের দিনেও অসংখ্য মুসলমানকে হত্যা করলো। তাদের প্রচার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালালো। এই ঘটনার পেছনেও ইয়াহূদীদের চক্রান্ত সক্রিয় ছিল। কারণ যেদিন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে হামলা হলো, সেদিন সেখানে একজন ইয়াহূদীও তাদের কর্মস্থলে যোগ দেয়নি। অথচ প্রায় চারহাজার ইয়াহূদী সেখানে চাকরী করতো।

ঘটনা যেভাবে সংঘটিত হলো, সম্পূর্ণ দৃশ্য ভিডিও করে সমস্ত প্রচার মাধ্যমে একযোগে বিশ্বব্যাপী প্রচার করা হলো। এ ধরনের একটি মারাত্মক ঘটনার সম্পূর্ণ দৃশ্য যারা ভিডিও করলো, তারা ঘটনার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই অবহিত না থাকলে

যাবতীয় দৃশ্য ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করলো কিভাবে? অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের দ্বারা এ ঘটনা সংঘটিত হবার অসংখ্য প্রমাণ মওজুদ থাকার পরও তাদের প্রতিপালক ইসলাম বিদ্বেষী আমেরিকা ইয়াহূদীদের পরিকল্পনা মাফিক সমস্ত দোষ ইসলাম পন্থীদের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে রক্তশোষক ভ্যাম্পায়ারের মতই নির্বিচারে গনহত্যা চালালো এবং স্বাধীনতাকামী মুসলিম সংগঠন, সেবামূলক মুসলিম সংগঠনসহ ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত করলো। ফ্রান্স, লন্ডন ও ভারতে বোমাবাজি করিয়ে সেই একই কৌশলে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করা হলো।

মুসলিম নামের অধিকারী যেসব লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে, ইসলাম সম্পর্কে তাদের জ্ঞা[illegible] পর্যায়ের। কারা তাদেরকে এই ঘটনা ঘটাতে উৎসাহিত করেছে, কারা অর্থ সরবরাহ করছে, তাদের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কি– প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে, যথাযথ পন্থায় তদন্ত করলে অবশ্যই পর্দার আড়ালে লুকায়িত নাটের গুরুদের চেহারা দুনিয়াবাসীর সম্মুখে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এখানে প্রশ্ন হলো, বিশ্বব্যাপী এ সন্ত্রাসী অপতৎপরতার তদন্ত করবে কে? তদন্তের দায়-দায়িত্ব যারা গ্রহণ করেছে, তাদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ। ইসলাম আর মুসলিম নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই যাদের গাত্রদাহ শুরু হয় কখনোই তারা সঠিক পথে তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের চেহারা দুনিয়ার সামনে তুলে না ধরে মুসলমানদের নামই উচ্চারণ করবে।

ইসলামের **'ধৈর্য ধারণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন'** নির্দেশ যদি কোনো মুসলমান অমান্য করে অধিকার আদায়ের জন্য সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে, তাহলে এটাও তো খতিয়ে দেখতে হবে, কেনো সে সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করলো।

সারা দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে, নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে, নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে, মুসলিম দেশ দখল করা হচ্ছে, সম্পদ বিনষ্ট ও দখল করা হচ্ছে, নিত্য-নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার করে তা মুসলমানদের ওপরে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পরিস্থিতির এই প্রেক্ষাপটে 'ধৈর্যহারা' কোনো মুসলমান যদি আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে, তাহলে কি তাকে সন্ত্রাসী বলা যাবে?

এ সম্পর্কে স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ আবু জাফর সাহেব তাঁর রচিত 'অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয় কথা' নামক গ্রন্থের ২৩৫ পৃষ্ঠায় আকর্ষনীয় দৃষ্টান্ত দিয়ে খুবই সুন্দর কথা উপস্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'অসংখ্য ফুলে-ফুলে পরিভ্রমণ

করে বহু পরিশ্রমে মৌমাছি তার মৌচাকে মধু সঞ্চয় করে রাখে। নির্দয় দস্যুর মতো বাওয়ালি (যারা মধু সংগ্রাহক) যখন মৌচাকে হানা দেয়, ক্ষুব্ধ রাগান্বিত মৌমাছি তার মধু ও মৌচাক রক্ষার্থে যদি বাওয়ালিকে দংশন করে, সেটা কি সন্ত্রাস? আসলে কে সন্ত্রাসী? দস্যু বাওয়ালি, নাকি বিক্ষুব্ধ মৌমাছি? কী অদ্ভূত পরিহাস! পাশ্চাত্যের বাওয়ালিরা মুসলিম বিশ্বের সর্বস্ব লুণ্ঠনে মেতে উঠবে, তারা নিষ্পাপ নিরপরাধ! আর যারা আত্মরক্ষার্থে আত্মহুতি দিচ্ছে, তারা সন্ত্রাসী! বিচারের কী অকথ্য অদ্ভূত মানদন্ড, যা দেখে ইবলিসও লজ্জা পায়।' এক বিখ্যাত উর্দুভাষী কবি বলেছেন–

وہ قتل بھی کرتے چرچا نہی ہوتا

ہم آہ بھی کرتے بدنام ہوجاتا

ও কতল ভি করতে চর্চা নাহি হোতা

হাম আহ্ ভি করতে বদনাম হো জা তা।

সে খুন করে কিন্তু এ ব্যাপারে কেউ তার সমালোচনাও করে না। আহত হয়ে যন্ত্রণা কাতর শব্দ আমার মুখে উচ্চারিত হলেই চারদিকে আমার দুর্ণাম ছড়িয়ে পড়ে।

ইয়াহূদী সম্প্রদায় কর্তৃক মুসলিম রাষ্ট্র ফিলিস্তিন দখল করার পূর্বে ও পরে ইয়াহূদীরা অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে মুসলমানদের রক্তে প্লাবন বইয়ে দিয়েছে। এখনও প্রতিদিন সেখানে মুসলিম নারী, শিশু-কিশোর ও যুবকদের হত্যা করছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বেও হামাসের প্রথম সারির কয়েকজন সম্মানিত নেতাকে সন্ত্রাসী কায়দায় হত্যা করেছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অভিশপ্ত ইয়াহূদীদের এসব জঘন্য কার্যকলাপকে সন্ত্রাসের সংজ্ঞায় আনা হচ্ছে না। আত্মরক্ষার্থে মুসলমানরা যদি একটি ঢিলও ছুড়ে, সাথে সাথে একে সন্ত্রাসী কার্যক্রম হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

অভিভাবক, খতীব, ওয়ায়েজীন ও ইমামগণের দায়িত্ব

বর্তমানে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে শত্রুপক্ষ যে কৌশলে অপতৎপরতা চালাচ্ছে, তা প্রতিহত করা একমাত্র সরকারেরই দায়িত্ব নয়। দেশের জনগণকে নিজেদেরই স্বার্থে এ ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন হতে হবে এবং শত্রুদের দমন করার জন্য সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে হবে। এ ব্যাপারে দল, মত, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর নাগরিককেই এগিয়ে আসতে হবে। 'আমার পসন্দের দল সরকারে নেই, সুতরাং সরকারের দুর্নাম হলে আমার কিছুই যায় আসে না' এই মনোভাব ত্যাগ

করতে হবে। যান-বাহনে বা স্কুলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে এতে শুধু সরকারী দলের লোক বা সরকারী দলের সমর্থক লোকদের সন্তানরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সকল শ্রেণীর মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং দেশ ও জাতির এই ক্রান্তিকালে 'দল প্রেম নয়' দেশ প্রেমিক হিসেবে সাধ্যানুযায়ী ভূমিকা পালন করতে হবে।

অভিভাবকগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে, সন্তান কি করছে কোথায় যাচ্ছে এবং কোন্ শ্রেণীর লোকদের সাথে মেলামেশা করছে। দল হিসেবে সন্তান, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এবং অধিনস্থ কর্মচারী কোন্ দলকে পসন্দ করছে। ইসলামের নামে কোনো ব্যক্তি কাউকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কে কোন্ ধরনের বই-পত্র পড়ছে, ফোনে আভাষে-ইঙ্গিতে জাতিসত্তা, সরকার ও দেশের প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো আলোচনা করছে কিনা এ ব্যাপারে অভিভাবকগণকে সচেতন ভূমিকা পালন করতে হবে।

অভিভাবকগণ যদি অনুভব করেন যে, তার সন্তান, ভাই, অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের কেউ অথবা অধীনস্থ লোকদের কেউ ইসলামের লেবাসধারী হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কোনো সংগঠনের প্রতি সহানুভূতিশীল, তাহলে তাকে প্রকৃত ইসলাম ও ইসলামী দল সম্পর্কে বুঝিয়ে ঐসব সন্ত্রাসবাদী-জঙ্গীবাদী সংগঠনের ছোবল মুক্ত করতে হবে। আর যদি বুঝা যায় যে, আদর-ভালোবাসা দিয়ে, চেষ্টা-সাধনা করেও এদেরকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরানো যাবেনা, তাহলে মায়া-মমতা বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাতে নিজের নিরাপত্তার স্বার্থে, সমাজ, দেশ ও জাতির স্বার্থে এদেরকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে তুলে দিন। মনে রাখবেন, আপনার অধীনস্থদের ব্যাপারে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন–

لاَ يَسْتَرْعِىْ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَبْدًا رَعِيَّةً قَلَّتْ اَوْكَثُرَتْ اِلاَّ سَأَلَه اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عَنْهَايَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَقَامَ فِيْهَا اَمْرَاللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَمْ اَضَاعَه حَتّٰى يَشَاءَ لَه عَنْ اَهْلِ بَيْتِه خَاصَّةً–

আল্লাহ যে বান্দাকেই বেশী অথবা কম লোকের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন, কিয়ামতের

দিন অবশ্যই তাকে প্রশ্ন করা হবে যে, সে অধীনস্থ লোকদের দ্বীনের ওপর চালিয়েছিলো না তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। বিশেষ করে তার বাড়ির পরিবারের লোকদের ব্যাপারেও হিসাব গ্রহণ করবেন।

মায়া-মমতা ও ভালোবাসার বশবর্তী হয়ে আপনজনদেরকে যদি ধ্বংসের পথ থেকে ফিরানো না হয়, তাহলে কিয়ামতের দিন এরা যখন জাহান্নামে যাবে তখন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলবে, যারা আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়নি, ভুল পথে চলতে দেখেও নিষেধ করেনি, তারা আজ কোথায়? তাদেরকে পায়ের নীচে ফেলে পিষে তারপর জাহান্নামে যাবো। তারা যা বলবে, পবিত্র কোরআনে সে কথাগুলো এভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الاَسْفَلِيْنَ–

আমরা তাদের পদদলিত করবো, যাতে তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। (সূরা হামীম আস্ সাজ্দাহ্-২৯)

শিক্ষকগণ অভিভাবকদের বড় অভিভাবক। তাঁরা শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় ছাত্রদেরকে বুঝাবেন, 'আল্লাহর আইন চালুর নামে যারা সন্ত্রাস করছে তারা আসলে আল্লাহর আইনের দুশমন। ইসলামের শত্রুদের হাতের পুতুল হিসেবেই তারা কাজ করছে। ইসলামে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের স্থান নেই এবং ইসলাম সবসময় নিয়মতান্ত্রিক পন্থাই অনুসরণ করে। আদালতে বোমা মেরে বিচারক হত্যা করে বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে বিদেশী আগ্রাসনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।'

সম্মানিত খতীব, ইমাম ও ওয়ায়েজীনগণকে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এভাবে যদি ইসলামের নামে শত্রুপক্ষ সন্ত্রাস চালাতে থাকে, তাহলে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলাম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকগুলো ইসলামের ব্যাপারে ভুল ধারণা পোষন করবে। আর এ জন্য আল্লাহর দরবারে আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদেরই দায়ী হতে হবে। আলেম সমাজই ইসলাম সম্পর্কে সবথেকে বেশী জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহর আদালতে কোন্ কোন্ বিষয়ে জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারেও তাঁরা পূর্ণ সচেতন রয়েছেন। 'আল্লাহর আইন চালু'র নামে যারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষকে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে সচেতন না করলে আল্লাহর আদালতে সর্বাগ্রে আলেমদেরই জবাবদিহি করতে হবে, এ ব্যাপারেও আলেম সমাজ সচেতন রয়েছেন।

যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী মাহফিলে বক্তৃতা করেন, তাঁরা কোরআন-হাদীস দিয়ে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখবেন এবং ইসলামী জীবন বিধান শ্রোতাদের সম্মুখে তুলে ধরবেন। খতীব ও ইমামগণ সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ জুমাবারে অনেক লোক সম্মুখে পেয়ে থাকেন। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে খুতবায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আলোচনা করে মানুষকে সচেতন করুন। তাদেরকে এ কথা বুঝান, যারা আল্লাহর আইন চালুর নামে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পিতামাতাকে সন্তানহারা করছে, স্ত্রীকে স্বামীহারা করছে, সন্তানকে ইয়াতিম করছে, বোনকে ভাইহারা করছে, পরিবারের উপার্জনশীল একমাত্র ব্যক্তিকে হত্যা করে গোটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছে, তারা অবশ্যই ইসলাম, মুসলমান, দেশ-জাতি ও সমগ্র মানবতার দুশমন। এদের সন্ধান পাওয়া মাত্র আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ফোন করে ধরিয়ে দিয়ে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে।

ষড়যন্ত্রকারীরা বোমাবাজদের দিয়ে যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে নামিয়েছে, তারা যদি আল্লাহ না করুন সফল হয়, তাহলে এর প্রথম শিকার আলেম-ওলামা, মাশায়েখ তথা ইসলাম পন্থীদেরকেই হতে হবে। দেশের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করে দেয়া হবে, কারাগারগুলো আলেম-ওলামা দিয়ে পরিপূর্ণ করা হবে, সংবিধান থেকে বিস্মিল্লাহ উঠিয়ে দেয়া হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুবাক্য প্রয়োগ করে কবিতা-সাহিত্য রচনা করা হবে, ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ করে দেয়া হবে, মুসলমানদের কলিজা পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হবে। সর্বোপরি ইসলাম ও মুসলমানদের হেয়-প্রতিপন্ন করা হবে এবং আলেম-ওলামাদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের পাত্রে পরিণত করা হবে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী বাতিল করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা হবে, যার ফলশ্রুতিতে কোরআন-হাদীসের বিধান প্রচার, প্রসার ও ইসলামী আন্দোলন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের সকলকে ভয়াবহ এই পরিস্থিতি সাফল্যের সাথে উত্তরণের তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন– ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নারী অধিকার সনদ

প্রেক্ষিত ঃ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮

নারী অধিকার আধুনিক বিশ্ব

আধুনিকবিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও চিন্তা- চেতনা ও মননশীলত দিক থেকে যতোই অগ্রসর হচ্ছে, ততোই তার দুটো দিক আমাদের সম্মুখে স্প দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। একঃ মানবতার কল্যাণ প্রচেষ্টা। দুইঃ এরই ছদ্মাবরণ ইসলামী আদর্শ বিলুপ্ত করার সুগভীর ষড়যন্ত্র।

পাশ্চাত্য বিশ্ব তার নিজের তৈরী করা অবাধ তথ্য প্রবাহ, নারী- পুরুষের অব মেলামেশা, সমকামীতা, বিকৃত যৌনতায় পরিপূর্ণ আকাশ সংস্কৃতির কারণে তাদে শান্তির নীড় পারিবারিক প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। সেক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে মুসলমানর শান্তিতে স্বস্তিতে যৌথ পরিবার প্রথায় নিশ্চিন্ত মনে ঘুমায় কেনো? এটাই সাম্প্রদায়িক পরং ও পরমত অসহিষ্ণু পাশ্চাত্যের গাত্রদাহ। আর এ বিষয়টি তারা প্রচ্ছন্নও রাখেনি বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল আমেরিকার কট্টর সাম্প্রদায়িক প্রেসিডেন্ট- যার কাছে নাকি তার 'গড' এর পক্ষ থেকে নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে যুদ্ধের নির্দেশ এসেছে, তি সারা দুনিয়ার মুসলমানদের লক্ষ্য করে স্বদম্ভে ঘোষণা করেছেন, 'বিশ্বে শান্তি-স্বস্তি সাথে বসবাস করতে হলে আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।' তিনি তার প্রাচ্য প্রতীচ্যের সঙ্গী সাথীদের সহযোগিতায় মুসলমানদের শান্তি বিনষ্ট করার লক্ষে কল্পিত সন্ত্রাস দমনের নামে ইসলামী সভ্যতা- সংস্কৃতি ধ্বংস ও মুসলিম দেশসমূ এবং এর সম্পদ দখল করার সুদূর প্রসারী নীল নকশা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মরি হয়ে উঠেছেন।

ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমনদের ষড়যন্ত্রের ধারাবাহিকতায় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্ত মুসলিম দেশ- বাংলাদেশেও ২০০৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী 'জাতীয় নারী উন্নয় নীতি '০৮' বিগত ৮ই মার্চ '০৮ তারিখে ঢাকাস্থ উসমানী মিলনায়তনে বিশ্ব না দিবসের এক অনুষ্ঠানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক নীতিমালাটি সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

এই নীতিমালার প্রতি গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হ যায় যে, দেশী- বিদেশী ইসলামের চরম বিদ্বেষীদের মাধ্যমে রচিত এ নীতিমাল প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালার উল্লেখযোগ্য অংশই মুসলমানদের হৃদপি পবিত্র কোরআন হাদীসের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। বর্তমান সময়ে সম্পূ অনাধিকার ও অযাচিতভাবে এদেশের ৯০% জনগণের চিন্তা-চেতনা, ঈমান আকিদ বিশ্বাসের সাথে বিরোধপূর্ণ এই নীতিমালা প্রণয়নের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য হচ্ছে আমেরিকা- ইউরোপের অনুরূপ বাংলাদেশেও মুসলমানদের ঐতিহ্য বিনষ্ট কে এদেশ থেকে শান্তিপূর্ণ পারিবারিক ব্যবস্থা সমূলে উচ্ছেদ করা এবং শতকরা ৯০% মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের হৃদয়ে আগুন জ্বালিে

এদেশকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, ব্যর্থ ও অকার্য্যকর রাষ্ট্র প্রমাণ করে প্রত্যক্ষভাবে আগ্রাসী শক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ইসলাম কোনো অসম্পূর্ণ জীবন বিধানের নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। ভারসাম্যমূলক ইসলামী জীবন বিধানে নারীনীতি, শ্রমনীতি, শিশু- কিশোর নীতি, তরুণ- যুবনীতি, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সম্মান- মর্যাদা ও নিরাপত্তা নীতি, খাদ্যনীতি, কৃষিনীতি, ভূমিনীতি, শিল্পনীতি, মালিক-শ্রমিক নীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা নীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, সভ্যতা- সংস্কৃতি নীতি, উত্তরাধিকার নীতিসহ মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যত নীতিমালা প্রয়োজন, সে সকল নীতিমালা দিয়ে ইসলাম পরিপূর্ণ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। ইসলামী জীবন বিধানের মোকাবেলায় প্রাচ্য-প্রতীচ্যের অতীত ও বর্তমানের সকল মতবাদ- মতাদর্শ ও সভ্যতা- সংস্কৃতি একেবারেই নিঃস্ব সর্বহারা।

পাশ্চাত্যের ভোগবাদী পরমত অসহিষ্ণু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন চিন্তা নায়ক ও নেতৃবৃন্দের কাছে মুসলমানদের সুখ-শান্তি ও স্বস্তি একেবারেই অসহনীয়। মুসলিম দেশসমূহের সম্পদের প্রতি সুদূর অতীত থেকেই তাদের রয়েছে লোলুপ দৃষ্টি। ঠিক এ কারণেই গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের ফেরিওয়ালা আমেরিকার কোনো কোনো নেতা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বেই তৈল সমৃদ্ধ ইরান- ইরাক নিশ্চিহ্ন করার নিলর্জ্জ হুমকি দিচ্ছেন। অথচ এরাই সারা দুনিয়ায় নিজেদেরকে গণতন্ত্রের একমাত্র ঠিকাদার হিসেবে দাবী করে মানবাধিকারের জন্য কুম্ভিরাশ্রু বর্ষন করে। গণতন্ত্রের আলখেল্লার আড়ালে রয়েছে তাদের দানবীয় চেহারা, তারা মুসলিম দেশসমূহের প্রাকৃতিক সম্পদ সংশ্লিষ্ট দেশকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে দিতে নারাজ, স্বনির্ভর নীতিমালা বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, নিজেরা একাধারে পারমাণবিক অস্ত্র মওজুদ করছে, কিন্তু কোনো মুসলিম দেশ এ পথে অগ্রসর হতে চাইলে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপসহ নির্লজ্জভাবে যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছে। এমনকি জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রেও পারমাণবিক শক্তি অর্জনের পথে চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

বৈষয়িক উপায়- উপকরণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সমরশক্তি ও অর্থনৈতিক শক্তির দিক থেকে যারা বলিয়ান হয় বিশ্বনেতৃত্বের আসনে তারাই আসীন হয় এবং তাদেরই সভ্যতা-সংস্কৃতি সারা দুনিয়ায় প্রভাব বিস্তার করে, আর এটাই হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। এসব দিক থেকে মুসলমানরা বিগত শতাব্দীসমূহের যে যুগ পর্যন্ত অগ্রগামী ছিলো, ঠিক সে যুগ পর্যন্তই মুসলমানরাই বিশ্বনেতৃত্বের আসনে আসীন ছিলো এবং ইসলামী সভ্যতাই পৃথিবীতে বিজয়ীর আসনে আসীন ছিলো। এ সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নারী অধিকারের সাথে পাশ্চাত্য জগৎ ছিলো সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারণ পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মের নামে যেসব মত রয়েছে এবং মানব রচিত যে সকল মতবাদ রয়েছে, এসব ধর্ম এবং মতবাদ নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার না দিয়ে ঘৃণা ও

লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। অপরদিকে একমাত্র ইসলামই নারীকে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল গহ্বর থেকে টেনে উঠিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করেছে।

বিশ্বনেতৃত্বের আসন থেকে মুসলমানদের দুঃখজনক পতনের পরে পাশ্চাত্যের গ্রীক প্রভাবিত নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শনের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সভ্যতা- সংস্কৃতি বিজয়ীর আসনে আসীন হয়। অবাধ বিকৃত যৌনতা নির্ভর এই সভ্যতা এই পৃথিবীর জীবনকেই একমাত্র জীবন হিসেবে গণ্য করেছে ফলে এ সভ্যতায় বিশ্বাসী ও প্রভাবিত লোকজন জীবন- যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তথাকথিত নারী উন্নয়নের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য এবং যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। নারী উন্ননের নামে যে সকল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, এসব সম্মেলনে দেহপসারিণী- রূপজীবীনিদের তথা বেশ্যাদেরকেও নারী প্রতিনিধি হিসেবে শুধু আমন্ত্রণই জানানো হয় না, তাদের সকল ব্যয়ভারও সম্মেলনের উদ্যোক্তাগণ বহন করে। অবশ্য বর্তমানে তারা বেশ্যাদের বেশ্যা হিসেবে চিহ্নিত না করে নির্লজ্জভাবে যৌনকর্মী বা সেক্স ওয়ার্কার হিসেবে দুনিয়াব্যাপী পরিচিত করানোর অপচেষ্টা করছে। যে ইউরোপ- আমেরিকা নারী অধিকারের ঠিকাদারী গ্রহণ করেছে, সেসব দেশের অধিকাংশ অধিবাসী বিকৃত খৃষ্টীয় আদর্শে বিশ্বাসী। বিকৃত খৃষ্টীয় আদর্শের অনুসারী পোপ-পাদ্রীগণ নারী সম্পর্কে বেশ কয়েকবার সম্মেলন করেও 'নারী মানুষ কি না' এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি।

ইসলাম নারীকে শুধু মানুষই নয়, পুরুষের তুলনায় তিনগুণ বেশী অধিকার দিয়েছে, নারীর সতীত্ব-সম্ভ্রম নিরাপদ করার লক্ষ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্টীয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, নারীর যৌবনকে পরম সম্মান- মর্যাদার বিষয় হিসেবে গণ্য করে এবং নারীর প্রতি সামান্যতম অপবাদ আরোপকারীর প্রতিও দন্ড আরোপের বিধান করেছে।

ইসলামী জীবন বিধানে নারীকে পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করে ব্যবসায়িক ফায়দা লুটা যাবে না, যথেচ্ছভাবে তার যৌবনকে ভোগ করা যাবে না, পূর্ণমাত্রায় তাঁর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে, এসব বিষয় পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীদের জন্য বড়ই পীড়াদায়ক। আর ঠিক এ কারণেই একদিকে তারা ইসলামী নীতিমালার বিপরীত নীতামালা প্রণয়ন করে তাদের বরকন্দাজদের মাধ্যমে কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগ করে মুসলিম দেশসমূহে চালু করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অপরদিকে ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলিম নারী-পুরুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে 'ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কম মর্যাদা দিয়েছে, ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে, পিতার সম্পত্তিতে সমঅধিকার দেয়নি, স্বাধীনতা থেকে নারীকে বঞ্চিত করেছে, ইসলাম নারীকে পিতা, স্বামী ও সন্তানের দাসীতে পরিণত করেছে, ইসলাম

নারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল হতে দেয় না' ইত্যাদি ধরণের ঘৃণ্য প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

আমরা অত্র পুস্তকে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী সভ্যতার অনুসারীদের নারী নীতি সম্পর্কে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য, ইসলামের নারী নীতি সম্পর্কে তাদের ঘৃণ্য প্রচারণা ও ইসলাম নারীকে পুরুষের তুলনায় কতটা বেশী অধিকার দিয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। তবে ইসলাম প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠী ধর্ম হিসেবে যা কিছুই অনুসরণ করে, সে সকল ধর্ম নারীর প্রতি কোন্ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে তা আলোচনা করা প্রয়োজন। ইসলাম প্রদত্ত অধিকার ও অন্যান্য আদর্শ প্রদত্ত অধিকার তুলনামূলক আলোচনা করলে সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যাবে, ইসলাম নারীকে সম্মান-মর্যাদার কোন্ উচ্চস্তরে আসীন করেছে।

ইসলাম পূর্ব অবস্থায় নারী

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ইতিহাসের যে পর্যায়ে আল্লাহর কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছিলো, সে সময় কন্যা সন্তান ছিল অসম্মান ও অমর্যাদার প্রতীক। এ জন্য কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করতো। গর্ভবতী মায়ের প্রসব বেদনা শুরু হলে তাকে একটি গর্তের কিনারায় রাখা হতো অথবা তার পাশেই একটি গর্ত খনন করা হতো। পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সবার মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতো আর কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে তাকে জীবিত অবস্থায় গর্তে ফেলে মাটি চাপা দেয়া হতো।

কখনো কন্যা সন্তানকে উট বা ছাগল চরানোর উপযুক্ত বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত জীবিত রাখা হতো। এ পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন চলতো এবং তাকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে পরিবারে রাখা হতো। এরপর যথা সময়ে পশম দিয়ে বানানো গরম পোশাক পরিয়ে উত্তপ্ত মরুভূমিতে উটের রাখাল হিসাবে পাঠিয়ে দিতো। পশমী পোষাকে আবৃতা কিশোরী মেয়েটি মরুভূমির প্রচন্ড উত্তাপে মারা পড়তো অথবা বন্য জন্তুর খোরাকে পরিণত হতো বা নরপশুদলের সম্মিলিত ধর্ষণের শিকারে পরিণত হয়ে প্রাণত্যাগ করতো।

ক্ষেত্র বিশেষে কন্যাকে জীবিত রাখলেও তার জীবন ছিলো যন্ত্রণাদায়ক। প্রত্যেক মুহূর্তে মেয়েটি উপেক্ষা আর নির্যাতনের শিকার হতো। তার বিয়ের পরে স্বামী মারা গেলে মেয়েটির অভিভাবক এসে নিজের শরীরের পোষাক মেয়েটির শরীরের ওপরে নিক্ষেপ করতো। এই পোষাক নিক্ষেপ করার অর্থ ছিল, এই মেয়েটি অন্য কাউকে বিয়ে করার অধিকার রাখে না। কখনো সেই অভিভাবকই মেয়েটিকে ভোগের

সামগ্রীতে পরিণত করতো অথবা পুনরায় বিয়ে না দিয়ে মেয়েটির মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তার ওপরে নির্যাতন করা হতো। কখনো এভাবে নারীকে তালাক দেয়া হতো, যে ব্যক্তি তালাক দিলো তার অনুমতি ব্যতীত বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত সেই নারী অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না।

হিন্দু ধর্মে নারী

পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম নারীর কোনো সম্মান ও মর্যাদাই প্রদান করেনি। পুরুষ একাধিক বিয়ে বা স্ত্রী বিয়োগের পরে পুনরায় বিয়ে করার অধিকার লাভ করবে কিন্তু নারীর সে অধিকার নেই। সতীদাহ তথা স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়িয়ে মারার অমানবিক ব্যবস্থা চালু ছিল হিন্দু ধর্মে। কোনো নারী যদি সৌভাগ্য ক্রমে স্বামীর জ্বলন্ত চিতা থেকে জীবিত বের হতো পারতো তাহলে তাকে এমনভাবে তিরস্কার কার হত যে, সে নারীর পক্ষে জীবিত থাকার তুলনায় মৃত্যুই উত্তম বিবেচিত হতো।

হিন্দু ধর্মে একজন পুরুষ একই সাথে দশজন নারীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারে। রাজা দশরথের তিনজন স্ত্রী ছিল। মহারাজা ধ্রুবের ছিল পাঁচজন, পাঁন্ডুর ছিল দুইজন, অর্জুনের ছিল তিনজন স্ত্রী। এদের মধ্যে তালাক প্রথা নেই। ফলে যথেচ্ছা অত্যাচার করলেও নারী মুক্তির কোনো বিধান নেই। স্বামী হলো নারীর দেবতা। অতএব দেবতা কোনো পাপ করতে পারেনা। দিনরাতের এমন কোনো মুহূর্ত নেই যে মুহূর্তে নারী স্বাধীন থাকতে পারে। সকল ক্ষমতা স্বামীর অধিকারে থাকবে। নারী স্বাধীন হবার যোগ্য নয়। নারী তার সমগ্র জীবনকালে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। পিতা তার কন্যাকে যার সাথে বিয়ে দিবেন, সে যেমনই হোক না কেনো- তার সাথেই তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। স্বামীর মৃত্যুর পরে তাকে আজীবন নিষ্ঠুর বৈধব্য ব্রত পালন করতে হবে। নারীর সখ আহ্লাদ বলে কোন কিছু থাকতে পারে না।

শয্যাপ্রিয়তা, অলঙ্কারাসক্তি, ব্যভিচারের ইচ্ছা, আত্মগর্ব, অহংকার, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মিথ্যা বলা এবং যে কোনো পুরুষ দেখলেই তার সাথে দেহ মিলনের ইচ্ছা নারীর স্বভাবের অন্তরগত। কোনো ধরনের পরামর্শ নারীর সাথে করা যাবেনা, পরামর্শ করার সময় নারীকে কাছেও রাখা যাবেনা। এই পৃথিবীতে পুরুষ পাপ করলে পরজন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। নারী জাতি হীন, পাপমূর্তি এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। নারী দাস সম্প্রদায়ভুক্ত।

কোনো মানুষকে যদি এক হাজারটি মুখ দিয়ে হাজার বছর জীবিত রাখা হয় আর সে যদি তার এক হাজারটি মুখ দিয়ে প্রত্যেক মুহূর্তে নারীর দোষ বর্ণনা করে, তবুও

নারীর দোষ বর্ণনা করে শেষ করতে পারবে না। ধন-সম্পদে নারীর কোনো অধিকার নেই। ঋণে ডুবে থাকা ব্যক্তি পর জন্মে নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। শিক্ষা গ্রহণের কোনো অধিকার নারীর নেই।

উল্লেখিত বাণীসমূহ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের। নারীর সম্মান ও মর্যাদা তারা কেমন করে কিভাবে দিয়েছে তাদের ধর্মগ্রন্থে উদ্ধৃত ঐ কথাগুলো পাঠ করলেই উপলব্ধি করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মে নারী

অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ- এটা হলো বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি। সেই বৌদ্ধ ধর্ম নারী সম্পর্কে বলছে–নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়া মানবীয় পবিত্রতার পরিপন্থী। নারীর সাথে কোনরূপ মেলামেশা বা তাদের প্রতি কোনো অনুরাগ রেখোনা। তাদের সাথে কোনো ধরনের কথা বলবে না। পুরুষদের জন্যে নারী ভয়ংকর বিপদ স্বরূপ। নারী তার মনোহর কমনীয় ভঙ্গীদ্বারা পুরুষের বিশ্বাস নামক সম্পদ লুটে নেয়। নারী এক ছলনা বৈ কিছুই নয়। নারী থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। নারীর সাথে একত্রে থাকা অপেক্ষা বাঘের মুখে তার খাদ্য হিসাবে যাওয়া বা ঘাতকের তরবারীর নীচে মাথা পেতে দেওয়া অতি উত্তম।

বৌদ্ধ ধর্মের উপখ্যানে এ ঘটনা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, উরুবিল্ব গোত্রপতির মেয়ে মারা গেলে একদিন স্বয়ং বুদ্ধ তার কবর খুলে মেয়েটির কাফনের কাপড় নিয়ে গেলেন এবং তা দিয়ে জামা বানিয়ে ব্যবহার করলেন। (Saint Hiler Budha & his relegion, p-50)

নারী সম্পর্কে উল্লেখিত বৌদ্ধ ধর্মের বাণীসমূহ পাঠ করলে অনুধাবন করতে কষ্ট হয়না, এই ধর্ম নারী জাতিকে কি ধরনের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।

ইয়াহূদী ধর্মে নারী

নারী সম্পর্কে ইয়াহূদী ধর্মের বক্তব্য হলো–নারী পাপের প্রসবন। কোনো ভালো কাজ করার যোগ্যতা নারীর নেই। এ কারণে সে সম্মান পেতে পারে না। নারীকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র ভোগ করার জন্যে। নারী জাতি সৃষ্টির আদি থেকেই পাপের উস্কানি দিয়ে আসছে। নারীকে সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত করা যাবে না। কোনো নারীর স্বামীর সাথে যদি অন্য পুরুষের ঝগড়া শুরু হয়, আর নারী যদি তাঁর স্বামীকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়ায়, এটা তাঁর ক্ষমাহীন অপরাধ। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে নারীর উভয় হাত কেটে দিতে হবে। নারীকে যে কোনো সময় যে কোনো কারণে বা কারণ ব্যতীতই তালাক দেয়া যেতে পারে। প্রতিটি পুরুষের এই বলে

দোয়া করা উচিত যে, হে স্রষ্টা! তুমি আমাকে যে নারী না করে পুরুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছো, এ কারণে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ওপরে উল্লেখিত ইয়াহূদী ধর্মের বাণীসমূহ পাঠ করার পরে আর ব্যাখ্যার দাবী রাখে না যে, ইয়াহূদী ধর্ম নারীকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখে। ইয়াহূদী ধর্মেই শিশু কন্যাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা চালু ছিল।

পারসিক ধর্মে নারী

পারসিক ধর্ম নেতার নাম যরথুষ্ট্র। তার প্রবর্তিত ধর্মেও নারীর কোনো মর্যাদা রাখা হয়নি। যেসব বিধান রাখা হয়েছে তা নারীর জন্য চরম অমানবিক। যরথুষ্ট্র নারী সম্পর্কে বলেছেন, যে নারীর সন্তান নেই সে নারী পুলসিরাত পার হয়ে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং নারী যেন অন্য কারো সন্তান গর্ভে ধারণ বা পালন করে হলেও মাতৃপদ লাভ করে। নারীর মাসিক হলে এই ধর্মে তাকে চরমভাবে ঘৃণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কোনো পুষ্পবতী নারী যেন সূর্য না দেখে এবং কোনো পুরুষের সাথে কথাও না বলে। আগুনের দিকে সে যেন না তাকায়। পানিতে অবতরণ না করে। অন্য কোনো পুষ্পিতা নারীর সাথে একত্রে শয়ন না করে ও খাদ্য স্পর্শ না করে। কোনো পাত্র ধরতে হলে হাতে যেনো কাপড় জড়িয়ে নেয়। ঋতুবতী নারী এই সকল আদেশ অমান্য করলে তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যাবে। ঋতুকাল নারীর একটি পাপ কাল। বছরে তার জন্য একটি মাস নির্ধারিত রয়েছে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য।

সন্তান প্রসবকারিণী নারীর দুর্ভোগের শেষ ছিল না। সন্তান প্রসবের পরে নারী এমনই অপবিত্রা হয়ে যেত যে, সে নারী ঘরের বাইরে আসতে পারবে না। এমন কি বারান্দায় পর্যন্ত আসা যাবে না। মাটিতে পা রাখলে মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে যেত, কোনো কাঠের পাত্র নারী স্পর্শ করতে পারবে না। এ ধরনের অমানবিক বন্ধনে নারীকে বেঁধে রেখেছে এই ধর্ম। নারী তার স্বামীর দাস, নারীর জীবন তার কাছে এক ঘৃণ্য বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঈসা (আঃ) আগমনের পূর্বে নারী

হযরত ঈসার আগমনের পঁচিশ বছর আগের যুগটি ছিল যরথুষ্ট্রের যুগ। এই ধর্মে যৌনাচার লাগামহীন। ফলে যারা নিজেদের যৌবনকে কানায় কানায় উপভোগ করতে চাইতো তারা সে যুগে দলে দলে এই ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সম্রাট কায়খসরু, গস্টাসপ ও কায়কোবাদের মত প্রতাপশালী ব্যক্তিগণ এই ধর্ম গ্রহণ করার ফলে এই মতবাদ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্রাট পারভেজও এই মতবাদ গ্রহণ

করেছিল। এই ধর্মকে বলা হয় মজুসিয়াত। যৌনাচারের বাঁধাধরা আইন ছিল না বলে সম্রাট পারভেজ তার ভোগের জন্যে বহু সংখ্যক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। যৌন চাহিদার ক্ষেত্রে কোনো বাছ-বিচার নেই। এ ধর্মের বিধান অনুযায়ী যে কোনো সময় স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক বা হত্যা করতে পারে। নিজের স্ত্রীকে প্রয়োজনে অন্য কারো ভোগের জন্য দেয়া পাপের বিষয় নয়। নারীকে যে কোনো সময় বিক্রি করে দেয়া যায়।

সতিন পুত্র সৎ মা'কে ভোগ করতে পারে। এই ধর্মের আরেক ধর্মীয় নেতা মযুকের মতানুসারে, ধন-সম্পদ ও নারী হলো সকল পাপের মূল উৎস। নারী কারো ব্যক্তিগত সম্পদ হতে পারে না, নারী জাতীয় সম্পদ। সুতরাং একা কেউ কোন নারীকে ভোগ করতে পারবে না। উঠিয়ে দেয়া হলো বিয়ে প্রথা। ধর্মনেতা মযুকের এই যৌনাচারের নীতির সাথে ভারতের ভগবান রজনীশের যৌননীতির হুব-হু মিল দেখা যায়। পারস্য সম্রাট শাহ কাবাদ এ ধর্ম গ্রহণ করার ফলে তিনি সাম্রাজ্য ব্যাপী এই নীতি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রাসাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে দিলেন। ফলে যে কোনো লোক প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজপরিবারের নারীদেরকে ভোগ করতে পারতো। সম্রাট নিজেও যে কোনো লোকের স্ত্রীকে ভোগ করতো।

খৃষ্ট ধর্মে নারী

খৃষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থা আরো শোচনীয়। নারী মানুষ কিনা বা নারীর আত্মা বলে কিছু আছে কিনা তাই নিয়েই এ ধর্ম সন্দেহ পোষণ করে। নারী হলো সকল পাপের প্রতীক, নারীর রক্ত অপবিত্র, নারী ছলনার প্রতীক, নারী থেকে দূরে থাকো, নারী শয়তানের শক্তি, নারী অজগর সাপের মতো রক্ত পিপাসু, নারীর মধ্যে বিষ আছে, চরিত্র ধ্বংসের মূল শক্তি নারী, সে শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। নারীর স্বভাব বিচ্ছুর মতো কামড়ানো, শয়তানের ডান বাহু নারী, পুরুষের অধীনে থাকবে নারী, তার কোনো স্বাধীন সত্তা নেই, নারী যদি কোনো পুরুষের শরীর স্পর্শ করে তাহলে সেই পুরুষের সকল পুণ্য কর্ম বরবাদ হয়ে যাবে, নারী যদি কোনো ভুল করে তবে তা ক্ষমার অযোগ্য, পৃথিবীর কোনো কিছুর ওপরে নারীর অধিকার নেই, নারীর মধ্যে মানবীয় গুণাবলী নেই, তাদের মধ্যে চেতনা নেই, তারা মানুষ ও পশুর মাঝামাঝি পর্যায়ের এক বিশেষ প্রাণী। নারীরা আদৌ মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ৫৮৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে কয়েকটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল, ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর তারা সিদ্ধান্ত জানিয়েছিল, নারীরা মানুষ বটে তবে পুরুষের সেবা করার জন্যই তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে।

বর্তমানেও তথাকথিত সভ্য মানুষের মন থেকে নারী সম্পর্কে আপত্তিকর ধারণা

বিদায় নেয়নি। নারীমুক্তির নামে নারীকে কৌশলে নির্যাতন করা হচ্ছে। অন্ধকার যুগে নারীর ওপরে চলতো বিভিন্ন কায়দায় নির্যাতন আর আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতার নামে, নারী মুক্তির নামে নারীদেরকে তাদের স্বীয় মান সম্মান ও উচ্চ আসন থেকে টেনে নিচে নামিয়ে আনা হয়েছে। তাদের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে নারী সম্পর্কিত প্রবাদ

ইসলামী বিপ্লব পূর্ব ইরানে নারী সম্পর্কে প্রবাদ প্রচলিত ছিল, নারী এক আপদ তবে কোনো পুরুষ এই আপদহীন নয়। আজও আর্জেন্টিনায় প্রচলিত আছে, একটি ভালো দরজার যেমন কাঠ দরকার তেমনি নারীর জন্য কাষ্ঠদণ্ড প্রয়োজন। অর্থাৎ নারীকে পশুর ন্যায় পিটানোর জন্য লাঠি একান্ত প্রয়োজন। ভারতে প্রবাদ বাক্য আছে, নারী নরকের প্রধান প্রবেশ পথ। আমেরিকায় প্রবাদ প্রচলিত, যেখানেই নারী সেখানেই সমস্যা। জার্মানীতে বলা হয়, যখনই কোনো নারী মারা যায় তখনই পৃথিবীর সমস্যা কিছুটা কমে হয়। ফ্রান্সে বলা হয়, নারী পুরুষের সাবান বিশেষ। আয়ারল্যাণ্ডে বলা হয়, নারী শয়তানকেও প্রতারিত করে। রাশিয়ায় বলা হয়, মুরগীর বাচ্চা যেমন মুরগী চিনতে পারে না তেমনি নারীকে চিনতে পারে না কোনো পুরুষ, নারীর হৃদয় অন্ধকার জঙ্গলের মতো।

অষ্ট্রেলিয়ায় পশুর পাশাপাশি নারীকে দিয়ে বোঝাবহন করা হতো। খাদ্যের অভাব দেখা দিলে নারীকে হত্যা করে ভক্ষণ করা হতো। ১৯১৯ সনের পূর্ব পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ায় নারী সমাজ কোনো প্রকার সম্পদের অধিকারী হয়নি। ১৯০৭ সন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডেও ঐ একই অবস্থা ছিল নারীর ক্ষেত্রে। বৃটেনে ১৮৭০ সনে ও জার্মানে ১৯০০ সনের পূর্ব পর্যন্ত নারীর কোনো অধিকার ছিল না। আর বিশ্ব- মোড়ল আমেরিকা নারীকে সীমিত আকারে অধিকার দেয়া শুরু করেছে ১৮৮১ সাল থেকে। ১৮৩৫ সালে আমেরিকার মেয়েরা সর্বপ্রথম স্কলে যাবার তথা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই মেয়েদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে। ১৮৮৪ সালে আমেকিরার মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার লাভ করে। আর ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই পিতা, স্বামী ও অন্যান্য আত্মীয়ের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে। আমেরিকার মেয়েরা ১৯২০ সালে ভোটের অধিকার লাভ করে। অপরদিকে মুসলিম নারীরা তাদের এই রাজনৈতিক অধিকার পুরুষদের সাথে সাথেই পেয়েছে। আমেরিকায় নারীদেরকেই সর্বাধিক দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো। সেখানে দাস প্রথা বন্ধ হয় ১৮৬৩ সালে এবং এ দাস প্রথা বন্ধ করতে গিয়ে আমেরিকায় যে গৃহযুদ্ধ হয়েছিলো, তাতে প্রায়

সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষ নিহত হয়। অথচ ইসলাম ১৪শ' বছর পূর্বেই দাস প্রথা বিলুপ্তির সূচনা করে বিধান দিয়েছিলো, 'একজন দাস মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার আহার ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত অধিকার তার মালিকের সমপর্যায়ে হবে।' অথচ আমেরিকা তথা পাশ্চাত্যের নগ্ন সভ্যতার পূজারীরাই আজ মুসলমানদেরকে নারীর অধিকার শেখাতে চায়!

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও নারী

বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী ও পুরুষের মধ্যে মানবীয় সম্পর্কে শেষ বন্ধনটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে মানুষকে নিতান্তই পাশবিক স্তরে উপনীত করার লক্ষ্যে নারী সম্পর্কে নানা ধরনের নীতিমালা দেশে দেশে তাদের বশংবদদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে। কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতায় পাশবিক উত্তেজনা ও যৌন লালসার পরিতৃপ্তিই হচ্ছে সাধারণ নারী-পুরুষের সম্পর্কের একমাত্র ভিত্তি। আর ঠিক এ কারণেই পশ্চিমা দেশসমূহে নারী একজন পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করে প্রেম ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত যেমন একত্রে বসবাস করা কল্পনাও করে না, তেমনি একজন পুরুষও একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে সুখ-দুঃখ তথা সমব্যথার সঙ্গিনী বানিয়ে জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তাও করে না। ফলে পশ্চিমা দেশসমূহে পারিবারিক প্রথা ও বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত প্রায়। বিয়ের বন্ধনে যারা আবদ্ধ হয়, স্বল্প দিনের মধ্যেই দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে তালাক তথা বিচ্ছেদের মাধ্যমে। ফলে পাশ্চাত্য দেশসমূহে জারজ সন্তানের জন্মহার বর্তমানে সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কারণ নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যে প্রেম-ভালোবাসাকে কেন্দ্র করে, এর পরিবর্তে তারা নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি রচিত করেছে যৌন-লালসা তথা পাশবিকতার ওপরে। এ কারণেই তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে লিভ-টুগেদার প্রথা তথা বিয়ে ব্যতীতই নারী-পুরুষের একত্রে বসবাস এবং যে কোনো মুহূর্তেই তারা প্রয়োজনে যৌনসঙ্গী পরিবর্তন করতে পারে।

ইসলামী সভ্যতায় নারী

অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের সম্পর্ক মাটির গভীরে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত শক্তিশালী বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে। অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ যেনো একটি বৃক্ষমূল থেকে উদ্ভূত দুটি শাখা বিশেষ। আর এ সম্পর্কের ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রেম-ভালোবাসা ও মায়া-মমতার ওপরে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের ওপরে। আর ঠিক এ কারণেই মানুষ হিসেবে ইসলাম নারী ও পুরুষে কোনো ব্যবধান করেনি, উভয়কেই সমমর্যাদার আসনে আসীন করেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً-

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রব-কে ভয় করো, যিনি তোমাদের একটি (মাত্র) ব্যক্তিসত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি (তার) থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন, (এরপর) তিনি তাদের (এই আদি জুড়ি) থেকে বহু সংখ্যক নর-নারী (দুনিয়ায় চারদিকে) ছড়িয়ে দিয়েছেন। (সূরা আন নিসা-১)

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا-

হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। (সূরা হুজুরাত- ১৩)

পবিত্র কোরআনের উক্ত আয়াত সম্মুখে রাখলে এ কথা কি বলার কোনো সুযোগ রয়েছে যে, ইসলাম নারীকে পুরুষের মুখাপেক্ষী করেছে? বরং বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন, মানুষ হিসেবে পুরুষকে যেমন নারীর মুখাপেক্ষী করা হয়েছে তেমনি নারীকেও পুরুষের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। একজন অপরজনকে ব্যতীত সম্পূর্ণ অচল। দুই চাকা বিশিষ্ট গাড়ী যেমন এক চাকার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না, তেমনি নারী ব্যতীত পুরুষ এবং পুরুষ ব্যতীত নারীও শান্তিপূর্ণভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করতে পারেনা। সৃষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ উভয়ই মানুষ এবং উভয়ই সৃষ্টি হয়েছে শুক্রবিন্দু থেকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-

اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالاُنْثٰى-

সে কি (এক সময়) এক ফোঁটা স্খলিত শুক্রবিন্দুর অংশ ছিলো না? তারপর (এক পর্যায়ে) তা হলো রক্তবিন্দু, অতপর আল্লাহ তা'য়ালা (তাকে দেহ সৃষ্টি করে) সুবিন্যস্ত করলেন, এরপর আল্লাহ সে অবস্থা থেকে নারী-পুরুষের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (সূরা আল কিয়ামাহ্-৩৭-৩৯)

اِنَّا خَلَقْنَا الاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا

بَصِيْرًا اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا–

আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি (নারী পুরুষের) মিশ্রিত শুক্র থেকে, যেনো আমি তাকে (তার ভালো মন্দের ব্যাপারে) পরীক্ষা করতে পারি, অতপর (এর উপযোগী করে তোলার জন্যে) তাকে আমি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন করে সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে (চলার) পথ দেখিয়েছি, সে চাইলে (আল্লাহর) কৃতজ্ঞ হবে, না হয় কাফির (অকৃতজ্ঞ) হয়ে যাবে। (সূরা আদ্ দাহ্র- ২-৩)

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা এই পৃথিবী সৃষ্টি করে এর মধ্যে মানুষের প্রয়োজনে যে সকল উপকরণ দান করেছেন, তা মানুষ হিসেবে শুধুমাত্র পুরুষকেই ভোগ করার অধিকার দেননি। বরং মানুষ হিসেবে নারী-পুরুষ উভয়কেই এ ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْ لَكُمْ مَّا فِى الاَرْضِ جَمِيْعًا–

তিনিই সেই মহান সত্তা, যিনি এ পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের ব্যবহারের জন্যে তৈরী করেছেন। (সূরা আল বাকারা-২৯)

وَلَقَدْ مَكَّنّٰكُمْ فِى الاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ–

আমিই তোমাদের এই যমীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, এ জন্যে আমি তাতে তোমাদের জন্য সব ধরনের জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। (সূরা আল আ'রাফ-১০)

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَه ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً–

তোমরা কি এ কথা কখনো চিন্তা করে দেখোনি, যা কিছু আকাশসমূহে রয়েছে, যা কিছু রয়েছে যমীনের মধ্যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা তা তোমাদের অধীন করে রেখেছেন এবং তোমাদের ওপর তিনি দৃশ্যমান- অদৃশ্যমান যাবতীয় নেয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছেন। (সূরা লুকমান- ২০)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الاَرْضِ جَامِيْعًا مِّنْهُ–

একইভাবে তাঁর (অনুগ্রহ) থেকে তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। (সূরা জাসিয়া-১৩)

মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং এ ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষে কোনো বৈষম্য করা হয়নি। পৃথিবীতে শুধুমাত্র পুরুষকেই মহান আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। বরং নারী- পুরুষ উভয়কেই প্রতিনিধি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اِنِّـىْ جَاعِلٌ فِى الاَرْضِ خَلِيْفَةً–

আমি পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি বানাতে চাই।' (সূরা বাকারা-৩০)

هُـوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِى الاَرْضِ–

তিনিই এ যমীনে তোমাদের (তাঁর) প্রতিনিধি বানিয়েছেন। (সূরা ফাতির- ৩৯)

لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِـىْ اٰدَمَ–

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের মর্যাদা দান করেছি।' (সূরা বনী ইসরাঈল- ৭০)

নবী করীম (সাঃ)ও একাধিকবার বলেছেন, 'সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসেবে নারী ও পুরুষে সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে একে অপরের প্রতি কোনেই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। সাদার ওপর কালোর, কালোর ওপর সাদার, আরবের ওপর অনারবের, অনারবের ওপর আরবের কোনোই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান এবং আদম মাটি থেকে সৃষ্টি। অহঙ্কারের সকল উপকরণ আমার পায়ের নীচে।'

সুতরাং সৃষ্টিগতভাবে মানুষ হিসেবে পুরুষের ওপর নারীর এবং নারীর ওপর পুরুষের সম্মান-মর্যাদার দিক থেকে কোনো ব্যবধান ইসলামে নেই। বরং সঙ্গত কারণেই পুরুষের তুলনায় নারীর সম্মান-মর্যাদার প্রতি ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে তার নিরাপত্তা বিধান করেছে। একজন পুরুষের জন্যে একাকী নির্জন পথে বা রাতে পথ চলার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করা হয়নি, কিন্তু একজন নারীর দৈহিক শক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাঁর ইজ্জত-আব্রু রক্ষার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মর্যাদার ভিত্তি

কোরআনের জ্ঞান বিবর্জিত কুসংস্কারে বিশ্বাসী বর্তমানে অধিকাংশ লোকদের ধারণা, উচ্চ শিক্ষিত, ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোকজনই প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার অধিকারী। যারা প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ অর্জন করতে পারেনি, তারা সম্মান ও মর্যাদার পাত্র নয় এবং এই ঘৃণিত ধারণার আবর্তেই বর্তমান পৃথিবীতে মানবতা

আবর্তিত হচ্ছে। উন্নত চরিত্র, উচ্চ পর্যায়ের নৈতিকমান, সততা, মহানুভবতা, ন্যায় পরায়ণতা, জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি, পান্ডিত্য এসবের কোনো মূল্য দেয়া হয় না। এসব দুর্লভ গুণ ও বৈশিষ্ট্য যে সব দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, মানব সমাজে এরা অপাংক্তেয়। এরা সমাজের কোনো একটি স্তরেও নেতৃত্বের আসন লাভের যোগ্য নন। জাতির পরিচালকদের কাছেও এরা গুণীজন হিসাবে বিবেচিত হন না। সামাজিক বা জাতীয় কোনো অনুষ্ঠানেও এরা দাওয়াত লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন না। কারণ তারা ধন-সম্পদ আর প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।

আর আপাদ-মস্তক যাদের নোংরামীতে নিমজ্জিত, কদর্যতা আর কলুষতাই যাদের চারিত্রিক ভূষণ, ন্যায়-অন্যায়বোধটুকু যারা বিসর্জন দিয়েছে, দুষ্কৃতি আর দুর্নীতির উচ্চমার্গে যাদের অবস্থান, অশ্লীলতা আর নোংরামীর যারা স্রষ্টা, পরস্বার্থ অপহরণে যারা পারদর্শী, ব্যক্তিস্বার্থের কাছে যারা জাতীয়স্বার্থ বলিদানে উন্মুখ, সততা, ন্যায় নীতি শব্দগুলো যারা পরিহার করে চলে, এসব লোকগুলোই সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। এরাই জাতীয় হিরো এবং গুণীজন হিসাবে বরিত হয়। কারণ এদের রয়েছে অবৈধ পথে উপার্জিত অঢেল অর্থ-সম্পদ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি। সমাজের ক্ষুদ্র একটি নেতৃত্বের আসন থেকে শুরু করে দেশের বৃহত্তর নেতৃত্বের আসনে এরাই সমাসীন। পরকালে অবিশ্বাসী এসব ভ্রষ্ট ও চরিত্রহারা লোকগুলো নেতৃত্বের আসনে আসীন রয়েছে বলেই সর্বত্র অশান্তি, বিপর্যয় এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছে।

প্রকৃত সম্মান-মর্যাদার লাভের মানদন্ড কি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে কোন্ নারী বা পুরুষ প্রকৃত সম্মান মর্যাদার অধিকারী তা মহান আল্লাহ তা'য়ালা নিরুপণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ–

আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহকে সর্বাধিক ভয় করে। (সূরা আল হুজুরাত- ১৩)

অর্থাৎ যে নারী বা পুরুষের নৈতিকমান তথা আল্লাহভীতি যতটা উচ্চে সে নারী বা পুরুষের সম্মান- মর্যাদার আসনও ততটাই উচ্চে। এ সম্মান-মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি, ধনী-গরীব, সুন্দর-কুৎসিত, সাদা-কালো, বংশ ইত্যাদির কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহান আল্লাহর সৃষ্টি হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই সমান, কেউ ছোট বা কেউ বড় অথবা কেউ উচ্চ বা নীচুও নয়। সৃষ্টিগতভাবেও কেউ উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়। দুনিয়ার সকল নারী-পুরুষই একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীতে এমন কোনো পুরুষ নেই যার

সৃষ্টি ও জন্মের ক্ষেত্রে কোনো নারীর প্রত্যক্ষ অবদান নেই। অপরদিকে দুনিয়ার এমন কোনো নারীও নেই, যার জন্মের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষের প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। ঠিক এ কারণেই নারী-পুরুষ কেউ কারো ওপরে কোনো ধরণের মৌলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে না এবং কেউ কাউকে জন্মগত কারণে নীচ, হীন, ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলেও তুচ্ছ- তাচ্ছিল্য করতে পারে না এবং এসব বিষয় ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা করেছে, 'মানব সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে যে নারী বা পুরুষ তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে এবং ঈমানের দাবী অনুসারে জীবন পরিচালিত করে, তারাই দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান-মর্যাদার অধিকারী।'

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ، وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا–

হে ঈমানদার ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সর্বদা সত্য কথা বলো, তাহলে তিনি তোমাদের জীবনের কর্মকান্ড শুধরে দিবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন, যে কোনো ব্যক্তিই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে করবে সে অবশ্যই এক মহাসাফল্য লাভ করবে। (সূরা আল আহ্যাব-৭০- ৭১)

পুরুষই হোক বা নারীই হোক, পবিত্র কোরআন- সুন্নাহর মানদন্ডে প্রকৃত ঈমানদার কে, এ সম্পর্কেও ইসলাম স্পষ্ট ঘোষণা করেছে–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا–

সত্যিকার ঈমানদার হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, অতপর (আল্লাহর বিধানে) সামান্যতম সন্দেহও পোষণ করেনা। (সূরা হুজুরাত- ১৫)

নারী ও পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক

আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি, পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারী-পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে ওঠে যৌনতাকে কেন্দ্র করে এবং এই পাশবিক প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে সম্পর্কের ভাঙ্গা-গড়া চলতে থাকে। যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার লক্ষ্যে তারা নানাবিধ উপায়- উপকরণ আবিষ্কার করেছে এবং ভোগের ক্ষেত্রে যেনো অনাকাংখিতভাবে সন্তানের আগমন না ঘটে, এ লক্ষ্যে তারা জন্ম নিরোধোক

সামগ্রীর উৎপাদন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিই করে চলেছে। অপরদিকে ইসলাম নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করে বলেছে–

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا–

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি তোমাদের একটি প্রাণ থেকেই সৃষ্টি করেছেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তার থেকে তিনি তার জুড়ি বানিয়েছেন, যেনো তার জুড়ির কাছ থেকে সে পরম শান্তি লাভ করতে পারে। (সূরা আল আ'রাফ- ১৮৯)

সৃষ্টিগতভাবে পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের জুড়ি বানানো হয়েছে এবং ইসলাম ঘোষণা করেছে, এই জুড়ি একে অপরের কাছ থেকে পরম প্রশান্তি লাভ করবে। একে অপরের প্রতি প্রবল আকর্ষণবোধ, প্রেম- ভালোবাসা ও গভীর মায়া-মমতা না থাকলে সেখানে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে প্রশান্তি লাভের প্রশ্নই আসে না। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর প্রশান্তি লাভের সঙ্গী হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন–

وَمِنْ ايٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً–

তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের সঙ্গী- সঙ্গিনীদের বানিয়েছেন, যাতে করে তোমরা তাদের কাছে সুখ শান্তি লাভ করতে পারো, উপরন্তু তিনি তোমাদের মাঝে ভালোবাসা ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (সূরা আর রূম- ২১)

অর্থাৎ নারীর প্রতি পুরুষ সঙ্গীর এবং পুরুষের প্রতি নারী সঙ্গীর হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা ও মায়া-মমতা তথা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটিই হলো নারী-পুরুষের স্থায়ী সম্পর্কের মূলভিত্তি। এই ভিত্তি অটুট ও দৃঢ় রাখার জন্যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পুরুষকে নারীর এবং নারীকে পুরুষের পোশাক হিসেবে উল্লেখ করেছেন–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ–

তোমাদের নারীরা যেমনি তোমাদের জন্যে পোশাক স্বরূপ, ঠিক তোমরাও তাদের জন্যে পোশাক সমতুল্য। (সূরা আল বাকারা-১৮৭)

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য জীবনের দর্শনই হচ্ছে প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা। পোশাক যেমন মানবদেহের সাথে মিশে থাকে, দেহকে আবৃত রাখে এবং রোদ, আলো-বাতাসের মধ্যে যা কিছু ক্ষতিকর বস্তু রয়েছে তা থেকে রক্ষা করে, ঠিক তেমনি একজন নারীও পুরুষের এবং পুরুষও নারীর প্রতি পোশাকের ভূমিকা পালন করে নানাবিধ ক্ষতিকর অবস্থা থেকে পরস্পরকে রক্ষা করে। অর্থাৎ নারী-পুরুষ দাম্পত্য জীবনে তাদের হৃদয় ও আত্মা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবে। একে অপরের সম্মান-মর্যাদা, স্বাস্থ্য, মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে, পরস্পরের গোপনীয়তা ও সম্পদ রক্ষা করবে এবং পরস্পরের চরিত্র ও সম্ভ্রমকে কলঙ্কের কালিমা থেকে হেফাজত করবে। এসবই হলো নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রাণবস্তু এবং এই প্রাণবস্তু যৌনতা নির্ভর সম্পর্কের মাধ্যমে কোনোক্রমেই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয় বিধায় পাশ্চাত্যে পরিবার প্রথা প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-ভালোবাসার সম্পর্ক নেই, সন্তানের সাথে পিতামাতার সম্পর্কের ইতি ঘটেছে, পারিবারিক জীবনের শান্তি ও স্বস্তির শেষ রেশটুকুও বিদায় গ্রহণ করেছে। এর স্বাভাবিক পরিণতিতে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ নাগরিকের মন-মানসিকতা হয়েছে বহিরমুখী। কর্মক্লান্ত দেহে বাড়িতে ফিরে পারিবারিক পরিবেশে শান্তির আশা নেই জেনে তারা মানসিক শান্তির অন্বেষায় ছুটে যায় ক্লাব, পার্ক, বার, লটারী-জুয়া, নৃত্য ও পানশালায়। সময়ের ব্যবধানে চিত্তবিনোদনের এসব মাধ্যমও তাদের কাছে মহাবিরক্তির উপকরণে পরিণত হয়। নিজের কাছে পৃথিবীকে তখন মনে হয় বন্দীশালা, অশান্তির অনলে পরিপূর্ণ এই বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভের আশায় তখন তারা বাধ্য হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেয়।

ইউরোপ এবং আমেরিকায় আত্মহত্যার বর্তমান পরিসংখ্যান দেখে সেখানের চিন্তাবিদগণ শিউরে উঠেছেন। প্রতিকারের পথ খুঁজতে গিয়ে তারা পুনরায় পূর্বের তুলনায় অধিক ভুল পথেই অগ্রসর হচ্ছেন, ফলে অশান্তির দাবানল পূর্বের তুলনায় বিস্তৃতিই লাভ করছে। সদ্য ঘটে যাওয়া মাত্র দুটো ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। আমেরিকার লসএঞ্জেলস্ এলাকায় সুজান নামক একজন মহিলা তার তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে সকালের নাস্তায় ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেয়। এরপর খাওয়া শেষে সন্তানদের জানায় তিনি তাদেরকে নিয়ে সমুদ্রতটে বেড়াতে যাবেন। গর্ভধারিণী মায়ের সাথে বেড়াতে যাবে, এই আনন্দে তিন সন্তান পছন্দের পোশাক পরে দ্রুত গাড়িতে গিয়ে বসে সিট বেল্ট বেঁধে নেয়।

এরপর মা সুজান ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালাতে থাকে। গাড়ির ঝাঁকুনি এবং ঘুমের ওষুধের প্রভাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিন সন্তান গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে

পড়ে। সমুদ্রের নির্জন বেলাভূমিতে গিয়ে মা সুজান গাড়ি থামিয়ে নিজে নেমে পড়ে। এরপর সোজা সমুদ্রের দিকে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে নিজে দ্রুত সেখান থেকে সরে নিরাপদ স্থানে গিয়ে দাঁড়ায়। সে দেখতে থাকে কিভাবে তার তিন সন্তানসহ গাড়ি সমুদ্রের তলদেশে ডুবে যায়। পরবর্তীতে গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেফতার হবার পরে সন্তানদের এভাবে নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে হত্যা করার কারণ হিসেবে সে জানায়, স্বামীর সাথে পারিবারিক অশান্তি এবং সন্তান থাকার কারণে নিত্য-নতুন বয়ফ্রেন্ডরা তাকে এড়িয়ে চলে, এ কারণেই সে সন্তানদের হত্যা করে ঝামেলা মুক্ত হয়েছে।

আমেরিকার নিউইয়র্ক শহর। স্বামী-স্ত্রী কর্মস্থলে যাবার পথে তাদের দুই বছর বয়সী একমাত্র পুত্র সন্তান সাইমনকে চাইল্ড হোমে রেখে যায়। সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে তাকে নিয়ে আসে। বাড়িতে ফিরে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে টেলিভিশনের সামনে বসে যৌনতা ও সন্ত্রাস নির্ভর ছবি দেখতে থাকে। ছোট্ট অবুঝ সন্তান সারা দিন পর পিতামাতাকে কাছে পেয়ে বার বার কোলে এসে বসার জন্য বিরক্ত করতে থাকে। এক পর্যায়ে পিতা ক্ষিপ্ত হয়ে দুই হাতে শিশু সন্তানকে ওপরে উঠিয়ে সজোরে মেঝেয় ছুড়ে মারে। পিতামাতার সম্মুখে শিশু সন্তান মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে এক সময় তার কচি দেহ নীরব নিথর হয়ে যায়। পিতামাত উভয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় সন্তানের দেহ নিজ হাতে টুকরা টুকরা করে কেটে নিজেদের প্রিয় কুকুর ড্যানীকে খাওয়ায়।

এরপর তারা নিজেরাই 'সন্তান হারিয়ে গেছে' উল্লেখ করে নিকটবর্তী পুলিশ স্টেশনে ডায়রী করে। অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে পুলিশের সন্দেহ হলে তারা কুকুরের পেট এক্স-রে করে শিশুর হাত-পা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে পেয়ে পিতামাতাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা সত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদী জীবন দর্শন এবং যৌনতা নির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতি এভাবেই মানুষের মধ্য থেকে মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহ নিঃশেষ করে দেয়। ফলে মানুষ বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে মানুষের মত থাকলেও মননশীলতার দিক তারা সম্পূর্ণ পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে যায়। নাস্তিক্যবাদ ও ভোগবাদী সভ্যতার কোলে লালিত- পালিত সেনাবাহিনী আফগানিস্থান, ইরাক, সোমালিয়া, লেবানন, ফিলিস্তীন ইত্যাদি মুসলিম দেশে আগ্রাসন চালিয়ে হাজার হাজার মুসলিম পুরুষদের একত্রিত করে মা, বোন, সন্তান ও স্ত্রীর সামনে তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মৃতদের আপনজনরা যখন করুণ স্বরে বুকফাটা আর্তনাদ করেছে, তখন এসব সেনাবাহিনী বুলড্রেজার দিয়ে মুসলমানদের মৃতদেহগুলো মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বিদ্রুপ করে বলেছে, 'তোমরা কেঁদো না, আগামী বছর এখানে আলুর ফলন খুব ভালো হবে।'

নারীর মর্যাদা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

পশ্চিমা দেশসমূহে, প্রাচীন গ্রীক, রোম, প্রাচ্যের ভারত, আরব ও অন্যান্য কোনো একটি দেশেও নারীকে নূন্যতম সম্মান- মর্যাদাও দেয়া হয়নি। আরবে একটি উটের যে সম্মান-মর্যাদা ও নিরাপত্তা ছিলো, একজন নারীর তা ছিলো না। গোত্রপতি ধনাঢ্য ব্যক্তির দ্বারা নারী গর্ভবতী হতো। তারপর সে ব্যক্তি কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বন্ধুদের দাওয়াত দিয়ে আহার পর্ব শেষে মদ্য পানে মেতে উঠতো। এরপর সম্মানিত মেহমানদের অধিক আনন্দ দেয়ার উদ্দেশ্যে গর্ভবতী নারীকে বন্ধুদের সম্মুখে এনে উলঙ্গ করে তার পেট তারবারী দিয়ে চিরে গর্ভের সন্তান বের করা হতো। মা এবং সন্তান মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মৃত্যুবরণ করতো। নির্মম নিষ্ঠুর লোমহর্ষক এই দৃশ্য দেখে উপস্থিত মেহমানরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়তো। পিতার মৃত্যুর পরে সৎমাকে কে ভোগ করবে, তা নিয়ে টানা হেঁচ্ড়া শুরু হতো।

বর্তমান প্রযুক্তিগত দিক থেকে উন্নত দেশসমূহ- যারা নারী অধিকারের নিত্য- নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করছে, তারা আরবের সেই যুগকে 'মূর্খতার অন্ধকার যুগ' হিসেবে ইতিহাসে উল্লেখ করেছে। কিন্তু মূর্খতার যুগের সেই লোমহর্ষক অমানবিক কর্মকান্ড নারী অধিকারের দাবীদাররা মুসলিম নারীদের সাথে আধুনিক পদ্ধতিতে করে যাচ্ছে। হার্জেগোভিনা- বসনিয়ায় বেয়নটের আঘাতে গর্ভবতী নারীদের পেট চিরে সন্তান বের করেছে, তারপর শিশুর পা ধরে পাথুরে দেয়ালে আছ্ড়ে হত্যা করেছে। অন্য দিকে শিশুর মাতাও এক সময় নির্মম যন্ত্রণায় মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়েছে। শিশু ও নারী অধিকারের ফেরিওয়ালা পশ্চিমা দেশসমূহ মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ লুটে নিয়ে সেখানে কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করে অগণিত নারী-শিশুকে প্রতি মুহূর্তে হত্যা করছে।

গ্রীক, রোম এবং ভারতেও নারীকে গরু-ছাগলের মতো বিক্রি করা হয়েছে। এখন পর্যন্তও ভারতে কন্যা শিশু অনাকাংখিত এবং পণ্য-দ্রব্যের মতো নারী বেচা-কেনা হয়। বিধবা নারীকে অভিশপ্ত জ্ঞান করে তাকে আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়া হয় অথবা ডাইনি হিসেবে চিহ্নিত করে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কন্যা শিশুকে ভারতে দেবদেবীর মন্দিরে পূর্বেও যেমন বলী দেয়া হতো এখনও দেয়া হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে মাদক সেবন করিয়ে জীবন্ত অবস্থায় যেমন স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় উঠিয়ে দেয়া হতো, বর্তমানেও এ প্রথা অনেক ক্ষেত্রে আইন করেও বন্ধ করা যায়নি। মন্দিরের সেবায়েতদের মনোরঞ্জনের জন্যে নারীকে পূর্বেও যেমন সেবাদাসী হিসেবে প্রেরণ করা হতো, বর্তমানেও ধর্মগুরুর আশ্রমে গুরুর পদসেবা করার জন্য নারীকে প্রেরণ করা হয়।

বর্তমানে পুজিবাদী দুনিয়ায় নারীর যৌবনকে যেমন ব্যবসার পণ্যে পরিণত করা হয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় নারীকে 'জনগণের সম্পদ' এ পরিণত করা হয়েছিলো। প্রাচীন আরবে নিজ কন্যা সমাজে নিষ্ঠুরভাবে লাঞ্ছিতা হবে, গোত্রপতি ও প্রভাবশালী ধনাঢ্য লোকদের ভোগের পাত্রী হবে, সকল দিক থেকে অধিকার বঞ্চিতা হবে, স্বামীর পরিবারে কোনো সম্মান- মর্যাদা পাবে না, পিতা হয়ে নিজ কন্যার প্রতি এ ধরণের নিষ্ঠুর আচরণ যেনো দেখতে না হয়, এ জন্যেই কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে তাকে জীবন্ত অবস্থায় পাহাড়ের গুহায় নিক্ষেপ অথবা গর্তে মাটি চাপা দেয়া হতো।

কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরে পিতার অবস্থা কেমন হতো তা পবিত্র কোরআন এভাবে তুলে ধরেছে–

وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُكُمْ بِالاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ، يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ، اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ، اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ–

যখন এদের কাউকে কন্যা জন্ম হওয়ার সুখবর দেয়া হয়, তখন দুঃখে ব্যথায় তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়, যে বিষয়ে তাকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছিলো তার মনের কষ্টের কারণে সে তার জাতির লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে চায়। ভাবতে থাকে; সে কি এ সদ্য প্রসূত কন্যা সন্তানকে অপমানের সাথে রাখবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে? ভালোভাবে শুনে রাখো, আসলে কন্যা সন্তান সম্পর্কে ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা অতি নিকৃষ্ট! (সূরা আন্ নাহ্ল-৫৮- ৫৯)

অর্থাৎ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখতে হলে লাঞ্ছনা আর অপমানের জীবনবরণ করেই রাখতে হবে নতুবা তাকে হত্যা করতে হবে। ঘৃণা, লাঞ্ছনা, অপমান আর জুলুমের মাত্রা কোন্ পর্যায়ে উপনীত হলে একজন পিতা তাঁর কলিজার টুকরা সন্তানকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারে, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। পশ্চিমা সভ্যতার অনুসারী ও পূজারীদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে অতীত ইতিহাস এবং ইসলামে নারী অধিকারের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখুন, ইসলাম নারীকে কিভাবে কন্যা হিসেবে, বধু হিসেবে এবং মাতা হিসেবে ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্ধকার গর্ত থেকে সসম্মানে বের করে উচ্চ মর্যাদা দান করেছে। ইসলাম নারী জীবনের সকল দিক ও বিভাগে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে। আমরা এখানে শুধু গুরুত্বপূর্ণ চারটি স্তরের কথা

আলোচনায় আনতে চাই। একঃ কন্যা হিসেবে নারী, দুইঃ বধু হিসেবে নারী, তিনঃ মাতা হিসেবে নারী ও চারঃ সমাজ সংস্থার সদস্য হিসেবে নারী।

কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

পবিত্র কোরআনের সূরা আন্ নাহ্লের ৫৯ নম্বর আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কন্যা সন্তানের জন্ম হওয়াকে 'সুখবর ও সুসংবাদ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে, ইসলাম নারীকে তাঁর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ অধিকার প্রদান করে কতটা উচ্চসম্মান- মর্যাদার আসনে আসীন করেছে।

মানব জাতির অর্ধেক ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো নারী। তাকে অবহেলা ও উপেক্ষা করে মানব সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বর্তমান সমাজ নারীকে কিরূপ মর্যাদা দিচ্ছে তা দেখে এ ধারনা করা বোকামী যে, ইসলাম বোধহয় নারীকে এমন মর্যাদাই দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস ও মুসলমানদের ইতিহাসে যেমন আকাশ- পাতাল ব্যবধান রয়েছে তেমনি ব্যবধান রয়েছে নারীকে মুসলমানদের দেয়া অধিকারে ও ইসলামের দেয়া অধিকারে।

ইসলামী রাষ্ট্র সমাজ এবং পারিবারিক ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা পুরুষের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। প্রাচীন আরবে কন্যা সন্তান হত্যার নির্মম নিষ্ঠুর প্রথা ইসলামই উৎখাত করেছে। সেখানে কন্যা সন্তানের হাত চুম্বন করা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হতো, কন্যা সন্তান ছিল অকল্যাণ ও অগৌরবের প্রতীক। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং এসব ব্যবস্থা উৎখাত করলেন। কন্যার হাত তিনি চুম্বন করতেন।

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُوْثِرْ وَلَدَه عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ-

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে লোকের কন্যা-সন্তান রয়েছে এবং সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি এবং তাকে ঘৃণার চোখেও দেখেনি, তার ওপর নিজের পুত্র সন্তানকে অগ্রাধিকারও দেয়নি, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, প্রথমে কন্যা সন্তান প্রসব করায় মায়ের সৌভাগ্য নিহিত আছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দু'টো কন্যা সন্তানকে বয়স প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করলো সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এ রকম থাকবো। (এ কথা বলে তিনি) তাঁর আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন।' (মুসলিম)

সম্পদে কন্যার অধিকার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে–

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ، فَاِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ–

আল্লাহ্ তা'য়ালা (তোমাদের উত্তারাধিকারে) সন্তানদের সম্পর্কে (এ মর্মে) তোমাদের জন্য বিধান জারি করছেন যে, এক ছেলের অংশ হবে দুই কন্যা সন্তানের মতো, কিন্তু (উত্তরাধিকারী) কন্যারা যদি দু'য়ের বেশী হয় তাহলে তাদের জন্যে (থাকবে) রেখে যাওয়া সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ, আর (সে) কন্যা সন্তান যদি একজন হয়, তাহলে তার (অংশ) হবে (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) অর্ধেক। (সূরা নিসা- ১১)

ইসলাম ছেলেদেরকে উপার্জনে যেমন বাধ্য করেছে কন্যাদেরকে তা করেনি। ইসলাম বলেছে, কন্যাকে লালন-পালন, তার যাবতীয় ব্যয়ভার বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে বহন করবে পিতা। পিতার অবর্তমানে করবে পরিবারের অভিভাবক। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে, তাদেরকে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রদর্শন করবে, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে আত্মনির্ভরশীলা করে দেবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর জান্নাত লাভ করবে। এক ব্যক্তি জানতে চাইলো কন্যার সংখ্যা বেশি কম হলেও কি সে ব্যক্তি জান্নাত পাবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, সেও জান্নাত পাবে।' (আল আদাবুল মুফরাদ)

কন্যা যদি বিধবা বা স্বামী কর্তৃক পরিত্যাক্তা হয়ে পিতা বা ভাইয়ের কাছে ফেরৎ আসে তাকে লালন পালন করতেও ইসলাম উৎসাহিত করে ঘোষণা করেছে, 'নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে উত্তম সাদকার কথা কেনো বলে দিবো না! তাহলো তোমাদের সে কন্যা যাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তোমরা ব্যতীত তাকে উপার্জন করে প্রতিপালন করার মতো দ্বিতীয় কেউ নেই।' (ইবনে মাজাহ্)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বর্তমানে যারা সভ্যতার দাবীদার, তারাও শুধু ছেলেই কামনা করেন- কন্যা নয়। শুধু তাই নয়, বার বার কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে বলে স্ত্রীর ওপরে চালায় অত্যাচার এবং তালাক দিতেও দেখা যায়। কিন্তু বিজ্ঞান তো বলছে পুত্র সন্তান হোক বা কন্যা সন্তানই হোক-জন্মদানের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা নেই। পুরুষের নিকট হতেই নারীর গর্ভে কন্যা বা পুত্র সন্তানের ভ্রূণ প্রবেশ করে।

কন্যা সন্তানের অধিকারী কে হবে আর কে পুত্র সন্তানের অধিকারী হবে এ ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর কুদরতী হাতে। মুসলিম পরিবারে কন্যা অথবা পুত্র সন্তান যা-ই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো, মুসলিম পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মুসলিম পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্ম মোটেও অমর্যাদাকর নয় বরং কন্যা সৌভাগ্যের প্রতীক। মুসলিম মাতাপিতা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে আনন্দ প্রকাশ করবে আর কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে মুখ কালো করবে এমনটি কল্পনাও করা যায় না। মুসলিম মাতাপিতার কাছে পুত্র কন্যা সমান। এদের মধ্যে কোন ব্যবধান তারা করেননা। কারণ এ ধরনের ব্যবধান করা বা পুত্র সন্তানকে কন্যা সন্তানের উপর অগ্রাধিকার দেয়া ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। পুত্র হোক বা কন্যা হোক, এক সন্তানের উপরে আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া বড় ধরনের গোনাহ। অবশ্য শরিয়ত সম্মত কারণে প্রাধান্য দেয়া যেতে পারে।

তথাকথিত কিছু মুসলিম পরিবার রয়েছে, যে পরিবারে কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে পরিবারে যেন শোকের ছায়া নেমে আসে। সন্তান সুন্দর বা কুৎসিত, কন্যা বা পুত্র হবে এটা সম্পূর্ণ মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। মাতাপিতার অন্তরে সন্তানের ব্যাপারে কামনা বাসনা যা-ই থাক, সেই কামনা বাসনা অনুযায়ী আল্লাহর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয় না। কাকে কন্যা দান করলে তার কল্যাণ হবে। অথবা অকল্যাণ হবে, আর কাকে পুত্র দান করলে কল্যাণ অথবা অকল্যাণ হবে এটা মহান আল্লাহই ভালো জানেন। মুসলিম মাতাপিতা অবশ্যই আল্লাহর কাছে পুত্র বা কন্যা কামনা করে দোয়া করতে পারেন। কিন্তু দোয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এটা ঠিক নয়। বান্দার জন্যে যেটা কল্যাণের আল্লাহ তাই করেন। মহান আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই তিনি করেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ
الذُّكُوْرَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا–

তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র দেন। যাকে ইচ্ছা পুত্র-কন্যা মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছে বন্ধ্যা বানিয়ে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিশালী। (সূরা শূরা-৪৯-৫০)

উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সন্তান-সন্ততি দানের কথা বলতে গিয়ে কন্যা সন্তানের প্রসঙ্গ আগে বলেছেন। সূরা আন্ নাহ্লে কন্যা সন্তানের জন্মের বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা 'সুখবর এবং সুসংবাদ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এসব দিক সম্মুখে রাখলে স্পষ্টতই অনুধাবন করা যায়, ইসলাম নারীকে কত বেশী অগ্রাধিকার দিয়ে মর্যাদাবান করেছে এবং এ কারণেই ইসলামের দৃষ্টিতে কন্যা সন্তানকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কে সন্তানের মাতাপিতা হবে আর কে হবে না, কে পুত্র সন্তান লাভ করবে আর কে কন্যা সন্তান লাভ করবে, এ ব্যাপারে মানুষের কোনো ক্ষমতা নেই এবং এ ক্ষেত্রে মানুষ একেবারেই অসহায়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও (Medical Science) ক্ষমতা নেই। মানুষের ভাণ্ডারে এমন জ্ঞান নেই, যে জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি প্রয়োগ করে সে জানতে পারবে, 'পুত্র সন্তান তার জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা 'কন্যা সন্তান তার জন্যে ক্ষতিকর হবে।' এ জ্ঞান মানুষের নেই। আল্লাহর ফায়সালা থাকলে, পুত্র হোক বা কন্যা হোক যে কোনো সন্তানই কল্যাণকর হতে পারে অথবা অকল্যাণকরও হতে পারে। পুত্র বা কন্যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে পুরস্কার দেয়া হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাজ হলো সে দানের মূল্য দেবে এবং দানকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আল্লাহর দানের মূল্য না দেয়া এবং অকৃতজ্ঞ হওয়া কখনই মানুষের পক্ষে শোভা পায় না। আল্লাহই ভালো জানেন, কাকে কোন্ নিয়ামত দিতে হবে এবং তিনিই নিজের জ্ঞান ও কুদরতের অধীন বিজ্ঞতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাকেই নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করা মানুষের কর্তব্য।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এর নিকট এক ব্যক্তি বসেছিল। লোকটির কয়েকটি মেয়ে সন্তান ছিল। সে বললো, হায়! এসব মেয়ে যদি মরে যেতো তাহলে কতই না ভালো হতো! হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এ কথা শুনে ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে তাকে বললেন, 'তুমি কি তাদের রিযিক দাও।' কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করা অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহর রাসূল স্বয়ং ছিলেন কন্যা সন্তানের পিতা। কন্যা সন্তান সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'যখন কারো গৃহে কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তখন আল্লাহ সেখানে ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তারা এসে বলেন, হে গৃহের বাসিন্দারা। তোমাদের ওপর সালাম। ফেরেশতারা ভূমিষ্ঠ কন্যাকে নিজের পাখার ছায়াতলে নিয়ে নেন এবং তার মাথার ওপর নিজের হাত রেখে বলতে থাকেন, এটি একটি দুর্বল দেহ। যা একটি দুর্বল জীবন থেকে জন্ম নিয়েছে। যে ব্যক্তি এ দুর্বল জীবনের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেবে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য তার সাথে থাকবে।' (আল মু'জামুস সাগীর লিত তাবারাণী)

পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে সে গৃহে রহমতের ফিরিশ্‌তা প্রবেশ করে সালাম জানায়, এমন কোনো কথা কোরআন- হাদীসে পাওয়া না গেলেও কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এ সুসংবাদ হাদীসে মওজুদ রয়েছে। এ কথা কন্যা সন্তানের উচ্চমর্যাদার কারণেই বলা হয়েছে। সকল সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নবীকুল শিরোমণি নবী সম্রাট বিশ্বনবী (সাঃ) এর চারটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত খাদিজা (রাঃ) এর গর্ভে। তাঁর কন্যা সন্তানগণ জীবিত থাকলেও একে একে তাঁর সবগুলো পুত্র সন্তান মৃত্যুবরণ করলেও তিনি কখনো পুত্র সন্তান লাভের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন বলে কোনো প্রমাণ হাদীসে নেই। নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং কন্যা সন্তানের পিতা ছিলেন এবং তিনি বলেছেন–

لاَ تَكْرِهُو الْبَنَاتِ فَانِّىْ اَبُو الْبَنَاتِ–

কন্যাদেরকে ঘৃণা করো না, আমি স্বয়ং কন্যাদের পিতা।

নবী করীম (সাঃ) তাঁর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সাথে যে আন্তরিকাতপূর্ণ ব্যবহার করেছেন তা ভাষার তুলিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি দূরে কোথাও সফরে যাবার পূর্বে সবশেষে কলিজার টুকরা হযরত ফাতিমা (রাঃ) এর সাথে দেখা করে যাত্রা করতেন। ফিরে এসে তিনি প্রিয় কন্যার সাথে সর্বপ্রথম দেখা করে তারপর অন্যান্য সকলের সাথে দেখা করতেন। কন্যার চেহারা একটু মলিন দেখলেই তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কন্যা ফাতিমাকে কষ্ট দিলো সে যেনো আমাকেই কষ্ট দিলো।'

মদীনায় হিজরত করার পরে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হতে বেশ সময় লেগেছিলো। প্রাথমিক দিকে অভাব এতটাই তীব্র ছিলো যে, নবী করীম (সাঃ) এবং অন্যান্য মুহাজিরদের দিনের পর দিন অনাহার অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে। এ সময় একদিন নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে কিছু গোস্ত এবং রুটি আনা হলো। তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে কিছু গোস্ত দুটো রুটি দিয়ে মুড়িয়ে একজন সাহাবীর হাতে দিয়ে বললেন, 'দ্রুত যাও, আমার ফাতিমা দুই দিন যাবৎ কিছুই খেতে পায়নি। তাঁর কাছে এগুলো পৌঁছে দাও।'

প্রাথমিক দিকে মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের জন্যে আবাসনের বেশ সমস্যা ছিলো। নবী করীম (সাঃ) এর কাছ থেকে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বেশ দূরে অবস্থান করছিলেন। পরস্পরে ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ হতো না, কন্যাকে বার বার দেখার জন্য পিতা রাসূল (সাঃ)-এর মন ব্যাকুল হয়ে থাকতো। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর এ অবস্থা অনুভব করতে পেরে তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আপনার কন্যাকে

আপনার কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করতে পারি।'

হাদীস ও ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব শোনার সাথে সাথে নবী করীম (সাঃ) পবিত্র চেহারা মোবারকে চাঁদের স্নিগ্ধ হাসি দেখা গেলো। তিনি কন্যা সন্তানদেরকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং বলেছেন, কন্যারা অত্যন্ত মুহাব্বাতওয়ালী এবং কল্যাণ ও খায়ের বরকতের হয়। (কানযুল উম্মাল)

নবী করীম (সাঃ) কন্যা সন্তানের পিতৃত্বকে সৌভাগ্য বলে গণ্য করে বলেছেন, 'কন্যা সন্তানদের ঘৃণা করো না, তারাই তোমাদের চক্ষু শীতলকারী, আনন্দদায়িনী এবং একান্ত আপনজন।' (আহ্মাদ, তাবারাণী)

নবী করীম ([illegible]) [illegible]ছেন, 'পুত্র ও কন্যা সন্তানের প্রতি একই আচরণ করতে হবে। উভয়ের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।' হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, নবী করীম (সাঃ) এর একজন সাহাবী তাঁর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। উক্ত সাহাবীর শিশু পুত্র সন্তান সেখানে এলে তিনি সন্তানের মুখে চুমে দিয়ে নিজের কোলে বসালেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁর শিশু কন্যা সেখানে এলে তিনি তাকে (মুখে চুমো না দিয়ে) নিজের সামনে বসালেন। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (সাঃ) উক্ত সাহাবীকে বললেন, 'তোমার কি উচিত ছিলো না, দুই জনের সাথেই সমআচরণ করা?'

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একজন গরীব মহিলা তার দু'টি কন্যাসহ আমার নিকট এলো। আমি তাকে তিনটি খেজুর দিলাম। সে দুটি খেজুর তার দু' মেয়েকে দিলো এবং অপরটি নিজে খাওয়ার জন্যে মুখের দিকে তুললো। কিন্তু সে খেজুরটিও মেয়ে দু'টি খেতে চাইলো। মহিলা সে খেজুরটিও দু'ভাগ করে দু' কন্যাকে দিলো। মহিলার এ কাজটি আমাকে বেশ অবাক করলো। আমি তার এ কাজের কথা আল্লাহর রাসূলের নিকট বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'আল্লাহ এ দু' কন্যা প্রতিপালনের বদৌলতে তার জন্যে জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন এবং তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে নাজাত দিয়েছেন।' (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

কন্যা সন্তানের পিতামাতার হাতেই তাদের জান্নাত। তারা যদি যথাযথভাবে কন্যা সন্তানের হক আদায় করেন, তাহলে জান্নাত লাভ করা সহজ হবে। আর হক আদায় না করলে নিজেরাই দুর্ভাগ্য ডেকে আনবেন। কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক।

বধু হিসেবে নারীর মর্যাদা

তদানীন্তন আরবে ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে কন্যা সন্তানদের প্রতি কেমন আচরণ করা হতো তা আমাদের ইতোপূর্বের আলোচনা থেকে সম্যক ধারণা

পাওয়া গেছে। শুধু কন্যা সন্তানই নয়, বধূ এবং মা তথা সকল স্তরের নারীই তদানীন্তন সমাজে চরম নির্যাতনের শিকার ছিলো। সে সমাজে বধূরও সম্মান-মর্যাদা বা কোনো প্রকার অধিকার স্বীকৃত ছিলো। বধু হিসেবে একজন নারীকে চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হতো এবং তার সাথে নিতান্তই দাসী- বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা হতো। মানুষ হিসেবে স্বামী জীবন ধারণের জন্যে যেসব উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো, স্ত্রীর জন্যেও তা প্রয়োজন- এ কথা স্বামী চিন্তাও করতো না।

নিজে উদর পূর্ণ করে আহার করতো, কিন্তু স্ত্রী আহার করেছে কিনা- সে কথা জানার বিষয়টিকে তারা অপমানজনক মনে করতো। তদুপরি সামান্য কোনো বিষয় স্বামীর মনঃপূত না হলেই স্ত্রীর ওপর চলতো অমানবিক নিষ্ঠুর নির্যাতন। মানুষ হিসেবে একজন বধূর ইচ্ছা- অনিচ্ছা থাকতে পারে, পছন্দ- অপছন্দ থাকতে পারে, স্বাধীন মতামত থাকতে পারে, শারীরিকভাবে অসুস্থ হতে পারে, অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা প্রয়োজন, এসব বিষয় ছিলো তদানীন্তন স্বামীদের কল্পনারও অতীত। গৃহপালিত উট-ছাগলের যে মর্যাদা তাদের কাছে ছিলো, নিজ স্ত্রীর সে মর্যাদাও তারা অনুভব করতো না।

সামান্য অজুহাতে বধূর প্রতি অকথ্য নির্যাতন, অনাহারে রেখে, আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে, উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রেখে শাস্তি দেয়া ছিলো নিতান্তই মামুলী ব্যাপার। ক্ষেত্র বিশেষে ক্রোধোন্মত্ত স্বামী তার স্ত্রীকে হত্যাও করতো। কারণ স্ত্রী হত্যার জন্যে বিচারের দন্ড ভোগ করতে হতো না। বধূর শারীরিক শক্তির প্রতি তোয়াক্কা না করেই তার প্রতি কষ্টসাধ্য কাজ এবং দূরহ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হতো।

স্ত্রীকে তার স্বামী সমাজপতি ও গোত্রপতি বা বন্ধুদের মনোরঞ্জন করার লক্ষ্যে প্রেরণ করতো। স্ত্রী এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করলেই তার ওপরে নেমে আসতো অত্যাচারের নির্মম খড়গ। বর্তমান সমাজেও এক শ্রেণীর অর্থলোলুপ স্বামী অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবার জন্যে বা চাকরী ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্যে তার সুন্দরী স্ত্রীকে ওপরওয়ালার কাছে ভোগের সামগ্রী হিসেবে প্রেরণ করে। স্ত্রী এতে রাজি না হলে তার দেহে সিগারেটের আগুনে ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে, এ সংবাদ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে পত্রিকার পাঠক মহল জেনেছেন।

ঠুনকো বিষয়ে স্ত্রীকে তালাক দেয়া ছিলো তদানীন্তন সমাজে শিশুর খেলনা পরিবর্তনের মতো। তালাক দেয়ার পরও সে স্ত্রী অন্য কোথাও বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো না। পূর্ব স্বামী এমন ধরণের নিয়ম- কানুনে তাকে আবদ্ধ রাখতো যে, সে নারীর পক্ষে অন্য কোনো পুরুষকে স্বামী হিসেবে বরণ করার স্বাধীনতা পেতো না। কখনো স্ত্রীকে তালাকও দিতে না আবার স্ত্রীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন-যাপনও

করতো না। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শূন্য হাতে বিদায় করা হতো। একদিকে মায়ের জন্য শিশু আর্তনাদ করতো, অপরদিকে মা কলিজার টুকরা সন্তানের জন্য করতো করুণ হাহাকার। তদানীন্তন সমাজে নারীর কি করুণ অবস্থা ছিলো, তা হযরত উমার (রাঃ) এর কথা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'মহান আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, জাহিলিয়াতের যুগে আমাদের কাছে নারীদের কোনো মূল্যায়ন ছিলো না, নারীরা ছিলো আমাদের নিকট তুচ্ছ- তাচ্ছিল্যের ব্যাপার মাত্র। পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নারীর অধিকার ও সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে স্পষ্ট এবং অপরিবর্তনীয় বিধান অবতীর্ণ করলেন এবং তাদের জন্যে সম্পদের অংশ নির্ধারণ করে দিলেন, তখন নারীর প্রতি আমাদের আচরণ, মনোভাব এবং ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন ঘটলো।' (মুসলিম, কিতাবুত তালাক)

এ পৃথিবীতে কেবলমাত্র ইসলামই নারীকে তাঁর প্রকৃতি অনুযায়ী সঠিক প্রাপ্য ও মর্যাদা দান করেছে। স্বামীদের প্রতি লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন–

وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ–

নিজ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করো। (সূরা আন্ নিসা-১৯)

স্ত্রী-ই শুধু মাত্র স্বামীর সেবাযত্ন করবে আর স্বামী তার স্ত্রীর সেবাযত্ন করবে না, এই ইনসাফহীনতা পরিহার করে চলার জন্যে স্বামীর প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে–

وَ لَاتَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ–

কখনো একে অপরের প্রতি মমতা ও সহৃদয়তা দেখাতে ভুলো না; কারণ তোমরা কে কি কাজ করো, তার সবকিছুই আল্লাহ তা'য়ালা পর্যবেক্ষণ করছেন। (সূরা বাকারা-২৩৭)

বধূ তার জীবনে স্বামীর কাছ থেকে এমন অনেক ধরনের জুলুমমূলক আচরণের সম্মুখিন হয়, যার সাক্ষী হিসেবে দ্বিতীয় কোনো মানুষ থাকে না। লোকজনের সম্মুখে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি এমন আচরণ করছে, যা দেখে অন্যেরা মনে করে, স্বামী লোকটি অত্যন্ত স্ত্রী ভক্ত। কিন্তু তার এ আচরণ যে একান্তই লোক দেখানো কৃত্রিম, তা বধূর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে না। এসব অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য কারো কাছে বধূ বিচার প্রার্থীও হতে পারে না। মানসিক যন্ত্রণায় সে নিঃশেষ হতে থাকে। নারী অধিকারের এই সুক্ষ্ম বিষয়ের প্রতিও ইসলাম দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, 'লোকচক্ষুর অন্তরালে বধুর প্রতি যদি ইনসাফ না করো, তার প্রতি

প্রদর্শনীমূলক আচরণ করো এবং তাকে মানসিক যন্ত্রণা দাও, সে বিষয়টির জন্যে আদালতে আখিরাতে তোমাকে গ্রেফতার করা হবে। কারণ আল্লাহ্ তা'য়ালা তোমার আচরণ পর্যবেক্ষণ করছেন।' সূরা বাকারার উপরোক্ত আয়াতের শেষে এ কথাগুলোই বলে স্বামীকে সাবধান করা হয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে অধিকার রয়েছে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীরও সমপর্যায়ের অধিকার রয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে–

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ–

পুরুষদের ওপর নারীদের যেমন ন্যায়ানুগ অধিকার রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীদের ওপর পুরুষের অধিকার। (সূরা বাকারা-২২৮)

আরামের শয্যায় শায়িত থেকে স্বামী যদি স্ত্রীকে পানি দেয়ার নির্দেশ দিতে পারে, তাহলে স্ত্রীও তার স্বামীকে অনুরূপ নির্দেশ দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে। শিশু সন্তানের জ্বালাতন কেবলমাত্র স্ত্রী-ই রাত জেগে সহ্য করবে আর স্বামী প্রবর নাক ডেকে ঘুমাবে, সন্তান কি শুধু স্ত্রীর? বধূ তো শিশু সন্তান বিয়ের সময় পিতার বাড়ী থেকে সাথে নিয়ে আসেনি। দাম্পত্য জীবনে উভয়ের অধিকার সমান। নারী অধিকারের ব্যাপারে পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে–

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ–

তারা হচ্ছে তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা হচ্ছো তাদের জন্যে পোশাক। (সূরা বাকারা-১৮৭)

নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীর তোমার প্রতি অধিকার রয়েছে।' (বোখারী)

স্বামীর পকেটে অর্থ রয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী সে মূল্যবান পোশাক ব্যবহার করবে, নামী-দামী হোটেলে গিয়ে উদরপূর্তি করবে, অন্য দিকে পারিবারিক পরিমন্ডলে বধূ ছিন্ন বস্ত্রে দিন অতিবাহিত করবে, প্রসাধনী পাবে না, কুচো চিংড়ী, ডাল আর আলু, কচু ভর্তা ছাড়া তার ভাগ্যে কিছুই জুটবে না, এই ইনসাফহীনতার প্রতিবাদ করে নবী করীম (সাঃ) বধুর অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য ঘোষণা করেছেন, 'তাকেও খাবার দিবে যখন যেমন তুমি নিজেও খাবে। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করে দিবে, যেমন মানের পোশাক তুমি নিজে গ্রহণ করবে।' (আবু দাউদ)

অপরদিকে বধুকে সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করে দেখতে স্বামীর যেমন মন চায়, স্ত্রীরও অনুরূপ মন চায় স্বামীকে সুন্দর পোশাকে দেখতে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন,

'আমি স্ত্রীর জন্যে সাজ-সজ্জা করা খুবই পছন্দ করি, যেমন পছন্দ করি স্ত্রী আমার জন্যে সাজসজ্জা করুক।' (ইবনে জারীর, ইবনে হাতেম)

বধূর সাথে যদি বনিবনা না হয়, তাহলে সুন্দর পদ্ধতি অবলম্বনে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে যেতে হবে। বনিবনা হচ্ছে না, এই ছুতোয় তার ওপরে কোনো ধরণের নির্যাতন করা যাবে না, তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না, তার প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়ে পৃথক হতে হবে। ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে–

فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ–

হয় ন্যায়-সঙ্গত পন্থায় তাকে ফিরিয়ে নিবে অথবা সৌজন্যের সাথে তাকে বিদায় দিবে। (সূরা বাকারা- ২২৯)

فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ–

হয় উত্তমভাবে তাদেরকে নিজের কাছে রাখবে অন্যথায় ন্যায়নীতির সাথে তাদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। (সূরা তালাক- ২)

فَاَمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ، وَّ لاَتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا–

তোমরা হয় তাদেরকে উত্তম পন্থায় ফিরিয়ে নাও অন্যথায় উত্তম পন্থায় বিদায় দাও। শুধু কষ্ট দেয়ার জন্য তাদের আটকে রেখো না। কেননা এতে তাদের অধিকার খর্ব করা হয়। যে ব্যক্তি এমন কাজ করবে সে নিজের ওপরই অত্যাচার করবে। (সূরা বাকারা- ২৩১)

মেয়ের বাবার বাড়ি থেকে নানা উপলক্ষ্যে ফল-ফলাদি, খাসি বা গোস্ত-রুটি পাঠাতে হবে, সন্তান প্রসবকালে বধুকে তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে হবে অথবা এ সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ বধুর পিতা বা অভিভাবককে বহন করতে হবে- বাধ্যতামূলক এসব রীতি-রেওয়াজ ইসলাম সমর্থন করে না। বাড়িতে কাজের লোক নেই, এই ছুতো দেখিয়ে ছেলে বিয়ে দিয়ে বধুকে বাড়ির দাসী বানানোর অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। সামর্থ অনুযায়ী স্বামীর পক্ষ থেকে বধুর জন্য 'পৃথক একটি ঘর, দুই জন কাজের লোক, একজন ঘরের কাজ করবে অপরজন বাইরের কাজ করবে, এ ব্যবস্থা বধুর জন্যে করে দিতে হবে। বধুর অনুমতি ব্যতীত তার ঘরে প্রবেশ করার অধিকার কারো নেই। প্রয়োজন হলে বধু তার স্বামীকে এসব বিষয়ে পরামর্শ দিবে। নবী করীম (সাঃ) তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে পরমর্শ গ্রহণ করে নারী হিসেবে বধূর প্রতি যথাযথ সম্মান-মর্যাদা প্রদর্শন করেছেন।

মাতা হিসেবে নারীর মর্যাদা

ইউরোপ- আমেরিকা তথা পাশ্চাত্য দেশসমূহে সন্তান তার পিতামাতার প্রতি কোনো দায়িত্ব অনুভব করে না। ১৮ বছরপূর্ণ হলে বা তার পূর্বেই সন্তান- সন্ততি বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে পৃথকভাবে বসবাস করতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা আশ্রয় গ্রহণ করে ওল্ডহোম তথা বৃদ্ধাশ্রমে। পিতামাতার জন্মদিনে বছরে একবার মন চাইলে সন্তান তাদেরকে দেখতে যায় অথবা কার্ড পাঠায়। হতাশার সাগরে নিমজ্জিত পিতামাতার পক্ষে সন্তানের পাঠানো কার্ডটির প্রতি অশ্রুসজল নয়নে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তাদের আর কোনোই উপায় থাকে না।

পক্ষান্তরে যে কোন বিচার বিশ্লেষণে, মানদন্ডে অথবা যুক্তিতে একজন মানুষের কাছে সবথেকে সম্মান- মর্যাদার ব্যক্তিত্ব হলেন তার জন্মদাতা পিতামাতা। মহান আল্লাহ্র পরেই মাতাপিতার স্থান। সন্তানের পক্ষে পিতামাতার ত্যাগ তীতিক্ষার বিনিময় দেয়া কখনো সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا–

এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাকে ব্যতীত অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতাপিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে যদি কোন একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সম্মুখে বার্ধক্যে পৌছে যায় তাহলে তাঁদেরকে 'উহ' শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভৎর্সনা করে কোন কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সঙ্গে আদব ও সম্মানের সঙ্গে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে নমনীয় হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো, হে রব! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো। যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও আপত্য স্নেহ দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩,২৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সুন্দর আচরণের

সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। পুনরায় উক্ত ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার পিতা। (বোখারী)

পৃথিবীতে এমন কোন আমল নেই, যে আমল করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি অত্যন্ত দ্রুত অর্জন করা যায়। কিন্তু মা! একমাত্র মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার এবং প্রাণভরে তার খেদমত করলে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি দ্রুত অর্জন করা যায়।

হযরত আবি উমামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতাপিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি বললেন, মাতাপিতা তোমাদের জান্নাত এবং জাহান্নাম। (মিশকাত)

হযরত জাহিমার (রাঃ) পুত্র হযরত মাবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (রাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সঙ্গে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এ জন্য আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন? জাহিমা (রাঃ) বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর, তিনি জীবিত আছেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর সেবাযত্ন করতে থাকো। কেননা তাঁর পায়ের তলাইতেই তোমার জান্নাত। (নাসাঈ)

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক! লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতাপিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোন একজনকে কিন্তু (তাদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।'

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ নেক আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বললেন, যে নামায সময় মত পড়া হয়। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এরপর কোন কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? তিনি বললেন, মাতা-পিতার সঙ্গে সুন্দর আচরণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরপর? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (বোখারী)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর খিদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলেন, আমি আপনার

নিকট হিজরত ও জিহাদের বাইয়াত করছি এবং আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান চাচ্ছি। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতাপিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তুমি কি বাস্তবিকই আল্লাহর নিকট নিজের হিজরত ও জিহাদের প্রতিদান চাও? সে বললো, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর নিকট প্রতিদান চাই। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তাহলে মাতাপিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণ করো। (মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করছেন, এক ব্যক্তি মাতাপিতাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে নবী করীম (সাঃ) এর কাছে হিজরতের বাইয়াত করার জন্য উপস্থিত হলো। এ সময় তিনি বললেন, যাও, মাতাপিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁদেরকে ঠিক সেভাবেই খুশী করে এসো যেভাবে কাঁদিয়ে এসেছো। (আবু দাউদ)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর নাযিলকৃত আদেশ এবং হিদায়াত মানা অবস্থায় সকাল করলো, সে যেন নিজের জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা খোলা অবস্থায় সকাল করলো। যদি মাতাপিতার মধ্যে কোনো একজন হয় তাহলে যেন জান্নাতের একটি দরজা খোলা অবস্থায় পেল। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতা সম্পর্কিত আল্লাহর আদেশ ও হিদায়াত অমান্য করলো, তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা পেল। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি মাতাপিতা তার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তাহলেও? তিনি বললেন, যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তাহলেও! এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন (মিশকাত)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, যে সুসন্তানই মাতাপিতার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে একবার তাকাবে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাকে একটি কবুল নফল হজ্জের সওয়াব দান করেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! যদি কেউ একদিনে শতবার রহমত ও ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখে! তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ যদি কেউ শতবার দেখে তবুও। আল্লাহ (তোমাদের ধারণায়) অনেক বড় এবং সম্পূর্ণ পবিত্র। (মুসলিম)

হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের হায়াত দারাজ এবং প্রশস্ত রুজী কামনা করে তাহলে সে যেন নিজের মাতাপিতার সাথে ভালো আচরণ এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।

হযরত মুয়াজ বিন আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করলো তার জন্য সুসংবাদ হলো, আল্লাহ তা'য়ারা তার হায়াত দারাজ করবেন।

পিতামাতা তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সম্পদ সন্তানের জন্যে ব্যয় করেছেন। এখন সন্তান

বড় হয়ে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করেছে, সে সম্পদ প্রয়োজনে অবশ্যই মাতাপিতার জন্যে ব্যয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ، قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتمى وَالْمَسكِيْنَ وَابْنِ السَّبِيْلِ–

হে রাসূল, লোকেরা আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে তারা কোথায় ধনমাল ব্যয় করবে। আপনি বলে দিন, তোমরা যা কিছু খরচ করবে, তা করবে পিতামাতার জন্যে নিকটাত্মীয়দের জন্যে, ইয়াতীম, মিসকীন ও সম্বলহীন পথিকদের জন্যে। (সুরা বাকারা- ২১৫)

সন্তানের অর্থ সম্পদে পিতামাতার অধিকার সম্পর্কে মহানবী (সাঃ) বলেছেন। সন্তান পিতার অতি উত্তম উপার্জন বিশেষ, অতএব তোমরা (পিতামাতা) সন্তানদের ধনসম্পদ থেকে পূর্ণ স্বাদ গ্রহণ সহকারে পানাহার করো।

পিতা ও মাতা এ উভয়ের মাধ্যমেই মহান আল্লাহ পৃথিবীতে সন্তান প্রেরণ করেন। পিতা ব্যতীত যেমন সন্তানের কল্পনা করা যায় না তেমনি মাতা ব্যতীতও সন্তানের আশা করা যায় না। তবুও ইসলাম মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। কারণ সন্তানের জন্যে সবথেকে বেশী কষ্ট স্বীকার করে মা। সন্তান পেটে ধারণ করা, বয়ে বেড়ানো, যন্ত্রণা সহ্য, প্রসব করা, সন্তান লালন- পালন করা যে কি কষ্টের ব্যাপার সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ কারণেই মায়ের কষ্টের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে ইসলাম পিতার তুলনায় মায়ের অধিকার বেশী প্রদান করেছে। মায়ের কষ্ট সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

حَمَلَتْهُ اُمُّه كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا، وَحَمْلُه وَفِصلُه ثَلثُوْنَ شَهْرًا–

তার মা কষ্ট করে করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করেই ভূমিষ্ঠ করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর (কঠিন কাজ) এর মেয়াদ হলো আড়াই বছর। (সূরা আল আহকাফ-১৫)

একবার এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে এসে অভিযোগ করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। তিনি বললেন, নয় মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সে ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি সে খারাপ

মেজাজের। নবী করীম (সাঃ) বললেন, তোমার জন্যে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো সে সময়তো সে খারাপ মেজাজের ছিল না।

সে ব্যক্তি বললো, আমি আমার মায়ের সেসব কাজের প্রতিদান দিয়েছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই প্রতিদান দিয়েছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে হজ্জ্ব করিয়েছি। নবী করীম (সাঃ) সিদ্ধান্তমূলক জবাব দিয়ে বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের প্রতিদান দিতে পারো, তুমি ভূমিষ্ঠ হবার সময় যে কষ্ট সে স্বীকার করেছে?

মায়ের মর্যাদার কারণে মায়ের বোন খালার মর্যাদাও মহান আল্লাহ বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। মা জীবিত না থাকলে খালার সেবাযত্ন করতে হবে। একজন মানুষ নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গোনাহ্ করেছি। হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার জন্য তওবার পথ কি খোলা আছে? তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি বললো, মা তো জীবিত নেই। তিনি বললেন, আচ্ছা তোমার কি খালা বেঁচে আছেন? সে বললো, জ্বী, বেঁচে আছেন। তিনি বললেন, খালার সাথে সুন্দর আচরণ করো।

নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'জান্নাত মায়েদের পায়ের তলে।'

মায়ের সম্মান-মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন- হাদীস যত কথা বলেছে, তা একত্রিত করতে গেলে বড় ধরনের গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। পৃথিবীর সকল পুরুষের পায়ের তলায় স্যান্ডেল বা জুতা। কিন্তু নারীর পায়ের তলায় রয়েছে সন্তানের জান্নাত। কারণ নারী মায়ের জাতি, তাদের সম্মান- মর্যাদা সর্বাধিক। তাদের উচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়েই ইসলাম ঘোষণা করেছে, মায়ের পায়ের নীচেই জান্নাত।

নারী স্বাধীনতা- ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী

ইসলাম নারীকে পরাধীনতার অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে দাসত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে। কন্যা হিসেবে, বধু হিসেবে এবং মা হিসেবে নারীকে সম্মান-মর্যাদার কত উচ্চ সোপানে আসীন করেছে, তা ইতোপূর্বে আমরা যৎকিঞ্চিত আলোচনা করেছি। নারী জীবনের উক্ত তিনটি স্তরের কোন্ একটি স্তরেও নারীকে পরাধীন করা হয়নি, করা হয়নি কারো দয়া- দাক্ষিণ্যের মুখাপেক্ষী। প্রত্যেক স্তরেই নারীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেয়ার জন্য পুরুষদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কন্যা সন্তানের জন্মের বিষয়টিকে 'সুসংবাদ, সুখবর, ফিরিশ্তাদের দোয়া, কন্যা সন্তান সৌভাগ্যের প্রতীক' ইত্যাদি কথা বলে নারীকে পুরুষদের কাছে মূলতঃ সম্মান- মর্যাদার প্রতীক হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার পূজারীদের সুরে সুর মিলিয়ে যারা নারী স্বাধীনতার জিগির তুলে ইসলামের বিরোধীতা করছেন তাদের জানা উচিত, নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য প্রণোদিত আওয়াজ সেই সমাজ থেকেই সর্বপ্রথম উঠেছে, যে সমাজে নারীকে পরিণত করা হয়েছে পুরুষের দাসী, ভোগের সামগ্রী, চিত্তবিনোদন ও যৌন কামনা পূরণের উপকরণ হিসেবে। শয়তানের সহচরী হিসেবে আখ্যায়িত করে নারীর আত্মা বলে কিছুই নেই- এ রায় নারী সম্পর্কে তারাই দিয়েছিলো। নারীর মৌলিক অধিকার হরণ করে তাকে খেল- তামাসার সামগ্রীতে তারাই পরিণত করেছিলো।

নারীকে সম্মানজনক স্বাধীনতা ইসলাম দিয়েছে, তাঁর সকল প্রকার অধিকার ইসলামই সংরক্ষণ করে তাকে তাঁর ইজ্জত- আব্রুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে পুরুষকে বাধ্য করেছে। 'নারী যৌন উপকরণের সামগ্রী নয় বরং নারীই আদর্শ ও সুনাগরিক গড়ার কারিগর'– এ কথা সর্বপ্রথম ইসলামই ঘোষণা করে তাকে স্বামী তথা পুরুষের কর্মে সহযোগিতা, তাকে উৎসাহ- উদ্দীপনা, সাহস দান, পরামর্শ দেয়া এবং সন্তানকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ার দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বড় মেয়ে (হযরত আয়িশা (রাঃ) এর বড় বোন) হযরত আসমা (রাঃ) তাঁর স্বামীকে অর্থোপার্জনে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর স্ত্রী নিজে উপার্জন করতেন, তাঁর উপার্জিত অর্থ তিনি ইয়াতিমদের জন্য ব্যয় করতেন এবং স্বামীকেও দিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজসহ জুম্য়া ও ঈদের নামাজে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন। নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁরা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। সমাজে সুকৃতির প্রসার ঘটানো ও দুষ্কৃতির প্রতিরোধে এবং শিক্ষার প্রসারে তাঁরা পুরুষদের পাশাপাশি ভূমিকা পালন করেছেন। আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষের দ্বারা চরমভাবে নির্যাতিতা হয়েছেন। আদর্শ প্রতিষ্ঠা, রক্ষা, দেশ ও জাতিকে রক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা নিজের জানবাজি রেখে এমন দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে পুরুষের ভূমিকাকে তাঁরা ম্লান করে দিয়েছেন।

সুতরাং এ কথা যারা বলে ইসলাম নারীকে চার দেয়ালে আবদ্ধ করে বন্দিনী করেছে, হয় তারা ইসলামে নারী অধিকার ও স্বাধীনতা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না, অজ্ঞ মূর্খ অথবা তারা জেনে বুঝেই পশ্চিমা প্রভুদের উচ্ছিষ্ট কুড়ানোর লোভে ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে।

শিক্ষা গ্রহণে নারীর স্বাধীনতা

না জেনে না বুঝে অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কিছু সংখ্যক মানুষ শিক্ষার অগ্রদুত হিসেবে জীবিত বা মৃত কিছু নারী-পুরুষকে জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করে থাকেন।

ইসলাম বিরোধীদের কাছে পূজনীয় একজন নাস্তিকের সমাধিকে তারা নানা রংয়ে সজ্জিত করে তার সমাধিকে 'জ্যোতির্ময় আঙ্গিনা' নাম দিয়ে জাতির কাছে তাকে শিক্ষার অগ্রদুত হিসেবে পরিচিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, মানব জাতির মধ্যে শিক্ষার আলো সর্বপ্রথম জ্বালিয়েছেন নবী- রাসূলগণ। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) কে যাবতীয় জ্ঞান- বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। মানব জীবনের নখ কাটা, দাঁত পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত সকল কিছুর শিক্ষা মানব মন্ডলী নবী-রাসূলদের কাছ থেকেই পেয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর কাছে হেরা পর্বতের গুহায় ওহী হিসেবে পবিত্র কোরআনের যে আয়াত সর্বপ্রথম অবতীর্ণ হয়েছে, তার প্রথম শব্দই হলো 'পড়ো'।

পড়ার তথা শিক্ষা গ্রহণ বা জ্ঞানার্জনের এই আদেশ শুধু মাত্র পুরুষদের জন্যেই নয়, নর-নারী নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে। নবী করীম (সাঃ) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্যে জ্ঞানার্জন করা বাধ্যতামূলক।' পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে চিন্তা- গবেষণা, শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদী ব্যাপারে বারবার তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে, 'তোমরা কি বুঝো না? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না? তোমাদের কি জ্ঞান-বিবেক বুদ্ধি নেই? এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্যে রয়েছে শিক্ষনীয় বিষয়।'

ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষার অধিকার দেয়নি- এই অপপ্রচার যারা চালাচ্ছেন, তাদেরকে আমরা বিনয়ের সাথে জানাচ্ছি, সমগ্র মানবমন্ডলীকে লক্ষ্য করেই কোরআন- হাদীস চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে তাগিদ দিয়েছে। নারী সমাজ কি মানবমন্ডলীর বাইরের কোনো প্রজাতি? তাঁরা কি মানবমন্ডলীর অন্তর্ভুক্ত নয়?

তবে হ্যাঁ, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ পূজারীদের কাছে নারী সমাজ যৌন উপকরণের সামগ্রী হলেও ইসলামের দৃষ্টিতে তাঁরা মানবমন্ডলীর সম্মানিতা মর্যাদার অধিকারিণী মায়ের জাতি। এ জন্যেই ইসলাম পুরুষদের পাশাপাশি নারীকেও চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক ইত্যাদী হয়ে মানব সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার কাজে উৎসাহিত করেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন-

اغْدُ عَالِمًا او مُتَعَلِّمًا اَوْ مُسْتَمِعًا اَوْ مُحِبًّا وَلاَ تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكْ-

আলেম হও অথবা ইলমের অনুসন্ধানকারী হও, জ্ঞানের কথা শ্রবণকারী হও অথবা আলেমদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো এবং পঞ্চম হয়ো না, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (ফয়যুল কাদীর, হাদীস নং ১২১৩)

অর্থাৎ ইসলাম চারজনের একজন হতে নির্দেশ দিয়েছে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে জ্ঞানী হতে হবে অথবা জ্ঞানার্জনকারীদের একজন তথা ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে। জ্ঞানের কথা যারা শোনে তাদের একজন হতে হবে অথবা যারা জ্ঞানী তাদের সাথে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এই চারজনের একজন হতে হবে কিন্তু পঞ্চম হওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই চার শ্রেণীর বাইরে অবস্থান করে মুর্খ থেকে নিজেকে ধ্বংস করা যাবে না।

আলেম এবং ইলম্ আরবী শব্দ, এ শব্দ দ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে জ্ঞানী এবং জ্ঞান। আমরা বিনয়ের সাথে প্রশ্ন রাখতে চাই, নবী করীম (সাঃ) কি শুধুমাত্র পুরুষদের লক্ষ্য করেই উক্ত কথাগুলো বলেছেন না নারী-পুরুষ নির্বেশেষে সকল মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন? নিঃসন্দেহে ইসলামের বিধান নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্বও সকল শ্রেণীর মানুষের। ইসলাম নারীকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখার অধিকার দিয়েছে। হযরত আয়িশা (রাঃ) সহ ইসলামের স্বর্ণালী যুগে বহু বিদুষী নারীর নাম পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষাবিদ হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। হাদীস শাস্ত্রের বিরাট একটি অংশ জুড়ে রয়েছেন হযরত আয়িশা (রাঃ)। পুরুষ সাহাবায়ে কেরাম জটিল কোনো সমস্যায় নিপতিত হলে সমাধানের জন্য তাঁর কাছেই যেতেন। হযরত খানসা (রাঃ) সে যুগে মহিলাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা কবি ছিলেন। যাঁর কবিতা এখন পর্যন্ত পৃথিবীর নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে পাঠকদের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ করছে।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই নয়, নারী অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। আত্মরক্ষা ও দেশ রক্ষার জন্য যে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নারী তা গ্রহণ করবে। মহিলা সাহাবীগণ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন, আহতদের সেবযত্ন করেছেন। ওহূদের ময়দানে প্রতিপক্ষ যখন নবী করীম (সাঃ) কে আক্রমণ করার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছিলো, তখন মহিলা সাহাবী উম্মে আম্মারা (রাঃ) একা তরবারী চালিয়ে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন। ইতিহাস এই অসীম সাহসী নারীকে 'আল্লাহর বাঘিনী' হিসেবে উল্লেখ করেছে। মহিলা সাহাবীগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধে শুধু মাত্র তাঁবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে রোমান সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেছিলেন। সামরিক প্রশিক্ষণ না থাকলে যুদ্ধের ময়দানে মহিলাগণ কিভাবে সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন?

অর্থোপার্জনে নারীর স্বাধীনতা

হযরত খাদিজা (রাঃ) ছিলেন নবী করীম (সাঃ) এর প্রথমা স্ত্রী। তিনি বয়সের দিক থেকে রাসূল (সাঃ) এর থেকে ১৫ বছরের বড় ছিলেন। তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ

ব্যবসায়ী ছিলেন। দেশ- বিদেশের সাথে তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত ছিলো এবং তিনি নবী করীম (সাঃ) কে তাঁর ব্যবসা কাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। আমদানী- রফতানী ব্যবসা করতে প্রখর জ্ঞান- বুদ্ধির অধিকারী না হলে এ ব্যবসায় সুফল আশা করা যায় না। রাসূল (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ) এর এ ব্যবসায় সমৃদ্ধি এনেছিলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী, সমগ্র পৃথিবীর জন্যে রহমত। নারী-পুরুষ সকলের জন্যেই তিনি সকল বিষয়েরই শিক্ষক হিসেবে আগমন করেছিলেন।

ব্যবসা কিভাবে কোন্ নীতিতে করতে হবে, তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন এবং ব্যবসার যে নীতিমালা তিনি দান করেছেন তা শুধু পুরুষদের জন্যে নয়- নারীর জন্যেও। সুতরাং যোগ্যতা থাকলে নারীও বৈধ উপায়ে ব্যবসা করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখবে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা সুদ হারাম করেছেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে বা লেনদেনেই সুদের আদান- প্রদান হয়ে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তি বা ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে থাকেন, ইসলাম নারীকে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার অধিকার দেয়নি। তাদের অবগতির জন্যে আমরা জানাচ্ছি, সুদ ও ব্যবসা সম্পর্কিত আয়াতসমূহ শুধুমাত্র পুরুষদের জন্যেই প্রযোজ্য নয়, নারীর জন্যেও সমভাবে প্রযোজ্য।

নারী নিজের ইজ্জত- আব্রু রক্ষা করে সম্মান- মর্যাদার সাথে ব্যবসা করবে, তাঁর ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করা যাবে না। এমনকি তাঁর স্বামীও অযাচিতভাবে এতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারীর উপার্জনে তাঁর স্বামীর অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে পারবে না। বর্তমানে যে সকল নারী চাকরী বা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছেন, তাদের অধিকাংশের অভিযোগ- বেতন পেলেই বিবাহিতা হলে তা স্বামীর হাতে আর বিবাহিতা না হলে তা পিতা বা ভাই অথবা অভিভাবকের হাতে তুলে না দিলে তাদের প্রতি নেমে আসে দৈহিক নির্যাতন।

মনে রাখতে হবে, ইসলাম নারীকে উপার্জনে বাধ্য করেনি। কেউ যদি উপার্জন করে তাহলে তাঁর উপার্জিত অর্থে ভাগ বসানোর অধিকারও ইসলাম কাউকে দেয়নি। নারী যদি ইচ্ছা করে স্বামী, পিতা, ভাই বা অভিভাবককে কিছু দেয়- তা দিতে পারে। কিন্তু তাঁকে বাধ্য করা যাবে না এবং এবং ব্যাপারে তাঁর প্রতি সামান্যতম রূঢ় আচরণও করা যাবে না।

সম্পদ অর্জনে নারীর স্বাধীনতা

নারী পরমুখাপেক্ষী নয়, স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে- এ ব্যবস্থা পৃথিবীতে ইসলামই সর্বপ্রথম করেছে। পিতামাতার ও অন্যান্যদের সম্পদে তাকে অধিকার দেয়া হয়েছে, নিজ মোহ্‌রানার অর্থ ও প্রাপ্ত অন্যান্য সম্পদ সে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রাপ্ত

সম্পদ ব্যবসার কাজে লগ্নি করে সে সম্পদ বৃদ্ধি করবে, এ সম্পদও সে হালাল পথে স্বাধীনভাবে ব্যয় করবে, নারীর এ অধিকারের প্রথম স্বীকৃতিও ইসলামই দিয়েছে।

'নামাজ আদায় শেষ হলে তোমরা মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়ো, আল্লাহ তা'য়ালা যে নে'মাত তোমাদের দিয়েছেন তা অনুসন্ধান করো।' পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সক্ষম সকল মানুষের জন্যেই প্রযোজ্য। নারী সুযোগ থাকলে সম্পদ অর্জন এবং বৃদ্ধি করার প্রচেষ্টা চালাবে। সে যুগে হযরত খাদিজা (রাঃ) প্রভৃত সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন এবং সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বহু মহিলা সাহাবী সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) এর কন্যা পৈতৃক সুত্রে বিপুল সম্পদ লাভ করেছিলেন। হযরত সাবেত ইবনে কায়েস (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত জামীলা (রাঃ) বিশাল খেজুর বাগানের মালিক ছিলেন। উল্লেখ্য, সে সময় আরবে সবথেকে অর্থকরী ফসল ছিলো খেজুর। (বোখারী, কিতাবুত তালাক)

পবিত্র কোরআনে হালাল পথে সম্পদ অর্জনের তাগিদ, পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয়, অভাবী লোকদের দান করা এবং জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ্ তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করার নির্দেশ নারী-পুরুষ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। ইসলামের স্বর্ণ যুগে মহিলাগণ সম্পদের অধিকারিণী ছিলেন বলেই তাঁরা দু'হাত ভরে দান করার সুযোগ পেয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) যখনই দান করার জন্যে বলেছেন, তখনই সম্মানিতা মহিলারা প্রাণ খুলে দান করেছেন। রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশে মহিলা জমায়েতে হযরত বিলাল (রাঃ) চাদর পাঠিয়ে দিতেন, মহিলাদের দানে উক্ত চাদর বড় পুটলির আকার ধারণ করতো। সম্পদ উপার্জন, সংরক্ষণ, বৃদ্ধিকরণ ও দান করার স্বাধীন অধিকার নারীর জন্য একমাত্র ইসলামই দিয়েছে, পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মে নারীর এ অধিকারের স্বীকৃতি নেই।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনে নারীর অধিকার

আবহমান কাল থেকে বাংলাদেশে মুসলিম সমাজে প্রচলিত রয়েছে, বিয়ের সময় পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। ক্ষেত্র বিশেষে পাত্র-পাত্রী পরস্পরকে দেখার সুযোগও পায় না। আবার দেখার সুযোগ পেলেও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা পাত্রীর থাকে না। পাত্র বা পাত্রের অভিভাবকের যদি পাত্রীকে পছন্দ হয় তাহলে বিয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে পাত্রকে পাত্রীর পছন্দ হয়েছে কিনা বা পাত্রী এ বিয়েতে রাজি আছে কিনা তা জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয় না। পাত্র-পাত্রী একে অপরের জীবন সাথীই শুধু নয়, তার সুখ-দুঃখের ও সমব্যথার সারা জীবনের সঙ্গিনী। এ ক্ষেত্রে শুধু একজনের মতামতের ওপর বা অভিভাবকের মতামতের ওপর নির্ভর করে বিয়ের বিষয়টি চূড়ান্ত করা ইনসাফের পরিচায়ক নয়।

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রের যেমন অধিকার রয়েছে পাত্রীর যাবতিয় দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, পাত্রীরও অনুরূপ অধিকার রয়েছে। পাত্রী যদি জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধিসম্পন্না ও প্রাপ্ত বয়স্কা হয়ে থাকে, তাহলে পাত্রীর পিতা, ভাই বা অন্য কোনো অভিভাবককে তার এই অধিকার খর্ব করার ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সারা জীবন একটি মেয়ে যে পুরুষটির জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে থাকবে, তার সম্পর্কে সকল কিছু জানা, খোঁজ নেয়া এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার অবশ্যই সেই মেয়ের রয়েছে।

পিতামাতা, বড় ভাই বা নিকটাত্মীয়রা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে পরামর্শ অবশ্যই দিবেন, কিন্তু চূড়ান্ত মতামত দেয়ার অধিকার পাত্রীর। বলা বাহুল্য মেয়েকে এই অধিকার কেবলমাত্র দিয়েছে ইসলাম এবং ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মে নারীর এই অধিকার স্বীকৃত নয়।

নবী করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, 'পূর্বে বিবাহিত কিন্তু বর্তমানে জুড়িহীন ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তাদের কাছ থেকে স্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যাবে এবং পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়ের বিয়ে হতে পারে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে স্পষ্ট সম্মতি পাওয়া যাবে। সাহাবায়ে কেরাম জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তার সম্মতি কিভাবে পাওয়া যাবে? তিনি জানালেন, জিজ্ঞেস করার পর নীরব থাকাই তার সম্মতি।' (বোখারী, মুসলিম)

অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে হতে পারে না- এ মর্মে হাদীসের নামে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু ইমাম বোখারী ও হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য বিখ্যাত ইমামগণ উক্ত কথাটি সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন, এটি কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নয়। কারণ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'পূর্বে বিবাহিত ছেলেমেয়েরা তাদের নিজেদের বিয়ে সম্পর্কে মতামত জানানোর ব্যাপারে তাদের অভিভাবকের তুলনায় অধিক অগ্রগামী। আর পূর্বে অবিবাহিত ছেলেমেয়েদের নিকট তাদের বিয়ের ব্যাপারে তাদের মতামত অবশ্যই জানতে চাওয়া হবে এবং তাদের নীরবতাই তাদের সম্মতির নামান্তর।' (মুসলিম)

জীবন সাথী নির্বাচনে নারীকে মতামত জ্ঞাপনের অধিকার ইসলামই দিয়েছে এবং তাদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ- অপছন্দ এবং স্বাধীন মত প্রকাশের স্বাধীনতাও ইসলাম দিয়েছে। নারীর অমতে তাকে জোরপূর্বক কারো সাথে বিয়ে দেয়া ইসলামী জীবন বিধানে বৈধ নয়। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে হযরত খানসা বিনতে হাজাম (রাঃ) কে তাঁর অমতে তাঁর পিতা এক লোকের সাথে বিয়ে দেন। হযরত খানসা কোনো মাধ্যম ব্যতীতই সরাসরি নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা এমন একজন লোকের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছেন,

যিনি পূর্বে বিয়ে করেছিলেন। এ বিয়ে আমার পছন্দের নয়। তাঁর কথা শুনে নবী করীম (সাঃ) উক্ত বিয়ে বাতিল করে দেন। (বোখারী)

আরেকটি অবিবাহিতা মেয়েকে তাঁর অনুমতি ব্যতীতই বিয়ে দেয়া হয়। মেয়েটি নবী করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলে তিনি সে বিয়েও বাতিল করে দেন। (নাসাঈ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অবিবাহিতা একটি মেয়েকে তাঁর পিতা এমন একজন লোকের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো, যাকে সে মেয়ে পছন্দ করতো না। নবী করীম (সাঃ) সে মেয়েকে বিয়ে বহাল রাখা বা বাতিল করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

একটি [illegible] করীম (সাঃ) এর কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করলো, 'পিতা আমাকে আমার চাচাত ভায়ের সাথে বিয়ে দিয়েছে। যার সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছে সে খুবই নীচু প্রকৃতির মানুষ, আমাকে বিয়ে করে সে তার নীচুতা দূর করতে ইচ্ছুক।' নবী করীম (সাঃ) মেয়েটিকে উক্ত বিয়ে বহাল রাখা বা না রাখার পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু মেয়েটি জানালো, 'আমার পিতার দেয়া বিয়েতেই আমি রাজি হয়েছি।' জানতে চাওয়া হলো, 'তাহলে অভিযোগ নিয়ে আসা হয়েছে কেনো?' মেয়েটি বললো, 'আমি এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে এসেছি, নারীরা ভালোভাবে জেনে নিক যে, বিয়ের ব্যাপারে তাদের পিতার কিছুই করণীয় নেই অর্থাৎ বিয়ের ব্যাপারে মেয়ের মতামতের গুরুত্বই সর্বাধিক।' (মুসনাদে আহ্মাদ, ইবনে মাজাহ্)

তবে ইসলাম বিয়ে পূর্ব প্রেমকেও নিষিদ্ধ করেছে। প্রেমের নামে যথেচ্ছাচার, পার্কে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে বা প্রকাশ্যে ঘনিষ্ঠভাবে বসে আপত্তিকর আচরণ করা, প্রেমিকের সাথে ঘোরাঘুরি করা, ফোনে ঘন্টার পর ঘন্টা গল্প করা এসব ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। আগুন এবং জমাটবাঁধা ঘী পাশাপাশি থাকলে আগুনের উত্তাপে যেমন ঘী গলবেই, তেমনি তরুণ- তরুণী বা যুবক- যুবতী পাশাপাশি অবস্থান করলে নৈতিক স্খলন ঘটবেই। বেগানা একজন নারী এবং এবং একজন পুরুষ একত্রিত হলে শয়তানকে দিয়ে সেখানে তিনজন হয়। বলাবাহুল্য, শয়তানের কাজই হলো পরস্পরের মনে কুচিন্তা সৃষ্টি করা। প্রেমের নামে বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে লাগামহীনভাবে তরুণ- তরুণী, যুবক- যুবতী মেলামেশা করছে। এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে রাস্তা- পথে, ডাস্টবীনে নবজাতক সন্তান পাওয়া যাচ্ছে এবং নার্সিং হোমগুলোয় গিয়ে গর্ভপাত ঘটাচ্ছে। গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে অনেক মেয়েই মৃত্যুবরণ করছে। অনেক মেয়ে লজ্জা ও ভয়ে আত্মহত্যা করতেও বাধ্য হচ্ছে এবং এসব সংবাদ প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে।

নারীর মোহ্‌রানা লাভের অধিকার

ইসলাম মোহ্‌রানা ব্যতীত কোনো নারীকে বিয়ে করা পুরুষদের জন্য হারাম ঘোষণা করেছে। মোহ্‌রানা কম বেশী যাই হোক, তাতে যদি পাত্রী রাজি থাকে তাহলে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে- নতুবা নয়। কারণ মোহ্‌রানা নারীর অধিকার এবং এ অধিকার সামর্থ্য অনুযায়ী পুরুষদেরকে অবশ্যই নারীকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মোহ্‌রানা নারীর নিরাপত্তার প্রতীক- ভবিষ্যতের আশ্রয়স্থল। কোনো কারণে স্বামী যদি তাঁর স্ত্রীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটায় তাহলে তালাকপ্রাপ্তা নারী মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ দিয়ে নিজের জীবন ধারণের খরচ যোগাতে পারে। ইসলাম মোহ্‌রানার আদায়ের নির্দেশ দিয়ে নারীকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করেছে এবং অন্যের মুখাপেক্ষীতা ও পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়েছে।

প্রশ্ন হলো, বিয়ের সময় কি পরিমাণ মোহ্‌রানা ধার্য্য করা উচিত। এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন এবং এর সমাধান ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পাত্রী স্বয়ং যেমন করতে পারে অথবা এ দায়িত্ব পরিবারের মুরব্বিদের ওপরও ন্যস্ত করতে পারে। তবে এ বিষয়ে ইসলাম বাড়াবাড়ি করাও পছন্দ করেনি। সাধ্যের অতীত এমন কিছু কারো প্রতি চাপিয়ে দেয়া যাবে না। দেশের সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে পাত্রের প্রতিও যেনো অসাধ্য না হয় এবং পাত্রীও যেনো না ঠকে এভাবে মধ্যম ধরণের মোহ্‌রানা ধার্য্য করা উচিত।

ধার্য্যকৃত মোহ্‌রানা বিয়ের সময়ই পরিশোধ করা সর্বোত্তম। যদি তৎক্ষণাত সম্পূর্ণ মোহ্‌রানা পরিশোধ করা সম্ভব না হয় তাহলে পাত্রীর মতামত সাপেক্ষে কিছু অংশ বিয়ের সময় এবং পরবর্তীতে বাকি অংশ পরিশোধ করতে হবে। কত দিনের মধ্যে পরিশোধ করবে, সে সময়ও আলোচনা সাপেক্ষে বিয়ের সময়ই নির্ধারণ করা উচিত। মোহ্‌রানা পরিশোধের ইচ্ছা যদি কারো না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই বড় ধরনের গোনাহ্‌গার হতে হবে এবং কিয়ামাতের ময়দানে ব্যভিচারীদের কাতারে দাঁড়াতে হবে।

মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ একান্তভাবেই নারী তথা পাত্রীর। এতে অন্য কারো কোনো অংশ নেই। পাত্রীকে গড়ে তুলতে তার পেছনে অনেক খরচ হয়েছে, এ কথা বলে অভিভাবক পাত্রীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোহ্‌রানার অর্থ-সম্পদ দাবী করতে পারবে না। তবে পাত্রী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাপ্ত মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ কাউকে সম্পূর্ণ অংশ বা কিছু অংশ দেয়, তাহলে তা ভিন্ন কথা।

মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদ হালাল পন্থায় স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে কেউ-ই হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। নারী ইচ্ছে করলে উক্ত অর্থ-সম্পদ

দিয়ে ব্যবসাও করতে পারে অথবা নিজের কাছে গচ্ছিতও রাখতে পারে বা ব্যাংকেও গচ্ছিত রাখতে পারে। স্ত্রীর মোহ্‌রানার অর্থ- সম্পদে স্বামীর কোনো অধিকার নেই। এ অর্থ- সম্পদ কাজে লাগিয়ে স্ত্রী যদি বিশাল বিপুল অর্থ- সম্পদের মালিকও হয়, তবুও এতে স্বামীর কোনো অংশ ধার্য্য হবে না।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা বাস্তব সত্য যে, বর্তমান নামধারী মুসলমানদের মধ্যে বিষয়টি সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থায় রূপ নিয়েছে। ইসলামের নির্দেশ অমান্য করে বিয়ের সময় পাত্রী পক্ষের কাছ থেকেই পাত্রপক্ষ বিপুল অর্থ- সম্পদ আদায় করছে। এর নাম যৌতুক এবং যৌতুক গ্রহণ করা ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। পাত্রকে গড়ে তুলতে পাত্রের অভিভাবকের যেমন অর্থ- সম্পদ ব্যয় হয়, তেমনি ব্যয় হয় পাত্রীকে গড়ে তুলতে। কোনো কোনো পাত্রের অভিভাবক পাত্রের বিয়ের সময় পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে সকল ব্যয় কড়ায়- গন্ডায় আদায় করে নিবে, এই মনোভাব নিয়েই পাত্রের পেছনে অর্থ ব্যয় করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এই ঘৃণ্য মানসিকতাকে নিন্দনীয় ঘোষণা করা হয়েছে। এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে মুসলিম মন- মানসের পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং বিশেষ করে এ বিষয়ে নারীদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিয়ের সময় পাত্রপক্ষ প্রদর্শনী মূলকভাবে বিপুল অঙ্কের অর্থ মোহ্‌রানা ধার্য্য করে বটে, কিন্তু পরিশোধ করে না। পাত্রীর পক্ষ থেকেও তা পরিশোধ করার জন্যে তাগাদা দেয়া হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে তাগাদা দিলে পাত্রীর ওপর নেমে আসে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন। পুরুষের সমান অধিকারের নামে একশ্রেণীর নারীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করলেও ইসলাম তাদেরকে যে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে এ বিষয়ে তারা মুখ খোলে না। নারীর সুখ-দুঃখ দেখার নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের অর্থে ব্যাঙের ছাতার মতো যত্রতত্র বহু সংখ্য নারী সংগঠন গজিয়েছে। পর্দানশীন নারীকে কিভাবে পর্দার বাইরে আনা যায়, নম্র, ভদ্র ও লজ্জাবনত তরুণীদেরকে কিভাবে লজ্জাহীন করে অগণিত পুরুষের কামনা তাড়িত দৃষ্টির সম্মুখে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গী প্রদর্শন করে নাচানো যায়, পরনের পোশাক আরো কতটা খাটো করা যায়, অবাধে কিভাবে রূপ- যৌবন ভোগ করা যায় ইত্যাদি হলো তাদের গবেষণার বিষয় এবং এসব বিষয়ে তারা নারীদের সচেতন করার প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। সমঅধিকারের নামে নারীকে ব্যবসার পণ্য বানানোর পক্ষে গলদঘর্ম হলেও তারা নারীর ন্যায্য অধিকারের পক্ষে এবং যৌতুকের বিরুদ্ধে তেমন সোচ্চার ভূমিকা পালন করে না।

নারী প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম তাদেরকে যে ন্যায্য পাওনা দিয়েছে, তা আদায়ের জন্যে পশ্চিমা সভ্যতা বাস্তবায়নে অঙ্গিকারাবদ্ধ তথাকথিত এসব নারী

সংগঠন কোনো কর্মসূচী দেয়া দূরে থাক 'টু' শব্দ পর্যন্ত করে না। যৌতুক শব্দকে প্রচ্ছন্ন রেখে 'পাত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিছুটা সাহায্য করুন' অথবা 'নতুন সংসার গড়বে, সংসারটি সাজিয়ে দিন' এসব কথা বলে পাত্রীপক্ষের কাছ থেকে কৌশলে বিপুল অর্থ- সম্পদ হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে। অবস্থা বর্তমানে এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে পিতামাতার রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। অথবা কন্যা ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই পিতামাতা ব্যাংকে কন্যার নামে অর্থ জমা করতে থাকেন। এসবের বিরুদ্ধে সমঅধিকারের দাবীদারদের মুখ থেকে একটি শব্দও বের হয় না।

প্রতিবেশী দেশ ভারতে যৌতুকের অভিশাপ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, গর্ভধারণ করার সাথে সাথে ভ্রুণ কন্যা না পুত্র তা পরীক্ষা করা হয়। মেডিক্যাল সাইন্স যদি ভ্রুণকে কন্যা হিসেবে চিহ্নিত করে, তাহলে তৎক্ষণাত গর্ভপাত ঘটানো হয়। গর্ভ পরীক্ষা করার সুযোগ যারা পায় না তাদের কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে গোপনে হত্যা করা হয়। গত এপ্রিল ২০০৮ এ এক পরিসংখ্যান দেখা গিয়েছে, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। কারণ ভারতে প্রতি বছর প্রায় দেড় মিলিয়ন কন্যা ভ্রণ হত্যা করা হয়। সেখানে বিয়ের কনে পাওয়াই দুরুহ হয়ে উঠেছে এবং এ ব্যাপারে উক্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী মনোমহন সিং উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বলে পত্রিকায় সংবাদ ছাপা হয়েছে।

পুরস্কার ও শাস্তি লাভের ক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার

সৎকাজের পুরস্কার বা বিনিময় ইসলাম পুরুষের তুলনায় নারীকে ক্ষেত্র বিশেষে বেশী দিয়েছে। যেমন প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধের ময়দানে যৌক্তিক কারণে নারী যদি অংশ গ্রহণ করতে না পারে, তাহলে বাড়িতে অবস্থান করে নারী মহান আল্লাহর কাছে বিনিময় লাভ করবে। কিন্তু একজন পুরুষকে যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করতে হবে তারপর সে বিনিময় লাভ করবে। সন্তান গর্ভে থাকার কারণে যে রাতগুলো নারী ঘুমাতে পারে না, নির্ঘুম রাত অতিবাহিত করার কারণে নারী সারা রাত জেগে তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়ের সওয়াব পায়। গর্ভে সন্তান ধারণ, প্রসব করা, দুধ পান করানো এবং সন্তান প্রতিপালনের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিপুল বিনিময় নারীকে দেয়া হবে, তা থেকে পুরুষরা বঞ্চিত।

মুমিন নারী- পুরুষকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা সমমর্যাদায় অভিষিক্ত করে একে অপরের বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَاْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه، اُولٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ-

মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে, নামাজ আদায় করে, যাকাত দেয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা এবং রাসূলের আনুগত্য করে, তাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা দয়া পরবশ হবেন। (সূরা তাওবা- ৭১)

উল্লেখিত আয়াতে বেশ কয়েকটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মুমিন নারী-পুরুষ একে অপরের বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজ, সভ্যতা- সংস্কৃতি গড়ার ক্ষেত্রে এককভাবে পুরুষকে ক্ষমতা দেয়া হয়নি। মুমিন পুরুষ ও নারী পরস্পরের যৌথ প্রচেষ্টায়, শ্রমে ও মেধায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, সভ্যতা- সংস্কৃতি বিনির্মাণ করবে। দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং এ কাজ করতে গিয়ে যা কিছু শুভ সুন্দর তা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে উভয়ে যৌথভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করবে। আর যা কিছু অশুভ অসুন্দর তা সমাজ ও দেশ থেকে মূলোৎপাটন করার কাজেও অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে। উভয়ে নিজ প্রতিপালকের দাসত্বের যথাযথ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার লক্ষ্যে নামাজ আদায় করবে এবং সম্পদের অধিকারী হলে যাকাত দান করবে। এই কাজগুলো যদি তারা করেন তাহলে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন।

আমরা বিনয়ের সাথে নারী-পুরুষের সমঅধিকারের দাবীদারদের কাছে প্রশ্ন রাখছি, লক্ষ্য করুন তো- উল্লেখিত আয়াতে ইসলাম কি নারী-পুরুষকে সমঅধিকার দিয়ে একই কাতারে দাঁড় করায়নি? বিষয়টি তো এমন নয় যে, নারীর কাজে এক ধরণের বিনিময় এবং পুরুষের কাজে আরেক ধরণের বিনিময় দেয়া হবে। বরং উভয়ের কাজে সমান বিনিময় দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

اَنِّىْ لاَ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى-

আমি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষ বা নারীর কর্ম বিফল করি না। তোমরা একে অপরের অংশ। (সূরা আলে ইমরাণ- ১৯৫)

নারী ও পুরুষ সৎকাজ করলে মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে উভয়কেই বিনিময় হিসেবে জান্নাত দানে ধন্য করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন–

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

فَأُولَـئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا–

যে ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করবে, নারী বা পুরুষ- সে যদি ঈমানদার অবস্থায়ই তা সম্পাদন করে, তাহলে সে এবং তার মতো সব লোক অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। পুরস্কার দেয়ার সময় তাদের প্রতি এক অণু পরিমাণও অবিচার করা হবে না। (সূরা আন নিসা-১২৪)

ইসলাম নারী ও পুরুষের জন্যে সৎকাজের বিনিময় দেয়ার ক্ষেত্রে একই ধরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘোষণা করেছে–

وَعَدَ اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ–

মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। (সূরা তাওবা- ৭২)

অজ্ঞতার কারণে কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন, আল্লাহ তা'য়ালা পরকালে জান্নাতী পুরুষদের তো হুর দিবেন, কিন্তু জান্নাতী নারীদেরকে কি দিবেন?

যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই জান্নাত লাভের অধিকারী হয়, তাহলে তারা যদি পৃথিবীর অনুরূপ জান্নাতেও একে অপরের সঙ্গী হতে চায় তাহলে তারা তাই লাভ করবেন। আর একে অপরকে যদি না চায় তাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তাদের উভয়কেই নতুন সঙ্গী দান করবেন। কোরআন- হাদীসে জান্নাতীদের জন্যে যে 'হুর' এর কথা বলা হয়েছে, এর এক অর্থ হলো সঙ্গী।

আর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ একজন জান্নাতী হলে তাদেরকে অবশ্যই সঙ্গী দেয়া হবে। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, যে সকল নারী-পুরুষ মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করবেন, তারা জান্নাতে যা চাইবেন তাই পাবেন। জান্নাতে চাওয়ার তো প্রয়োজন হবে না, মনের মধ্যে যে ইচ্ছা জাগ্রত হবে তাই জান্নাতীরা পাবেন।

সুতরাং হাস্যকর বালখিল্য প্রশ্ন তুলে সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার হীন প্রচেষ্টা পরিহার করে প্রকৃত সত্য জানা ও বুঝার চেষ্টা করলে এর মধ্যেই দেশ ও জাতির মঙ্গল নিহিত রয়েছে। নারী ও পুরুষ কাউকেই কোনো দিক থেকেই ইসলাম বঞ্চিত করেনি। সকলকেই সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তা'য়ালা, যিনি সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টির প্রতি তিনিই সর্বাধিক যত্নবান, মমতা তাঁরই বেশী। নারী- পুরুষ তিনিই সৃষ্টি করেছেন

এবং তিনিই সবথেকে বেশী ভালো জানেন কাকে কতটুকু অধিকার দিতে হবে। তিনিই সবথেকে বড় ইনসাফকারী এবং তিনি নারী-পুরুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا–

মুসলমান পুরুষ, মুসলমান নারী, মুমিন পুরুষ, মুমিন নারী, আনুগত্য পরায়ণ পুরুষ এবং আনুগত্য পরায়ণ নারী, সত্যবাদী পুরুষ এবং সত্যবাদী নারী, ধৈর্য্যশীল পুরুষ এবং ধৈর্য্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ এবং বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ এবং দানশীল নারী, রোজাদার পুরুষ এবং রোজাদার নারী, যৌন অঙ্গসমূহের সংরক্ষণকারী পুরুষ এবং এসব অঙ্গের সংরক্ষণকারী নারী, সর্বোপরি আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ এবং স্মরণকারী নারী, নিঃসন্দেহে এদের জন্যে আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা আল আহ্যাব- ৩৫)

ইসলাম সৎকাজের বিনিময় প্রদানের ক্ষেত্রে নারী- পুরুষকে ন্যায্য অধিকার দান করেছে। উভয়েরই যে কেউ অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলে শাস্তির ক্ষেত্রেও ন্যায্য দন্ড প্রয়োগ করেছে। পবিত্র কোরআন ঘোষণা করেছে, 'আল্লাহ তা'য়ালা মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং কাফিরদের জাহান্নামের ভয়াবহ আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেখানে তারা চিরকাল ধরে জ্বলতে থাকবে।' (সূরা তাওবা- ৬৮)

সুতরাং ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে এ কথা বলে যারা সমঅধিকারের নামে মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিতে চায়, বিয়ে প্রথা বিলুপ্ত করে সমগ্র জাতিকে ব্যভিচারে লিপ্ত করতে চায়, অবাধ যেনা- ব্যভিচার ও গর্ভপাতের অধিকার চায় তারা মানবতার দুশমন। এদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সকলের উচিত ইসলাম যাকে যে অধিকার দিয়েছে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানো।

সমাজ সংস্থার সদস্যা হিসেবে নারীর অধিকার

নর-নারী উভয়ের প্রত্যক্ষ অবদানেই এই পৃথিবীর মানব সভ্যতা সচল রয়েছে। মানব বংশবৃদ্ধি করণে একা নর বা নারী কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই অবদান রয়েছে এবং সর্বাধিক ত্যাগ- তিতীক্ষা বরণ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে নারী। বিশ্বের সকল নামী-দামী ব্যক্তিত্ব নারীর গর্ভেই অস্তিত্ব লাভ করেছে, নারীই তাকে প্রসব করেছে এবং নারীর কোমল কোলেই সে লালিত পালিত হয়েছে। নারী বৃদ্ধি করেছে মানব সম্প্রদায়ের সম্মান- মর্যাদা। এ জন্যে সমগ্র মানবতাই নারীর কাছে চিরকালের জন্য ঋণী। নারীকে ঘৃণা করে বা তাকে অবহেলিত দৃষ্টিতে দেখে কোনো সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারেনি।

মানব সন্তান লালন- পালনে যার অবদান সবথেকে বেশী সেই নারী অবশ্যই সমাজে তার যোগ্যতা অনুযায়ী অবদান রাখবে। নারী যেনো তাঁর অর্জিত জ্ঞান এবং যোগ্যতা প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে এ জন্যে ক্ষেত্রও প্রস্তুত করতে হবে। হযরত যুবায়ের (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) নিজ আবাসস্থল থেকে প্রায় দুই মাইল দূরে তাঁর স্বামীর খেজুর বাগান পরিচর্যায় যেতেন। হযরত আসমা বিনতে মুহারিমা (রাঃ) নামক এক মহিলা সাহাবী আতরের ব্যবসায়ী ছিলেন। হযরত উমরা বিনতে তাবজা (রাঃ) নামক আরেক মহিলা সাহাবী সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র ক্রয় করার জন্যে স্বয়ং বাজারে যেতেন। হযরত উমার (রাঃ) এর খেলাফত কালে তিনি শিফা (রাঃ) নামক একজন মহিলা সাহাবীর প্রতি বাজার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। (বোখারী, আবু দাউদ, ইবনে সা'দ, ইবনে হিশাম, আল ইস্তিয়াব)

তাঁরা অবশ্যই পর্দার হক আদায় করেই সমাজ সংস্থার সদস্যা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং বর্তমানেও নারীকে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। দেশ ও জাতির উন্নয়নের নামে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থান থেকে বের করে এনে পুরুষদের কামনা- বাসনা পূরণের উপকরণে পরিণত করার পথও ইসলাম রুদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম পর্দার ব্যবস্থা করে নারীকে তাঁর যোগ্যস্থানে রেখে তাঁর কাছ থেকে খেদমত গ্রহণ করেছে। ইসলামের স্বর্ণালী যুগে মহিলা সাহাবীগণ সমাজ ও জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে মুমিন নারী ও পুরুষদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، يَاْمُرُوْنَ

بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-

মুমিন নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু। তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে। (সূরা তাওবা- ৭১)

মুমিন নারী সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে। এই কাজ দুটো করতে হলে অবশ্যই কতৃত্বের পদে আসীন থাকতে হয় বা এমন ক্ষমতা অর্জন করতে হয়, যে ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, অন্যায়- অবিচার, শোষণ- বঞ্চনা, প্রতারণা, জুলুম- অত্যাচার, যেনা- ব্যভিচার, দস্যুপনা, ছিনতাই- রাহাজানি, খুন, দাঙ্গা- ফাসাদ, লজ্জাহীনতা, নগ্নতা- অশ্লীলতা ইত্যাদির মূলোৎপাটন করা যায়। অপরদিকে শুভ সুন্দর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কল্যাণকর কর্ম বিকশিত করার জন্যেও কর্তৃত্ব প্রয়োজন। এ জন্যে নারীকে সেই যোগ্যতা অর্জন করে কর্তৃত্বের পদে আসীন হতে হবে এবং শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজকে সুন্দর সাজে সজ্জিত করবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, 'তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

নারী তার অর্জিত জ্ঞান ও যোগ্যতা কোন্ কাজে লাগিয়েছে, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নে তা কিভাবে ব্যবহার করেছে সর্বোপরি আদর্শ নাগরিক গড়ার ব্যাপারে তারা কি ভূমিকা পালন করেছে, এ ব্যাপারে তাদেরকে অবশ্যই আদালতে আখিরাতে জবাবদীহী করতে হবে। তবে নারী তার নিরাপদ স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে এবং পুরুষও তার জন্য নির্ধারিত স্থানে থেকে ভূমিকা পালন করবে। নারী- পুরুষ পাশাপাশি অবস্থান করে সুন্দর কিছু গড়তে গিয়ে ভাঙ্গন এবং বিপর্যয়ই অধিক সৃষ্টি করবে। মানব সভ্যতার অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে পশ্চিমা সভ্যতা এ কথার সাক্ষী, কর্মক্ষেত্র পৃথক না করে একত্রে কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে সর্বক্ষেত্রেই নারী একশ্রেণীর পুরুষ কর্তৃক নানাভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছে এবং হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় নারীর অধিকার

দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, দেশের আইন- শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা, দেশে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রেখে মুসলিম হিসেবে নিজের আদর্শ ও ঈমান- আকিদার প্রতি নিরাপত্তামূলক দৃষ্টি দিয়ে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব নারী-পুরুষ সকলের। নবী করীম (সাঃ) এর যুগে মহিলা সাহাবীগণ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়- অপরাধ

প্রতিরোধে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। দেশের প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি মুসলমানদের কাছে পবিত্র এবং সিজদার স্থান। দেশকে রক্ষার প্রয়োজনে মুসলিম নারীগণ সে যুগেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

পরিবার প্রথা, বিয়ে ও নৈতিকতায় অবিশ্বাসী বিপথগামী একশ্রেণীর মহিলারা পশ্চিমা প্রভুদের ইশারায় এদেশে মুসলিম নারীদের চরিত্র হনন করার কাজে লিপ্ত। ইতোমধ্যেই বহু সহজ- সরল নারী এদের হীন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছে। নানা উপলক্ষ্যে এসব বিপথগামী নারীদের প্রাকাশ্যে রাজপথে নামিয়ে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করানো হয়, বহু সাধারণ মানুষ এদের হাতে আহত হয়েছে। পুলিশকে পর্যন্ত এরা মারত্মকভাবে আহত করে হাসাপাতালে পাঠিয়েছে। গত ২৮শে অক্টোবর ২০০৭ সালে বিপথগামী নারীদের হাতে লগি-বৈঠা দিয়ে রাস্তায় নামানো হয়েছিলো। তারা প্রকাশ্যে পথচারী মানুষকে আহত করাসহ জাতীয় সম্পদের ক্ষতি সাধন করেছে। দেশ- বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাদের জংলী তান্ডবের সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। এতে করে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের মর্যাদা ভূলুষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে নারী সমাজের কলঙ্ক এসব দুষ্টক্ষত এবং নারী অপরাধীদের দমন করে দেশকে স্থিতিশীল রাখার জন্যে সুদক্ষ নারী বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা পূর্বের তুলনায় বেশী অনুভূত হচ্ছে। অপরাধী গোষ্ঠী নারী এবং শিশু- কিশোরদের মধ্যেও অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। বহুমাত্রিক সমস্যায় দেশ ও জাতিকে আষ্ঠেপৃষ্ঠে অক্টোপাশের মতোই জড়িয়ে ধরেছে। এ ক্ষেত্রে আইন শৃংখলা রক্ষা, সমাজকে মাদকমুক্ত করা, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ নানামুখী অপরাধ দমনে শুধুমাত্র পুরুষদের দ্বারা গঠিত বাহিনী দিয়ে সম্ভব নয়।

পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী যে নারী বাহিনী গঠিত হবে, তাদের কর্মক্ষেত্রও হবে পৃথক এবং তাদের ইজ্জত- আব্রু রক্ষা করে নারীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ এবং দায়িত্ব পালনের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে যোগ্য নারীদেরকে অস্ত্র পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রয়োজনের সময় যেনো তাঁরা দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অবদান রাখতে পারে। নবী করীম (সাঃ) এর সাথে নারীরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন। আহত সৈন্যদের পানি পান করানো, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা, নিহত ও আহতদের স্থানান্তরিত করা, সৈনিকদের খাদ্য প্রস্তুত করার কাজ যেমন তাঁরা করেছেন, তেমনি প্রয়োজনের সময় অস্ত্র হাতে শত্রু বাহিনীর মোকাবেলাও করেছেন।

হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) এর সাথে সাতটি যুদ্ধে যোগ দেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হুনাইনের যুদ্ধে হযরত উম্মে সুলাইম (রাঃ) তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিপক্ষের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) এর পরে সারা দুনিয়ার মধ্যে অদ্বিতীয় জেনারেল সমরবিদ হযরত খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) এর বোন হযরত খাওলা (রাঃ) যুদ্ধের ময়দানে রোমকদের বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছেন।

জাতীয় উন্নয়নে নারীর অধিকার

দেশের অর্থনীতি গতিশীল রাখতে হলে নারী- পুরুষ উভয়কেই যথাযথ ভূমিকা পালন করতে হবে। শিক্ষাঙ্গন, কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা, হাসপাতাল, অফিস-আদালতসহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে নারী তার জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, শ্রম-মেধা প্রয়োগ করে দেশকে উন্নতির পথে অগ্রসর করাবে। নারী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, ডক্টর, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি হবে, ব্যবসা- বাণিজ্যসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবে, দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'আদর্শ মানব গড়ার কারিগর' হবে, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকতা করবে এবং প্রশাসনে প্রয়োজনীয় স্থানে অবদান রাখবে।

তবে নারীর কর্মক্ষেত্র হবে পৃথক, পশ্চিমা সভ্যতার অনুকরণে নারী- পুরুষ একত্রে পাশাপাশি অবস্থান করে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এ সুযোগ ইসলামে নেই। কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র নারী- পুরুষ যেখানেই পাশাপাশি অবস্থান করছে, সেখানেই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। পরস্পরে আলাপচারিতা, দৃষ্টি বিনিময়, মন দেয়া- নেয়া ইত্যাদি কারণে কর্মের গতি স্বাভাবিক কারণেই শ্লথ হয়ে যায়। সেই সাথে বিবাহিত নর-নারী পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়ার কারণে বহু সংসার ভেঙ্গেছে এবং এখনও ভাঙ্গছে। স্বার্থান্বেষী ও দুশ্চরিত্র একশ্রেণীর পুরুষদের হাতছানির প্রতি বিশ্বাস করে বহু তরুণী তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব হারিয়েছে। বহুল ক্ষেত্রে নারী যৌন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়েও চাকরী হারানো ও সম্মান মর্যাদার ভয়ে তা প্রকাশ করতে পারে না।

একত্রে কাজ করতে গিয়ে বহু নারী ধর্ষিতা হচ্ছে, অনেকে গর্ভবতী হচ্ছে, গর্ভপাত ঘটাতে গিয়ে নারী মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ছে। প্রাইভেট ক্লিনিকগুলোয় তদন্ত করলেই এর সততা পাওয়া যাবে। অনেকে প্রেমের নামে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নারীর সর্বনাশ করে দূরে সরে যাচ্ছে। উপায়ন্তর না দেখে নারী আত্মহত্যার পথ বেছে

নিচ্ছে। বিগত এক বছরের পত্রিকা রিপোর্ট দেখলে দেখা যাবে, কত বিপুল সংখ্যক নারী এ অবস্থার শিকারে পরিণত হয়েছে। এসবই হয়েছে নারী- পুরুষের অবাধ মেলামেশা, শিক্ষাঙ্গনে একত্রে শিক্ষাগ্রহণ এবং একত্রে কর্মক্ষেত্রে কর্মরত থাকার কারণে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কলম্বিয়া, কানাডা ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশে যৌন নির্যাতনের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কর্মক্ষেত্রে শতকরা ৭৩ জন নারী তাদের অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সেনাবাহিনী এবং পুলিশ অন্যান্য বাহিনীতে যে সকল নারী পুরুষদের সাথে কর্মরত রয়েছে, তাদেরও সেই একই অবস্থা। বৃটেন এবং আমেরিকায় এই অবস্থা সবথেকে বেশী ভয়াবহ। পশ্চিমা দেশে প্রতি তিন নারীর দুইজন কিশোরী বয়সেই সহপাঠী অথবা শিক্ষকদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। গীর্জায় কর্মরত নারীরা পাদ্রীদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। পশ্চিমা দেশে ১৬ বছরের কোনো মেয়ে যদি বলে সে কখনো বয়ফ্রেন্ডকে দেহদান করেনি, তাহলে সে বন্ধু-বান্ধবীর কছে উপহাসের পাত্রে পরিণত হয়। এসবই ঘটেছে নারী-পুরুষের স্বাধীন মেলামেশার কারণে।

বর্তমানে গার্মেন্টস সেক্টরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। যেখানে শুধুমাত্র নারী শ্রমিকের দ্বারা কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, আর যেখানে নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের দ্বারা সম্মিলিতভাবে কারখানা পরিচালিত হচ্ছে, তদন্ত করলে প্রমানিত হবে- এ দু'য়ের উৎপাদন ক্ষমতা সমান নয়। যেখানে এককভাবে নারী বা পুরুষ কর্মরত রয়েছে সেখানের উৎপাদন অবশ্যই বেশী।

দেশে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সরকারী- বেসরকারী অর্থ ব্যয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ইচ্ছে থাকলে তারা অবশ্যই নারীদের জন্যে পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপন করতে পারতেন। মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন বহু নারী পৃথক শিক্ষাঙ্গন না থাকার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রয়েছেন। আবার অনেক নারী উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার পরও পৃথক কর্মক্ষেত্র না থাকার কারণে জাতি তাদের খেদমত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং সমঅধিকার নয়, নারীকে তাঁর ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে দিতে হলে অবশ্যই নারীর জন্যে প্রয়োজনীয় সকল কিছু পৃথক করতে হবে। তাহলে নারীর পক্ষে নিজের সম্মান-মর্যাদা, ঈমান- আকিদা টিকিয়ে রেখে যথাযথভাবে দেশ ও জাতির প্রতি অবদান রাখা সম্ভব হবে।

নারীর একাধিক বিয়ের অধিকার

সমঅধিকারের জিগির যারা তুলেছে, তারা দেশের জনগণের চিন্তা-বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য রেখে একত্রে নারীর একের অধিক স্বামী রাখার দাবী প্রকাশ্যে না তুললেও নারীকে লম্পট পুরুষদের যৌন সামগ্রীতে পরিণত করার জন্যে নারীর অবাধ যৌন স্বাধীনতা চায়। ইতোপূর্বেই তাদের পূজনীয় এক মহিলা 'জরায়ুর' স্বাধীনতার দাবী তুলেছিলো। অর্থাৎ স্বাধীনভাবে উক্ত নারী যে কোনো পুরুষের সন্তান নিজের জরায়ূতে ধারণ করতে চায়। বাংলাদেশের তাওহীদী জনতা উক্ত নারীকে দেশে স্থান দেয়নি। ভারতের কোলকাতায় আশ্রয় নিয়েও উক্ত নারী সেখানে টিকতে পারেনি। ভারত সরকারও নিকৃষ্ট বোঝা ঘাড় থেকে নামিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

উক্ত নারীর জঘন্য দাবীর সাথে সুর মিলিয়ে সে সময় বেশ কিছু লোকজন মত প্রকাশ করেছিলো, আর এই সুযোগে এ দেশবাসী জেনেছিলো স্বাধীন জরায়ূর সন্তানের সংখ্যা এদেশে কতটি!

তথাকথিত নারীবাদীরা বলে থাকে, ইসলাম একজন পুরুষকে একত্রে চারজন স্ত্রী রাখার অধিকার দিলেও নারীকে সে অধিকার না দিয়ে তার প্রতি অবিচার করেছে।

এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো, ইসলাম একজন পুরুষকে চারজন স্ত্রী গ্রহণে উৎসাহিত করেনি, প্রয়োজন হলে পথ খোলা রাখা হয়েছে মাত্র। পৃথিবীর অন্যান্য সকল ধর্মে বহু বিবাহের নির্দেশ রয়েছে এবং ঐসব ধর্মের পূজনীয় ব্যক্তিদের অধিকাংশেরই একের অধিক স্ত্রী ছিলো। কারো কারো শতাধিক স্ত্রী ছাড়াও উপপত্নী ছিলো বহু সংখ্যক। কেবল মাত্র ইসলামই বলেছে একটি বিয়ে করো। স্মরণে রাখতে হবে, ইসলামের আদেশ বা নিষেধের ৫টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হলো, আবশ্যকীয় বা বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয়টি হলো প্রশংসিত বা উৎসাহিত। তৃতীয়টি হলো, অনুমোদনীয় বা গ্রহণযোগ্য। চতুর্থটি হলো অপছন্দনীয় বা নিরুৎসাহিত। পঞ্চমটি হলো নিষিদ্ধ বা অবৈধ।

পুরুষের জন্যে একের অধিক বিয়ের বিষয়টি অনুমোদনীয় বা গ্রহণযোগ্য। ইসলাম এ কথা বলেনি যে, তোমরা প্রত্যেকেই চারটি করে বিয়ে করো, এটা করলে বহুত বহুত ফায়দা হবে। বরং বলেছে একটি বিয়ে করো। ইসলাম একথাও বলেনি যে, যে ব্যক্তির একজন স্ত্রী রয়েছে তার তুলনায় একাধিক স্ত্রী যার আছে সে ব্যক্তি উত্তম। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনে বলেছেন-

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ،

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ-

নারীদের মাঝ থেকে তোমাদের যাদের ভালো লাগে তাদের দুইজন, তিনজন বা চারজনকে বিয়ে করে নাও, কিন্তু তোমাদের যদি এই আশঙ্কা হয় যে, তোমরা একের অধিক হলে তাদের মধ্যে ইনসাফ করতে পারবে না, তাহলে তোমাদের জন্যে একজনই যথেষ্ট। (সূরা আন্ নিসা- ৩)

বরং বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্যেই ইসলাম এ ব্যবস্থা দান করেছে। কারণ ইতোপূর্বে ক্ষমতা ও বিত্তশালী নরপতিগণ অগণিত নারীকে বিয়ের নামে বা উপপত্নী বানিয়ে নিজের দখলে রেখে তাদের যৌবন লুণ্ঠন করেছে। ইতিহাস কথা বলে, কেউ কেউ কয়েক হাজার নারীকে নিজের স্ত্রী বানিয়ে রেখেছে। কতক ধর্মের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ কয়েক শত নারীকে স্ত্রী হিসেবে বন্দী রেখে কারোও প্রতিই যথাযথ দায়িত্ব পালন করেনি। বিভিন্ন দেশের শাসকবৃন্দ একত্রে কয়েক হাজার নারীকে অন্দর মহলে আবদ্ধ রেখে তাদের অধিকার হরণ করেছে। ইসলাম এসব ঘৃণ্য কর্ম বন্ধ করার জন্যে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে।

একের অধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে এ জন্যে যে, সকল পুরুষের ক্ষেত্রে একজন মাত্র নারীকে নিয়ে জীবন অতিবাহিত করা সম্ভব হয় না। পশ্চিমা দেশসমূহে যারা বিবাহিত, শুধুমাত্র স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট নয় বিধায় তারা নিত্য-নতুন গার্লফ্রেন্ডকে সঙ্গী বানায়। নারীও স্বামী থাকার পরও অন্য পুরুষদের বয়ফ্রেন্ড হিসেবে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হলো, বৈধভাবে বিয়ের মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা ভালো না একজন স্ত্রী থাকার পরও বহু সংখ্যক নারীর সাথে ব্যভিচারের সম্পর্ক গড়ে তোলা ভালো?

যেনা- ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ করার জন্যেই একের অধিক নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করার পথ খোলা রেখে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে-

ذَلِكَ اَدْنَى اَلاَّ تَعُوْلُوْا-

মনে রেখো, যৌনতার সীমালংঘন থেকে রক্ষার জন্য এটাই হচ্ছে উত্তম ও সহজতর পন্থা। (সূরা আন্ নিসা-৩)

চরিত্র নিষ্কলুষ রাখা এবং পরিবারের বন্ধন অটুট রাখা এবং সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ করার জন্যেই ইসলামে একের অধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং এ ব্যাপারেও সাবধান করা হয়েছে, একের অধিক স্ত্রী যাদের রয়েছে তারা যেনো সকলের সাথে ইনসাফ করে। যদি তা না করে তাহলে আদালতে আখিরাতে শাস্তির সম্মুখিন হতে হবে।

পুরুষ একের অধিক বিয়ে করলে প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভের সন্তানই উক্ত পুরুষের বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ পিতৃ পরিচয় ঠিক থাকে, কিন্তু একজন নারী যদি একাধিক স্বামী গ্রহণ করে, তাহলে তার সন্তান কোন্ পিতার পরিচয়ে পরিচিত হবে?

সে নারী কিভাবে তার সন্তানের পিতা হিসেবে কোন্ স্বামীকে সনাক্ত করবে?

একই সময়ে সকল স্বামী যদি সে নারীর প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে উক্ত নারী কোন্ স্বামীকে বঞ্চিত করে কোন্ স্বামীর কাছে যাবে?

একাধিক স্বামী গ্রহণকারিণী নারীর সন্তান কয়জন পিতার নাম বলবে?

একজন পুরুষের পক্ষে একাধিক স্ত্রীর প্রতি দায়িত্ব পালন করা সহজ, কিন্তু একজন নারীর পক্ষে একাধিক স্বামীর প্রতি দায়িত্ব পালন কি সম্ভব?

মাত্র কিছু দিন পূর্বে আমেরিকার হলিউডের এক বিখ্যাত নায়িকা জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে মাত্র ২৬ বছর বয়সে বিপুল সম্পদ রেখে আত্মহত্যা করে। উক্ত নায়িকা বিয়ে না করে একত্রে ৭ জন বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিভটুগেদার করতো। এতে করে তার গর্ভে একজন কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং উক্ত কন্যাকে সে এক চাইল্ড হোমে রেখে ব্যয়ভার নিজেই বহন করতে থাকে। মায়ের মৃত্যুর পরে উক্ত কন্যাই মায়ের পরিত্যাক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। এই কন্যা কার অধীনে থাকবে এ প্রশ্ন উঠলে উক্ত নায়িকার ৭জন বয়ফ্রেন্ডই উক্ত কন্যাকে নিজের সন্তান বলে দাবী করে। কারণ কন্যাকে যে ব্যক্তি নিজের কাছে রাখতে পারবে সে ব্যক্তির অধীনেই নায়িকার রেখে যাওয়া বিপুল সম্পদ থাকবে। শেষ পর্যন্ত বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং আদালতই উক্ত কন্যার পিতৃত্ব নির্ধারণ করবে। এখন পর্যন্ত বিষয়টির সুরাহা হয়নি।

একজন নারী যদি বহু স্বামী গ্রহণ করে তাহলে উক্ত ধরণের সমস্যাসহ আরো নানাবিধ সমস্যার উদ্ভব ঘটবে এবং এতে মানবিক ও সামাজিক বিপর্যয় দেখা দিবে। এ কথা বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীতে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা কম। এরপর যুদ্ধে এবং নানা ধরণের কঠিন দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পুরুষরা অধিক সংখ্যক মৃত্যুবরণ করে। পৃথিবীতে শিশু মৃত্যুর হারও কন্যার তুলনায় পুত্রের বেশী, কারণ পুত্র শিশুর তুলনায় কন্যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী। নারীর তুলনায় পুরুষের গড় আয়ূ কম এবং পুরুষের মৃত্যুর হার বেশী এবং পৃথিবীতে বিধবার সংখ্যাও বেশী। আমেরিকায় পুরুষের তুলনায় নারীরসংখ্যা ৮ মিলিয়ন বেশী, শুধু নিউইয়র্ক সিটিতেই পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা এক মিলিয়ন বেশী। বৃটেনে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় ৫ মিলিয়ন বেশী। রাশিয়ায় পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা প্রায় ১০ মিলিয়ন বেশী। জার্মানীতে নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায়

৬ মিলিয়ন বেশী। এরপরও পশ্চিমা বিশ্বে রয়েছে সমকামী। যাদের সংখ্যা শুধু আমেরিকাতেই ২৬ মিলিয়ন। এরা নারীদের বিয়ে না করে এক পুরুষ আরেক পুরুষকে বিয়ে করে।

শুধু আমেরিকাতেই একজন পুরুষ যদি একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে তাহলে সেখানে ৩০ মিলিয়ন নারীর ভাগ্যে স্বামী জুটবে না। ঠিক একইভাবে বৃটেনে ৪ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না, রাশিয়ায় ১০ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না, জার্মানে ৬ মিলিয়ন নারী স্বামী পাবে না। পুরুষের পক্ষে যদি একাধিক বিয়ের অনুমোদন না থাকে, তাহলে বিশ্বের অতিরিক্ত নারীর ভাগ্যে কি ঘটবে?

এ ক্ষেত্রে স্বামী না পাওয়া নারীদের জন্যে মাত্র দুটো পথ উন্মুক্ত থাকে, যার একটি সম্মানজনক আরেকটি অত্যন্ত ঘৃণিত। স্বামী না পাওয়া নারী বিবাহিত পুরুষের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজনের স্ত্রী পরিচয়ে নিজের সম্মান- মর্যাদা রক্ষা করে ইজ্জত আব্রুর সাথে জীবন যাপন করবে। এ ক্ষেত্রে সতীন থাকলেও সে নারী থাকবে সুরক্ষিত এবং নিরাপদ। দ্বিতীয় পথটি হলো, সে নারী নিজেকে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করবে। নারীর সম্মান- মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে তাকে গণসম্পত্তি হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্যেই ইসলাম পুরুষের জন্যে একাধিক বিয়ের পথ উন্মুক্ত রেখেছে এবং নারীর একত্রে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ করেছে।

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনে নারী

ইসলাম নারীর প্রতি এই পৃথিবীর সর্বাধিক কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেছে। নারীকে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়নি। পুরুষকে অর্থোপার্জনে বাধ্য করা হয়েছে ফলে পুরুষ অর্থ- সম্পদ উপার্জনের লক্ষ্যে দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়ায় এবং বহু কষ্টে প্রবাস জীবন- যাপন করে। পুরুষকে অত্যন্ত জটিল সমস্যার মোকাবেলা করে অর্থোপার্জন করতে হয়। ইসলাম পুরুষকে এসব জটিল কাজে বাধ্য করলেও নারীকে এসব ঝামেলায় জড়াতে বাধ্য করেনি বরং নিরুৎসাহিত করেছে।

কিন্তু সবথেকে যে কঠিন কাজটি নারীকে করতে বাধ্য করেছে তাহলো, আদর্শ মানব তথা সুনাগরিক গড়া। মা হলো আদর্শ মানব এবং সুনাগরিক গড়ার কারখানা। কেবলমাত্র একজন সুশিক্ষিত ও সচেতন মা-ই পারে তার সন্তানকে সভ্য, নম্র, বিনয়ী, চরিত্রবান, গর্ব- অহঙ্কার মুক্ত, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, দেশ প্রেমিক ও মানব দরদী হিসেবে গড়ে তুলতে। মা নামক এই কারখানা থেকে যদি আদর্শ মানব সমাজ ও দেশে সরবরাহ করা হয়, তাহলে সে সমাজ, দেশ ও জাতি হবে দুর্নীতি মুক্ত, শোষণ মুক্ত, ভীতিহীন নিরাপত্তপূর্ণ আদর্শ মানব সমাজ।

দেশ ও জাতিকে দুর্নীতির কলুষ মুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত এবং ইনসাফে পরিপূর্ণ করতে হলে নারী জাতিকে কোরআন- হাদীসের ভিত্তিতে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। এ ধরণের মায়েদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও পরম আদরে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেসব নাগরিক তৈরী হবে তারাই দেশকে অত্যন্ত দ্রুত উন্নতির উচ্চ সোপানে পৌছে দিবে।

সুতরাং অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে হলে পুরুষদের পাশাপাশি নারী সমাজকেও অগ্রসর করাতে হবে। শিক্ষাকে গণমুখী করে কোরআন-হাদীসের আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে এবং এই শিক্ষাকে করতে হবে সহজ লব্ধ ও ব্যয়হীন। পৃথিবীতে যে দুটো জিনিস সবথেকে সহজলভ্য করা প্রয়োজন ছিলো, তাহলো একটি শিক্ষা ও অপরটি চিকিৎসা। কিন্তু তা না করে মানব সম্পদ উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উক্ত বিষয় দুটোকে করা হয়েছে সবথেকে বেশী জটিল এবং ব্যয়বহুল।

বিলাস সামগ্রী এবং মারণাস্ত্রের উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে মানুষের একান্ত প্রয়োজনের দিকসমূহের ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র থেকে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের পরাধীনতার পূর্ব পর্যন্তও ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিচারপ্রার্থীর জন্য বিচার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ খরচ মুক্ত ছিলো। শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপকরণসহ তার পোশাক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্র সরবরাহ করতো। ৬০- ৭০ এর দশকেও স্কুলগুলোয় ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দুধ, ঘী ও নানা ধরণের রোগের প্রতিষেধক বিনামূল্যে দেয়া হতো। সুতরাং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বন্ধ করে, কম গুরুত্বপূর্ণ খাতে ব্যয় কমিয়ে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিয়ে হলেও শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। কোরআন- হাদীসের ভিত্তিতে রচিত শিক্ষা নারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার ঘটিয়ে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলে তাদের অধিকারের জন্যে নিত্য- নতুন কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না, নিজের অধিকার তারা নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সাথে তাঁরা দেশ ও জাতিকে আদর্শ নাগরিক সরবরাহ করে দেশকে যে কোনো ধরণের অনাচার থেকে মুক্ত রাখার কঠিন দায়িত্বও পালন করতে পারবে।

উত্তরাধিকার আইনে নারীর অধিকার

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধপূজারীরা আরেকটি হাস্যকর অভিযোগ তুলে থাকেন যে, পুত্র সন্তানের তুলনায় কন্যা সন্তানকে পিতার সম্পত্তি অর্ধেক দিয়ে এবং দুইজন নারীর সাক্ষ্যকে একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান করে ইসলাম নারীর প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করেছে। এসব দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন অন্ধদের অবস্থা হয়েছে 'কলুর বলদের' অনুরূপ। চোখে তারা পাশ্চাত্যের ঠুলি পরে ইসলামকে দেখে থাকে। ইসলাম পিতার সম্পদে

পুত্রের তুলনায় কন্যাকে অর্ধেক দিয়েছে এ কথা অবশ্যই সত্য, কিন্তু কেনো অর্ধেক দিয়েছে এবং এর মুল কারণ সম্পর্কে কি কখনো তারা নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করে দেখেছেন? পূর্বের বদ্ধমূল ধারণা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরাধিকারের উক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি তারা চিন্তা করতেন, তাহলে এ দাবী তুলতে বাধ্য হতেন যে, আমরাও নারীর অনুরূপ অধিকার চাই। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পূর্বে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা আলোচনা করতে চাই।

একটি বিষয় স্পষ্ট যে, পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত ধর্মের নামে প্রচলিত যে সকল মত ও পথ রয়েছে, এর কোনো একটিতেও তার অনুসারী নারীদেরকে উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সম্পদ লাভের অধিকার দেয়া হয়নি। হিন্দু আইনে যে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে করে একজন নারীর পক্ষে উত্তরাধিকারিণী হিসেবে সম্পদ লাভ করা অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার। বৌদ্ধ, জৈন, ও শিখ সম্প্রদায়ে পৃথক উত্তরাধিকার আইন নেই। ভারতীয় বৌদ্ধ, জৈন ও শিখ সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার ভারতীয় হিন্দু আইনে শাসিত ও আওতাভুক্ত বলে এসব ধর্মের অনুসারী নারীদের পক্ষেও সম্পদের অধিকারিণী হওয়া প্রায় অসম্ভব। ইয়াহূদী ধর্মেও নারীকে উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য করা হয়নি। খৃষ্টীয় আদর্শ হিসেবে বর্তমানে যা প্রচলিত রয়েছে সেখানেও উত্তরাধিকার আইনে নারীর প্রতি ইনসাফ করা হয়নি। ফরাসী আইনে বিবাহিত নারীরা ১৯৬৫ সালের পূর্বে আইনগত ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃত ছিলো না। পশ্চিমা দেশসমূহে মাত্র কিছু দিন পূর্বে নারীর অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

অথচ ইসলাম নারীকে সার্বিক দিক দিয়ে সম্মান- মর্যাদা প্রদর্শন ও তাঁর ন্যায্য অধিকার দিয়েছে সপ্তম শতাব্দীতে। যেসব দেশ মাত্র বিগত দেড় শতাব্দী পূর্বে মানবাধিকার, নারীর অধিকার, সভ্যতা- সংস্কৃতি ও জ্ঞান- বিজ্ঞানের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে, তারাই নারীর সমঅধিকারের জিগির তুলে নারীকে সম্মান মর্যাদার আসন থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে যৌনদাসীতে পরিণত করেছে। কেড়ে নিয়েছে তাদের কাছ থেকে সম্মান- মর্যাদা ও ইজ্জত আব্রু রক্ষার অধিকার। নারীকে করেছে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত এবং সন্তানকে মায়ের স্নেহের পরশ থেকে বঞ্চিত করে শিশু অধিকারের প্রতি বিদ্রূপ করেছে।

ইসলাম কন্যা সন্তান এবং পুত্র সন্তানের দায়িত্বের পরিধি অনুযায়ী পৈতৃক সম্পদে কন্যা ও পুত্র সন্তানের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে। পবিত্র কোরআনে সম্পদে যাদের অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে মাত্র চারজন পুরুষ এবং অবশিষ্ট আটজনই নারী। ইসলাম কন্যার অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যা কেবলমাত্র কন্যাগণই

পাবে। অথচ একই মাতাপিতার সন্তান হবার পরেও পবিত্র কোরআনে পুত্রের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে 'যাবিল ফুরুজ' এর অন্তর্ভুক্ত না করে 'আসাবা' হিসেবে রাখা হয়েছে। 'যাবিল ফুরুজ' বলতে তাদেরকেই বুঝায় যাদের জন্য অংশ নির্ধারিত এবং নির্ধারিত অংশ পাবার পরও অবশিষ্ট সম্পত্তি যারা পায়। 'যাবিল ফুরুজ' বর্তমান না থাকলে যারা সমগ্র সম্পত্তির অধিকারী হয় তাদেকে 'আসাবা' বলা হয়। ইসলাম উত্তরাধিকার আইনে পুত্রের অংশ পাবার ব্যাপারে কন্যার অংশকেই প্রকৃত ভিত্তি হিসেবে সাব্যস্ত করে পুত্রের তুলনায় কন্যার অধিকারকেই প্রাধান্য দিয়েছে।

পবিত্র কোরআনের সূরা নিসায় উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনে যা কিছু বলা হয়েছে তাতে দেখা যায়, নারী কোনো ক্ষেত্রে পুরুষ অপেক্ষা বেশী পায়, কখনো কম পায় আবার কখনো সমান পায়। যেমন পিতার ইন্তেকালের পর পুত্র দুই ভাগ পেলে কন্যা পায় এক ভাগ। আবার সন্তানের সম্পত্তিতে মাতাপিতা উভয়েই এক এর ছয় ভাগ পায়। এক্ষেত্রে নারী পুরুষ সমান অংশ পায়। ভাইবোন দূরবর্তী কোনো আত্মীয়ের উত্তরাধিকার হলে উভয়ে এক এর ছয় ভাগ পায় অর্থাৎ সমান অংশ পায়। আবার সন্তান যদি শুধু মাত্র কন্যা ও পিতাকে রেখে ইন্তেকাল করে, তাহলে পিতার সম্পদে কন্যা পায় এক এর দুই অংশ এবং পিতা পায় এক এর ছয় অংশ।

প্রশ্ন সমঅধিকারের নয়, ইনসাফের। কি পরিমাণ সম্পত্তি কে কতটুকু পেলো আর কে পেলো না, এ দ্বারা কারো সম্মান- মর্যাদা নির্ণয় করা হয় না। দৃষ্টি দিতে হবে ন্যায্য পাওনা ও দায়িত্বভারের দিকে। ইসলাম নারীর প্রতি কোনো কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করেনি। যা কিছু তা পুরুষের কাঁধে অর্পিত হয়েছে। দৈহিক গঠন, দেহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, মানসিক শক্তি ইত্যাদি কারণে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল এবং এসব কারণেই নারীকে দূরহ বোঝা বহন থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে। যে ওজনের বোঝা বহন করার জন্যে একজন বা দুইজন পুরুষই যথেষ্ট, তা একজন বা তিন চারজন নারীর পক্ষে দৈহিক কারণেই সম্ভব নয়।

দশজন নারীকে প্রহরা দেয়ার জন্যে দুইজন পুরুষ যথেষ্ট হলেও দশজন পুরুষকে প্রহরা দেয়ার জন্যে পাঁচজন নারী যথেষ্ট নয়। শত্রুদল কর্তৃক নারীদের আক্রমণ আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকলে সেখানে নারী ব্যতীত পুরুষ যদি না থাকে, তাহলে তাদের নিরাপত্তার জন্যে যতজন পুরুষ আক্রামণকারী থাকে সমসংখ্যক নারী দেয়া হবে না। বরং কয়েকগুণ বেশী সংখ্যক নারীকে নিরাপত্তার জন্যে দেয়া হবে। এ বিষয়টি নারীকে অবমূল্যায়ন করা বা অসম্মানিত করার জন্যে নয়, বরং তাদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তা করা হবে।

ইসলাম পুরুষের প্রতি আর্থিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে এবং কারণেই বোনের তুলনায় ভাইকে পিতার সম্পদে বেশী দিয়েছে। পিতার ইন্তেকালের পরে পরিবারের সকল সদস্য তথা বোনদেরও ভরণ- পোষণের জন্য দায়িত্ব ভাইয়ের প্রতি অর্পণ করা হয়েছে। ভাই বিবাহিত হলে স্ত্রীকে মোহ্‌রানা দিতে হবে এবং তাঁর নিজের সন্তান-সন্ততি থাকলে তাদের ভরণ- পোষণের ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। পিতা বা মাতার পক্ষের আত্মীয়-স্বজন থাকলে তারা বাড়িতে এলে তাদের জন্যে যা কিছু খরচ তা ভাইকেই করতে হবে। নিজ স্ত্রীর আত্মীয়- স্বজন এলেও তাকেই খরচ করতে হয়।

কোনো ব্যক্তি এক পুত্র এবং দুই কন্যা ও স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করলো। পুত্র তার পিতার সম্পদ থেকে বেশী সম্পদ পেলো। দুই বোন ও মা যা কিছু পেলো, এগুলো রিজার্ভ ফান্ডের মতোই রয়ে গেলো। কারণ ভাই এ কথা বলতে পারবে না যে, 'তোমরা যে যার অংশ পেয়েছো আমিও আমার অংশ পেয়েছি। এখন তোমরা তোমাদের অংশ দ্বারা নিজেদের ব্যয়ভার বহন করো, আমি তোমাদের কারো ব্যয়ভার বহন করতে পারবো না।' এ কথা বলার অধিকার ইসলাম ভাইকে দেয়নি এবং দুই বোন ও মায়ের সম্পত্তিতে হাত বাড়ানোর অধিকারও তাকে দেয়া হয়নি। ভাইকেই উপার্জন করে বোন ও মায়ের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে হবে, নিজ বিয়ের সময় পিতার পক্ষ থেকে পাওয়া অথবা নিজের উপার্জিত সম্পদ দিয়েই স্ত্রীর মোহ্‌রানা পরিশোধ ও বিয়ের খরচ যোগাতে হবে। বোন, মা ও স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যয়ভারও ভাইকেই বহন করতে হবে। বোনরা যদি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চায় তাহলে সে খরচও ভাইকেই বহন করতে হবে এবং বোনদের বিয়ের খরচও বহন করতে হবে।

বাড়িতে কোনো মেহ্‌মান এলে বা অন্য যে কোনো খরচ একমাত্র ভাইকেই করতে হয়। বোন বিয়ের সময় স্বামীর কাছ থেকে মোহ্‌রানা পায়, স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়। বোন তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ভাইয়ের বাড়িতে এলে সকল খরচ ভাইকেই বহন করতে হয়। বোন যদি উপার্জন করে, তাঁর উপার্জিত অর্থ- সম্পদে স্বামীসহ অন্য কাউকে অধিকার দেয়া হয়নি। এভাবে নারীকে ইসলাম বিভিন্ন দিক থেকে পুরুষের তুলনায় যেমন অধিক লাভবান করেছে তেমনি তাকে দায়িত্ব বহন থেকেও মুক্ত রেখেছে। সুতরাং ইসলাম নারীকে উত্তরাধিকারে ঠকায়নি, বরং পুরুষের তুলনায় বেশী দিয়েছে।

আর সাক্ষীর বিষয়টি সকল ক্ষেত্রে একজন পুরুষের তুলনায় দুইজন নারীর সাক্ষ্য সমান- এটা ইসলামের বিধান নয়। ইসলাম পরিবেশ- পরিস্থিতি ও অবস্থা অনুযায়ী

ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। ইসলাম কঠোরতা পছন্দ করে না, মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যমূলক জীবন বিধান দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম ঘোষণা করেছে-

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান, যা তোমাদের জন্যে কষ্টকর তা চান না। (সূরা বাকারা- ১৮৫)

هُوَ اجْتَبٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ-

আল্লাহ তা'য়ালা ইসলামী জীবন বিধানে তোমাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেননি। (সূরা হজ্জ- ৭৮)

وَخُلِقَ الانْسَانُ ضَعِيْفًا-

মানব সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল, এ জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। (সূরা নিসা- ২৮)

'কোনোভাবেই ক্ষতিকর হবে না এবং হয়রান করা হবে না' এই হাদীসকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেই এরই ভিত্তিতে কোরআন- হাদীসের আলোকে ইসলামী জীবন বিধানের নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। নবী করীম (সাঃ) একাধিকবার নির্দেশ দিয়েছেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার বিধানকে কখনো কঠোর করবে না, আল্লাহর বিধান খুবই সহজ এবং তা মানুষের কাছে সহজভাবেই বর্ণনা করবে। কারো প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করবে না।'

এ জন্যেই ক্ষেত্র বিশেষে অত্যন্ত যুক্তি-সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক কারণে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে। আবার কখনো পুরুষের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে একজন নারীর সাক্ষ্যকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। শিশুর জন্ম, নারীদেহের ত্রুটি, আঘাত জনিত ঘটনা এবং ধর্ষণ জনিতসহ অন্যান্য বিষয়ে নারীর সাক্ষ্যই পুরুষের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য করা হয়েছে। কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করলে সে ক্ষেত্রে একজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান।

যেসব ক্ষেত্রে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে সেসব বিষয় একান্তভাবেই ধির স্থিরতা, ধৈর্য্য, সাহস, অদূরদর্শিতা, অকম্পিত চিত্ত, দৃঢ়তা এবং পর্যবেক্ষণ ও স্মৃতিশক্তি জনিত। একজন নারীর সম্মুখে যদি কোনো মানুষকে জবেহ

করা হয়, তাহলে ঐ লোমহর্ষক দৃশ্যের কারণে এবং ঘটনার আকস্মিকতায় নারীর পক্ষে ভয়-বিহ্বলা হয়ে জ্ঞান হারানোর সম্ভাবনা সর্বাধিক। যদি প্রমাণ হয় যে, ঘটনার সময় উক্ত নারী ভয়-বিহ্বলা হয়ে পড়েছিলো, সাহস হারিয়ে ছিলো, তার হৃদ কম্পন দেখা দিয়েছিলো সর্বোপরি খুনের দৃশ্য দেখে জ্ঞান হারিয়ে ছিলো। তাহলে ঘটনার সময় উপস্থিত থাকলেও উক্ত নারীর সাক্ষ্য কি গ্রহণযোগ্য হবে? কিন্তু একজন পুরুষ ঘটনার সময় উপস্থিত থাকলে যদি সে নিজেকে সুস্থ রাখতে পারে, তাহলে তার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। পরিবেশ পরিস্থিতি প্রমাণ করেছে যে, এ ধরণের ঘটনা ঘটলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারী নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না, কিন্তু পুরুষ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে।

বৈজ্ঞানিকভাবেই প্রমাণিত যে, নারীর স্মৃতিশক্তি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি পুরুষের তুলনায় বহুল দুর্বল। মুসলিম পরিবারে কোরআন তিলাওয়াতের দিক থেকে নারীরা প্রথম কাতারে রয়েছে। কিন্তু কোরআন মুখস্থ করার দিক থেকে তারা পেছনের কাতারে রয়েছে। কোরআন প্রতিদিন তিলাওয়াত করলেও নারীর পক্ষে সহজে হাফেজ হওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রতিদিন কোরআন তিলাওয়াত না করলেও পুরুষের পক্ষে স্মৃতি-সম্ভারে কোরআন অঙ্কিত করা খুবই সহজ। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকেও পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বল। এসব যুক্তি-সঙ্গত ও বৈজ্ঞানিক কারণেই ক্ষেত্র বিশেষে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান করা হয়েছে। অন্য দিকে ক্ষেত্র বিশেষে একজন নারীর সাক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে নারী ও পুরুষের প্রতি ইনসাফ করা হয়েছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায়- নারী যৌনদাসী

শুধু মানব সম্প্রদায়েই নয়, সমগ্র প্রাণীকুলেই বংশবৃদ্ধির জন্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ জন্য সৃষ্টিগতভাবে উভয়কে বিপরীত গুণ-বৈশিষ্ট্য দান করে সৃষ্টিসমূহে স্থিতিশীলতা ও ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীসমূহের প্রতি পৃথিবীর কোনো বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়নি। অন্যান্য প্রাণী তাদের জন্যে নির্ধারিত যেখানে যা কিছু পাচ্ছে তাই আহার করছে, বিপরীত লিঙ্গের সাথে মিলিত হচ্ছে এবং মিলিত হবার ক্ষেত্রেও তারা কোনো পার্থক্য করছে না, অর্থাৎ এ ব্যাপারে তারা কোনো নিয়ম-নীতির অধীন নয়। সবকিছু শেষে নির্ধারিত সময়ে অন্যান্য সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করছে।

কেবলমাত্র মানুষকেই এর বিপরীত করা হয়েছে। মানুষের সকল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্যে রয়েছে কিছু নিয়ম-নীতি এবং পার্থক্য বোধ। এই পৃথিবী এবং

এর মধ্যে যা কিছুই রয়েছে সকল কিছুর প্রতিই তার দায়িত্ব- কর্তব্য রয়েছে। মানুষের জন্যে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে। সেই সাথে বংশবৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে কতক পুরুষ ও কতক নারীকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বাইরে কোনো পুরুষ বা নারী ইচ্ছে করলেই কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না, করলে তা হবে নিয়ম- নীতির বিপরীত তথা অবৈধ। প্রাণীকুলের জন্যে বৈধ ও অবৈধতার সীমারেখা নির্দিষ্ট করা হয়নি, কিন্তু মানুষের জন্যে তা করা হয়েছে। প্রাণীকুলের জন্যে লজ্জার আবরণ দেয়া হয়নি, কিন্তু সুষ্ঠু সভ্যতা- সংস্কৃতি বিনির্মাণে ও বিপর্যয় এড়াতে মানুষের জন্যে লজ্জার আবরণ দেয়া হয়েছে।

জন্তু- জানোয়ারের অনুরূপ মানুষও যদি যৌন সম্পর্ক স্থাপনে লজ্জার আবরণ ও নিয়ম- নীতি দূরে নিক্ষেপ করে, তাহলে সে মানুষ আর পশুর মধ্যে স্বভাবগত দিক থেকে কোনোই পার্থক্য থাকে না। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে এ প্রকৃতি সম্পন্ন মানুষকে পশুর তুলনায় অধিক বিভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন—

أُولَـٰئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ—

এরা হচ্ছে জন্তু- জানোয়ারের মতো, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের চাইতেও এরা বেশী বিভ্রান্ত। (সূরা আ'রাফ- ১৭৯)

কিন্তু দুঃখজনক হলেও এ কথা সত্য যে, মানব ইতিহাস এ কথা প্রমাণ করে, ইসলামী জীবন দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন মানব সম্প্রদায় আচরণগত দিক থেকে পশুর তুলনায় অধিক নীচতার পরিচয় দিয়েছে এবং বর্তমান সময় পর্যন্তও দিচ্ছে। হাজার হাজার বছর অতীতে নারী-পুরুষে সম্পর্ক স্থাপনের দিক দিয়ে যেমন কোনো পার্থক্য করা হয়নি, তোয়াক্কা করা হয়নি কোনো ধরণের নিয়ম- নীতির, প্রয়োজনে বিপরীত লিঙ্গ ত্যাগ করে সমলিঙ্গের প্রতিই উন্মত্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক তেমনি বর্তমানেও অনুরূপ আচরণ করা হচ্ছে।

অধিক ঘৃণিত বিষয় হলো, অতীত জনগোষ্ঠী কখনো সমলিঙ্গের কাউকে বিয়ে করেছে বলে ইতিহাস প্রমাণ করতে না পারলেও তাদেরকে পশ্চাৎপদ, মূর্খ, অনগ্রসর ইত্যাদি অভিধায় অভিযুক্ত করতে যারা অগ্রগামী, তারাই সমলিঙ্গের সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং পার্লামেন্টে তথাকথিত আলোকিত লোকদের দ্বারাই উক্ত আইন অনুমোদিত হচ্ছে।

অতীতে ইসলাম বিবর্জিত মানব সভ্যতা যেমন নারী- পুরুষে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে 'যৌন আকাঙ্খা পূরণই' জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পরিণত করে নারীকে পারিবারিক বন্ধন মুক্ত করে রাস্তায় নামিয়ে তার যৌবনকে লেহন করেছে, সেই একই উদ্দেশ্যে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাও আধুনিক কৌশলে নারীকে পথে বের করেছে। অতীত এবং বর্তমানের পার্থক্য শুধু মাত্র কৌশলে, উদ্দেশ্যে কোনোই পার্থক্য নেই। অতীতে নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তাকে যৌনদাসীতে পরিণত করা হয়েছিলো, বর্তমানে এমন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে যে, নারী যেনো স্বেচ্ছায় তার যৌবনকে পুরুষের জন্যে গণসম্পত্তিতে পরিণত করতে বাধ্য হয়।

এই ঘৃণিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যৌনতার পূজারীরা সমঅধিকার ও নারী স্বাধীনতার আলখেল্লা গায়ে জড়িয়েছে। পূজিবাদী অর্থব্যবস্থার কারণে উপার্জনের ক্ষেত্র করা হয়েছে সঙ্কুচিত এবং ব্যয়ের ক্ষেত্র করা হয়েছে প্রসারিত। ফলে বাধ্য হয়েই নারী ও পুরুষ উভয়কেই জীবন ধারণের প্রয়োজনে উপার্জনের জন্যে পথে বের হতে হয়েছে। ক্রমশ পরিবার প্রথা ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে, অবাধ যৌনতার সুযোগ সৃষ্টি করে বিয়ের প্রতি অনাগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে, প্রত্যেক মুহূর্তে দৃষ্টির সম্মুখে যৌন উপকরণ সহজলভ্য করে মস্তিষ্কের যৌন গ্রন্থি উত্তেজিত রেখে মানুষকে পশু-সুলভ আচরণে বাধ্য করা হয়েছে। ফলে শুধু মাত্র আমেরিকাতেই প্রতি এক মিনিটে ৪২ জন নারী ধর্ষন ও যৌন নির্যাতনের শিকারে পরিণত হচ্ছে।

বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা সবথেকে ক্ষমতাধর, গণতান্ত্রিক, সুশাসিত, সুসভ্য ও উন্নত দেশ হিসেবে দাবী করে। মানবাধিকার, সমঅধিকার, নারী-শিশু অধিকারসহ অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারে তারাই জিরাফের মতো গ্রীবা বাড়িয়ে সবথেকে বেশী চিৎকার করে। সেই দেশেই নারী সবথেকে বেশী অরক্ষিত এবং প্রতি মিনিটে ৪২ জন নারী সেখানে কামনা তাড়িত পুরুষের লালসার শিকারে পরিণত হয়। তাহলে অন্যান্য পশ্চিমা দেশসমূহের কি অবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। আমেরিকায় মাত্র একদিনে যে অপরাধ সংঘটিত হয়, সৌদী আরবে তা সারা বছরেও হয় না। কারণ সেখানে বেশ কিছু ইসলামী বিধি- বিধান কঠোরভাবে কার্য্যকর রয়েছে এবং এ কারণেই জাতীয়ভাবে যৌন উচ্ছৃংখলা পরিহার করে নাগরিকদের জীবন পরিচালিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় জাতীয় উন্নয়ন ও সমঅধিকারের নামে সকল ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি বসতে বাধ্য করা হয়েছে। পরিবার রক্ষা ও গঠনে নিরুৎসাহিত

করা হয়েছে, সন্তান প্রতিপালনে সৃষ্টি করা হয়েছে অনাগ্রহ, লজ্জা নামক নারীর ভূষণকে 'সজোরে দূরে নিক্ষেপের বিষয়' এ পরিণত করা হয়েছে, সান বাথের নামে সমুদ্রের বেলাভূমিতে নারীকে উলঙ্গ করে পুরুষকে যৌন উন্মাদে পরিণত করা হয়েছে, ব্যাপক আকারে যৌন উত্তেজক সামগ্রীর উৎপাদন ঘটানো হয়েছে, নিজেরা পায়ে মোজা তার ওপরে জুতা, পায়ের গোড়ালীর নীচ থেকে কণ্ঠনালী ও হাতের কব্জি পর্যন্ত পোশাকে আবৃত করে নারীর সকল কিছু অনাবৃত করার মতো পোশাকের নামে টুকরো কাপড়ের ব্যবস্থা করেছে, প্রয়োজনে সে টুকরো কাপড়ও দূরে নিক্ষেপের ইচ্ছা সৃষ্টি করা হয়েছে। নারীকে পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে পরিণত করা হয়েছে।

এরপরেও যৌন দেবতার পাশ্চাত্যের পূজারীরা ক্ষান্ত হয়নি, নারীর যৌবনকে লেহন করার কোনো এক পর্যায়ে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হলে সমলিঙ্গের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থাও করে তা আইনগতভাবে অধিকারে পরিণত করেছে, যৌন উত্তেজক উপকরণ কারণবশত উত্তেজনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হলে যৌন ক্রিয়াকর্মের বাস্তব দৃশ্য টিভি চ্যানেল, সিডি, ভিসিডি, ইন্টারনেট, ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে ও পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে দৃষ্টির সম্মুখে তা দৃশ্যমান করে উত্তেজনা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘৃণিত এসব দৃশ্য অত্যন্ত সহজলভ্য করার জন্যে মুষ্ঠিবদ্ধ মোবাইল ফোন সেটেও সরবরাহ করা হয়েছে। যেনো শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের মানুষই এই নোংরা সাগরে স্নান করে নিজেকে তৃপ্ত করতে পারে।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় এভাবে সকল ক্ষেত্রেই যৌনতাকে প্রাধান্য দিয়ে মানুষকে পশুস্তরে নামিয়ে দিয়ে নারীকে করা হয়েছে যৌনদাসী। মুসলিম দেশসমূহ এখন পর্যন্ত বহুলাংশেই পাশ্চাত্যের ঐ নোংরা প্রভাব থেকে সংরক্ষিত রয়েছে। এখন পর্যন্ত মুসলিম দেশসমূহে পরিবার প্রথা ও বিয়ের প্রথা অটুট রয়েছে। মুসলিম নারী লজ্জাকে ভূষণ হিসেবেই রক্ষা করছে, নিজের সতীত্বকে প্রাণ দিয়ে হলেও তারা রক্ষা করে, আদর্শ মানব ও সুনাগরিক গড়ার লক্ষ্যে তারা সন্তান প্রতিপালনকেই প্রাধান্য দেয়, পারিবারের প্রতি আনুগত্যশীল থেকে তারা আত্মীয়তার বন্ধনকে অটুট রেখেছে, পরিবারের ছোট বড় ও বয়স্ক সদস্যদের মায়া-মমতা, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে জড়িয়ে রেখেছে, অবাধ মেলামেশা ও যৌনতাকে তারা এখন পর্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে, বিয়ে ব্যতীত যৌন সম্পর্ককে তারা চরম গর্হিত কাজ বলে মনে করে। মুসলমানদের এসব বিষয় পাশ্চাত্যের কাছে অসহনীয় এবং এ কারণেই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষনা করেছে, 'পৃথিবীতে শান্তি ও স্বস্তির সাথে বসবাস করতে হলে অবশ্যই আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে হবে।'

তাদের অবস্থা হয়েছে সেই লেজকাটা শিয়ালের মতো। ধোপা বাড়ির উচ্ছিষ্ট খেতে গিয়ে লেজ খোয়ানোর বিষয়টি সে জ্ঞাতী ভাইদের কাছে গোপন করেছিলো। লোভকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের লেজ হারিয়ে নিজের অপরাধ ঢাকার জন্যে নিজেকে লেজহীন মানুষের ন্যায় মর্যাদাবান হিসেবে দাবী করে অন্য শিয়ালদেরকেও লেজ কেটে মর্যাদা অর্জন করার কুপরামর্শ দিয়েছিলো সুশীল শিয়াল।

পাশ্চাত্যের নোংরা সভ্যতার অন্ধ পূজারীরাও লেজকাটা শিয়ালের মতোই কূট-কৌশল এঁটেছে। পশু- প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নিজেদের যে সর্বনাশ তারা করেছে, এই ক্ষতি নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তা রফতানী করার উদগ্র বাসনা বাস্তবায়ন করার জন্যে মুসলিম দেশসমূহে তাদের বরকন্দাজদের মাধ্যমে নানা ধরণের নীতিমালা ও অধিকারের নামে বাস্তবায়ন করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মুসলিম নামধারী এসব উচ্ছিষ্ট ভোগীরাও কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার ক্ষেত্র তাদের জন্যে উর্বর হলেও মুসলমানদের ময়দান উর্বর নয়, এ কথা অনুধাবন করতে তারা ভুল করেছে। সময় থাকতে বিষয়টি অনুভব করলেই তারা নিজেদের জন্য কল্যাণকর প্রস্থানের পথ সম্মুখে খোলা দেখতে পাবেন, নতুবা যে পথেই প্রস্থান করার জন্যে পা বাড়াবেন, সম্মুখে দেখতে পাবেন ধ্বংস গহ্বর- যা অন্ধকার অতলান্ত গুহায় গিয়ে মিশেছে।

সমঅধিকার বা নারী স্বাধীনতা বলতে কি বুঝায়?

এ কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, ইসলাম নারী- পুরুষের সমঅধিকারে নয়- ন্যায্য অধিকারে বিশ্বাসী। ইসলাম নারী-পুরুষ তথা সকলের জন্যেই ইনসাফ বা ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে এবং তা কায়েম হবার জন্যেই এসেছে। সৃষ্টিগতভাবে যাকে যে যোগ্যতা প্রদান করা হয়েছে, সেই যোগ্যতা অনুযায়ীই প্রত্যেকে প্রত্যেকের অধিকার বুঝে পাবে এবং এ ব্যবস্থা কেবলমাত্র কালজয়ী আদর্শ ইসলামী জীবন বিধানেই নিহিত রয়েছে।

আধুনিক বিশ্বে যারা নানা অধিকার পালনের জিগির তুলেছে এবং বিভিন্ন দিবস ঘোষণা করে তা ঘটা করে পালনের রেওয়াজ বের করেছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃষ্টিগতভাবে মানব প্রকৃতি ও সৃষ্টিসমূহের গতি-প্রকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। আর ঠিক এ কারণেই মানব সভ্যতাসহ সমগ্র বিশ্বে জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে মহাবিপর্যয় দেখা দিয়েছে। নানা বস্তুর মিশ্রণ ঘটিয়ে ক্ষতিকর গ্যাস ও পদার্থ আবিষ্কার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করা হয়েছে, চরম ক্ষতিকর মারণাস্ত্রের পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে পৃথিবীর ওজনস্তর ও আবহাওয়া বিনষ্ট করা

হয়েছে। অন্য দিকে মানব সৃষ্ট এই সমস্যার কারণ চাপানো হচ্ছে প্রকৃতির ওপর। আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে স্পষ্ট বলেছেন, 'বিপর্যয়কর যা কিছুই দেখছো তা তোমাদেরই হাতের উপার্জন করা।'

এবার নারী-পুরুষের সমান অধিকারের দাবীদারেরা লক্ষ্য করুন, নারী যদি দাবী জানায়, আমরা যেমন সন্তান ধারণ করি এখন থেকে পুরুষকেও সন্তান ধারণ করতে হবে, প্রসব বেদনা সহ্য করতে হবে, দুধপান করাতে হবে। গৃহস্থালী কাজে পুরুষকেও রান্না, কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, বিছানা করা, সন্তানকে স্কুলে আনা-নেয়া, মাছ- তরকারী কাটা, পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সেবাযত্ন করা সকল কিছুই আমাদের সাথে করতে হবে। নারীর সমঅধিকারের দাবীদার কি কখনো ভেবে দেখেছেন, এসব কাজ যথাযথভাবে করা কি পুরুষের পক্ষে সম্ভব হবে?

সমঅধিকারের অর্থ যদি এটা হয় যে, নারীও পুরুষের সম্মান- মর্যাদা লাভ করবে, শিক্ষা, ব্যবসা- বাণিজ্য, সামরিক- বেসামরকি স্থলে চাকরী, অর্থ- সম্পদে অধিকার, শিল্প- কলকারখানা স্থাপনের অধিকার, বুনন শিল্পে অংশগ্রহণ করে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নকশা তৈরীর অধিকার, সকল কর্মক্ষেত্রে অবদান রাখার অধিকার, নিজেদের মেধা ও মননশীলতা জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহার করার অধিকার, তাহলে এসব অধিকার ইসলাম নারীকে দিয়েছে এবং তা আমরা ইতোপূর্বে আলোচনাও করেছি।

ক্লাবে গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করা, পার্কে গিয়ে কোলের ওপর প্রেমিককে শুইয়ে রেখে চুলে বিলি দেয়া, লিভ-টুগেদার করা, বেইলী রোডের ফুটপথে, চন্দ্রিমা উদ্যানে ও ফ্লাই ওভারে জোড়ায় জোড়ায় একত্রে গা ঘেষে বসে যুবক- যুবতীর বাক- বাকুম করা, পুরুষ বন্ধুদের সাথে যেখানে খুশী সেখানে বেড়াতে যাওয়া, রাত কাটানো, কংফু- ক্যারাতের প্রশিক্ষণ নিয়ে রাস্তায় নেমে গাড়ি ভাংচুর করা, ইট- পাথর নিক্ষেপে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা, পুলিশকে কামড়ানো, মিছিলে এসে নিজেই নগ্ন হয়ে সমর্থক পত্রিকার ক্যামেরাম্যানের সম্মুখে পোঁজ দিয়ে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে 'নগ্ন' করার দোষ চাপানো, মাঠে- ময়দানে, স্টেডিয়ামে, অডিটোরিয়ামে কনসার্টের নামে নর্তন- কুর্দন করা, অবাধে মাদকদ্রব্য সেবন করা, প্রতি বছর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ভালোবাসা দিবসের নামে বিউটি পার্লারে গিয়ে আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিতা হয়ে রাস্তায় ও পার্কে ফুলের মালা বিনিময় করা, পহেলা বৈশাখে বাসন্তী রংয়ের শাড়ী পরে রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে পুরুষের সম্মুখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা, পুরুষ বন্ধুর সাথে ডেটিং করা, লং ড্রাইভে যাওয়া, একই সাথে অনেক পুরুষের সাথে

মোবাইল ফোনে সম্পর্ক সৃষ্টি করে সকলের কাছে প্রেমের বাণী এসএমএস করে সকলের কাছ থেকে উপহার নেয়া বা আর্থিকভাবে শোষণ করা, স্বামী- সন্তান ভাসিয়ে দিয়ে পরকিয়ায় জড়িয়ে পড়া, সন্ধ্যার পরে কোন্ পথ বা চত্বরে পুরুষ বন্ধুর সাথে বসে চিনা বাদাম চিবানো এসবই যদি নারী অধিকার বা নারীর সমঅধিকার হয়, তাহলে আমরা বিনয়ের সাথে আবেদন করছি, আমরা আমাদের সম্মানিতা মা- বোন ও কন্যাদের এসব অধিকার দিতে সম্পূর্ণ অপারগ।

এসব গর্হিত কর্মকান্ড কি নারীর সম্মান- মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে না নারীত্বের অবমাননা ঘটিয়ে তাকে ঘৃণার অতল তলদেশে নিক্ষেপ করেছে? আমাদের সম্মানিতা মা-বোনরা ও সচেতন সমাজ, বিষয়টি কি একটু ভেবে দেখবেন?

নারী অধিকারের নামে পাশ্চাত্যে সভ্যতার অন্ধ পূজারী ও তাদের এদেশীয় উচ্ছিষ্ট ভোগীরা নির্লজ্জভাবে সম্মানিতা মর্যাদাবান নারীকে SEX INDUSTRY বানিয়ে SEX WORKER এ পরিণত করেছে, এক কথায় এদেশের মানুষ যাদেরকে বেশ্যা নামে অভিহিত করে থাকে। পশ্চিমা প্রভুদের নিক্ষেপ করা হাড়চাটা এদেশীয় গোলামেরা সামান্য সুঁই- সুতো থেকে শুরু করে ব্যবসা যোগ্য সকল পণ্য-দ্রব্যের লেবেলে নারীকে ব্যবহার করেছে এবং তা প্রচারের জন্যেও তারা কেবলমাত্র নারীর সৌন্দর্য্যকেই একমাত্র পূজি হিসেবে গ্রহণ করেছে। চলচ্চিত্র নির্মাণের নামে, কণ্ঠশিল্পী বানানোর নামে, সুন্দরী প্রতিযোগিতার নামে, মডেল বানানোর নামে নারীর যৌবনকেই এরা অর্থোপার্জনের মাধ্যমে পরিণত করেছে। এতেও এদের অর্থোপার্জনের আকাঙ্খা যখন মিটেনি, তখন তারা তথাকথিত এসব নারী শিল্পীদের মাধ্যমে মাদক ও যৌন উত্তেজক দ্রব্যের ব্যবসা শুরু করেছে।

মায়ের জাতী নারীর প্রতি চরম এই অবমাননা এবং লজ্জানক আচরণের ব্যাপারে নারীবাদিরা কেনো কথা বলে না, তা কি সচেতন মহল ভেবে দেখেছেন?

বছরে একটি দিনকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে তা দেশে দেশে ঘটা করে নানা রংয়ে ও ঢংয়ে উদযাপন করে, সুসজ্জিতা নারীদের দিয়ে বড় বড় শহরগুলোয় র‍্যালি, শোভাযাত্রা বের করে, সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে, সভা সমাবেশের আয়োজন করে, গোল টেবিল বৈঠক, টিভি চ্যানেলে টক-শোজীবীদের দ্বারা টক-শো করিয়ে বা উদ্যাম নৃত্যের আয়োজন করে অথবা বিভ্রান্ত কবিদের দিয়ে কবিতার আসর বসিয়ে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করে কি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব?

বরং এই অর্থ দিয়ে দুস্থ্ নারী, যারা পথে পথে মাটির বোঝা বহন করে, ইট- পাথর ভাঙ্গে, ভিক্ষা করে, ক্ষেত- খামারে কাজ করে, জঠর জ্বালায় নিজেকে কামনা তাড়িত লম্পট পুরুষের কাছে বিক্রি করে, সব্জির বোঝা বহন করে দুয়ারে দুয়ারে যায়, এসব অভাবী নারীদের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নে ভূমিকা রাখা যায়। নারী অধিকারের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের যেসব সেবা দাসীদেরকে আমরা সোচ্চার দেখি, তারা বিউটি পার্লারে গিয়ে একদিনের মেকআপে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, সে অর্থ দিয়েও প্রতিদিন কয়েকজন দুস্থ্ নারী মোটা চালের ব্যবস্থা করে ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করতে পারে। সুতরাং মা- বোনদেরকে এসব নারীবাদীদের ছোবল থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিজের সম্মান- মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। ইসলাম নারীদেরকে কত বেশী অধিকার দিয়েছে তা জানার চেষ্টা করুন, আপনারা যদি জানতেন যে ইসলাম আপনাদেরকে কি অধিকার দিয়েছে, তাহলে আমার বিশ্বাস, আপনারাই সে অধিকার আদায়ের জন্যে পথে নামতেন।

দারিদ্র দূরীকরণের নামে কতিপয় এনজিওদের জাতিসত্তা বিরোধী ভূমিকা

পৃথিবীর কোনো একটি দেশেও এনজিও তৎপরতার মাধ্যমে দারিদ্র দূরীভূত হয়েছে, এমন প্রমাণ কেউ-ই দিতে পারবে না। মুসলমানদের নির্মূল করার লক্ষ্যে যারা নিত্য- নতুন অস্ত্র আবিষ্কার করে মুসলিম দেশসমূহ দখল ও সেখানে আবিষ্কৃত অস্ত্রের ধার পরীক্ষা করছে, নিজেরা পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হলেও মুসলমানদের এই অধিকার নেই বলে ঘোষণা করছে, সেই সব দেশের ধূরন্ধর নেতারা মুসলমানদের দারিদ্র দূর করার জন্যে কোনো ধরণের স্বার্থ ছাড়াই অর্থের পাইপ লাইন খুলে দিবে, এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?

প্রকৃত বিষয় হলো, মুসলমানদের পরিবার প্রথা, বিয়ে প্রথা, মুসলিম নারীদেরকে পর্দার আড়াল থেকে বের করে বেপর্দা করা, ইসলামের দৃষ্টিতে চরমভাবে ঘৃণিত সুদ প্রথা গ্রামে গঞ্জের রান্নাঘর পর্যন্ত পৌছানো, এক কথায় মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতি ধ্বংস করে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসারী বানানোই পশ্চিমা দুনিয়ার অর্থানূকুল্যে পরিচালিত অধিকাংশ এনজিও সমূহের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

এসব এনজিও ঋণের বেড়াজালে গরীব মুসলিম নারী-পুরুষকে আবদ্ধ করে সুযোগ বুঝে তাদেরকে কাজে লাগায়। ইসলাম বিরোধী কোনো নীতিমালা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে যখন তারা কোনো সভা- সমাবেশের আয়োজন করে, তখন ঋণের জালে আবদ্ধ মুসলিম নারী- পুরুষকে সভা- সমাবেশে যোগ দিতে বাধ্য করে। হুমকী দেয়া হয়, তাদের সমাবেশে যোগ না দিলে ঋণ দেয়া বন্ধ করে দিবে অথবা যা কিছুই

দিয়েছে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। আবার নির্বাচনের সময় এনজিও সমূহের পছন্দের ধর্মনিরপেক্ষ দলের প্রার্থী, যারা স্বাভাবিকভাবেই ইসলাম বিদ্বেষী, তাদেরকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহীতাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

এসব কাজ নির্বিঘ্নে করার জন্যে ইসলামী এনজিও গুলোর ঘাড়ে 'সন্ত্রাসী' সৃষ্টির বদনাম চাপিয়ে এনজিওগুলো প্রায় বন্ধ করে নিজেদের এনজিওগুলোর পথ সুগম করা হয়েছে। তারা নির্বিঘ্নে ইসলাম সম্পর্কে গরীব মুসলমানদের ভুল বুঝিয়ে তথাকথিত নারীনীতিসহ ইসলাম বিরোধী নানা নীতির সমর্থক প্রস্তুত করছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মান্তরিতও করছে। আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, সরকারকেই এসব এনজিওদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সর্বোপরি জাতি সত্তা বিরোধী কর্মকান্ডের লাগাম টেনে ধরতে হবে। এনজিও প্রধানদের অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও ভোগ-বিলাসীতা সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে। দারিদ্র দূর করার নামে অর্থ এনে সে অর্থে তারা কিভাবে বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ, ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও কুকুর প্রতিপালনে ব্যয় করছে তা তদন্ত করে তাদেরকে প্রচলিত আইনের মাধ্যমে শাস্তির আওতায় আনতে হবে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ এর মূল উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক বিশ্বে ও বাংলাদেশে মুসলমানদের পারিবারিক প্রথা বিনষ্টের জন্য নারীর মানবাধিকার ও নারী উন্নয়ন নীতিমালা নিয়ে তারা আকস্মিকভাবে শশব্যস্তে লাফিয়ে আসেনি, এই নীল নকশা বাস্তবায়নের পেছনে রয়েছে নাতিদীর্ঘ ইতিহাস। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আতন্তর্জাতিকভাবে নারী উন্নয়ন, সমাজ উন্নয়ন, মানবাধিকার, সংস্কৃতি ইত্যাদি যেসব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়, সেসব সম্মেলনে আয়োজকরা মুসলিম দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে সেই সকল ব্যক্তিবর্গকেই নির্বাচিত করেন, আদমশুমারীর খাতায় যাদের নাম মুসলিম হিসেবে উল্লেখ রয়েছে বটে কিন্তু চিন্তা-চেতনায় যারা নাস্তিকতায় বিশ্বাসী এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী। দলিল-দস্তাবেজে এসব ব্যক্তিবর্গের দস্তখত গ্রহণ করে সাধারণ মুসলমানদেরকে এ কথাই বুঝানো হয় যে, মুসলিম নেতৃবৃন্দের সম্মতিক্রমেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে ইসলাম, মুসলমানদের ঈমান- আকিদা ও মুসলিম সভ্যতা- সংস্কৃতি বিরোধী যে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তা নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে ঘোষণা না করে তত্বাবধায়ক সরকারকে কেনো বেছে নেয়া হলো, কেনো

বর্তমান মহিলা উপদেষ্টার দ্বারা এ নীতি ঘোষণা করা হলো, এই নীতিমালার পেছনের ইতিহাস কি, কোন্ উদ্দেশ্যে তা ঘোষণা করা হয়েছে, কি রয়েছে এই নীতির মধ্যে, তা আলোচনা করার পূর্বে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত নারী নীতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। কেননা, পশ্চিমা দুনিয়ার চাপিয়ে দেয়া জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ঘোষিত নারী নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের অন্যান্য দেশসমূহ ইসলামকে প্রতিপক্ষ মনে করে এবং একে প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র বিশ্বকে এককেন্দ্রীক ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্যে সুদূর প্রসারী ব্যাপকভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রমশ সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জাতিসংঘ নাম হলেও এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয় ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী লোকদের মাধ্যমে। ফলে আমেরিকা তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জাতিসংঘ নামক অনুগত এই প্রতিষ্ঠানটিকে নিজের সহযোগী হিসেবে পেয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা দুনিয়াকে নিজের প্রভাবাধীনে রেখে ইসলামের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্যে যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চায় তার নাম দিয়েছে 'বিশ্বায়ন'। বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে কোনো দেশ যেনো বাধার সৃষ্টি করতে না পারে এর জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথমে কৌশলে গর্ভাচেভের মাধ্যমে রাশিয়ার পতন ঘটায়। এরপর সে সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তুলে বিভিন্ন মুসলিম দেশ দখল ও মুসলিম দেশসমূহে সামরিক ঘাঁটি বানিয়ে সৈন্য সমাবেশ করে। সেই সাথে পৃথিবীর অন্য কোনো রাষ্ট্র যেনো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হতে না পারে, সে প্রচেষ্টা বর্তমান সময় পর্যন্তও অব্যহত রেখেছে।

জাতিসংঘ এবং তার সকল শাখা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা অর্থপুষ্ট এনজিওগুলো এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহ আমেরিকার বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষেই কাজ করে যাচ্ছে। এ কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামের উত্থান প্রতিরোধ করার জন্যেই বিশ্বায়ন পরিকল্পনা ও সন্ত্রাস দমনের ধোঁয়া তোলা হয়েছে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘকে দিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের সভ্যতা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যে সংবিধান প্রস্তুত করে, তাতে নারী-পুরুষের সমান অধিকার এবং লিঙ্গের ভিত্তিতে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য করা যাবে না বলে উল্লেখ করে। এরপর তা বাস্তবায়নে আরেক ধাপ অগ্রসর হবার জন্যে ১৯৪৬ সালে পশ্চিমা বিশ্ব অনুগত জাতিসংঘের মাধ্যমে মহিলা কাউন্সিল গঠন করে। তারপর দুনিয়ার নানা দেশে মহিলা কাউন্সিলের সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে।

নারী সম্পর্কিত এ ধরনের সম্মেলন সর্বপ্রথম ১৯৭৫ সনে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিশ্বনারী সম্মেলনে বাংলাদেশকেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিয়ে বাংলাদেশের বাইরে নারী উন্নয়নের নামে ইসলাম বিদ্বেষীদের দ্বারা যে আন্দোলন চলছে উক্ত আন্দোলনের সাথে মুসলিম প্রধান এদেশকেও যুক্ত করা হয়। ১৯৮০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় নারী সম্মেলন। ১৯৮৫ সালে কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবীতে তৃতীয় বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত হয় এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নারী উন্নয়ন সম্মেলন। ১৯৫৯ সালে কমনওয়েলথ জেন্ডার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। একই বছরের ৪ থেকে ১৫ই সেপ্টেম্বর চীনের বেইজিংয়ে চতুর্থ বিশ্বনারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনাম এবং ১৯৯৪ মিসরের রাজধানী কায়রোতে দু'টো আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এর আরো পূর্বে ১৯৭৯ সালে জাতিসংঘে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ Convntion on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) গৃহীত হয়। ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ কতিপয় আপত্তিসহ এই সনদে অনুস্বাক্ষর করে।

উল্লেখ্য, যদিও ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত মিলোনিয়াম সামিটের অধিবেশনে বাংলাদেশ Optional Protocol on CEDAW স্বাক্ষর করে কিন্তু এ নীতিমালার ৩.১, ৩.২, ৩.৩, ৩.৪, ৩.৫, ৩.৬, ৯.২, ৯.৫, ৯.৬ ও ৯.১৩ অনুচ্ছেদসহ অনেকগুলো অনুচ্ছেদই সরাসরি কোরআন- সুন্নাহ্র সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে OIC সদস্যভূক্ত অধিকাংশ দেশ এই নীতিমালায় স্বাক্ষর করেনি।

এসব সম্মেলনে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, তা পাঠ করলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পশ্চিমা দুনিয়ার প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ জাতিসংঘ বিশ্বায়ন পরিকল্পনার আড়ালে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ ও জৈনদের পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে তাদের চিন্তা- চেতনা ও বিশ্বাস অনুসারে সারা দুনিয়ার নারী-পুরুষকে উলঙ্গ সভ্যতার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায়। প্রণীত দুই ধারার এক নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে–

To tak all appropriate measures including legislation to modify or abolish existing law, regulations, customs and practices which constitutes discrimination against woman and to repeal all national penal provision which constitution discrimination against woman.

অর্থাৎ 'ঘোষিত নীতি বাস্তবায়নের পথে যদি প্রচলিত বা পুর্বপ্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়ম-নীতি, আইন- বিধান, সমাজে প্রতিষ্ঠিত প্রথা, লোক প্রথা লোকাচার বাধার সৃষ্টি করে তাহলে এসব কিছুকে সংশোধন করতে হবে অথবা বাতিল করতে হবে এবং বিচারালয়ে নারীর প্রতি পক্ষপাতমূলক যেসব ধারা রয়েছে সেগুলোও বাতিল করতে হবে।'

জাতিসংঘের সহযোগিতায় ২০০০ সালে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে একটি বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, উক্ত সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন–

(১) তরুণ- তরুণীদের যৌন স্বাধীনতার প্রতি আহ্বান জানিয়ে যৌনকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং বিয়ে দেরী করে করতে উৎসাহিত করতে হবে।

(২) পারিবারিক পরিমন্ডলের বাইরে নারী-পুরুষকে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং পরিবার গঠনে বিয়ের ভূমিকাকে উৎখাত করতে হবে।

(৩) গর্ভপাতকে আইনগত মর্যাদা দিতে হবে।

(৪) সকলের মধ্যে পশ্চিমা আদর্শের এভাবে বিস্তার ঘটাতে হবে যে, দুইজন মানুষ হলেই পরিবার গঠিত হয়, তা দুই জন পুরুষই হোক অথবা দুইজন নারী।

(৫) সাংসারিক কাজকর্ম করলে যেহেতু পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না, এ কারণে নারীদেরকে সংসারের কাজ না করার জন্যে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৬) স্ত্রী যেনো স্বামীর বিরুদ্ধে অধিকার হরণের মামলা করতে পারে, এ লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত স্থাপন করতে হবে এবং সে আদালতকে শাস্তি প্রদানের অধিকার দিতে হবে।

(৭) সমকামিতা বৈধ বলে স্বীকৃতি দিতে হবে, সেই সাথে অবাধে যৌনকর্ম ও আচরণে সকলকে উৎসাহিত করতে হবে, এসব করতে গেলে আইনগত বাধা যা আছে তা অপসারিত করতে হবে।

(৮) পশ্চিমা বিশ্বে নারীর যে সমঅধিকার রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করতে হবে, নর-নারীতে সমতা বজায় রাখতে হবে, নর-নারী দুইজনকেই সংসারের কাজ, সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন করতে হবে এবং পৈতৃক সম্পদে নর-নারীকে সমান অধিকার দিতে হবে।

(৯) চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ঘোষণা পত্রে যেসব ইসলামী দেশ আপত্তি উত্থাপন করেছিলো, তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশও উক্ত সম্মেলনে গৃহীত কতিপয় প্রস্তাবের প্রতি অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের সাথে আপত্তি উত্থাপন করেছিলো।

অর্থাৎ পশ্চিমা বিশ্বের প্রণীত ও বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নীল নকশা নারী নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে কোরআন- হাদীস বাতিল করতে হবে, পারিবারিক ও সামাজিক সকল প্রথা নির্মূল করতে হবে, পরিবার প্রথা বিলুপ্ত করতে হবে, পুরুষে পুরুষে ও নারীতে নারীতে বিয়ে জায়েয করতে হবে, অবাধে যৌন কর্ম করতে হবে, জারজ সন্তানকে বৈধতা দিতে হবে, দেশে প্রচলিত সকল নিয়ম-নীতি ও আইন-সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে। স্বামী তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য নারীর সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, স্ত্রীও স্বামীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য পুরুষদের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করবে, আর এসব ব্যাপারে কেউ কারো প্রতি কোনো বাধা সৃষ্টি করলেই পারিবারিক আদালতে একের বিরুদ্ধে অন্যজন অধিকার হরণের মামলা করে স্বামী বা স্ত্রীকে শাস্তির মুখোমুখি করবে।

আবহমান কাল থেকে প্রচলিত রয়েছে একজন পুরুষ আর একজন নারী বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুইজনে মিলে পরিবার গঠনের ভিত্তি রচিত করে। এসব সেকেলে ধারণা, এই ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে একজন পুরুষ আরেকজন পুরুষকে অথবা একজন নারী আরেকজন নারীকে বিয়ে করলেই পরিবার গঠিত হবে। পিতামাতা নিজ শিশু, কিশোর ও তরুণদেরকে যৌনতার প্রশিক্ষণ দিবেন এবং সক্ষম বয়সে উপনীত হলেই যৌনকর্মে উৎসাহিত করবেন। যৌনকর্ম করার কারণে কোনো মেয়ে গর্ভবতী হলে সে গর্ভপাত ঘটাতে যেনো কেনো ধরণের বাধার মুখোমুখি না হয়, সে ব্যবস্থাও করতে হবে। আর এই হলো পাশ্চাত্যের প্রণীত ও জাতিসংঘ ঘোষিত নারী নীতি এবং বিশ্বায়নের পরিকল্পনা।

বাংলাদেশেও ২০০৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী মহিলা ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা যে নারীনীতি ঘোষণা করেছে এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তা অনুমোদনও করেছে, উক্ত নারীনীতিও বিশ্বায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ ঘোষিত নারীনীতিরই অংশ। পশ্চিমা বিশ্বের বিশ্বায়ন পরিকল্পনা ও নারী নীতি উক্ত দেশসমূহে গ্রহণযোগ্য হলেও কোনোক্রমেই তা প্রাচ্যের দেশসমূহে গ্রহণযোগ্য তো নয়ই বরং ঘৃণারও অযোগ্য। এ ধরণের কোনো নীতি তা উন্নয়ন নামের আড়ালেই হোক বা অন্য কোনো কিছুর ছদ্মাবরণে, তা এদেশবাসী জীবন থাকতে আত্মঘাতী উক্ত নীতি কখনোই বাস্তবায়ন হতে দিবে না।

মুসলিম দুনিয়াকে গ্রাস ও ইসলামী সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্যে বিশ্বায়ন ও নারী অধিকারের নামে যে আমেরিকা ও তার সহযোগিরা দিনরাত তারস্বরে আর্তনাদ করছে, সেই আমেরিকায় কি ২১৭ বছরের ইতিহাসে একজন নারীও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে? ২১৭ বছরে আমেরিকা কি কোনো নারীকে ভাইস প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে? এই দীর্ঘ ইতিহাসে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো নারীকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বানিয়েছে?

ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থীদের অধিকাংশই নাস্তিক ও মুরতাদ। ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তারা নারী অধিকারের ব্যাপারে দিনরাত চিৎকার করে। তাদের প্রভু রাষ্ট্র রাশিয়াতেও কি কোনো নারীকে দেশের প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছিলো? রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল কি কোনো নারীকে করা হয়েছিলো?

রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র আত্মহত্যা করার পরে জীবিকার তাগিদে যারা চীনের দিকে কেবলা পরিবর্তন করেছে, সেই চীনেও কোনো মহিলাকে দেশের প্রেসিডেন্ট বা পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল বানানো হয়েছে?

দীর্ঘ দিনব্যাপী বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি বাংলাদেশকে সারা দুনিয়ার বুকে মৌলবাদী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। কিন্তু সেই বাংলাদেশেই বিগত ২৭ বছর ব্যাপী দুইজন নারী দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে নেতৃত্বে রয়েছেন। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দুইজন নারীই বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও সরকার প্রধান ছিলেন। এখন পর্যন্তও এদেশেই তাঁরা বরণীয় অবিসংবাদিত নেতা।

তাঁরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সরাসরি কোরআন- হাদীস বিরোধী কোনো নীতি বাস্তবায়ন করার সাহস করেননি আগামীতে ক্ষমতায় যাবার স্বার্থেই হোক বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারানোর ভয়েই হোক অথবা ইসলামের প্রতি প্রকৃত আকর্ষণ বোধের কারণেই হোক। অথচ বিশ্বায়ন পরিকল্পনাকারী দেশ ও তার সহযোগিরা এ কারণেই এমন এক সরকারকে নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের জন্যে বেছে নিয়েছে, যে সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদীহী করতে হয় না। তাহলে এদেশের জনগণ কি এ কথাই বুঝবে যে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও বিশ্বায়ন পরিকল্পনাকারী দেশগুলো অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ২০০৬ সালে ২৮শে অক্টোবরের রক্তাক্ত ঘটনা ঘটিয়ে তাদের নীল নকশা বাস্তবায়নের পথ উন্মুক্ত করেছিলো? সুশীলরা তাহলে তাদেরই ক্রীড়নক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে?

২৮শে অক্টোবর প্রকাশ্যে লগী-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে মানুষ হত্যা করা হবে, দেশের অগণিত সম্পদ ধ্বংস করা হবে, ইসলামী আন্দোলনের জনসভায় আক্রমণ করা হবে, ১/১১ এর ঘটনা ঘটানো হবে এসবই বেশ পুরনো পরিকল্পনা। এসব ঘটনা ঘটিয়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহ তাদের ঘৃণ্য পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে, রাজনৈতিক কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে তা সম্ভব হবে না জেনেই তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। এ জন্যেই আমরা দেখেছি ১/১১ এর পূর্বে পাশ্চাত্য দেশসমূহের রাষ্ট্রদুতদের এখানে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করতে। ১/১১ এর অন্যতম এক রূপকারকেও দেখা গেলো তিনি মধ্যপ্রাচ্যের একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ থেকে বাংলাদেশে ছুটে এলেন তাদের পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তা দেখার জন্যে। আর এসব তথ্য আমেরিকার মাটিতেই ফাঁস করে দিয়েছেন উইলিয়াম স্লোন। তিনি আমেরিকা অঞ্চলের মানবাধিকার আইনজীবীদের সংগঠন 'আমেরিকান এ্যাসোসিয়েশন অব জুরিষ্ট' এর কানাডা চ্যাপ্টারের সভাপতি এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নিয়ে কর্মরত 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব ডেমোক্রাটিক ল' ইয়ার্সের কর্মকর্তা।

তিনি ১৭ থেকে ২৩শে ফ্রেবুয়ারী ২০০৬ পর্যন্ত তার ঢাকা সফরের অভিজ্ঞতার রিপোর্ট বিশ্বব্যাপী একযোগে প্রকাশ উপলক্ষ্যে গত ৮ই মার্চ ২০০৮ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির জ্যাকসন হাইটসে এক সংবাদ সম্মেলনে উক্ত তথ্য ফাঁস করে বলেছেন, 'আমি যখন ২০০৫ সালে ঢাকা সফর করি তখন একজন এমপি ও একটি পত্রিকার সম্পাদকের সাথে বৈঠক করার সময় যা কিছু শুনেছিলাম বর্তমানে বাংলাদেশে তাই ঘটছে। চারদলীয় সরকার পদত্যাগ করার সাথে সাথে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নির্বাচনের ইস্যুতে কী ধরণের আন্দোলন হবে, নির্বাচন বানচালের জন্যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির অবতারণা করা হবে, এরপর জরুরী আইন জারী হবে এবং এ সময় সামরিক বাহিনীকে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেয়া হবে, এ অবস্থায় চলবে দুর্নীতি দমন অভিযান এ অভিযানের টার্গেট হবেন দুই নেত্রী এবং অন্যান্য রাজনীতিবিদগণ। তারপর সংস্কারের নামে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে ভেঙ্গে কয়েক টুকরো করার পর আমেরিকার পছন্দের লোকদের নেতৃত্বে গঠন করা হবে নতুন রাজনৈতিক ফ্রন্ট এবং নির্বাচনের মাধ্যমে সেই ফ্রন্টের লোকজনের সমন্বয়ে সরকার গঠন করা হবে।'

সুতরাং বিশ্বায়ন পরিকল্পনার অধীনেই ইসলাম বিদ্বেষী পশ্চিমা অপশক্তি 'নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' সুশীলদের দ্বারা তত্ত্বধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়েছে।

এ ঘোষণা করার জন্যও প্রয়োজন ছিলো ইসলাম বিদ্বেষী এক নারীর। সে নারীকেও তারা বেছে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তুর্ভক্ত করেছে। এই মহিলা তার ছাত্রী জীবন থেকেই নাস্তিক্যবাদ সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি দলের সাথে জড়িত ছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি উক্ত দলের কেন্দ্রীয় নেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

কোরআন- সুন্নাহ এবং এদেশের গণমানুষের আবহমান কালের লোকাচার বিরোধী 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ঘোষণা করার আরেকটি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য হলো, এদেশকে মৌলবাদী এবং ব্যর্থরাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপিত করে এদেশে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া।

ইতোপূর্বে তথাকথিত এক শায়খ ও তার কিছু সংখ্যক উন্মাদ অনুসারীদের মাধ্যমে ইসলামের নামে সারা দেশে বোমাবাজি করিয়ে, আদালতের বিচারক হত্যা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পুলিশ হত্যা করিয়ে, ইসলামী দলগুলোকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে, এদেশ মৌলবাদীরা নিয়ন্ত্রণ করছে, এ ধরণের কল্পিত গালগল্প ফেঁদে নানা ভাষায় বই লিখে তা আমেরিকার সফররত প্রেসিডেন্টকে উপহার দিয়ে, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছে ও দুতাবাসসমূহে পাঠিয়েও বিশ্বে এদেশকে মৌলবাদী ও অকার্য্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করা যায়নি।

সুতরাং প্রয়োজন ছিলো নতুন আরেক ষড়যন্ত্রের। বর্তমান নারী নীতি হলো সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ বিশেষ। ষড়যন্ত্রকারীরা ভালো করেই জানে যে, এই নীতি ঘোষণা করার সাথে সাথে এদেশের বরেণ্য ওলামা- মাশায়েখ, সম্মানিত খতীবগণ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ নীরব থাকবে না, তারা প্রতিবাদ মিছিল করবে, সভা- সমাবেশ করবে। এই সুযোগে কোরআন প্রেমিক জনতার মিছিলে কিছু সংখ্যক ভাড়াটে লোক ঢুকিয়ে দেয়া হবে, যারা জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করবে, ভাংচুর করবে, পুলিশের প্রতি আক্রমণ চালাবে, দেশব্যাপী বিশৃংখল এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। যার মাধ্যমে তাওহীদী জনতাকে দুনিয়ার সম্মুখে মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার চমৎকার সুযোগ হবে। কিন্তু দেশ প্রেমিক জনগণের কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের এ চক্রান্ত ধরা পড়েছে।

কারণ যে দেশের মুসলমানরা মসজিদের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে থাকে, সেই দেশের মুসলমানরা প্রতিবাদ বিক্ষোভের নামে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের টাইলস্ ভাঙ্গবে বা জায়নামাজ বের করে আগুনে পোড়াবে, এ কথা শয়তানেও বিশ্বাস করবে না। সুতরাং বিগত ১৮/ ০৪/ ০৮ তারিখে ঢাকা

বায়তুল মুকাররমে যে ঘটনা ঘটেছে তা অবশ্যই অনুপ্রবেশকারী ইসলামের দুশমনদের ঘৃণিত অপকর্ম, এটা অবশ্যই কোনো আলেম বা মুসল্লীদের কাজ নয়।

কোন্ আমলে কে দুর্নীতি করেছে, কে কত অর্থ-সম্পদের অধিকারী তা খুঁজে বের করার জন্যে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন প্রয়োজনে দীর্ঘ ৫০ বছরের পেছনের ইতিহাসও অনুসন্ধান করছেন। কিন্তু সারা দেশব্যাপী যারা বোমাবাজি করলো, তাদেরকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলানো হলেও তাদের পেছনের শক্তিকে এখন পর্যন্ত আড়ালেই রাখা হয়েছে। পেছনের এই শক্তিই বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে মৌলবাদী, ব্যর্থরাষ্ট্র ও অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে আগ্রাসী শক্তির আগ্রাসনের পথ খোলাসা করার কাজে ব্যস্ত রয়েছে। কারণ তারা ইতোপূর্বেই ভবিষ্যৎ বাণী করেছে, বাংলাদেশ দ্বিতীয় আফগানিস্থানে পরিণত হবে। তাদের বড় পরিচয়, তারা 'বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে' এই শ্লোগানে বিশ্বাসী।

তত্বাবধায়ক সরকার ইচ্ছে করলে উক্ত পেছনের শক্তির চেহারা জাতির সম্মুখে স্পষ্ট করে দিতে পারেন। কারণ এই শক্তিই বর্তমান সরকারের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তত্বাবধায়ক সরকারের ইখতিয়ার বহির্ভূত কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে বলে সচেতন জনগোষ্ঠী ধারণা করতে বাধ্য হচ্ছেন। সরকারের প্রতি আমাদের পরামর্শ, বামপন্থীদের সমীহ করার কোনো যুক্তি নেই। তারা একান্তই পরগাছা এবং গণবিচ্ছিন্ন, বরং সরকার পরিচালনা ও জীবন পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'য়ালাকে ভয় করে চলুন।

সকল ধর্মের জনগোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান

আমরা এদেশে বসবাসরত মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ ইত্যাদী ধর্মের অনুসারী ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' এর অধিকাংশ ধারা উপধারা সকল ধর্মের বিরোধী, এদেশের গণমানুষের চিন্তা- চেতনার বিরোধী, এদেশের লোকাচার, প্রথা, সভ্যতা- সংস্কৃতি বিরোধী। এ নীতি বাস্তবায়ন হলে আমরা কেউ স্ব স্ব ধর্ম অনুসরণ করতে পারবো না, আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তান- সন্ততি ও দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকগণের নৈতিক চরিত্র বলতে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

আমাদের চোখের সম্মুখেই আমাদের কলিজার টুকরা সন্তান- সন্ততি যেনা- ব্যভিচারে লিপ্ত হবে, দেশে নারী ধর্ষণ বৃদ্ধি পাবে, নারীর সমঅধিকার ভোগ করতে

গিয়ে এদেশের নারী সমাজ যৌনদাসীতে পরিণত হবে, দেশের যুব সমাজ নানা ধরণের যৌন রোগে আক্রান্ত হবে, কিশোর, তরুণ ও যুবকরা নৈতিক চরিত্র হারিয়ে পশুস্তরে নেমে যাবে। এ নীতির কারণে সকল ধর্মের লোকজনই ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। সুতরাং সময় থাকতে সকলকেই তথাকথিত এ নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ অবস্থান গ্রহণ করতে হবে।

তত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা পদে আসীন থেকে যে মহিলা এই নারী নীতি ঘোষণা করেছেন, উক্ত মহিলা গোড়া থেকেই ধর্ম বিদ্বেষী। তত্বাবধায়ক সরকারের নিয়ম-নীতি, করণীয়- অকরণীয়, উচিত- অনুচিত ও দেশের সংবিধানের তোয়াক্কা না করে উক্ত মহিলা উপদেষ্টা নিজ পছন্দের রাজনৈতিক আদর্শ প্রচার করছেন। তিনি দেশের ইসলাম প্রিয় তাওহীদী জনতা ও আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখদের প্রতি সীমাহীন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে' গর্তে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপ, অশুভ শক্তি, মৌলবাদী, ফণা তুলেছে' ইত্যাদি ভাষায় গালাগালাজ করেছেন।

সেই সাথে বর্তমান তত্বাবধায়ক সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, বামরামপন্থী ধর্মবিদ্বেষী গুটি কতক জনবিচ্ছিন্ন পরজীবী লোক আর হাতে গোণা কয়েকজন সুশীল- ধর্মকে যারা একান্তই অপ্রয়োজনীয় জিনিস ও আফিম বলে মনে করে, তাদের আবদারের কাছে নতি স্বীকার করে তাদেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে এদেশের ১৪ কোটি ধর্মভীরু মানুষকে অবজ্ঞা করলে নিভানোর অযোগ্য দাবানল সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ১৪ কোটি মানুষের চিন্তা- চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে অতিদ্রুত 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' বাতিল ঘোষণা করুন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ও আমাদের সংবিধান

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী ও আমাদের সংবিধান

ক্ষুধা-দারিদ্র, বেকারত্ব ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের চরম উর্ধ্বগতিসহ দেশে বহুবিধ সমস্যা বিরাজমান থাকা সত্বেও সাম্প্রতিককালে এক শ্রেণীর রাজনীতিক, সুশীল, বুদ্ধিজীবী, কলামিষ্ট ও টক্-শোজীবীরা উল্লেখিত অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। এ ব্যাপারে তাদের অহরহ নির্বাচন কমিশন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট দাবীর বহর দেখে মনে হয় দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতিই মহাসমস্যা। এ সমস্যার সমাধান করতে পারলেই দেশ সুখের সাগরে ভাসবে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কোরআন-হাদীস বিরোধী দাবী। কারণ তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বলতে ইসলামী রাজনীতিকেই বোঝাতে চান। এ দাবী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি অবজ্ঞা ও বিরোধিতার শামিল। এ বিষয়টি দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে বোধগম্য করার লক্ষ্যে সংক্ষেপে কোরআন-হাদীস, দেশের সংবিধান ও বিভিন্ন দেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা এ পুস্তিকার লক্ষ্য।

ধর্মীয় রাজনীতির সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্পভাবে চারটি মূলনীতির কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তবনার ২নং প্যারায় বলা হয়েছে, 'আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

অর্থাৎ উপরিউক্ত চারটি আদর্শই বর্তমান সরকারের মূলনীতি। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিতে যদিও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিলো কিন্তু Proclamation order no-1 of 1977 এর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকেই সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি আজ ঐতিহাসিক সত্য। এই অন্তর্ভুক্তি ঠিক হয়েছে কিনা এবং না করলে কি হতো? মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র কোন্‌টি ছিলো? পৃথিবীর অন্যান্য দেশে মূলনীতি পরিবর্তন করা হয় কিনা? ঘোষণার মাধ্যমে মূলনীতি পরিবর্তন করা বৈধ কিনা? এই প্রশ্নগুলো নিতান্তই অবান্তর, কারণ ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এই মূলনীতি পরিবর্তন করে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়েছে। বাস্তব সত্য হলো ১৯৭৭

থেকে আজ পর্যন্ত আমরা **'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'** এই নীতির ওপর অবিচল আছি এবং এটি বর্তমানে অটল বাস্তবতা। হয়তো মূল সংবিধান প্রণয়নকারীদের অনেকেই এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন না কিন্তু ১৯৭৭ পরবর্তী প্রজন্ম সংবিধানকে বর্তমান অবস্থায় মেনে নিয়ে এর আনুগত্য করছে এটাও অটল বাস্তবতা। বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ পুনরায় ১৯৭২-এর সংবিধানের চেতনায় ফিরে যাবার দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে ৩০ বছর পূর্বের সত্যটি কি ভুলা যাবে? একটি জাতির জন্য ৩০ বছর অনেক লম্বা সময় এবং জাতীয় জীবনে গত ৩০ বছরে 'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

সেক্যুলার পন্থীগণ হয়তো বলবেন, আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতারও প্রতিফলন ঘটেছে। সাংবিধানিকভাবে এ দেশ যে কয় বছর ধর্মনিরপেক্ষ ছিলো, সেই কয় বছরে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েও এ দেশের জনগণের মন-মানসিকতা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করা তো যায়নি বরং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করার কারণে এই মতবাদের প্রতি এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিলো ৭ই নভেম্বরে সিপাহী-জনতার মিছিলে 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগানের মাধ্যমে। তর্কের খাতিরে তারপরও বলা যায়, যে কয় বছর এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনার বিপরীত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতিফলন ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিলো, তার তুলনায় ৫ গুণ অধিক সময় ব্যাপী 'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার' নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই চেতনা এ দেশের জনগণের শুধু চিন্তা-চেতনার সাথেই সম্পর্কিত নয়, রক্তের প্রত্যেকটি কণিকাকে এ চেতনা সচল করে রেখেছে।

তাত্ত্বিকভাবে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাথে ঐকমত্য পোষণ না করলেও এটা বাস্তব সত্য যে, ১৯৭১ থেকে ৭৭ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাই ছিলো এ দেশের সংবিধানের ভিত্তি। অপরদিকে **'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা'**- এই নীতির সাথে সেক্যুলার বামপন্থীগণ ঐকমত্য পোষণ না করলেও এটা অটল বাস্তবতা যে, ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তব চেহারা দেখে আমরা জাতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে আমরা সেক্যুলার রাষ্ট্র নই এবং এ মীমাংসিত বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তোলারও কোনো অবকাশ নেই। দেশের গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁরা নিয়মিত নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত ও রোজা রেখে বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য ভিক্ষা চেয়েছেন।

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো তা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের ঈমান-আকিদা বিসর্জন দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাদের জ্বালাও-পোড়াও নীতি ও হত্যা-ধর্ষনের বিরুদ্ধে একটি শোষনমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হবার পর তদানীন্তন শাসকবর্গ ভারত থেকে ধার করা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং রাশিয়ার বস্তা পচা সমাজতন্ত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৭১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত জাতির ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চাপিয়ে দিয়েছিলো। এর পরের ইতিহাস বাস্তবতার ইতিহাস। তা হচ্ছে ১৯৭৭ থেকে উক্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে আজ অবধি ধর্মীয় রাজনীতির বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কোন্‌টি হওয়া উচিৎ এ নিয়ে বিতর্ক তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এ দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অন্তরে যে চিন্তা চেতনা লালন করছে, তাদের রক্তের প্রত্যেকটি কণিকায় যে চেতনা অনুক্ষণ শানিত রয়েছে, সেই চেতনাই ৭৭ পরবর্তী সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে এবং এই চেতনার উপরই সমগ্র জাতি এখন পর্যন্ত অবিচল রয়েছে। সুতরাং এ কথা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই সাংবিধানিকভাবে মানতে বাধ্য যে, **'সংবিধানের মূলনীতিই দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের মূলনীতির উৎস হওয়া উচিৎ'**। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দলের গঠনতন্ত্র দেশের সংবিধানের সাথে Contradictory হওয়া যাবে না এবং এটাই একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সংবিধানের দাবী। আর বিশেষ করে যে দেশটির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে।

দেশের সরকার পদ্ধতি, সুশাসন ও উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক থাকাটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু সংবিধান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা মোটেও সমীচীন নয়। এ বিতর্ক তোলা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ও আত্মঘাতী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড নিয়ে সমালোচনা আর সংবিধানের মূলনীতির সমালোচনা কখনোই এক হতে পারে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়ে সরকারের চালিকাশক্তি হতে হবে। যেহেতু গণতান্ত্রিক উপায়ে কোনো না কোনো দল সরকার গঠন করে, সেহেতু দলীয় গঠনতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা রাখে। কারণ দলের কর্ণধাররাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আর ঠিক এ কারণেই দলীয় গঠনতন্ত্রে দেশের সাংবিধানিক মূলনীতি প্রতিফলিত না হলে সরকারের কর্মকান্ডে সাংবিধানিক মূলনীতিসমূহও প্রতিফলিত হয় না।

সুতরাং বর্তমানে সংস্কারের যে পথ অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে, সেই পথ অনুসারে যাচাই করতে হবে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্রে দেশের সাংবিধানিক মূলনীতির কতটুকু প্রতিফলন রয়েছে। যদি সাংবিধানিক মূলনীতির প্রতিফলন দলের গঠনতন্ত্রে না ঘটে থাকে তাহলে দেশের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেকটি দলের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে। দলীয় গঠনতন্ত্রে যদি দেশের সংবিধানের ভিত্তিতে সংস্কার করা না হয়, তাহলে অতিতের ন্যায় দেশের সরকার প্রধানের পক্ষে আগামীতেও বিদেশে গিয়ে দেশের সাংবিধানিক চেতনার বিরুদ্ধে নিজের দলের অবস্থান তুলে ধরার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আর এটা হবে একটি স্বাধীন দেশের জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের শামিল। সুতরাং বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে সবথেকে বড় বিচার্য ও সংস্কারের বিষয় **'রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতির'** প্রতি মনোযোগী হয়ে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২(ক) এ বলা হয়েছে, **'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে'**।

উল্লেখিত এই অনুচ্ছেদটি ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এমন কি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমেও জেনারেল জিয়াউর রহমান এই অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত করেননি। ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন সংসদে ৮ম সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ৯ই জুন তা সাংবিধানিক আইনে পরিণত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মাদ এরশাদ এই মহৎ কাজটি সম্পাদন করেন। কিন্তু বর্তমানে সেই এরশাদ সাহেবই কোন্ সুতোর টানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদারদের সুরে সুর মিলাচ্ছেন যা বুদ্ধিজীবী মহলের হাসির খোরাক যোগাচ্ছে।

১৯৭৭ সালে Proclamation order no-1 of 1977 এর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে পরিবর্তন আনা হয় এরই ভিত্তিতে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১২ নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বাস্তবতার নিরিখে দেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার স্বার্থে ১২ নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয় এবং আজ অবধি সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি পরিত্যক্ত বা বিলুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে'।

১৯৭২ সালের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদে একটি Proviso সংযুক্ত ছিলো। কিন্তু ১৯৭৬ সালে Proclamation order of 1976 (2nd Proclamation order no-III of 1976) এর মাধ্যমে Proviso টি বিলুপ্ত করা হয় এবং আজ অবধি তা বিলুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় ভাগের অনুচ্ছেদ (২৬-৪৭ক) পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই অধিকার হরণ করতে চায় তাহলে ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের সরণাপন্ন হয়ে ঐ ৩৮ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

মৌলিক অধিকার ও মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি বড় ধরণের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ক) এ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থাকে 'মৌলিক প্রয়োজন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এই মৌলিক প্রয়োজনসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করতে না পারলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের সরণাপন্ন হতে পারবেন না। কারণ এই মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মেটানো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সামর্থের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে সামর্থবান না হলে এই চাহিদাগুলো পরিপূর্ণ করা বাস্তবসম্মত নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের অন্নের ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত না হলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের সরণাপন্ন হয়ে অন্নের (খাদ্য) ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারবেন না। নীতিগতভাবে এই প্রয়োজন সমূহ মেটানোর জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কারণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে যে বিষয়গুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে সংবিধানের ৩য় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে যে অধিকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ যোগ্য অর্থাৎ যদি কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় তাহলে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ এ মৌলিক অধিকারটি আইনের মাধ্যমে বলবৎ করবে।

বহুল আলোচিত Writ petition গুলো সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট বিভাগ শুনানি করে থাকে এবং Facts finding এর ভিত্তিতে রায় প্রদান করে থাকে। যেহেতু অনুচ্ছেদ ৩৮ মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (সরকারসহ) যদি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারটি লংঘন করে, তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে Writ petition এর মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারেই দল, সংগঠন, সমিতি ও সংঘের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তথা গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হরণ করা বা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ দেশের সংবিধান কাউকে দেয়নি। সংবিধান অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক এবং এ দাবী যারা তুলছেন তারা অবশ্যই দেশের সংবিধানের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করছেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুধু কি বাংলাদেশে?

ধর্মবিদ্বেষীদের জানা উচিৎ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি শুধু বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের যেসব দেশে গনতন্ত্র চালু আছে সেসব দেশেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অস্তিত্ব সগৌরবে বিরাজমান। রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ কথা জানেন যে দুনিয়ার নানা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সচল রয়েছে এবং এ বিষয়টি নিয়ে সেসব দেশে কারো মাথা ব্যথা নেই।

ভারতে ধর্মভিত্তিক দল বিজেপি গত পার্লামেন্টে ক্ষমতায় ছিলো বর্তমানে গুজরাটে ক্ষমতাসীন। শীব সেনা, রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘ এবং অন্যান্য হিন্দু ধর্মীয় দল সেখানে সক্রিয় রয়েছে। সারা পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নেপালই ঘোষিতভাবে ২০০৬ সালের মে মাসের ১৮ তারিখের পূর্ব পর্যন্ত ছিলো হিন্দু রাষ্ট। সেখানে আইনগতভাবে গরুকে জাতীয় পশু হিসেবে ঘোষণা করে গরু জবেহ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নেপালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করাও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, শ্রীলঙ্কায় জামায়াতে ইসলামী, ভারতে জামায়াতে ইসলামী ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী, জর্ডানে মুসলিম ব্রাদার হুড, মিসরে মুসলিম ব্রাদারহুড, ইন্দোনেশিয়ায় দি মুসলিম স্কলার্স পার্টি, ফিলিস্তিনে হামাস, মালয়েশিয়ায় দি প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি, লেবাননে হিয্‌বুল্লাহ, সুদানে ইসলামিক ফ্রন্ট এবং দি উম্মাহ্ পার্টি, আফগানিস্থানে হেজবে ইসলামী, বাহরাইন ও ইয়েমেনে আল ইসলাহ্ পার্টি, মরক্কতে জাস্টিস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি, তিউনিশিয়ায় আন্ নাহ্‌দাহ্ পার্টি, মালদ্বীপে আদালত পার্টি। তুরস্কে জাস্টিস এন্ড ডেভলেপমেন্ট পার্টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতাসীন হয়েছে।

অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে ১২টি খৃষ্ট ধর্মভিত্তিক দল। এর মধ্যে নিউ সাউথ ডয়েলসন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি বেশ তৎপর। অস্ট্রেলিয়ার পার্লামেন্টে এ দলের সদস্যও রয়েছে এবং এই দলের নেতা ফ্রেডনিল অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানদের আগমন নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী জানিয়েছেন। ধর্মহীন সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবাতেও রয়েছে ধর্মভিত্তিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। খোদ

আমেরিকাতে খৃষ্টধর্ম পুনর্জাগরণের শ্লোগান দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন।

বিগত অনেক বছর ব্যাপী বৃহত্তম দল হিসেবে পরিচিত জামানীর বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং চ্যান্সেলর এ্যান্‌জেলা মার্কেলের নেতৃত্বাধীন সহযোগী আরেকটি দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান সোসালিষ্ট পার্টি। এ দল দু'টো অনেক অঙ্গরাজ্য শাসন করেছে, কেউই ধর্মভিত্তিক এসব দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী তুলেছে বলে শোনা যায়নি। নেদারল্যান্ডে ক্ষমতায় রয়েছে চার দলের কোয়ালিশন সরকার। এর বৃহত্তম দলটির নাম ডাচ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং কোয়ালিশন সরকারের শরীক আরেকটি ধর্মভিত্তিক দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন। এসব দলের মূল আদর্শ খ্রীষ্টবাদ এবং দলের সদস্যদের মূলনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'বাইবেলই একজন সদস্যের অনুপ্রেরণার উৎস।' ধর্মভিত্তিক দলসমূহের কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় এসেই নেদারল্যান্ড থেকে ২৬ হাজার মুসলিম অভিবাসীকে বহিষ্কার করে নিজ ধর্ম ও দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছে।

সুইজারল্যান্ডে ধর্মভিত্তিক ক্রিশ্চিয়ান পিপলস পার্টি বহু পুরনো রাজনৈতিক দল, এ দলটি গঠিত হয়েছিলো ১৯১২ সনে এবং তারা বর্তমানে কোয়ালিশন সরকারের শরীক দল। এ দলটি ২০০৩ সালে ১৫ শতাংশ, ২০০৫ সালে ২০.৭ শতাংশ এবং ২০০৭ সালে ১৪.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিলো। সুইজারল্যান্ডে আরো দু'টো দল সক্রিয় রয়েছে, যাদের মূল আদর্শই হলো খ্রীষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা করা। এ দুটো দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল পার্টি ও ইভানজোলিক পিপলস পার্টি।

ইতালী ইউরোপের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ধনী দেশ এবং এ দেশটি জি-৮ এর সদস্যভুক্ত। এদেশের ধর্মভিত্তিক দলের নাম ক্রিশ্চিয়ান ইউনিয়ন এবং পার্লামেন্টে এ দলের ৩০ জন সদস্য রয়েছে। অষ্ট্রিয়ার খৃষ্টধর্মীয় গোঁড়া মৌলবাদী নেতা মেয়র কার্ল লুগার খৃষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৯৩ সালে ক্রিশ্চিয়ান সোস্যাল পার্টি গঠন করেন। ১৯৪৫ সালে অষ্ট্রিয়া স্বাধীন হলে দলের নাম পরিবর্তন করে অষ্ট্রিয়ান পিপলস পার্টি রাখা হয়। এ দলটি আরেকটি ধর্মভিত্তিক দল অষ্ট্রিয়ান ফ্রিডম পার্টির সাথে ২০০০ সালে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেছিলো। ২০০২ সালে খৃষ্টধর্মীয় শ্লোগানের ওপর নির্ভর করে উক্ত দলটি বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে এককভাবে সরকার গঠন করে।

কানাডার কুইবেক রাজ্যে ২০০০ সালে রোমান ক্যাথলিকদের সহযোগিতায় গঠিত হয়েছে ধর্মভিত্তিক দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি নামে ধর্মভিত্তিক দল রয়েছে বলিভিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, পানামা, রোমানিয়া,

নরওয়ে, সুইডেন, সার্বিয়া, সিরিয়া, এস্তোনিয়া, লেবানন, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, হাইতি, দক্ষিণ আফ্রিকাসহ অন্যান্য দেশে।

যুক্তরাজ্যে Monarch is the head of the church. সেই তিনিই Supreme defender of protestant faith. যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার সাধ থাকার পরও Protestant faith ত্যাগ করে Catholic faith গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করার পর এখন Catholic faith মতাদর্শে ফিরেছেন। ব্রিটেনের রাণী এলিজাবেথ সেখানকার বৃহত্তম গীর্জা এ্যাংলিকান চার্চের প্রধান। ব্রিটিশ লর্ড সভার ২৫টি আসন খৃষ্টান ধর্ম যাজকদের জন্য সংরক্ষিত। স্কটল্যান্ডে স্কটিশ ক্রিশ্চিয়ান পার্টি নামক ধর্মভিত্তিক দলটি রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ তৎপর। এ দলটি ২০০৪ সালে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট নির্বাচনে স্কটল্যান্ড থেকে অংশগ্রহণ করে ১.৮ শতাংশ ভোটও অর্জন করেছিলো। আধুনিক বিশ্ব যে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির দীক্ষা গ্রহণ করলো, সেই যুক্তরাজ্যেই যখন এই অবস্থা, তখন ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে কি আর কিছু অবশিষ্ট রইলো?

সুতরাং যে দেশের ১৪ কোটি মুসলমান জন্মসূত্রে বাংলাদেশী, যে দেশের মাটি ৩ লক্ষ মসজিদ ও অসংখ্য মাদ্রাসা বুকে ধারণ করে ধন্য; যে দেশের মানুষের ঘুম ভাঙ্গে ফজরের আযান শুনে, যে দেশের সংবিধান শুরু হয়েছে মহান আল্লাহ তা'য়ালার নাম নিয়ে, যে দেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম সংবিধানে লিপিবদ্ধ, সে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদাররা দিবা স্বপ্নে বিভোর হয়ে বোকার স্বর্গে বাস করছেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী করছে কারা আমি তাদের নাম এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি না। এরা জন বিচ্ছিন্ন পরগাছা, এদেরকে রাজনৈতিক ময়দানে জীবিত রেখেছে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়া, অন্যথায় জনগণের ঘৃণা মিশ্রিত অবজ্ঞা ও অবহেলায় এতো দিনে হয়তো পরগাছা এ প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতো। সমগ্র দেশে এদের ১% জন সমর্থনও নেই। ভোটের মাধ্যমে নিজেরা জিন্দেগীতে ক্ষমতায় যেতে পারবে না এ কথা তারা ভালোভাবেই জানে; তাই তাদের লক্ষ্য হচ্ছে ডেড ইস্যু বা নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়া, নির্বাচন কঠিন করে তোলা, নির্বাচন কমিশনকে বিতর্কিত করা, বর্তমান সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট করা এবং দেশকে পরনির্ভরশীল করা।

এদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বা টিভি পর্দায় টক-শো'তে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার আস্ফালন করে কোনো লাভ নেই।

আল্লাহ না করুন, জাতির দুর্ভাগ্যক্রমে আপনারা কখনো ক্ষমতায় গেলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র কি সব সর্বনাশ করবেন বলে বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ

অন্তর্জ্বালায় জ্বলে পুড়ে মরছেন তা রাখ-ঢাক না করে আপনাদের জনসভাগুলোয় ও টক্-শোতে উচ্চকণ্ঠে বলুনঃ–

'আমরা ক্ষমতায় গেলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করবো, কোথাও তাফসীর মাহ্ফিল, সীরাত মাহ্ফিল হতে দেবো না। কোরআনের বিধান লংঘন করে পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ ছেলে ও মেয়েকে সমান ভাগে ভাগ করে দেবো, মাদ্রাসা শিক্ষার ফাযিল কামিলের ডিগ্রী ও মার্স্টার্সের সমমান হতে দেবো না। কওমী মাদ্রাসাগুলো সন্ত্রাসী ও জঙ্গী উৎপাদনের কারখানা হিসেবে চিহ্নিত করে বন্ধ ঘোষণা করবো। একুশে বই মেলায় ইসলামী সাহিত্য বিক্রি নিষিদ্ধ করবো, ইসলামী এনজিওগুলোর সকল তৎপরতা বন্ধ করে দেবো। ধর্মীয় রাজনীতির সকল প্রকার চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষণা করবো। পুরুষ মাদ্রসাগুলো মহিলা শিক্ষয়ত্রী দিয়ে ভরে দেবো।'

তখন দেখা যাবে কত ধানে কত চাল, কয়টা ভোট আপনাদের কপালে জোটে, পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ধর্ম ও রাজনীতি

মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ মুসলিম দেশসমূহ কব্জা করা ও পাকিস্তান এবং ইরানের ওপর ছড়ি ঘুরানোর জন্য সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার প্রয়োজন ছিলো একটি অজুহাত দাঁড় করানো। চক্রান্তমূলকভাবে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করিয়ে অজুহাত দাঁড় করানো হলো এবং আফগানিস্থান ও ইরাকে হামলা চালিয়ে দেশ দুটো দখল করা হলো। কেনো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এ কাজ করলেন, সে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট ও পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন–

I am driven with a mission from God. God would tell me, `George! go and fight those terrorists in Afghanistan.' And I did, and then God would tell me, `George! go and the tyranny in Iraq,' and I did.

অর্থাৎ আমি ঈশ্বর প্রদত্ত একটি বিশেষ কাজ নিয়ে আগাচ্ছি। ঈশ্বর বলেছেন, 'জর্জ! আফগানিস্থানে গিয়ে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো' এবং আমি তাই করেছি। এরপর ঈশ্বর আমাকে বললেন, 'জর্জ! ইরাকে গিয়ে স্বৈরাচারের পতন ঘটাও' এবং আমি তাই করেছি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডবলিউ জর্জ বুশের উল্লেখিত কথাগুলো ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসের ৭ তারিখে ব্রিটেনের ইনডিপেন্ডেন্ট পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো।

সংবাদটির শিরোণাম ছিলো, 'Bush: God told me to invade Iraq.' সে সময় এ সংবাদ সারা দুনিয়ায় বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। খৃষ্টান বিশ্ব মুসলিম দুনিয়াকে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে বারবার তাদের ধর্মযুদ্ধ 'ক্রুসেড' পরিচালিত করেছে এবং জর্জ বুশও তার সাম্প্রদায়িক মনোভাব গোপন না করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছিলেন। মুসলমানরাও পাল্টা 'যুদ্ধ' ঘোষণা করে সারা দুনিয়ায় খৃষ্টানদের স্বার্থে আঘাত করতে পারে, এ ভয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমি সে অর্থে ক্রুসেড শব্দটি ব্যবহার করিনি।'

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ নিজে গোঁড়াপন্থী বা মৌলবাদী সুসমাচার মতবাদে বিশ্বাসী এবং খৃষ্টান। ইংরেজী ভাষায় যাকে বলা হয় Evangelical যা Relating to the Gospel, যীশূর বাণী বা সুসমাচার নামক পুস্তক যে চারজন লিখেছেন গসপেল তাদের একজন। জর্জ বুশ Evangelist অর্থাৎ যীশূর বাণী বা সুসমাচার প্রচারক। তিনি আমেরিকার মতো একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েও তাঁর ধর্মের শিক্ষা তিনি ভুলে যাননি, তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিফলন তিনি ঘটিয়েছেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করে, ইরাক ও আফগানিস্থান দখল করে এবং ইরানসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে হামলা করার ঘোষণা দিয়ে।

বর্তমানে সারা দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে উন্নত দেশের দাবীদার দেশটির প্রেসিডেন্ট- যিনি নিজেকে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নিজেকে সবথেকে ক্ষমতাধর বলে মনে করেন, তিনিও ধর্মকে নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে পরিণত না করে বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে টেনে এনেছেন। জর্জ বুশের আরেক সাঙ্গাত বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও ধর্মকে নিজের ব্যক্তিগত অঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে শেষবারের মতো যখন ভ্যাটিক্যান সফর করেন তখনই তিনি এ্যাঙ্গলিকান চার্চের অনুসরণ ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এরপর ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়ার পর তিনি ক্যাথলিক চার্চের অনুসারী হন। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে বিবিসি'র সংবাদ শিরোণাম ছিলো Tony Blair joins Catholic Church.

সারা দুনিয়াকে ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী বা ইয়াহূদী খৃষ্টান দেশসমূহ নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করলেও তাদের কর্মকান্ড প্রমাণ করে যে, তারা কেউই ধর্মনিরপেক্ষ নন। বরং গোঁড়া ধর্মপন্থী বা মৌলবাদী। বিট্রিশ সরকার প্রধানদের মধ্যে সকলেই ধর্ম বিশ্বাসের অনুগত ছিলেন। বর্তমান বিট্রিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন রাষ্টক্ষমতায় আরোহণ করার পরপরও নিজেকে চার্চ অব স্কটল্যান্ডের অনুসারী হিসেবে ঘোষণা দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জার্মানী নামক দেশটি ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের পরে সে দেশে খৃষ্টধর্মে বিশ্বাসী যতগুলো দল-উপদল ছিলো, সকলে একত্রিত

হয়ে খৃষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক নতুন ধারার রাজনীতি চালু করার জন্যে একটি দল প্রতিষ্ঠা করে উক্ত দলের নাম দেয় 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন অব জার্মানী'। কালের ব্যবধানে এই দলটি জার্মানবাসীর নিকট বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে এই দলটি জার্মানীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল এবং এই দলের প্রধান এ্যাঞ্জেলা মারকেল জার্মানীর চ্যান্সেলর। এই দলটির মূল লক্ষ্য হলো, খৃষ্টের চিন্তা- বিশ্বাস, নীতি, আচরণ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। দলটি বিশ্বাস করে খৃষ্টের মূল্যবোধ সমগ্র দুনিয়ার সম্মুখে তুলে ধরা ও পরিবেশের সংরক্ষণ করা মানব জাতির সামগ্রিক কর্তব্য।

আমেরিকা, বৃটেন ও জার্মানী এই তিনটি দেশই বর্তমান পৃথিবীতে সবথেকে ক্ষমতাধর। এই তিনটি দেশের কোনো একটি দেশও ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেনি বরং নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই উক্ত দেশসমূহের সরকার প্রধান পরিচালিত হন। অন্যান্য খৃষ্টান দেশসমূহও তাদের 'নেতা' আমেরিকা- বৃটেনকে অনুসরণ করছে। ক্রোয়েশিয়া নামক দেশটি এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছিলো। এ দেশটির অন্যতম ধর্মীয় দল 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত জাতিয় নির্বাচনে ৪৪ শতাংশ ভোট পায় এবং তারা অন্য দুটো দলের সাথে কোয়ালিশন করে জোটগতভাবে দেশ পরিচালনা করছে। খৃষ্টান প্রধান হাঙ্গেরী নামক দেশটির প্রধান রাজনৈতিক দলটির নাম 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি'। হাঙ্গেরীর ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ দলটি ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ক্রমশ দলটি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। এ দলটির নেতৃত্বাধীন জোট ২০০৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৪২.০ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদের ৩৮৬ টি আসনের মধ্যে ১৬৪টি আসনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। বর্তমানে হাঙ্গেরী ধর্মভিত্তিক উক্ত দলটির নেতৃত্বেই উন্নয়নের ধারা অব্যহত রেখে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

মোলাদাভিয়া নামক দেশটিতে 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি' দেশটির গত সাধারণ নির্বাচনে ৯.১ শতাংশ ভোট পেয়ে সংসদের ১০১টি আসনের মধ্যে ১১টি আসন লাভ করে। মালটার নামক দেশটি একটি দ্বীপদেশ। এ দেশটির অন্যতম রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনালিষ্ট পার্টি' প্রায় শত বছরের পুরনো দল। এ দলটি বাইবেলের আদর্শ অনুসরণ করে। ১৯৬১ সালে দেশটিতে নতুন সংবিধান চালু হবার পর থেকে উক্ত দলটি বিভিন্ন সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে দেশটিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে খৃষ্টীয় আদর্শে পরিচালিত উক্ত দলটি পুনরায় রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

'খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটিক অ্যাপিল' নামক রাজনৈতিক দলটির রয়েছে প্রায় শত বছরের ঐতিহ্য এবং এ দলটিই নেদারল্যান্ডের প্রধান রাজনৈতিক দল। খৃষ্টধর্মের প্রধান

দুইট ধারা ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট এর স্থানীয় নেতৃবৃন্দ খৃষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৮৮০ সালে একটি রাজনৈতিক মঞ্চ গঠন করে এবং সেখান থেকেই উক্ত দলটির অগ্রযাত্রা। এ দলটি একাধিকবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে এবং ২০০৬ সালের নির্বাচনে ব্যাপক বিজয় লাভ করে দলটি এককভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ পরিচালনা করেছে।

নরওয়ের ধর্মভিত্তিক অন্যতম রাজনৈতিক দলের নাম খৃষ্টান ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। দলটির প্রধান কেল ম্যাগনি বন্ডেভিক ১৯৯৭ সাল থেকে ২০০০ সাল এবং ২০০১ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। বাইবেলের অনুসারী ধর্মভিত্তিক দল 'ল এন্ড জাস্টিস পার্টি' পোল্যান্ডের অন্যতম রাজনৈতিক দল। এ দলটি গঠিত হয় ২০০১ সালে এবং এ পর্যন্ত দলটি দেশ পরিচালনায় যুক্ত রয়েছে।

পর্তুগাল নামক দেশটির প্রধান রাজনৈতিক দলটির নাম ডেমোক্র্যাটিক এন্ড সোস্যাল সেন্টার বা ডেমোক্র্যাটিক পিপলস্ পার্টি। খৃষ্টীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠায় অঙ্গিকারাবদ্ধ এ দলটি দীর্ঘ ২০ বছর বিরোধী দলে অবস্থান করে দেশসেবা করেছে এবং ২০০৫ সালের সাধারণ নির্বাচনে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে দেশ পরিচালনা করছে। এভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার সকল দেশেই যীশূ খৃষ্টের আদর্শ প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার নিয়ে ধর্মভিত্তিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা দেশ ও জাতির স্বার্থে ভূমিকা পালন করছে।

অথচ ইউরোপ ও আমেরিকা ইসলামী কোনো দল বা সংগঠনকে সহ্য করতে নারাজ। খোদ আমেরিকার অন্যতম রাজনৈতিক দল 'কনস্টিটিউশন পার্টি' এবং এই দলটি বাইবেলের নীতি- আদর্শে বিশ্বাসী দল ও সংগঠনকে একই প্লাটফর্মে এনে ধর্মীয় আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আমেরিকার বর্তমান ক্ষমতাসীন দল 'রিপাবলিকান পার্টি' এবং বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি উভয় দলই নানাভাবে ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই দলদ্বয়ের ওয়েবসাইট দেখলে বুঝা যাবে দল দুটো কিভাবে বাইবেলের নীতিভিত্তিক সংগঠন সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। এ লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট বুশ নানা ধরণের আইনও আমেরিকায় চালু করেছেন।

আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে এ পর্যন্ত হিন্দু ধর্মভিত্তিক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল রয়েছে ৩৩ এরও অধিক। উগ্র ধর্মান্ধ দল বিজেপি তো রাষ্ট্র ক্ষমতায় থেকে বিশাল ভারতও শাসন করেছে। হিন্দু ধর্মভিত্তিক ও হিন্দু জাতীয়তাবাদী উগ্র দলগুলোর উস্কানিতে ভারতে বার বার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটানো হয়। অগণিত মুসলমানদেরকে এরা জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছে, অগণিত মুসলিম নারীকে এরা ধর্ষন করেছে। এরা খৃষ্টানদের হত্যা করেছে, শিখদের হত্যা করেছে, মসজিদ, গীর্জা,

গুরুদুয়ারা ধ্বংস করেছে। ঈদের মাঠেও শূকর ছেড়ে দিয়ে এরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিয়েছে। আযান নিষিদ্ধ করেছে, ইসলাম, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, কোরআন ও হাদীসের নিন্দা করা এদের নিত্য- নৈমিত্তিক কাজ। কোরআন নিষিদ্ধের দাবী তুলে এরা আদালতে মামলা করেছে। এদের কারণেই ভারতের অগণিত ধনী মুসলমান পথের ফকিরে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু মানবাধিকারের ফেরিওয়ালারা কখনো এসব উগ্র সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ দলগুলো নিষিদ্ধ করার দাবী তোলেনি। বরং নানাভাবে মুসলিম নিধন যজ্ঞে সহযোগিতা করেছে। এদের একমাত্র যন্ত্রণা ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে। যে ইসলাম পৃথিবীতে আগমন করেছে দুনিয়াব্যাপী শান্তি ও স্বস্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, মানুষের সুকুমার বৃত্তিসমূহ বিকশিত করে দুনিয়ার সকল মানুষকে মানবতার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যেই যে ইসলামের আগমন, শোষণ জুলুম বঞ্চনা, প্রতারণা ইত্যাদি দূর করে সকলের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠাই যে ইসলামের অঙ্গিকার, নগ্নতা, বেহায়াপনা, জেনা- ব্যভিচার, লজ্জাহীনতা ইত্যাদি পশু প্রবৃত্তির কণ্ঠরোধ করে মানবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বিকশিত করাই যে ইসলামের লক্ষ্য- উদ্দেশ্যে, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমন, যুদ্ধ- মারামারি, দাঙ্গা- ফাসাদ দূর করে সারা দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাই যে ইসলামের প্রচেষ্টা, সেই ইসলামের বিরুদ্ধেই সাম্রাজ্যবাদী, পৌত্তলিক ও ত্রিত্ববাদীরা দন্ত- নখর বিস্তার করে মুসলমানদেরকে রক্তাক্ত করছে।

বাংলাদেশসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে এ পর্যন্ত ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার দোহাই দিয়ে ইসলামপন্থী কোনো দল বা সংগঠন অথবা ইসলামী ব্যক্তিত্ব কোনো অমুসলিমকে হত্যা করেছে? কোনো অমুসলিমকে ধর্ষণ দূরে থাক, কারো আঁচল ধরে টান দিয়েছে? অমুসলিম নারীদের প্রতি চোখ তুলে তাকিয়েছে? অমুসলিমদের ধর্মীয় স্থান কলুষিত করেছে? অমুসলিমদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি নিন্দাসূচক কথা বলেছে? এ ধরণের একটি প্রমাণও কোনো অমুসলিম দিতে পারবে না। বরং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে কোনো কোনো অমুসলিম ইসলামের বিরুদ্ধে ধৃষ্টতামূলক উক্তিও মাঝে মধ্যে করে থাকেন। শুধু তাই নয়, প্রয়াত একজন অমুসলিম নেতা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার রমনা পার্কে দাঁড়িয়ে ইসলামপন্থীদের লক্ষ্য করে হুঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন, **'ফতোয়াবাজদের আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই মারবো। যতদিন আমরা ফতোয়াবাজদের না মারতে পারবো, সমূলে নিশ্চিহ্ন না করবো, ততদিন এদেশে আর আমাদের মা কালী জাগবে না।'**

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের কলিজার টুকরা নবী করীম (সাঃ)-কে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়, নানা ধরণের কার্টুন পত্রিকায় ছাপা হয়। খৃষ্টান প্রধান দেশসমূহের কর্তা ব্যক্তিরা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা, নবী করীম (সাঃ),

কোরআন ও হাদীসকে গালি দেয়া মানুষের মৌলিক অধিকার বলে দাবী করেন, এমনকি ডাচ্ আদালত এ রায় পর্যন্ত দিয়েছে যে, মুসলমানদের নবীকে গালি দেয়া কোনো অপরাধ নয়।

এসবের প্রতিবাদে বাংলাদেশের ইসলামপন্থীরা মিছিল- সমাবেশের মধ্যেই যাবতীয় তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেন, কোনো হিন্দু, খৃষ্টানদের দিকে চোখ মোটা করেও তাকান না। বরং হিন্দু, খৃষ্টান ও বৌদ্ধরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোনো কারণে বিপদগ্রস্ত হলে তাদের দিকে মমতাভরে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু এরপরেও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা হয়। মুসলিম দেশসমূহে সাহায্য- সহযোগিতা দিয়ে এরা কিছু সংখ্যক উচ্ছিষ্ট ভোগী তৈরী করেছে। ডাস্টবীনের এসব হাড় চাটা গোলামদের জন্যে তারা ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়াসমূহও উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছে। এসব পরজীবী উচ্ছিষ্ট ভোগীদের একমাত্র কাজই হলো দিন রাত ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামী দল- সংগঠনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা। এসবের পেছনে পৌত্তলিক ভারত ও ত্রিত্ববাদী পরমত অসহিষ্ণু ইউরোপ- আমেরিকার চরম সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি কাজ করছে, এ বিষয়টি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশের বক্তব্যে আরেকবার স্পষ্ট হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মের প্রতি সহিংসতা

যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক এবং অসহিষ্ণু ভেবে পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্রে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে সকল সমস্যার সমাধান রয়েছে বলে মনে করেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের পক্ষে সোচ্চার হয়েছেন, তাদের কাছে বিনয়ের সাথে প্রশ্ন করতে চাই, আপনারা যে ধরণের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ পসন্দ করেন, সেই গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কতটা অসহনশীল তা কি কখনো খতিয়ে দেখেছেন? ভোগবাদী গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যেসব দেশে ক্রিয়াশীল রয়েছে, সেসব দেশের শাসকবৃন্দ জাতিগত ব্যাপারে, ভিন্ন আদর্শ ও ভিন্ন মতের ব্যাপারে কতটা অসহনশীল তা কি কখনো লক্ষ্য করেছেন?

আপনারা জানেন, **'ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না'** সাম্প্রদায়িক এ ঘৃণ্য ঘোষণাও এসেছে পশ্চিমা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হিসেবে দাবীদার বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের কাছ থেকেই। **'শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাস করতে হলে আমাদের সভ্যতা গ্রহণ করতে হবে'** এ ঘোষণাও এসেছে পরমত ও আদর্শ অসহিষ্ণু আমেরিকার প্রেসিডেন্ড জর্জ বুশের মুখ থেকে। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র মক্কায় বোমা নিক্ষেপ করার পরামর্শও দিয়েছেন পরধর্ম, অসহিষ্ণু পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী আমেরিকার একজন জাতীয় নেতা।

মাত্র কয়েকদিন পূর্বেও সাম্প্রদায়িকতার আগুনে জ্বলে পুড়ে ধ্বংস হলো ফ্রান্সের মূলবান ধন-সম্পদ। পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এতটাই অসহনশীল যে, মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রাচীন নিদর্শন, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা তারা বরদাস্ত করতে পারে না। নিজেরা পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী হয়ে সারা দুনিয়ার ওপর গদা ঘুরাচ্ছেন, কিন্তু মুসলিম কোনো রাষ্ট্র দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে ও আত্মরক্ষার জন্যে শান্তিপূর্ণভাবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করবে, এটাও তারা সহ্য করতে পারেন না। গণতন্ত্রের এসব ঠিকাদার ও মানবাধিকারের ফেরীওয়ালাদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আত্মরক্ষারও অধিকার নেই।

আমেরিকায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটযুদ্ধে পরাজিত হবার আশঙ্কায় প্রার্থীকে অবশ্যই খ্রীষ্ট ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হিসেবে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। প্রার্থীর পূর্বপুরুষদের অনেক দূরের কেউ ভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিলো বলে যদি প্রমাণ হয় তাহলে প্রার্থীকে ঘায়েল করার জন্য অন্য প্রার্থীরা উক্ত ধর্মীয় বিষয়টিকেই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আমেরিকার সাম্প্রতিক নির্বাচনী প্রচারণায় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী 'বারাক ওবামা'র বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়েছে, ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে, তার নাম থেকে ইসলামের গন্ধ আসে এবং তিনি নাকি কোনো একদিন মুসলিম পোশাক পরিধান করেছিলেন। তিনি যতই এসব অভিযোগ অস্বীকার করছেন, প্রতিপক্ষ ততই তার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক এসব অভিযোগ শানিত করছে।

আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেনো 'টু' শব্দ করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে, কবিতা সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ) এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরণের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা করে। নেদারল্যান্ডে কোরআন নিষিদ্ধ করতে হবে বলে তারা দাবী জানিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) ও পবিত্র কোরআনকে জঘন্য ভাষায় গালি দেয়া বৈধ বলে ডাচ্ আদালত মুসলমানদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে।

কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে এদেশে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের

দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। এমনকি আমার দেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো?

সম্প্রতি ইন্টারনেট ওয়েবসাইটে এমন একটি ঘৃণ্য দৃশ্য ছাড়া হয়েছে, যা দেখলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় আমেরিকার বুশ সরকার কিভাবে দুনিয়াব্যাপী ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়াচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে মানবতাকে জর্জরিত করছে। দৃশ্যে দেখানো হয়েছে একটি সুসজ্জিত মসজিদ এবং মসজিদে অবস্থান করছে বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন, যাদের মুখে রয়েছে দাড়ি, মাথায় টুপি পাগড়ী এবং গায়ে রয়েছে লম্বা জামা। অর্থাৎ প্রত্যেক লোককেই আলেমের সাজে সজ্জিত করা হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই অস্ত্রধারী, মসজিদে বসে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড ঘটানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা করছে। এসব লোকজন পরস্পরে কথাবার্তা বলার সময় পবিত্র কোরআন থেকে জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলছে। এ দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড সমর্থন করে।

এরপরের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে, আমেরিকার সৈন্যবাহিনী কমান্ড হামলা চালিয়ে মসজিদসহ কথিত সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করে দিলো।

ইন্টারনেট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ঘৃণ্য এই দৃশ্য সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দিয়ে এ কথাই দুনিয়াবাসীকে বুঝানো হয়েছে যে, ইসলামই সন্ত্রাসবাদের জনক এবং মসজিদসমূহ সন্ত্রানের সূতিকাগার ও মুসলমানরা সন্ত্রাসী। সাম্প্রদায়িক চিন্তা- চেতনায় মন-মানসিকতা কতটা আচ্ছন্ন থাকলে ইসলামের মতো কালজয়ী অসাম্প্রদায়িক আদর্শের প্রতি সাধারণ মানুষের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ ধরনের উস্কানীমূলক দৃশ্য মঞ্চায়ন করে তা ওয়েবসাইটে ছাড়া হয়েছে, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

একের পর এক এ ধরণের ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক কর্ম তাদের দ্বারাই সংঘটিত হচ্ছে, যারা গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, সহিষ্ণুতা, সহঅবস্থান, অন্যের আদর্শ ও মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদির কথা দুনিয়ার মানুষের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে বলে থাকে এবং নিজেদেরকে সবথেকে বেশী উদার বলে দাবী করে থাকে।

প্রকৃত বাস্তবতা হলো, পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীদের এতটাই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, তারা ভিন্ন কোনো আদর্শ ও সভ্যতা ক্ষণিকের জন্যেও সহ্য করতে নারাজ। এ কারণেই তারা সমরশক্তির বলে বলিয়ান হয়ে সাত সমুদ্রের ওপার থেকে ছুটে এসে মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্থান ও ইরাককে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করেছে। প্রাচীন সভ্যতার লালন ভূমি বাগদাদ নগরীকে মৃত্যুপুরীর রূপ দিয়েছে। পবিত্র মাস রমজানে এবং ঈদের দিনে ঈদের জামায়াতেও বোমা নিক্ষেপ ও গুলী চালিয়ে মুসলমানদেরকে পাখির মতো হত্যা করে গায়ের জোরে তারা তাদের 'গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠার অভিযান চালাচ্ছে।

ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারীরা কুকুর-বিড়ালের অধিকার সংরক্ষণে সদা সচেতন থাকলেও তাদেরই নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে মুসলমানের মরণ আর্তনাদ শোনার ক্ষেত্রে তাদের শ্রবণশক্তি বধির। নিজেরা গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারেন, কিন্তু মুসলিম নারীর হিজাব তারা সহ্য করতে পারেন না।

স্বৈরাতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদাররাই গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে অসহায় মুসলিম বন্দীদের চোখের সামনে পবিত্র কোরআনের চরম অবমাননা করেছে। গুয়ান্তানামো-বে কারাগারে অসহায় মুসলিম বন্দীদের ওপর এমন অকথ্য নির্যাতন করা হচ্ছে যে, বাধ্য হয়ে তারা আবেদন করছে, 'আমাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক।' ইরাকের আবু গারিব কারাগারে মুসলিম বন্দীদের উলঙ্গ করে জীবিত মানুষের পিরামিড তৈরী করেছে। ৭০/৮০ বছর বয়স্কা বৃদ্ধা নারীকে গাধার মতো করে তার পিঠে চড়ে আনন্দ উল্লাস করেছে।

বন্দীদের গলায় কুকুরের বেল্ট পরিয়ে টেনে হিঁচ্ড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বন্দীদের ওপর শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। হিংস্র কুকুরগুলো মুসলিম বন্দীদের ওপর হামলে পড়েছে, বন্দীদের করুণ আর্তনাদ যখন আকাশ বাতাস ভারী করে তুলেছে তখন মানবাধিকারের ফেরীওয়ালারা পৈশাচিক আনন্দে উল্লাস করেছে। এসব লোমহর্ষক দৃশ্য বিশ্ববাসী প্রিন্টিং ও ইলোক্ট্রোনিক মিডিয়ায় দেখেছে এবং সচেতন মানুষ পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র আর ধর্মনিরপেক্ষতার তথাকথিত উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রতি ঘৃণাভরে ধিক্কার দিয়েছে।

পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে সারা দুনিয়ার মুসলিমরা যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে পশু কোরবানী করেছে, ঠিক সেই দিনই ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মুসলমানদের ঈদ অনুষ্ঠানের প্রতি চরম বিদ্রুপ করা হয়েছে।

আমেরিকা- ইউরোপ তাদের নিজেদের দেশসমূহে বিশাল বিস্তীর্ণ এলাকা অনাবাদী ও পরিত্যক্ত থাকলেও অসহিষ্ণুতার কারণেই ইয়াহূদীদের ধর্মীয় রাষ্ট্র 'ইসরাঈল'

সেখানে প্রতিষ্ঠিত না করে মুসলমানদের উত্যক্ত করার লক্ষ্যেই মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈল নামক রাষ্ট্রের বিষ ফোঁড়া সৃষ্টি করা হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমত সহিষ্ণুতা যারা দেখতে পান তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী দেশসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিন। দেখুন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে হিন্দু দেবতা হনুমান, বানর আর ময়ুর পাখি হত্যা করা দূরে থাক, কষ্ট দেয়াও নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই ভারতেই মুসলমানদের কোরবানীর পশু গরু যবেহ স্থান বিশেষে নিষিদ্ধ এবং সারা দেশে আইনগতভাবে গরু যবেহ নিষিদ্ধের দাবী তোলা হচ্ছে। মাইকে আযান নিষিদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কোরআন নিষিদ্ধ করার দাবী করেছে। ধর্মনিরপেক্ষতা এর অনুসারীদের এতোই অসহিষ্ণু করে তুলেছে যে, ভারতীয় নেতা বালথ্যাকারে হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, **'মুসলমানদের লাথি মেরে ভারত থেকে বের করে দিতে হবে।'** গুজরাটে হাজার হাজার মুসলিম নিধন যজ্ঞের প্রধান হোতা নরেন্দ্র মোদীও ধর্মনিরপেক্ষ ভারতীয় নেতা। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নেতৃবৃন্দই বাবরী মসজিদ ধ্বংসের অনুকুল পরিবেশও সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ঈদের জামায়াতে শূকর ছেড়ে দিয়ে মুসলিম নিধন অভিযানও চালানো হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে। শিখ ধর্মাবলম্বী দেহরক্ষীর হাতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হবার পরে নির্দোষ শিখ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি যে নির্যাতন ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে চালানো হয়েছে, তা সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের সকল ইতিহাসকে ম্লান করে দিয়েছে।

সম্মানিত পাঠক, এবার সদ্য ঘটে যাওয়া দুটো ঘটনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, অসহিষ্ণুতা আর সাম্প্রদায়িকতা কিভাবে উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সারা দুনিয়ার সম্মুখে নিজের কুৎসিত অবয়ব আরেকবার উলঙ্গ করে দেখিয়েছে। ২৫ শে ডিসেম্বর ০৭, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বড় দিন। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে বসবাসরত খৃষ্টান সম্প্রদায়ও তাদের সব থেকে বড় ধর্মীয় উৎসব 'বড় দিন' উপলক্ষ্যে আনন্দে- উল্লাসে মেতে উঠেছিলো। হরিষে বিষাদ নেমে এলো। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের বৃহৎ সম্প্রদায়ের লোকজন একযোগে কয়েকটি গির্জায় হামলা চালিয়ে একজনকে হত্যা করলো, এতে গুরুত্বর আহত হলো ৩০ জন, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান ১৪ টি গির্জায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ভষ্মিভূত করে দিলো। (নয়া দিগন্ত, এএফপি, খালিজ টাইম, ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর' ০৭)

এবার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ফেরীওয়ালাদের পরমত অসহিষ্ণুতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখুন। ৯ই ডিসেম্বর' ০৭ তারিখে আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটির কিউ ট্রেনে একদল উচ্ছৃঙ্খল তরুণ- তরুণী তাদের ধর্মীয় শ্লোগান 'মেরি ক্রিসমাস' বলে চিৎকার করছিলো। একই ট্রেনের যাত্রী ছিলো ওয়ালটার এডলার নামক একজন

ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বী যুবক। মেরি ক্রিসমাস শ্লোগান শুনে সেও তাদের ধর্মীয় শ্লোগন 'হ্যাপি হনুকা' বলে ধ্বনি দিয়েছিলো। সাথে সাথে খৃষ্টান তরুণ- তরুণীর দল 'যিশু খৃষ্টকে হত্যা করেছে ইয়াহূদীরাই' এ কথা বলে ইয়াহূদী যুবকের ওপর প্রবল আক্রোসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। উক্ত কম্পার্টমেন্টে বেশ কয়েকজন ইয়াহূদী যাত্রীও ছিলো। নিজেদের জ্ঞাতী ভাইকে রক্ষা না করে তারা নীরবে দর্শকের ভূমিকা পালন করছিলো। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লালনভূমি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার নওয়াব পরিবারের সন্তান আমেরিকা প্রবাসী হাসান আসকারী- যার দেহের শিরা-উপশিরায় ধাবমান রয়েছে ইসলামী চেতনায় শানিত অসাম্প্রদায়িক মুসলিম রক্ত, তার পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা কি সম্ভব?

'মজলুমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াও' অসাম্প্রদায়িক মহান ইসলামের এ শিক্ষা হাসান আসকারীর রক্তে প্রতিবাদের তরঙ্গ সৃষ্টি করলো। ভুলে গেলো সে, ইয়াহূদীরা নবী করীম (সাঃ)-কে নানা কৌশলে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছে এবং খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে, তার মুসলিম ভাইবোন ফিলিস্তিনীদেরকে দেশ ছাড়া করেছে, প্রত্যেক দিনই মুসলিম ভাইদের রক্তে ইয়াহূদীরা হাত লাল করছে। সব কিছু ছাপিয়ে ইসলামের মহান শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারকে রক্ষার জন্যে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। নিজেও সে মারাত্মকভাবে আহত হলো খৃষ্টান তরুণ- তরুণীদের হাতে। অবশেষে পুলিশ মুমূর্ষ অবস্থায় ইয়াহূদী যুবক ও বাংলাদেশের হাসান আসকারীকে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার অগ্নিগর্ভ থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে প্রেরণ করলো।

আক্রমণের শিকার ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলার গত ২১শে ডিসেম্বর' ০৭ তারিখে নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আমি ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্ট্যাডি করেছি। তাতে ইসলাম ধর্মকে যারা সন্ত্রাস বা চরমপন্থা বলে অপবাদ দেয় তার কোনো সত্যতা খুঁজে পাইনি। আমি দেখেছি, ইসলাম হচ্ছে একান্তই মানবতার ধর্ম। বিশ্বাস ও আদর্শিকভাবে ইসলাম হচ্ছে আমাদের সব চেয়ে কাছের ধর্ম। আর এখন হাসানের আচরণে সেটি বদ্ধমূল হয়েছে আমার বিশ্বাসে। বর্তমানে ইয়াহূদী- মুসলিম বিদ্বেষ হচ্ছে একান্তই রাজনৈতিক। ধর্মীয় কারণে এটি হচ্ছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এ জন্যে বিষয়টি রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করতে হবে।'

নিউজ ওয়ার্ল্ডের সাথে সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের কৃতি সন্তান হাসান আসকারী বলেন, 'আমি যে ধর্মে বিশ্বাসী তা কখনো কাউকে হেয় বা অপমান করার নীতিতে বিশ্বাস করে না। ইসলাম বলেছে, কেউ অন্যায়ের শিকার হলে তাকে সাহায্য করতে। ইসলাম আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছে এবং এই শিক্ষাই আমাকে উজ্জীবিত

করেছে অসহায় নির্যাতিত ওয়ালটার এডলারকে সাহায্য করতে।' (সূত্রঃ নিউজ ওয়ার্ল্ড, নিউইয়র্ক, নয়াদিগন্ত, ২৭শে ডিসেম্বর' ০৭)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ সফরে এসে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নসিহত খয়রাত করতে ভোলেন না, কিন্তু নিজ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে তা তাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেনা।

ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে দিনরাত কথা বলে যারা মুখে ফেনা তুলছেন, হাসান আসকারীকে কি তারা সাম্প্রদায়িক বলবেন? কোন্ সে শিক্ষা যা হাসান আসকারীকে নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও একজন ইয়াহূদীকে সাহায্য করার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিলো? সে পবিত্র আদর্শের নাম ইসলাম।

হাসান আসকারী সেই দেশের সন্তান, যে দেশে রোজা আর পূজা নির্বিঘ্নে একই সাথে চলে। মসজিদ, মন্দির আর গির্জা পাশাপাশি অবস্থান করে এবং যে যার পদ্ধতিতে স্রষ্টার আরাধনা করে। যে দেশের মানুষ পরস্পরের ধর্মীয় আনন্দে অংশ গ্রহণ করে, পরস্পরের শোক-দুঃখে পাশে এসে দাঁড়ায়। ক্রান্তিকালে কে কোন্ ধর্মের অনুসারী সেদিকে কেউ-ই দৃষ্টি দেয় না। প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' এ বিধ্বস্ত এলাকায় আলেম-ওলামা, মাশায়েখ, ইসলামী দল ও ব্যক্তিত্বগণ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলকেই সাধ্যানুযায়ী সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার গন্ধও এদেরকে স্পর্শ করেনি।

বাংলাদেশ, অগণিত শহীদের রক্ত বিধৌত এদেশের মাটি। এ মাটিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় ওলামা, অগণিত পীর- আওয়ালীয়া। ধর্মভীরু অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে গর্বিত ভঙ্গিতে আপন অবয়ব উজ্জ্বল করে রেখেছে বাংলাদেশ। এই দেশ শুধু একজন হাসান আসকারীকে জন্ম দেয়নি, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে প্রস্তুত রয়েছে প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের অসংখ্য হাসান আসকারী। সুতরাং যে দেশ, যে মাটি হাসান আসকারীর মতো মানবতাবাদী সন্তান জন্ম দিয়ে সারা দুনিয়ায় নিজের ভাবমর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, সেই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতার আগুন জ্বালানোর স্বপ্ন যারা দেখছেন, তাদের সে স্বপ্ন এদেশের অসাম্প্রদায়িক জনতা বাস্তবায়িত হতে দিবে না ইন্শাআল্লাহ।

আমি আমার দেশের ঐ সকল বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিক, কলামিষ্ট-- যারা মুসলিম নামের অধিকারী তাদের প্রতি অনুরোধ করছি, আপনারা বাংলাদেশের অহঙ্কার হাসান আসকারীর মতো মন-মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারলেও ইয়াহূদী যুবক ওয়ালটার এডলারের মতো ঐ মানসিকতা অন্তত সৃষ্টি করুন, যে মানসিকতা আপনাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে জানা ও বোঝার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। ওয়ালটার এডলার ইয়াহূদী

যুবক হয়েও ইসলামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য মুসলিম নামধারী ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের, তারা নানা মতবাদ- মতাদর্শ ভিত্তিক রচিত বিশালাকৃতির গ্রন্থ অধ্যয়নে অনেক সময় ব্যয় করলেও ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্যে সামান্য সময় ব্যয় করে ওয়ালটার এডলারের ছাত্র হবার যোগ্যতাও অর্জন করেননি। নিজ ধর্মের প্রতি মুসলিম নামধারী বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টদের বিদ্বেষ প্রসূত অবজ্ঞার এ দুঃখজনক দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোনো জাতীর মধ্যে আছে বলে অন্তত আমার জানা নেই।

বাংলাদেশ, অগণিত শহীদের রক্ত বিধৌত এদেশের মাটি। এ মাটিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন মহান আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় ওলামা, অগণিত পীর- আওলীয়া। ধর্মভীরু অসাম্প্রদায়িক জনগোষ্ঠী বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে গর্বিত ভঙ্গিতে আপন অবয়ব উজ্জ্বল করে রেখেছে বাংলাদেশ। অসংখ্য মাদ্রাসা-মসজিদ বুকে ধারণ করে ধন্য বাংলাদেশ। আমাদের প্রিয় এ জন্মভূমি ৫৬ হাজার বর্গ মাইলের সুবিশাল দেশটির রয়েছে সহস্র বছরের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস।

১৯৪৭ সালে ভারব বর্ষ ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীন হয়। আমরা স্বাধীন হলাম '৪৭ এর ১৪ই অগাষ্ট আর ভারত স্বাধীন হলো '৪৭ এর ১৫ই অগাষ্ট।

এরপরে '৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ চূড়ান্ত স্বাধীনতা অর্জন করলো। **ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৪৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১টি বারের জন্যও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি, অপরদিকে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীন রাজনীতির পতাকাবাহী ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে ২৬ হাজার বারেরও বেশী।**

আমাদের দেশের মানুষের স্মৃতি এতো ভোঁতা হয়ে যায়নি যে, বাস্তব ইতিহাস ভুলে গিয়ে কতিপয় টক্‌শোজীবী, পরজীবী, উচ্ছিষ্ট ভোগী তথা কথিত বাম বুদ্ধিজীবী, সুশীল আর কলামিষ্টদের হুঙ্কারে দেশকে বাম রাজনীতিকদের হাতে তুলে দিয়ে ১৫ কোটি মানুষ নিজেরাই স্বেচ্ছায় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হবে।

সুতরাং সাম্প্রদায়িক সহিংতার আগুন জ্বালানোর স্বপ্ন যারা দেখছেন, তাদের সে স্বপ্ন এদেশের অসাম্প্রদায়িক জনতা বাস্তবায়িত হতে দিবে না ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রিয় পাঠক! পাশ্চাত্যের ভোগবাদী গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা আর সমাজতান্ত্রিক অসহিষ্ণুতা এতই উৎকট যে, এর অনুসারীরা ভিন্ন মত, আদর্শ ও ভিন্ন ধর্মীয় স্থান সহ্যই করতে পারেন না। তুরস্কের কামাল পাশা তার দেশে টুপি, মুসলিম নারীর হিজাব, মসজিদ, আরবী ভাষায় আযান এমনকি 'আল্লাহু আকবার' শব্দটিও সহ্য করতে পারেননি। এসব কিছু নিষিদ্ধ করেও তিনি স্বস্তি পাননি, অগণিত মসজিদকে তিনি পানশালায় পরিণত করেছিলেন এবং অগণিত ভিন্ন মতাবলম্বীকে তিনি অত্যন্ত

পৈশাচিক পদ্ধতিতে হত্যা করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক অসহনশীলতা এতটাই প্রকট ছিলো যে, সমাজতন্ত্রের পতনের পরে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে ভিন্ন মতাবলম্বীদের অগণিত গণকবর এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র আর রাশিয়ার সমাজতন্ত্র কতটা অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু তার লোমহর্ষক বর্ণনা রয়েছে নিম্ন লিখিত গ্রন্থ ও পত্রিকাসমূহে। একটু কষ্ট করে অধ্যয়ন করুন, সত্যকে সত্য হিসেবে জানতে চেষ্টা করুন।

(1) A History of Intellectual Development of Europe by Jhon Wiliam Draper.

(2) Diagnosis of Man by Kenneth Walker.

(3) Story of Civilization by Dr Will Durant.

(4) Christianity and Social Revolution by Prof. Josheph Nedham.

(5) History of the Latin Christianity by H. H. Milman.

(6) Lectuers on the History of the Eastern Church by A. P. Stanly.

(7) Democracy vs Liberty by Mr. Peregrine Worsthorne.

(8) The Menace of Free Journalism in America by Marry, The Listener, London, May 14, 1953.

(9) Freedom is not so simple, The Listener Weekly, London, Sept, 9, 1954.

(10) The Middle East Survey by S. A. Morrison.

(11) Foundation of Turkish Nationalism by Dr. Uril Hyde and Grey Wolf.

(12) Inside Europe by Jhon Gunther.

(13) A Study of History by Arnold Toynbee.

(14) The Politics of Democratic Socialism by E. F. M. Durbin.

(15) Gilmpses of World History by Jawhar Lal Nehru.

(15) The Scourge of the Swastika by Lord Russel.

(16) Economic Life of Soviet Russia by Calvin Hoover.

(17) Forced Labour in Soviet Russia by David Dallin.

(18) Cannibalism by Montaigen.

(19) Western Civilization' in 'In Praise of Idleness by Bertrand Russel.

(20) Naugt for your comfort by Father Trevor Hadlestone.

(21) Peoole of the Deer by Michael Joseph.

(22) The Revolt against Reason by Arnold Lunn.

(23) Difficulties in Evolutionary Theory by Dr. Douglas Dewer.

(24) Death of a Science in Russia by Konyezarcole.

(25) Soviet Genetics by Juliash Haxly.

(26) How near is War by Bertrand Russel.

(27) Freedom, Loyalty and Dissent by H. S. Commager.

(28) Democracy and the Teacher in the United States, Published in the Manchester Guardiam, Weekly, November, 1991.

(29) The Cancer World.

(30) The Animal farm.

সেই সাথে আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিন এর রচনা সমগ্র পড়ে দেখার অনুরোধ করছি। সুতরাং ইসলাম এবং এর অনুসারীদের অসহিষ্ণু আখ্যায় আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী যারা তুলছেন, তারাই সবথেকে বেশী অসহনশীল, সাম্প্রদায়িক এবং পরমত অসহিষ্ণু। এর বড় প্রমাণ, ধর্মবিদ্বেষী এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের দাবীদাররাই এদেশে হত্যা, গুম, জ্বালাও- পোড়াও, ভাংচুর ও গলাকাটা রাজনীতির প্রবক্তা। হিন্দুদের পূজা মন্ডপে হামলা করে তারাই মূর্তি ভেঙেছে। **'বন্দুকের নল থেকে ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'** এ শ্লোগান একমাত্র তারাই সারা দেশের দেয়ালে দেয়ালে লিখেছেন। দলীয় কোন্দলে নিজেরা মারামারি করে অন্যের ঘাড়ে অপবাদ চাপানো, হরতাল- অবরোধের নামে লুটতরাজ, অগ্নি সংযোগ, স্থাপনা ধ্বংস ও যান-বাহন ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করা এসব ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন তাদেরই নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ও ঘৃণ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের জন্মদাতা কারা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'চোরের মা'র বড় গলা' এ কথা সবাই জানে।

এবার ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বাস্তব চিত্র দেখুন, ধর্মভিত্তিক তথা ইসলামী রাজনীতি যারা করেন, তারাই সবথেকে বেশী শান্তি প্রিয়, দেশ প্রেমিক এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীদের হাতে এদের বহু নেতা-কর্মী শাহাদাতবরণ করেছেন, নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু এরা কখনো সভা সমাবেশ, মিছিল ও প্রতিবাদের নামে জ্বালাও- পোড়াও,

ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ ধ্বংস করেনি। দেশ ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী কোনো ধরণের কর্মসূচী পালন করেনি, স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দিয়ে বিদেশী কোনো শক্তির সাথে আঁতাত করেনি।

দেশ ও জাতির স্বার্থে মহান আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার লক্ষেই এরা আন্দোলন করছে। আর মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত সকল বিধানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানব জীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা। জুলুম, নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদ বন্ধ করে সংঘাত-সহিংসতার মূলোৎপাটন করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ করা। ইসলামী আন্দোলনে নিবেদিত লোকগুলো রাতদিন এ কাজই করে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তারা দেশের স্বার্থ বিরোধী বিন্দু পরিমাণ কাজ করেছেন বলে কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। দেশ প্রেম, সততা-স্বচ্ছতা ও জবাবদীহীতায় তারাই পরিচ্ছন্ন, এ কথা দেশবাসীর কাছে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। ক্ষমতায় থাকাকালে কেনো তারা দূর্নীতি করলেন না, এটাই কি তাঁদের বড় অপরাধ?

অতএব ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিদের ধারণা অনুযায়ী ইসলাম শুধুমাত্র নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাত সর্বস্ব কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রবর্তন করতে আসেনি। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। নিজকে মুসলমান দাবী করার পর এর কিছু বিধান স্বীকার করবো অবশিষ্ট বিধানসমূহের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করবো, এমন অধিকার কোনো মুসলমানকে দেয়া হয়নি এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে। এর বিপরীতে অবস্থানকারী মুনাফিক– অবশ্যই মুসলমান নয়। পবিত্র কোরআনের আয়নায় নিজের চেহারা দেখুন তাহলে নিজেকে আবিষ্কার করতে কষ্ট হবে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ–

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করলে কোনো মুমীন পুরুষ বা মুমীন নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকে না। (সূরা আহ্যাব- ৩৬)

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا–

কিন্তু না, আমি তোমার মালিকের শপথ করে বলছি, এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের যাবতীয় মত বিরোধের ফায়সালায় আপনাকে

(শর্তহীনভাবে) বিচারক মেনে নিবে। অতঃপর আপনি যা সিদ্ধান্ত দিবেন সে ব্যাপারে তাদের মনে যেনো আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না, বরং আপনার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তকরণে মেনে নিবে। (সূরা নিসা- ৬৫)

এ ধরণের অসংখ্য আয়াত- হাদীস দিয়ে প্রমাণ করা যাবে যে কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলমান তার জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশেও ধর্মীয় অনুশাসনের বাইরে অবস্থান নিতে পারে না। ইসলাম কর্তৃক তার সম্পূর্ণ জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত। সেক্ষেত্রে কোনো মুসলমান তার জীবনের বিশাল অঙ্গন রাজনীতি, সেই রাজনীতিকে ধর্ম মুক্ত করার প্রস্তাব ধর্ম তথা ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে একেবারেই মূর্খ অথবা নাস্তিক ধর্ম বিদ্বেষী ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না।

আরেকটি কথা এখানে স্পষ্ট করতে চাই, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের নীতিমালা অনুসারেই নাস্তিক ব্যতিত কারো পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যারা ধর্মনিরপেক্ষ হবার দাবী করেন এবং ব্যক্তি জীবনে ধর্ম পালন করেন বলে প্রচার করে থাকেন, তারা হয় ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সাথে জেনে বুঝে প্রহসন করেন অথবা দেশের ধর্মভীরু জনগণকে ধোকা দেয়ার জন্যেই প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালা স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, নাস্তিকতা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। English Secularism এ ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞায় উল্লেখ করা হয়েছে–

Secularism is a code of duty pertaining to this life founded on consideration purely human, and intended mainly for those who find theology indefinite or inadequate, unreliable or unbelievable. (English Secularism- 35)

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতা শুধুমাত্র মানব সম্প্রদায়ের পার্থিব দায়িত্ব সম্পর্কিত নিয়মসমূহ এবং যারা ধর্মতত্ত্বকে অস্পষ্ট, অপূর্ণ, বিশ্বাস স্থাপনের অযোগ্য এবং অবিশ্বাস্য মনে করে এই আদর্শ তাদের জন্যে।

বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, যারা ধর্মীয় বিশ্বাস ও নিয়ম-নীতিকে অপূর্ণ বলে মনে করে, ধর্মীয় বিষয় যাদের কাছে অস্পষ্ট এবং ধর্ম এমন এক আদর্শ যা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য তথা ধর্মীয় বিষয়সমূহ একেবারেই অবিশ্বাস্য, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কেবলমাত্র তাদেরই আদর্শ হতে পারে।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে নিজেদেরকে যারা দাবী করেন, এই ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যারা কথা বলেন, ধর্মনিরপেক্ষতার সংজ্ঞা অনুযায়ীই তারা নাস্তিক কিনা তা তাদেরকেই ভেবে দেখতে হবে। এখানে আমার নিজস্ব কোনো মন্তব্য নেই, আমি শুধু এতটুকুই বলতে চাই, যেখানে স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন

ধর্মের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। পবিত্র কোরআন বলছে–

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الاِسْلَامُ–

নিঃসন্দেহে (মানুষের) জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহ্ তা'য়ালার কাছে ইসলামই একমাত্র (গ্রহণযোগ্য) ব্যবস্থা। (সূরা আলে ইমরান-১৯)

লক্ষাধিক নবী- রাসূলদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, অসংখ্য সাহাবায়ে কেরামের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী ছিলেন না। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বের সম্মানিত ওলামায়ে কেরামের নিকট পরিচিত অগণিত বিজ্ঞ ওলামা- মাশায়েখদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ গ্রহণ তো করেনই নি বরং এ মতবাদকে সুস্পষ্ট কুফ্রী মতবাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশের মুসলিম নামধারী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টরা কোন্ সাহসে, কিসের বিনিময়ে এবং কোন্ খুঁটির জোরে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বানাতে চান এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষনার দাবী তোলেন? দেশ প্রেমিক ঈমানদার মুসলমানদের তা অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে।

যারা ব্যক্তি জীবনে ধর্ম-কর্ম পালনে অভ্যস্ত নয়, ধর্মে বিশ্বাস করে না, পরকালে জবাবদীহীতার প্রতি আস্থা নেই, কবরের আযাব, হাশর, মিযান, সিরাত, জান্নাত জাহান্নামকে কাল্পনিক বলে মনে করে এবং ধর্মকে 'আফিম' বলে, কেবলমাত্র তারাই দেশ ও রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাদের কাছে ধর্মই হচ্ছে জঙ্গীবাদের মূল। এরা কৌশলে দেশকে আবার ধর্মনিরপেক্ষ বানাতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর যেসব দেশ ইসলামকে উপেক্ষা করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে, সেসব দেশ এর বিষাক্ত ফলশ্রুতিতে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ও পরাজয় ব্যতীত আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি। তুরস্ক ও ভারত এর জ্বলন্ত প্রমাণ।

অথচ ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমেই মানুষ চরিত্রবান হতে পারে। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, মন্ত্রী ও এমপি থাকা অবস্থায় সুযোগ থাকা সত্বেও যারা অসৎ উপার্জন ও আমানতের খেয়ানত করেননি, যেসব সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষয়ত্রী, ব্যবসায়ী এবং আইন শৃঙ্খলা ও প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যারা সুযোগ থাকা সত্বেও নির্মোহ জীবন-যাপন করেছেন তা কেবলমাত্র তারা ধর্মকে বিশ্বাস ও আল্লাহকে ভয় করেন বলেই তাদের জন্য সততা-স্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করা সম্ভব হয়েছে। এর বিপরীতে অবস্থানকারী ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশেরই নৈতিক স্খলন ঘটেছে, তাদের পরিণতি

দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যা চোখে আঙ্গুল দিয়ে আর বোঝানোর প্রয়োজন পড়ে না।

সুতরাং কেবলমাত্র মতলববাজরাই দেশ ও রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত বানাতে চায়। কারণ সততা-স্বচ্ছতা সমৃদ্ধ জীবন-যাপন ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি না করা তাদের দৃষ্টিতে অপরাধ। তারা চায় দেশ থেকে নারীর পর্দা প্রথা উঠে যাক। নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা চালু হোক, নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী করা হোক, যুবক-যুবতীরা বল্গাহীনভাবে লিভ্ টুগেদারে অভ্যস্থ হোক, বাক-স্বাধীনতা ও মুক্ত চিন্তার নামে আল্লাহ ও রাসূল, কোরআন হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম ও আদালতে আখিরাত বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ফ্রীস্টাইল লেখালেখি চালু হোক এবং দেশের মাদ্রাসাগুলো বন্ধ হয়ে যাক। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ধর্মবিদ্বেষী বামপন্থীদের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে হাজারো ল্যাখো টক্-শো'র আয়োজন করে দর্শক শ্রোতাদের কান ঝালা পালা করা যাবে ঠিকই, কিন্তু দেশবাসীর হৃদয়ের গভীরে প্রথিত ইসলাম প্রীতির শেকড় উপড়ানো যাবে না। কারণ সূর্যালোকের বিরুদ্ধে নিশাচর প্যাঁচাদের ক্যাঁচ-ক্যাঁচানিতে প্যাঁচাদের কষ্টই বৃদ্ধি পায়, সূর্য্যের তাতে কিছুই আসে যায় না। সূর্য তার নিত্য দিনের অভ্যাস আলো ও উত্তাপ দিয়ে নিঃস্বার্থ কল্যাণ ছড়ায় বিশ্বময়। আর প্যাঁচারা সূর্য্যকে গালি দিতে দিতে চামচিকার মতো কোটরে লুকায়। জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়–

আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চেঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চেঁচাক।

মোরা গা'ব গান, ওদের মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক।।

ইসলাম মানবতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে, মানুষে মানুষে গোত্র, বর্ণ, ও অঞ্চলভিত্তিক পার্থক্যের সফল বিলোপ সাধন করাই ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বিখ্যাত চিন্তাবিদ Sir C. P. Ramaswamy Aiyer ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেছেন, 'ইসলাম কি দাবী করে? বর্তমান পৃথিবীতে প্রকৃত অর্থে সক্রিয় একমাত্র গণতান্ত্রিক ধর্মব্যবস্থা হিসেবে আমি ইসলামের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। কেবলমাত্র আমিই নই, চিন্তাশীল প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সত্যের স্বীকৃতি না দিয়ে পারবে না। হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। এ মহাসত্য স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করার সৎ সাহস আমার রয়েছে। দার্শনিক ভিত্তি থাকার পরও আমার নিজের ধর্ম 'একক এক মানব সমাজের' বাস্তব প্রতিষ্ঠায় সফলতা অর্জন করেনি। ঈশ্বরের সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে সকল মানবগোষ্ঠী এক ও অভিন্ন, এই অতীব প্রয়োজনীয় চেতনার বাস্তব প্রতিষ্ঠা করতে ইসলাম ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মই সক্ষম হয়নি। দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়েরস্ (Boers), শ্বেতাঙ্গ অষ্ট্রেলিয়া অথবা আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যসমূহের সমস্যা

এমনকি যুক্তরাজ্যের সমাজ জীবনে লুকায়িত দ্বন্দ্ব-বিভেদ ইত্যাদির মতো যে কোনো সমস্যা ইসলামে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।' (Eastern Times, 22nd December, 1944)

Arnold Toynbee তাঁর Civilization on Trial নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন, 'আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান দিকসমূহের সাথে অস্থির ও বিক্ষিপ্ত চিন্তার অনুসারী মানুষগুলো বড় ধরনের দুটো সমস্যা উপস্থিত করেছে। এর একটি হলো উগ্র বর্ণবাদ আর আরেকটি হলো মদ। এগুলোর মোকাবেলায় ইসলামের অভ্যন্তরীণ শক্তি এমন অবদান রাখতে সক্ষম, যা গ্রহণ করলে আমরা উন্নত নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের সৌধ গড়তে পারি। মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে বর্ণবাদের মূলোৎপাটন ইসলামের বিরাট অবদান। বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামের এই মহৎ নীতির প্রচার ও প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমানে যা অবস্থা, তাতে বর্ণবাদী অসহনশীলতার প্রচারকদের চেহারা ক্রমেই ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। বর্ণবাদী এই মানসিকতা চলতে থাকলে তা মারাত্মক ক্ষতি বা ধ্বংসের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। ইসলামের বর্ণবাদ বিরোধী শক্তির উত্থান ঘটিয়েই কেবলমাত্র বর্ণবাদকে পরাজিত করে শান্তি ও সহিষ্ণুতার পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।' (Civilization on Trial- by Arnold Toynbee, P. 205-206)

মহাপবিত্র সংবিধান আল কোরআন শুধুমাত্র মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠার কথা বলেনি, সকল মানুষের প্রতিই সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান এবং বিচার পরিচালনায় কোনো ধরনের পার্থক্য ও পক্ষপাতিত্বের সামান্যতম প্রশ্রয় দেয় না। কে মুসলিম এবং কে অমুসলিম, ইসলাম সুবিচারের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য করে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা নির্দেশ দিয়েছেন-

وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ-

যখন মানুষের মধ্যে তোমরা বিচার ফয়সালা করো তখন তা ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে করবে। (সূরা নেসা-৫৮)

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ-

আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নির্দশন দিয়ে প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে দিয়েছি পবিত্র গ্রন্থ ও ন্যায়দন্ড যাতে করে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। (সূরা আল হাদীদ-২৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوّمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالاَقْرَبِيْنَ، اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا، فَلاَ تَتَّبِعُوْا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ تَلْوا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا–

হে বিশ্বাসীগণ! সুবিচার প্রতিষ্ঠায় তোমরা কঠোরতা অবলম্বন করো, আল্লাহর সাক্ষী স্বরূপ, এমনকি তা যদি তোমার নিজের, তোমার পিতার বা তোমার আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় এবং সুবিচারের ক্ষেত্রে ধনী ও গরীবের মধ্যেও কোনো পার্থক্য করবে না, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করো না, এ পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। যদি সুবিচারকে বিকৃত করো বা সুবিচার প্রদর্শনে অস্বীকৃত হও,তাহলে মনে রেখো তুমি যা কিছুই করছো আল্লাহ সকল কিছুই দেখছেন। (সূরা নেসা-১৩৫)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا كُوْنُوْا قَوّمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ، وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلٰى اَلاَّ تَعْدِلُوْا، اِعْدِلُوْا–

হে বিশ্বাসীগণ! সাম্য ও সুবিচারের ক্ষেত্রে তোমরা অবিচল নিষ্ঠা প্রদর্শন করো। কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা যেনো তোমাদের সুবিচার থেকে বিপথগামী করতে না পারে। সুবিচারের সাথে কাজ করো। (সূরা মায়েদা- ৮)

সুতরাং পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে যে রাষ্ট্র গ্রহণ করবে, সেই রাষ্ট্রের মুসলিম, অমুসলিম সকল নাগরিকই সুবিচার লাভে ধন্য হবেন। ইসলামের এই নির্দেশ শুধুমাত্র কোরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করে কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানব গোষ্ঠীর সম্মুখে স্বর্ণালী দৃষ্টান্ত স্থাপনও করেছে। চুরির অপরাধে নবী করীম (সাঃ)-এর বিচারালয় থেকে উচ্চ সম্মান-মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী গোত্রের এক মহিলার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা হলো। সম্মান-মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সে রায় পুনর্বিবেচনার জন্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করা হলে তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করলেন, 'আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এ ধরনের অপরাধে অপরাধী হতো, তাহলে তাঁর ক্ষেত্রেও দন্ড ভোগের বিন্দুমাত্র হ্রাস- বৃদ্ধি করা হতো না।' (আল হাদীস)

দ্বিতীয় খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অপরাধে অভিযুক্ত

একজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের হাতে সোপর্দ করে অপরাধীকে হত্যা করে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো এবং অপরাধী মুসলমানকে হত্যা করে অমুসলিমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিলো। তৃতীয় খলিফার শাসনামলে দ্বিতীয় খলীফার এক সন্তান হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হলো। সাক্ষ্য প্রমাণে অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণ হলে দ্বিতীয় খলিফার সন্তানকেও প্রাণদন্ডে দন্ডিত করা হয়। চতুর্থ খলিফার শাসনামলে একজন অমুসলিমকে হত্যা করার অভিযোগে মুসলিম এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ প্রমাণিত হলে উক্ত মুসলিম ব্যক্তিকে প্রাণদন্ডাদেশ দেয়া হলো। নিহত অমুসলিমের ভাই এসে খলীফাকে জানালেন, 'অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিয়েছে, এ জন্যে আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। আপনারা তাকে মুক্তি দিন।' শুধুমাত্র মুখের কথায় খলীফা আসামীকে মুক্তি দিলেন না, তিনি গোয়েন্দাদের মাধ্যমে তদন্ত করে দেখলেন, কোনো ধরণের প্রভাব, হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন ব্যতীতই অমুসলিম লোকটি ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে আসামীকে মুক্তি দেয়ার অনুরোধ করছে। এরপর অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হয়। (Islamic Law and Constitution, P. 179)

এ ধরণের অসংখ্য দৃষ্টান্তে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষী, ইসলাম এবং ইসলামের অনুসারী ব্যতীত এ ধরণের অসাম্প্রদায়িক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন ভিন্ন কোনো আদর্শ এবং জনগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী মুসলিম শাসকগণ সকল ধর্মের প্রজাদের ওপর রাজত্ব করেছেন। রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি সুলতান মাহ্মুদের বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে একজন হিন্দু নাগরিক মামলা দায়ের করলে স্বয়ং সুলতান মাহমুদকে অভিযোগের জবাব দেয়ার জন্যে কাজীর আদালতে উপস্থিত হতে হয়েছিলো। একজন ব্যবসায়ীর সাথে অশোভন আচরণের অভিযোগে শেরশাহ সুরী তাঁর সন্তানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেছিলেন। একজন অমুসলিম মহিলাকে অপমান করার অভিযোগে সম্রাট আলমগীর তাঁর প্রধানমন্ত্রী আসাদ খাঁনের পুত্র মির্জা তাফাখুরকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।

অভিযোগ করা হয়ে থাকে ইসলাম এবং এর অনুসারীরা অমুসলিমদের প্রতি সহিষ্ণু নয়, অসহনশীল এবং এ কারণে ইসলামী রাজনীতি তথা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। এই দাবী যারা তুলছেন, তাদের প্রতি আমি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি, ইসলাম, ইসলামী শাসন এবং মুসলিম শাসনের ইতিহাসের প্রতি অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। অমুসলিমদের প্রতি অসহনশীলতার একটি দৃষ্টান্তও আবিষ্কার করতে পারবেন না। বরং মানবতাবাদী এবং সকল মানুষের জন্যে অনুসরণযোগ্য অগণিত দৃষ্টান্তে ইসলামী শাসন ও মুসলিম শাসনের ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ।

T. W. Arnold Toynbee লিখেছেন, 'মুসলিম সৈন্য বাহিনী জর্ডান উপত্যকায় পৌছার পর সেনাপতি আবু উবায়দা ফিবলে নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। এ সময় খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে তাদের নেতৃবৃন্দ মুসলিম বাহিনীর নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, সে পত্রে তারা উল্লেখ করেন, 'হে মুসলিম সম্প্রদায়! বাইজান্টাইনদের তুলনায় আমরা আপনাদের অধিক পসন্দ করি। ওরা আমাদের অনুরূপ খৃষ্টান হবার পরও আমাদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে বাস্তুহারা করেছে। অপরদিকে আপনারা এসেছেন আমাদের প্রাণ ও ধন-সম্পদের প্রতি নিশ্চিত নিরাপত্তার বাণী নিয়ে। তাদের তুলনায় আপনাদের শাসন আমাদের জন্যে অধিকতর মঙ্গলজনক।' এমিসা নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় নগরীর দরজা তাদেরই জ্ঞাতি ভাই হেরাক্লিয়াসের খৃষ্টান বাহিনীর জন্যে বন্ধ করে দিয়ে মুসলিম বাহিনীর প্রতি আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিলো, 'এই নগরীতে বসবাসকারী খৃষ্টান সম্প্রদায় গ্রীকদের অত্যাচার আর অবিচারের তুলনায় মুসলমানদের শাসন ও সুবিচারকে অধিকতর স্বাগত জানায়।' (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 55)

ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর খৃষ্টান প্রজাদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, জীবনাচার, ব্যবসায়-বাণিজ্য, স্বাধীনতা এবং তাদের ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের নিশ্চয়তা প্রদান করেন।' (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 269-270)

Arnold Toynbee লিখেছেন, 'উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মুসলিম বিজয়ীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং অভিযান চলাকালে তাদের মহানুভবতা ও উদারতা বিজিতের মন-মানসে তাদের জন্যে সৃষ্টি করেছিলো সম্মান-শ্রদ্ধা, বিজিতরা তাদেরকে স্বাগত জানিয়েছিলো। জেরুযালেম নগরী যখন ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার (রাঃ)-এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো তখন তিনি লিখিত শপথ পাঠ করেছিলেন, 'আমি উমার, জেরুযালেমবাসী খৃষ্টানদের প্রাণ, ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি, গির্জা, ক্রুশ ও তাদের ধর্ম, ভূমি এবং জীবনাচারের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের প্রতি নিশ্চয়তা দান করছি। এখানে তাদের গির্জা ধ্বংস করা হবে না, গির্জার কোনোরূপ অবমাননা বা ক্ষতি সাধন করা হবে না, এর মর্যাদার প্রতি আঘাত করা হবে না। ধর্মীয় কারণে এখানে কেউ-ই নির্যাতিত হবে না এবং ধর্মীয় কারণে কারো প্রতি আঘাত করা হবে না।' (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee)

জেরুযালেম নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার পর হযরত উমার (রাঃ) সেখানে অবস্থিত খৃষ্টানদের ধর্মীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সম্পর্কে ইরভমফড কমহভঠণণ লিখেছেন, 'উমার (রাঃ) পরিদর্শন করছিলেন তখন নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হয়। গির্জার পুরোহিত উক্ত গির্জাতেই খলীফাকে নামাজ আদায়ের জন্যে

অনুরোধ করেন। খলীফা বিনয়ের সাথে পুরোহিতকে বলেন, 'আজ আমি যদি এই গির্জায় নামাজ আদায় করি, তাহলে পরবর্তী সময়ে মুসলিম জনগোষ্ঠী এই গির্জাকে তাদের উপাসনার স্থান হিসেবে দাবী করতে পারে।' (The Preaching of Islam- by Arnold Toynbee, P. 5-7)

'প্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামী সরকার বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে নিপীড়ন ও সন্ত্রাসমূলক কোনো রূপ পরিগ্রহ করেনি। বর্বরতার অন্ধকার, চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির শৃংখলিত দুর্দশা, বুদ্ধিবৃত্তিক বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কোনো চিরন্তনী সংগ্রাম প্রবণতা আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না। পক্ষান্তরে এসবই ছিলো ইউরোপের গ্রীস ও রোমান সভ্যতার অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য।' (Robert Briffault: The Making of Humanity, P. 113)

খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী অধ্যুষিত সিরিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণকালে প্রথম খলীফা সেনাপতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'তোমাদের হাত যেনো নারী ও শিশুর রক্তে রঞ্জিত না হয়। শত্রুপক্ষের বৃক্ষ বিনষ্ট করবে না, তাদের শস্য ক্ষেতে আগুন দিবে না, কোনো ফলবান বৃক্ষ কাটবে না, গৃহপালিত পশুর ক্ষতি করবে না, তোমাদের খাদ্যের প্রয়োজনে তাদের পশু হত্যা করবে না, তাদের সাথে যদি চুক্তি হয় তাহলে সে চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, তাদের প্রতি দেয়া ওয়াদা যথাযথভাবে পালন করবে, তাদের উপাসনালয়ের কোনো ক্ষতি করবে না।' (Gibbon: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, P. 309-310)

ইতিসাহ সাক্ষী, ইসলাম ও মুসলমানদের পরমত সহিষ্ণুতায় সন্তুষ্ট হয়ে অমুসলিমরা মুসলিম শাসনের বাইরে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলো। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর লিখেছেন, 'বিজিতদের প্রতি ইসলামের সহনশীলতা, উদারতা, সুবিচার ও সংহতির নীতি রোমের খৃষ্টান শাসকদের অসহিষ্ণুতা ও অত্যাচার-নির্যাতনের সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টান্ত। সম্রাট হেরাক্লিয়াসের অধীনে খৃষ্টান নাগরিকরা যে অধিকার ভোগ করতো, তার তুলনায় অনেক বেশী জাতীয় স্বাধীনতা সিরিয়ার খৃষ্টানরা মুসলিম শাসকদের অধীনে ভোগ করেছে এবং এ কারণেই তারা তাদের পূর্ব জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক ছিলো না।' (Wiliam Muir: The Caliphate its Rise, Decline and Fall, P. 128)

উদ্ধৃতি বাড়িয়ে পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। তবে ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদার বন্ধুরা যতোই চেষ্টা করুন না কেনো, ইসলাম এবং এর অনুসারীদের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস মসীলিপ্ত করতে পারবেন না। দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য কিরণসম জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারবেন না। তুষার ধবল রাজহংসের শুভ্র দেহে যতোই পানির ছিটা দেয়া হোক, তা অবশ্য অবশ্যই ঝরে পড়বে।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রয়োজনীয়তা

মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ, ভবিষ্যৎও তার সম্পূর্ণ অজানা, অতীতকে সে ভুলে যায় আর বর্তমান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রায়ই ভুল করে। জ্ঞানের এ সীমাবদ্ধতা নিয়ে মানুষ যখন ব্যক্তি পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা করে তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে মাঝে মধ্যেই সংবিধান সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে ১৯৭২ সনে রচিত সংবিধান ২০০৬ সন পর্যন্ত গত ৩৪ বছরে তের বার সংশোধন করতে হয়েছে। সমগ্র বিশ্বে রাষ্ট্রসমূহের মানব রচিত সংবিধান সমূহের অবস্থাও এথেকে ব্যতিক্রম কিছুই নয়। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী জীবন বিধানের বিগত দেড় হাজার বছরেও সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সীমিত নয়, তিনি অসীম জ্ঞানের মালিক। যাঁর কাছে অতীত বা ভবিষ্যৎ কাল বলে কোনো কাল নেই, সকল কালই তাঁর কাছে বর্তমান। এ জন্যে তাঁর পক্ষেই কেবলমাত্র সম্ভব মানব সম্প্রদায়ের জন্য একটি কালজয়ী সার্বজনীন সংবিধান উপহার দেয়া। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই আল্লাহ তা'য়ালা মানব গোষ্ঠীর জন্য ইসলামকেই জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।

পবিত্র কোরআনকে সংবিধান হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন, আর এ পথে সঠিকভাবে চলার জন্য বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সেই সাথে আরো মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'য়ালা শুধু মুসলমানদের প্রতিপালক নন, তিনি 'রাব্বুল আলামীন' সমগ্র সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালনকারী। মহাগ্রন্থ আল কোরআন শুধু মুসলমানদের জন্য পথ নির্দেশিকা নয়, কোরআন হচ্ছে 'হুদাল্ লিন্নাস' মানব গোষ্ঠীর জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত গ্রন্থ। এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শুধু মুসলমানদের পথ প্রদর্শক ও করুণা হিসেবে প্রেরিত হননি, তিনি 'রাহ্মাতুল্লীল আ'লামীন' গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য তাঁকে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর করুণা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই সত্য যে, আল্লাহ তা'য়ালার দেয়া বিধান তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কল্যাণকামীতা থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য ইসলাম কবুল করলে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি পাওয়া যাবে, আর কেউ যদি ইসলাম কবুল নাও করে শুধু ইসলামী বিধান মেনে চলে তাহলে পরকালীন মুক্তির গ্যারান্টী না থাকলেও দুনিয়ার জীবনে অবশ্যই শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবন-যাপনে অবশ্যই ধন্য হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

এ বিষয়ে দেশের সুস্থ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক ও কলামিষ্টদের নিকট উদাহরণ স্বরূপ

কয়েকটি প্রশ্ন রাখতে চাই। কিছুক্ষণের জন্য তাঁরা নিজেদের মন-মস্তিষ্ক থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি তাদ্বের নিরঙ্কুশ আনুগত্য পরিহার করে উদার ও পবিত্র মনে ভেবে চিন্তে নিজের সচেতন বিবেককে জবাব দিন। প্রশ্নগুলো নিম্নরূপঃ–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا–

আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারার-২৭৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা সুদকে হারাম ও ব্যবসাকে হালাল ঘোষণা করেছেন। আমরা সবাই জানি সুদ পূজিবাদী শোষণের জঘন্য হাতিয়ার, সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি দিয়ে ধনীক শ্রেণী অধিক ধনশালী হয় আর দরিদ্র শ্রেণী হয় আরো নিঃস্ব। এমতাবস্থায় রাষ্ট্র যদি কোরআনের বিধান অনুযায়ী ব্যাংকিং সেক্টর থেকে শুরু করে সকল প্রকার অর্থনৈতিক লেন-দেন ও ব্যবসা-বাণিজ্যে সুদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّه كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلاً–

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যাবে যেয়ো না, নিঃসন্দেহে এ হচ্ছে একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বনী ইসরাঈলের-৩২)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা জেনা-ব্যভিচার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে জেনা-ব্যভিচার বন্ধ করার লক্ষ্যে জেনার উৎস নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী, সহশিক্ষা, পর্ণোগ্রাফী, অশ্লীল নাচ-গান, অশ্লীল সিনেমা ও অশ্লীল সাহিত্য বন্ধ করে দেয়, তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে শুধু মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলেই?

পবিত্র কোরআন মজীদের সুরা মায়েদার ৯০ থেকে ৯১ আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মদ-জুয়াসহ সকল প্রকার যৌন উত্তেজক মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সকলেই জানি, সব ধরণের জঘন্য পাপের উৎস মদ-জুয়া। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে দেশের নাগরিকদের জন্যে সব ধরণের মাদকদ্রব্য আমদানী-রফতানী, উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় এবং মদ্যপান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে মদ্যপ-মাতাল ও জুয়াড়িদের হত্যা-ধর্ষণ ও দূর্ঘটনার তান্ডব থেকে রক্ষা পাবে শুধু কি মুসলিম সমাজ নাকি জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই?

পবিত্র কোরাআন মজীদে সূরা বনী ইসরাঈলের ৩৩ নং আয়াতে এবং সূরা মায়েদার

৩৩ ও ৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা আদালতের মাধ্যমে নরহত্যা ও ব্যভিচারের অভিযোগে প্রমাণীত ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড দেয়া ছাড়া সকল প্রকার নরহত্যা ও সন্ত্রাসী তৎপরতা এবং চুরি-ডাকাতী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এখন রাষ্ট্র যদি আইনের মাধ্যমে অপরাধীদের কোরআনে বর্ণিত কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা কার্য্যকর করে তাহলে এদ্বারা উপকৃত হবে কি শুধু মুসলিম সমাজ নাকি এই আইনের মাধ্যমে নিরাপত্তা, শান্তি ও স্বস্থি পাবে সমগ্র জাতি?

সূরা বাকারার ২৮ নং আয়াতে এবং সূরা নিসার ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা নারীদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার, পুরুষের সমঅধিকার, তাদের ভরণ-পোষণের অধিকার এবং স্ত্রীর প্রতি সদাচরণ করতে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং পবিত্র ইসলামে সকল প্রকার নারী নির্যাতন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্র এ বিধান আইনের মাধ্যমে কার্য্যকর করলে এদ্বারা মুসলিম নারীরাই উপকৃত হবে নাকি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হবে? এসব প্রশ্নের জবাব যদি আপনাদের কাছে ইতিবাচক হয়, তাহলে লক্ষ্য করুনঃ–

ইসলাম সাম্প্রদায়িক নয়- সার্বজনীন, উগ্রপন্থী নয়- উদার, অসহিষ্ণু নয়- সহনশীল, ইসলাম মানব রচিত নয়- আল্লাহ প্রদত্ত। আর আল্লাহ হচ্ছেন সেই মহান সত্ত্বা যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা, নিয়ন্ত্রক, প্রতিপালক, তিনিই মানবকুল সৃষ্টি করেছেন। মানুষের কল্যাণ- অকল্যাণ কিসে হয় এবং তাদের জাগতিক ও পরকালীন উন্নতি কিসে হয় এসব কিছুকে সামনে রেখেই তিনি সংবিধান দিয়েছেন- যার নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন।

সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের শেষাংশে রাষ্ট্রকে তার নাগরিকদের সৎকাজের আদেশ এবং সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, কোরআনে বর্ণিত নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্র যদি উগ্রপন্থা, জঙ্গীবাদ, অসহিষ্ণুতা, অসহনশীলতা সহ সকল প্রকার গর্হিত ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে দেশের নাগরিকদের বিরত রাখে এবং সকল প্রকার ভালো তথা মানব কল্যাণমূলক কাজের প্রতি উৎসাহিত করে, তাহলে এদ্বারা শুধু মুসলিম নাগরিকবৃন্দ উপকৃত হবেন না, উপকৃত হবেন জাতি-ধর্ম, দল-মত নির্বিশেষে নাগরিক মাত্র সকলেই।

প্রাসঙ্গিক কারণে সূরা হাজ্জ এর ৪১ নং আয়াতের পূর্ণ অর্থ ও সামান্য ব্যাখ্যা প্রদান এখানে জরুরী মনে করছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُ
الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ–

আমি যদি এ (মুসলমান)-দের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি,

তাহলে তারা (প্রথমে) নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, (দ্বিতীয়ত) যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, আর (নাগরিকদের) তারা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।' (সূরা হাজ্জ-৪১)

প্রথম দুটো কাজ শুধু মুসলিম নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হলেও এর সুফল কিন্তু ভোগ করবেন মুসলিম- অমুসলিম সকল নাগরিকই। উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা যায় ব্যক্তির নামাজ আদায় এবং নামাজের শিক্ষা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করলে সে ব্যক্তির চরিত্রে অবশ্য অবশ্যই সৎ গুণসমূহ বিকশিত হবেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ–

নিঃসন্দেহে নামাজ (মানুষকে) অশ্লীলতা ও পাপাচার থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত- ৪৫)

এ জন্যে সত্যকার অর্থে নামাজী মুসলিম ব্যক্তির বিকশিত সৎ গুণ- বৈশিষ্ট্যের কারণে শুধুমাত্র মুসলিম নাগরিকই উপকৃত হবেন না, অমুসলিম নাগরিকগণও উপকৃত হবেন। এভাবে নামাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকগণও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কল্যাণ লাভ করবেন।

দ্বিতীয় কাজটি হলো যাকাত আদায়। অর্থাৎ দেশের ধনী মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। অর্থাৎ দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে তথা 'সাত তলা আর গাছ তলা' এ ব্যবধান দূর করা হবে। যাকাত ভিত্তিক এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ এক শ্রেণীর হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়া এবং শোষণের পথ রুদ্ধ করা হবে। ফলে দেশের মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিক সকলেই সমভাবে উপকৃত হবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের পরিচালকগণ নিজেরা সৎ হবেন, সৎ কাজের আদেশ দিবেন এবং যাবতীয় অসৎ কাজ থেকে দেশের নাগরিকগণকে বিরত রাখবেন। আর এই দুটো কাজ মুসলিম- অমুসলিম সকলের প্রতিই প্রযোজ্য হবে। যে রাষ্ট্রে শুধু মাত্র সৎকাজের প্রবর্তন করা হবে এবং অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা হবে, সেই রাষ্ট্রের সকল শ্রেণী, পেশা ও ধর্মের অনুসারী মানুষই শান্তি, স্বস্থি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। ইসলাম এ বিষয়টি শুধু মাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত করেনি, সকল মানুষের সাথেই সংযুক্ত করেছে। তাহলে এবার বলুন, ইসলামকে 'সাম্প্রদায়িক' বলার কি কোনো সুযোগ আছে?

সাম্য মৈত্রীর এ সংবিধান পবিত্র কোরআন স্পষ্ট ঘোষণা করেছে, 'সকল মানুষই এক আল্লাহর সৃষ্টি' তারা সকলেই পরস্পরে সমান। শ্রেণী, বংশ, গোত্র, বর্ণ ও

আঞ্চলিকতার পার্থক্য জঘন্য এক প্রথা মাত্র এবং এই জঘন্য প্রথার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা আদর্শসমূহ পৃথিবীর জন্য এক মহাবিপদ। সমগ্র মানবগোষ্ঠী মহান আল্লাহর একক এক পরিবার এবং কোনো ধরণের বিভেদের স্থান এখানে নেই। সমগ্র মানুষই এক, হোক সে মানুষ আরব বা অনারব, সাদা বা কালো, ধনী বা গরীব, প্রাচ্যের বা প্রতীচ্যের, আর্য বা অনার্য, দৈহিক গঠন আকৃতিতে সুন্দর বা কদাকার। সকল মানুষকেই মানুষ হিসেবে সম্মান মর্যাদা দিতে হবে। সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىْ اٰدَمَ–

আমি অবশ্যই আদম সন্তানদের (মানুষকে) মর্যাদা দান করেছি। (সূরা বনী ইসরাঈল-৭০)

সকল মানুষই একজন মাত্র নারী ও পুরুষ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। অতএব মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তথা সাম্প্রদায়িকতার মূলে কুঠারাঘাত করে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ তা'য়ালা ঘোষণা করেছেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ–

হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদের একটি পুরুষ ও একটি নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর আমি তোমাদের জন্যে জাতি ও গোত্র বানিয়েছি, যাতে করে (এর মাধ্যমে) তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো, কিন্তু আল্লাহর কাছে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে (আল্লাহকে) বেশী ভয় করে। (সূরা হুজুরাত-১৩)

এই পৃথিবীতে যে মানুষ আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করে, সে মানুষই সততা ও স্বচ্ছতার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত। আর এরূপ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই পৃথিবীকে শান্তি ও স্বস্তির আবাস স্থলে পরিণত করতে সক্ষম এবং মানব সমাজও এরূপ মানুষের দ্বারাই কল্যাণ লাভ করতে সক্ষম। আর ঠিক এ কারণেই আল্লাহভীরু মানুষকে সর্বাধিক মর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইসলাম মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি নিষিদ্ধ করেছে। সকল মানুষকেই সম্মান মর্যাদার আসনে আসীন করেছে। এরপরও যারা ইসলামী জীবন বিধানে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আবিষ্কার করছেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন, হয়তো তা ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই বলে না বুঝে করছেন অথবা জেনে

বুঝে বিশেষ কোনো দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নে নিষ্ফল প্রাণান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।

চরম দুর্ভাগ্য জাতির! বিগত ১৫ই নভেম্বর ০৭ এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭টি জেলা ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'এর আঘাতে যখন লন্ড ভন্ড, লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন তাদের সর্বস্ব হারিয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত, অগণিত মানব সন্তানের লাশ কাফন আর শুকনো জায়গার অভাবে দাফন করা যায়নি, দেশের পশু সম্পদ মৃত লাশ হয়ে ডোবা-নালায় ভাসছে, মূল্যবান সম্পদ রাশি সাগরে ভেসে গিয়েছে, মানুষকে গণকবর দেয়া হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দেশ প্রেমিকের দাবীদার অনেকেই ঢাকার অভিজাত এলাকায় ব্যয় বহুল ক্লাব ভাড়া করে দামী স্যুট-টাই পড়ে বেশ কেতাদূরস্ত হয়ে লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে মিমাংসীত ডেড ইস্যু নিয়ে হৈচৈ করলেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের আবদার তুললেন কাদের খুশী করার জন্যে? এসব দেশ প্রেমিকরা (?) যে অর্থ ব্যয় করে ডেড ইস্যু নিয়ে অহরহ আলোচনার ঝড় তুলছেন, সেই অর্থ কি দুর্গত মানুষদের জন্যে ব্যয় করতে পারেন না? এ সময় দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত না করে ধর্ম বিদ্বেষী এসব মহারথীরা হোটেল ভাড়া করে অথবা টিভি চ্যানেল দখল করে টক-শো ও গোল টেবিল বৈঠকের নামে যা খুশী তাই ফ্রী স্টাইলে আলোচনা করে চায়ের কাপে তুফান সৃষ্টি করছেন। বুভুক্ষ, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন মানুষের সাথে তথাকথিত রাজনীতিকদের এ নিষ্ঠুরতা চরম মূর্খতাকেও হার মানায়।

মুনাফিক চরিত্রের এবং প্রতিবেশী দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে নিয়োজিত ধর্ম বিদ্বেষী এসব জনবিচ্ছিন্ন তথাকথিত রাজনীতিকদের দেশ ও জাতি বিরোধী মহাষড়যন্ত্র থেকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ও তার অধিবাসীদের হেফাজত করুন। ধর্ম বিদ্বেষীদের উদ্দেশ্যে কবি সম্রাট মহাকবি আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার দুটো লাইন উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে আমার এ লেখার ইতি টানতে চাই।

কওম মাযহাবসে হ্যায়
মাযহাব জো নেহী তুম ভী নেহী।
যাযবে বাহাম জো নেহী
মাহফিলে আন্‌জুম ভী নেহী।।

কাব্যানুবাদ ঃ ধর্মতে হয় জাতির গঠন
ধর্ম নাই তো তুমিও নেই।
নাই কো যদি মাধ্যাকর্ষণ
গ্রহ সূর্য্য ভূমিও নেই।।

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতাঃ একটি পর্যালোচনা

ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মহীনতাঃ একটি পর্যালোচনা

সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ মানব রচিত এক মতাদর্শের নাম– যা আজ থেকে আড়াই শত বছর পূর্বে ইউরোপের মাটিতে খৃষ্টীয় পোপ-পাদ্রীদের অকল্পনীয় জুলুমতন্ত্রের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছে। এই মতবাদ গোটা মুসলিম মিল্লাত ও মুসলিম দেশসমূহের জন্য চরম আত্মঘাতি। এ মতবাদের মূল চেতনা কোরআন হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত, ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের পরিপন্থী।

কারণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের সার কথা হলো, ইসলামকে উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব থেকে অপসারণ করে দেয়া, রাষ্ট্রকে ধর্মমুক্ত করা, ইসলামকে দেশের আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ ও শাসন প্রভাবের স্থান থেকে বিদায় করে দেয়া। এ মতবাদের অনুসারীদের মরণপন প্রতীজ্ঞা হচ্ছে যে কোনো মূল্যে ইসলামকে উটপাখী বানিয়ে রাখতে হবে। উটপাখী নামে উট কিন্তু উটের ন্যায় বোঝা বহনে সক্ষম নয়। এটি এমন একটি পাখী, যা উড়তেও সক্ষম নয়। সুতরাং ইসলামকে উটপাখীর মতো করে মসজিদ-মাদ্রাসা ও খানকার চার দেয়ালে বন্দী করে রাখতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً–

হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইসলামের মধ্যে পুরোপুরিভাবে প্রবেশ করো। (সূরা বাকারাহ-২০৮)

পক্ষান্তরে ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বলছে, 'ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার' একে রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। তাদের বক্তব্য ও চিন্তা-চেতনা এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের লিখনীতে এটাই প্রমাণ করে যে, তারা আল্লাহর দেয়া বিধানের চাইতে উত্তম বিধান দিয়ে দেশ ও বিশ্ব পরিচালনায় পারঙ্গম। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা বলছেন–

وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ–

আল্লাহ্ অপেক্ষা বিশ্বাসীদের জন্য উত্তম আইনদাতা আর কে? (সূরা মায়িদা-৫০)

ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে। জীবনের ক্ষুদ্র একটি অংশ আল্লাহর জন্যে তাও আবার ঐচ্ছিক, আর বাকী সবটুকুন প্রবৃত্তির গোলামী, শাসক ও রাষ্ট্রের জন্য। ইসলামে বিশ্বাসী কোনো মুসলমানের জন্য এমন ধারণা পোষণ করা সুস্পষ্ট কুফ্‌রী। এ মতবাদের অনুসারীরা ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে

তেপান্তরের মাঠ দিয়ে লাগামহীন অশ্বে চড়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়াতে চান। কারণ অসৎ উপার্জনে, নারীর সৌন্দর্য্য প্রদর্শনীতে, অশালীন চলা-ফেরায়, মদপানে, জুয়া খেলায়, ব্যভিচারী লীভ টুগেদারে, সমকামীতায়, সুদ-ঘুষ ও জুলুম অত্যাচারের পথে ইসলামই সবথেকে বড় প্রতিবন্ধকতা। তাই জীবন-যৌবনকে কানায় কানায় ভোগ করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া ব্যতীত উপায় নেই। এ জন্য ওরা ওমর খৈয়ামের নসীহতে বিশ্বাসী–

এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও
কাল নিশিতের ভরসা কৈ?
চাঁদনী জাগিবে যুগ যুগ ধরি
আমরা তো আর রবোনা সৈ।
নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতায় শূন্য থাক
দূরের বাদ্য কী লাভ শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।

বুঝে হোক না বুঝেই হোক বিশ্বের কয়েকটি দেশের বিভিন্ন ধর্মের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অন্ধ অনুসারী। অন্যান্য ধর্মে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধানের অনুপস্থিতি হেতু সে সকল ধর্মের অনুসারীরা ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী হলে সেখানে আমাদের বলার তেমন কিছু থাকে না। কিন্তু একজন মুসলমান যখন নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করেন তখন তার প্রতি দুঃখ হয়। কারণ তিনি অনেক বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখলেও নিজ ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাদের এই ব্যর্থতার পেছনে দুটো কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ তিনি এমন শিক্ষায় শিক্ষিত যেখানে তিনি ইসলাম শিক্ষার পরিবেশ পাননি। দ্বিতীয়তঃ আমাদের আলেম সমাজের একটি অংশ তাদেরকে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ বা ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা তা বোঝাতে সক্ষম হননি। অতএব এ ব্যর্থতার দায় থেকে আমাদের আলেম সমাজও মুক্ত নন।

সুতরাং ঈমান ও কুফ্রীর মাঝে দোদুল্যমান ঈমান বিধ্বংসী এ বিষয়টির ওপরে একটু খোলামেলা আলোচনা করতে চাই; যদি নিরপেক্ষবাদীরা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা ইসলামে ফিরে আসেন এই আশায়।

বিতর্কিত এই মতবাদটি সম্পর্কে সূচনাতেই বলে নিতে চাই, ইংরেজী Secularism শব্দের বাংলা অনুবাদ হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা

মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য অথবা না বুঝে বলে থাকেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। আসলে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থই হলো ধর্মহীনতা। Oxford dictionary Secularism-এর সংজ্ঞা দিয়েছে–

Secularism means the doctrine morality should be based solely on regard to the well being of mankind in the present life- to exclusion of all considarations drawn from belif in God or in future state.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা মনে করে আল্লাহ বিশ্বাস বা পরকাল বিশ্বাস নির্ভর সকল বিবেচনা থেকে মুক্ত মানব জাতির বর্তমান কল্যাণ চিন্তার ওপর ভিত্তি করে নৈতিকতা গড়ে উঠবে।

Encyclopedia Britanica, সহ সকল বিশ্বকোষে Secularism-এর অর্থ করা হয়েছে–

No. 1- Secular sprit or tendency especially a system of politcal on social philosofy that rejects all forms religious faith.

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ হচ্ছে সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করে।

No. 2- The view that public education and other matters of civil society should be conducted without the introduction of a religious element.

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতার একমাত্র অর্থ ধর্মহীনতা, কোনো ধর্মের অন্তর্গত না থাকা বা ধর্মদ্রোহীতা। ধর্মনিরপেক্ষতার এসব অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ বা সংজ্ঞা পৃথিবীর কোনো ডিকশনারীতে নেই। ধর্মীয় আচরণকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের প্রত্যেক স্তর থেকে ধর্মকে মুক্ত রাখতে হবে এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এ মতবাদের লক্ষ্য। এ জন্যে এই মতবাদকে **'ধর্মহীনতা'** বলাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

বিশ্বখ্যাত Random house dictionary of english language-secularism- এর তিনটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে–

No. 1-Not regarded as religious or spiritually sacred. যা ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিকভাবে পবিত্র বলে বিবেচিত নয়।

No. 2-Not partaning to or connected with any religion. যা কোনো ধর্মের সাথে সম্পর্কিত নয়।

No. 3-Not belonging to a religious order. যা কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়।

কিন্তু আমরা যে ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলি তা কোনো সাধারণ ধর্মমত বা অস্পষ্ট এবং অপূর্ণাঙ্গ ধর্মবিশ্বাসের নাম নয়। ইসলাম হচ্ছে এক সার্বজনীন বিশ্বাসসম্মত পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শের নাম। যার মধ্যে রয়েছে বিশ্ব মানবতার ইহকাল ও পরকালের সার্বিক কল্যাণমূলক অভ্রান্ত দিক নির্দেশনা। মানব সভ্যতার বিকাশে এতে রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, ব্যক্তি, পরিবার-সমাজ পরিচালনার নির্ভুল পদ্ধতি, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং নির্মূল পদ্ধতি, মানবাধিকার, নারী-পুরুষের সমঅধিকার, শিশু কিশোরের অধিকার, মালিক-শ্রমিক ও মেহনতী জনতার অধিকার, সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসহ জীবন পরিচালনায় অভ্রান্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত সকল মানুষের গ্রহণযোগ্য এক মহাপরিকল্পনা। সুতরাং আল্লাহ, রাসূল, কোরআন-হাদীস ও পরকালে বিশ্বাসী একজন মুসলমান কোনো অবস্থাতেই মানব রচিত চরম ক্ষতিকর ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হতে পারে না। এটি ইসলামের সাথে সর্বোপরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে চরম বিশ্বাস ঘাতকতা।

কারণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের মূল কথাই হলো, রাষ্ট্র ও রাজনীতির সাথে ধর্ম সংযুক্ত থাকবে না, ধর্ম থাকবে ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পরিমন্ডলে সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনোভাবেই ধর্মকে বিবেচনা করা যাবে না। মুসলিম বিশ্বে ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ইসলাম মুক্ত শাসন, ইসলামকে ব্যক্তির জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। রাজনীতি, অর্থনীতি, তথা সকল কিছুকে ধর্মহীন তথা ইসলাম মুক্ত করা। ধর্মনিরপেক্ষতা বিশ্ববাসীর জন্য এক মরাত্মক ক্ষতিকর মতবাদ যা প্রত্যেকে ধর্মের মানুষকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ব্যাপারে অনীহা সৃষ্টি করে। এই মতবাদের প্রচার ও প্রসারের অর্থই মানবতার অকল্যাণ এবং ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতি। ধর্মনিরপেক্ষতা মুসলিম ঐক্য এবং পারস্পরিক সম্পর্কই শুধু বিনষ্ট করে না, বরং প্রত্যেক ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত হানে। এমনকি দেশের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতার জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। সুতরাং যে কোনো ধর্মাবলম্বীর পক্ষেই ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। অতএব ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া মানবতার কল্যাণকামী প্রত্যেকটি সচেতন মানুষের যেমন দায়িত্ব তেমনি প্রত্যেকটি মুসলমানের ঈমানের দাবী।

সমস্যা হলো আমাদের বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ফ্রয়েড, মার্কস, হেগেল, প্লেটো, ডারউইন, কপার নিকাস, কেপলার, লেনিন, মাও সেতুঙ, হোচিমিন থেকে শুরু করে রাজা রামমোহন রায় বা

করম চাঁদ গান্ধী পর্যন্ত যেভাবে পড়েছেন-জেনেছেন, তার শত ভাগের এক ভাগও আল্লাহ-রাসূল, কোরআন-হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র সম্পর্কে পড়তে বা জানতে চেষ্টা করেননি। না ছাত্র জীবনে না রাজনৈতিক জীবনে। ফলে নিরপেক্ষতাও যে একটি পক্ষ তা বুঝতে সক্ষম হননি। যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাঁরা নিঃসন্দেহে নিজেকে প্রতারিত করছেন। কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থই হচ্ছে পক্ষেও নয় বিপক্ষেও নয়।

ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে মুসলমান তো দূরের কথা, অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করার অর্থ নিজের সাথেই নিজেই প্রতারণা করার শামিল। আমার এ কথার স্বপক্ষে বাস্তব কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ–

একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে নামাবলী ও পৈতা জড়িয়ে, মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাখা পরেন, বার মাসে তের পূজা এবং তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে প্রত্যেহ মন্দিরে গিয়ে দেবতার পদপাদ্যে অর্ঘ-নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন তিনি কি আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন? তিনি তো ধর্মের পক্ষেই চলে গেলেন।

একজন শিখ যখন গুরু নানকের অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় পাগড়ী পরেন এবং হাতে বালা ও কৃপাণ ধারণ করেন, গুরুদুয়ারায় গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন তখন তো তিনি ধর্মের পক্ষেই থাকলেন। একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরমধর্ম ও জীব হত্যা মহাপাপ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে আত্মার মহানির্বাণ লাভের জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে প্যাগোডায় যান তিনিও তো ধর্মের পক্ষই অবলম্বন করলেন।

একজন খৃষ্টান যখন যিশুখৃষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করেন, গলায় ক্রুশ ঝুলান, ত্রিত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাস করেন, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ করে প্রতি রবিবার গির্জায় প্রার্থনা করেন, আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের প্রতিটি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে IN GOD WE TRUST তখন তারাও তো আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন না, ধর্মের পক্ষেই এলেন।

একজন মুসলিম পুরুষ যখন মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি এবং লম্বা জামা পরেন, নামাজ-রোজা, হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করেন, মুসলিম নারী যখন শালীন পোশাক তথা পর্দা করেন, হিজাব পরিধান করেন, আল্লাহ্-রাসূল, কোরআন-হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করেন, তিনিও তো ধর্মের পক্ষেই অবস্থান নিলেন। এটাই

যখন অটল বাস্তবতা, তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রইলো কে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

পাঠক, বিষয়টি আরো একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'য়ালা ধর্মের ব্যাপারে কি বলছেন, 'নিশ্চয়ই জীবন বিধান হিসেবে আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন।' (সূরা আলে ইমরাণ-১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)

পবিত্র কোরআনের ত্রিশতম পারায় সূরা কাফিরুনে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে দিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন, তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) তোমাদের জন্য, আমাদের দ্বীন (ধর্ম) আমাদের জন্য।' এখানেও ধর্মের পক্ষের কথা। অর্থাৎ তোমরা যে ধর্মেরই অনুসারী হও ধর্মকে মিশ্রণ করা যাবে না, ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকা যাবে না, তোমরা তোমাদের ধর্মের পক্ষে থাকো আমরা আমাদের ধর্মের পক্ষে থাকি।

বিশেষ করে একজন মুসলমানের জন্য ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ভাবার এবং নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষতার অনুসারী বানানোর অধিকার থাকতে পারে না। এটা তার ঈমানের সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক বা বে-ঈমানী।

ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ যদি পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পরধর্মের অধিকার, তাদের প্রতি উদারতা, সহিষ্ণুতা হয় তাহলে এর কোন্ বিষয়টি ইসলাম অমুসলিমদেরকে দেয়নি? সুতরাং নিজে গোলাম হয়ে প্রভুর আইনে নাক গলানো হচ্ছে কোন্ সাহসে? ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা লক্ষ্য করুনঃ-

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে অমুসলিমদের উপাসনালয় ভাংতে এবং তাদের উপাস্য দেবদেবীদের সম্পর্কে কটুক্তি করতে নিষেধ করেছেন।

বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সদাচরণ করতেন। তাদের গীবত করা, স্বার্থহানী, অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ ও নষ্ট করা এবং তাদের প্রতি জুলুম করা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। এর ব্যতিক্রম করা হলে নবী করীম (সাঃ) কিয়ামতের ময়দানে মজলুম অমুসলিমের পক্ষাবলম্বন করবেন বলে মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়েছেন। (হাদীস)

তাদের নিজেদের পরিমন্ডলে শুকর পালন ও মদ উৎপাদন, মদের ক্রয়-বিক্রয় ও তা খাওয়া-পান করায় কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করেননি। এমনকি কোনো মুসলমান কোনো অমুসলিমের মদ-শুকরের ক্ষতিসাধন করলে তার ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

অমুসলিমদের পারিবারিক কর্মকান্ড, তাদের বিয়ে-শাদী, পূজা-পার্বন, উপাসনালয় নির্মাণ, সংস্কার-সংরক্ষণে তাদের ধর্ম অনুযায়ী পালিত হবে তাতে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠদেশে তাদের মৌলিক মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার একজন মুসলিম নাগরিকের মতোই সংরক্ষিত হবে।

উল্লেখিত কথাগুলোর একটিও আমার মন-মস্তিষ্ক প্রসূত নয়। প্রমাণ হিসেবে দেখুন, ফাত্হুল বয়ান, ৪র্থ খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা, ফতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, আল মাবসুত, ১৩শ খন্ড, ৩৭ পৃষ্ঠা, শরহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, বাদায়ে আছ ছানায়ে, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা, দুররুল মোখতার, ৭ম খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, কিতাবুল খারাজ, ৮২ পৃষ্ঠা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি ইসলামের উদারতা, ঔদার্য্য, সহিষ্ণুতা, শ্রদ্ধাবোধ ও তাদের প্রতি ইসলাম প্রদেয় অধিকার সম্পর্কে পড়া-শোনা থাকলে কোনো শিক্ষিত মুসলমান বা কোনো সচেতন অমুসলিমও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারী হতেন না। আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসীদের অধিকাংশই ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের শিকার। ইসলাম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণেই তারা সাম্প্রদায়িকতা নির্মূলের নামে ইসলাম মুক্ত বাংলাদেশ দেখতে চান। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ যে মানবতার জন্যে চরম ক্ষতিকর এক অভিশাপমূলক মতবাদ, আমার মনে হয় এ বিষয়টি তারা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেননি।

দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনাকর অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্যই মহান আল্লাহ মানুষের জীবন বিধান হিসেবে পবিত্র কোরআন দান করে পরিপূর্ণভাবে কোরআনকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সত্য কথা বলা ও সৎ থাকার চেষ্টা করা হবে আর রাজনৈতিক জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসরণ করে মিথ্যা কথা বলা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়া হবে, জীবনকে এভাবে খন্ডিত করার অবকাশ ইসলাম দেয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْىٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ–

তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু কথা বিশ্বাস করবে, আর কিছু কথা করবে অবিশ্বাস? তোমাদের মধ্যে যারাই কোরআনের সাথে এরূপ আচরণ করবে দুনিয়ায় তাদেরকে দেয়া হবে লাঞ্ছনা ও অপমানের জীবন এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোরতম শাস্তি। (সূরা বাকারা-৮৫)

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ–

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। (সূরা নিসা-৫৯) এ আনুগত্য শুধু নামাজ-রোজা, হজ্জ-যাকাতেই নয়, বরং মুসলিম জীবনের কোনো দিক ও বিভাগই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বাইরে চলার কোনো মুসলমানেরই সুযোগ ও অধিকার নেই। দুনিয়ায় নবী-রাসূলগণের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিলো সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করা। এ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) রাজনীতি করেছেন, রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাছাড়া তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় অবদান রেখেছেন। এ কথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণীত এক মহাসত্য।

মহান আল্লাহর প্রেরিত অগণিত পূতঃ পবিত্র নবীদের একজনও ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন না, তাঁদের অসংখ্য সাহাবার একজনও এমনকি তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, মুহাদ্দেসীন, মুফাস্সিরীন, সালফে সালেহীনসহ সমগ্র বিশ্বের একজন হাক্কানী আলেম ও পীর-বুযর্গের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করতেন বা করেন। তবে বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে জীবন সায়াহ্নে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির কারো কুপরামর্শে মতিভ্রম ঘটলে তা ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এক ব্যতিক্রম ঘটনা। সেটা অনুসরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত নয়।

দুনিয়াব্যাপী ঢাকঢোল পিটিয়ে মুসলিম বিশ্বে একমাত্র কামাল পাশাই সর্বপ্রথম তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ চালু করেন। কামাল পাশা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে সারা দেশে আযান নিষিদ্ধ ও আরবী অক্ষর উৎখাত করেছিলো, ফেজটুপি ও বোরকা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলো। কোরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার, শিক্ষা, চর্চা নিষিদ্ধ করে অগণিত আলেম-ওলামাকে হত্যা করেছিলো। তুরস্কে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, প্রকাশ্যে মদপান, জেনা-ব্যভিচার বৈধ করে নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিমজ্জিত করা হয়েছিলো।

তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে দেখতে নারাজ। সম্প্রতি তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী তায়েব এরদোগান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুলকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দেন এবং নির্বাচনে নিশ্চিতভাবেই তিনি বিজয়ী হতেন বলে ধারণা করা হয়েছিলো। কিন্তু প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করে সকল আয়োজনই ব্যর্থ করে দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা। কারণ আব্দুল্লাহ গুলের সবথেকে বড় অপরাধ (?) তাঁর স্ত্রী

মাথায় স্কার্ফ পরিধান করেন। আর এ কারণেই ধর্ম বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষরা তুরস্কে সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ এক রাজনৈতিক সঙ্কট।

অতীতে ধর্মনিরপেক্ষ দল শাসন ক্ষমতায় থাকাকালে যে উন্নতি করতে পারেনি আব্দুল্লাহ্ গুলের দল জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হবার পরে তুরস্ককে সবথেকে বেশী উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়েছে। অগ্রগতি ও উন্নতির এই চিত্র ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোর সমর্থক পশ্চিমা দেশগুলোই তুলে ধরেছে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ডাচ সদস্য হেসে লাজেনজিক বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ্ গুলের দল তুরস্কের আধুনিকায়নের জন্য এত বেশী কিছু করেছে, যা কিনা পূর্বের সবগুলো ধর্মনিরপেক্ষ দল করতে ব্যর্থ হয়েছে।' তুরস্কে এখন পর্যন্ত মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ ব্যবহার নিষিদ্ধ। ২০০২ সালে আব্দুল্লাহ্ গুলের দল নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, তারা বিজয়ী হলে মেয়েদের মাথায় স্কার্ফ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবে। নির্বাচনে বিজয়ী হয়েও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তারা সে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেননি, এমনকি ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে যে আইন তারা করেছিলো পরবর্তীতে সে আইনও তারা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

এরপরেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা আব্দুল্লাহ্ গুলকে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন দেয়া মেনে নিতে পারেনি। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর স্ত্রী তুরস্কের ফার্স্ট লেডি হয়ে রাষ্ট্র প্রধানের বাসস্থান আঙ্কারার কাঙ্কায়া প্রাসাদে থেকে মাথায় স্কার্ফ পরে বিদেশী অতিথিদের সামনে আসবেন, এটা ধর্মনিরপেক্ষরা কল্পনা করতেও নারাজ।

সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষদের দাবী অনুসারে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ **'যার যার ধর্ম পালনের অধিকার'** তাদের এ দাবী অসত্য এবং স্পষ্ট প্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও তাদের সমমনা দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী। গত ২২/১২/০৫ তারিখে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের অনুসারীরা ঢাকা-পল্টন ময়দানের সমাবেশ থেকে যে ২৩ দফা ঘোষণা দিয়েছে তাতে তারা উল্লেখ করেছে, ক্ষমতায় যেতে পারলে তারা সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল করবে এবং দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিবিসির সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, **'তারা ক্ষমতায় গেলে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করার পদক্ষেপ নেবেন।'**

স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংযোজন করেছিলো। সংবিধানের শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লেখার প্রয়োজন মনে করেনি, তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের বাণী **'রাব্বি যিদ্নী ই'লমা'** বাক্যটি

বাদ দিয়ে শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে **'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক'** কোরআনের এই আয়াতটিও বাদ দিয়েছিলো। কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকেও **'ইসলাম'** শব্দ বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খন্ডিত করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হয়। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে **'ইসলামিক'** শব্দ বাদ দিয়ে কলেজটির ইসলামী চরিত্রই ধ্বংস করেছিলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে **'মুসলিম'** শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দেশের অসংখ্য শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে **'ইসলাম ও মুসলিম'** শব্দ মুছে দিয়েছিলো।

গত ১৮/৫/০৭ তারিখে চট্টগ্রাম সীতাকুন্ডে চন্দ্রনাথ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার নিজ দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার বিভৎসতা ও গুজরাট- আহমদাবাদের দগদগে ক্ষতের কথা ভুলে গিয়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের উপদেশ খয়রাত করেছেন, **'ভারতের মতো বাংলাদেশ একটি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলে এখানে গনতন্ত্র শক্তিশালী হবে।'** তার এই বক্তব্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সংবিধানে হস্তক্ষেপের শামিল। কারণ বাংলাদেশের সংবিধানে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এ দেশের ৯০ ভাগ মানুষের চিন্তা-চেতনার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সুতরাং এটি একটি মীমাংসিত বিষয় এবং একটি মীমাংসিত বিষয়ে ভারতের হাইকমিশনার অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন। আমরা ভারতের কাছ থেকে সুসম্পর্ক ও সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ কামনা করি, অবশ্যই বিগ ব্রাদারসূলভ আচরণ কাম্য নয়।

বাংলাদেশের মুসলমানগণ ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাস করে না বলেই এখানে সকল ধর্মের অনুসারীগণ পরস্পরে আত্মীয়সুলভ সম্পর্ক বজায় রেখে বসবাস করছে এবং মন্দির-মসজিদ পাশাপাশি অবস্থান করছে। ইসলাম মুসলমানদের শিক্ষা দিয়েছে অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা, সহিষ্ণুতা এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রতি চরম ঘৃণা। আর এ কারণেই মুসলমানগণ ভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসীদের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশের মুসলমানগণ ধর্মনিরপেক্ষতার খোলস ব্যবহার করে না বলেই সারা দুনিয়ায় এদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের বদ্ধমূল ধারণা, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রবেশাধিকার দিলে ধর্মীয় সংখ্যা লঘুরা নির্যাতিত হবে অথবা তারা নাগরিক সমঅধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। এটি তাদের সম্পূর্ণ অলীক ধারণা।

কারণ, ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক জীবন বিধান নয়, এটি সার্বজনীন– শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান।

তিনিই সেই আল্লাহ– যিনি শুধু **'রাব্বুল মুসলিমিনীন নন'** অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের প্রতিপালক নন। তিনি তো **'রাব্বুল আ'লামীন'** অর্থাৎ তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি যে জীবন বিধান দিয়েছেন তার নাম কোরআন যা শুধু **'হুদাল্লিল মুসলিমীন'** অর্থাৎ শুধু মুসলমানদের জন্য হিদায়াত গ্রন্থ নয়। বরং তা **'হুদাল্লিন্নাস'** অর্থাৎ গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হিদায়াতের মহাগ্রন্থ। আর এই পবিত্র কোরআন যাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি শুধু মুসলমানদের নবী নন। তাঁর সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলছেন–

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّى رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا–

হে নবী! আপনি বলুন, হে মানব সকল! আল্লাহর পক্ষ হতে আমি তোমাদের সকলের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি'। (সূরা আ'রাফ-১৫৮)

অর্থাৎ তিনি বিশ্বনবী আর এটাই যখন প্রকৃত বাস্তবতা, তখন বিশ্বজনীন ও সার্বজনীন ইসলাম নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ভাইয়েরা জলাতঙ্ক রোগীর মতো ধর্মাতঙ্ক রোগে কেনো ভুগছেন? রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী বিধান চালু হলে শুধু মুসলমানরা উপকৃত হবে আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা হবে নির্যাতিত, এ চিন্তা ইসলাম সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ, মূর্খ অথবা জ্ঞানপাপীদের। ঘুমন্ত মানুষকে ডেকে সচেতন করা খুবই সহজ, কিন্তু যারা জেগে ঘুমায় তাদেরকে জাগাবার সাধ্যি কার?

ইসলামী অনুশাসনে রাষ্ট্র পরিচালিত হলে অমুসলিমদের মুসলমান হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, নিজ ধর্মে অবিচল থেকেই সুখী-সমৃদ্ধ ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবন-যাপনে ধন্য হবেন তাঁরা। পবিত্র কোরআন থেকে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত অনুধাবন করুন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا–

তোমরা ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না, নিঃসন্দেহে এটি একটি অশ্লীল কাজ এবং নিকৃষ্ট পথ। (সূরা বানী ইসরাঈল-৩২)

লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই আয়াতে বলা হচ্ছে ব্যভিচার করা তো দূরে থাক– জেনার নিকটবর্তীও হয়ো না। এর অর্থ হলো, যেসব কাজ মানুষকে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করে

তোমরা তার ধারে কাছেও ঘেষোনা। মানুষকে জেনার প্রতি আকৃষ্ট বা পরনারীর প্রতি লালসায় উদ্বুদ্ধ করে বেপর্দা নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শনী, অশ্লীল নাচ-গান, অশ্লীল কবিতা-সাহিত্য, পর্ণো ছবি ইত্যাদী।

এ সকল অশালীন কাজ যদি আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় তাহলে এ দ্বারা শুধুই মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম রক্ষা পাবে না জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল নারীদেরই সতীত্ব-সম্ভ্রম রক্ষা পাবে?

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে–

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا–

আল্লাহ তা'য়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সূরা বাকারা- ২৭৫)

সুদ হচ্ছে বিশ্বব্যাপী পূজিবাদি শোষণের জঘন্য হাতিয়ার, এ কথা সর্বজন বিদিত। সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা এবং জাকাতভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখুন, 'সুদ হলো গরীবের কাছ থেকে নিয়ে ধনীদের দাও, আর জাকাত হচ্ছে ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের দাও।' সুতরাং সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থায় ধনীক শ্রেণীকে শিয়াল থেকে হিংস্র হায়েনা হতে সাহায্য করে।

এই জঘন্য সুদভিত্তিক সকল প্রকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সুদী লেন-দেন যদি আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা যায় তাহলে সুদের শোষণ থেকে শুধু কি মুসলমানরা রক্ষা পাবে না জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের অনুসারীরা সুদের অভিশাপ থেকে বেঁচে যাবে?

আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন, 'মদ-জুয়া শয়তান কর্তৃক উদ্ভাবিত নোংরা কাজ। এই মদ ও জুয়ার মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরে শত্রুতা ও হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজ থেকে তোমাদের বিরত রাখে। এসব জানার পরও কি তোমরা মদ-জুয়া থেকে বিরত থাকবে না?' (সূরা মায়েদা-৯০-৯২)

মদ-জুয়া সকল পাপের উৎস এ কথা কে না জানে? মদপান করে মানুষ মাতাল হয়, স্বাভাবিক জ্ঞানলোপ পায়, সে তখন পশুর মতো আচরণ শুরু করে। হত্যা, ধর্ষনসহ হেন পাপ নেই যা সে তখন করতে পারে না। আর জুয়ার মাধ্যমে হঠাৎ করে মানুষ বিনাশ্রমে লক্ষ-কোটি টাকার মালিক হয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়। সে তখন মানুষকে আর মানুষ মনে করে না। সকল প্রকার অবৈধ কাজ ও স্বেচ্ছাচারীতায় গা ভাসিয়ে দেয়।

মহাপাপের উৎস এই মদ-জুয়া যদি আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা যায়, তাহলে এ দ্বারা কি শুধু মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে না জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মাতাল ও জুয়াড়ীদের তান্ডব থেকে সকল ধর্মের লোকই নিস্তার পাবে? (তবে এ কথাও জেনে রাখা প্রয়োজন, যেসব ধর্মে মদপান নিষিদ্ধ নয়, তারা তাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে তা পান করতে বা উৎপাদন করতে পারবে, ইসলাম সেখানে বাধা দিবে না)

পাঠক, এবার একটু ভেবে দেখুন তো, এই সার্বজনীন ইসলাম নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষদের এতো ভয় কেনো?

জীবনের সাথে সকল প্রয়োজনীয়- আবশ্যকীয় বিষয়গুলোর আমরা পক্ষাবলম্বন করি, আর ধর্ম তাদের কাছে এমনই অনাবশ্যকীয় বিষয় যে, শুধু এই একটি ব্যাপারেই নিরপেক্ষ থাকতে চায় ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা। কিন্তু কেনো? তাদের ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের স্বপক্ষে কোরআন-হাদীসের কোনো প্রমাণ থাকলে আমার লেখার জন্য আমাকে গাল-মন্দ না করে সে সব দলীল নিয়ে এগিয়ে আসুন। যদি তারা তাদের দাবীতে সত্যবাদী হন।

এবার ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টি দিন, আমাদের স্বনামধন্য ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক, কলামিষ্ট ও কবি-সাহিত্যিক যারা ইসলামকে উগ্র জঙ্গীবাদ আর মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে মজা পান, তারা কি সুস্থ মস্তিষ্কে এগুলো লিখেন?

আমাদের একান্ত প্রতিবেশী দেশ ভারত মুসলমানরা দীর্ঘ আটশত বছর শাসন করেছে। মুসলমানরা যদি সাম্প্রদায়িক হতো তাহলে গোটা ভারত বর্ষে মন্দির, প্যাগোডা, গির্জা, গুরুদুয়ারা, বৌদ্ধাশ্রমসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সকল উপাসনালয় গুলো মসজিদ হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক ছিলো, আর অমুসলিম সংখ্যালঘুরা বিলুপ্ত প্রজাতিতে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু বাস্তবতা সাক্ষী দিচ্ছে এমনটি হয়নি। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন তো, ইতিহাস বলে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা থেকে মরক্কোর রাবাত পর্যন্ত এবং স্পেন, পর্তুগালসহ গোটা ফ্রান্সের ৫০% এর বিশাল ভূ-ভাগ সাড়ে সাতশত বছর মুসলমানরা শাসন করেছে। এসব দেশে মুসলমানরা কি অমুসলিমদের ওপর নির্যাতন করেছে বা তাদের নাগরিক ও ধর্ম পালনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে? ইতিহাসে এর একটি নজিরও কি ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা দেখাতে পারবেন?

বরং প্রকৃত ইতিহাস তো এই যে, বিশ্বে সকল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতেই অমুসলিম সংখ্যা লঘুরা ধর্ম-কর্ম পালনে সর্বাধিক নিরাপদ ও সুবিধা ভোগী। এটাই ইসলাম ও মুসলমানদের স্বর্ণালী ইতিহাস যা অন্যদের নেই। ইসলাম ও মুসলিম শাসনের অধীনে অমুসলিমদের সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি সম্পর্কে অমুসলিম

ঐতিহাসিকগণও প্রশংসা না করে পারেননি। বিস্তারিত জানার জন্যে নিম্ন লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থসমূহ পড়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

(1) The Caliphate its Rise, Decline & Fall by W. Muir.

(2) Preaching of Islam by T. W. Arnold.

(3) The History of the Decline & Fall of the Roman Empire by Gibbon.

(4) The Making of Humanity by Robert Briffault.

(5) Civilization on Trial by Arnold Toynbee.

(6) Muslim rule in India by Biddadhar Mahazon.

(7) Spanish Islam by Dozy.

(8) With Lawrence in Arabia by L. Thomas.

(9) Marriage in Early Islam by G. H. S. Stern.

(10) Studies in Mohammedanism by J. J. Poole.

(11) Saladin by Lane Pole.

(12) Lectures on Arabic Historians by Tr. Margoliouth.

(13) Dominion of the Arabs in Spain by Conde.

(14) History of the Arabs by P. k. Hitti.

(15) Lord Of Arabia by Armstrong.

(16) Rise of Mohamedan Power in India by Tr. Brigg.

(17) Moors in Spain by Lane Poole.

(18) Medieval India by Iswari Prasad.

(19) Short Stories From Islamic History by C. T. Dutt.

(20) Islam in the World.

(21) The Messenger: the Life of Mohammad.

(22) The Arab Conquest of Egypt.

(23) Civilization: Past and Present.

(24) Arabia before Mohammad.

(25) Mohammad & the Jews.

(26) Mohammad & the Rise of Islam.

(27) Mohammad: Prophet and Statesman.

(28) Mohammad & Mohammadanism.

(29) Arabe's Conquest of Egypt and the last thirty years of Roman Dominion.

বাংলাদেশে মুসলিম হিসেবে পরিচিত যে সকল নেতা ধর্মনিরপেক্ষতা চালু করার জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন, আমার ধারণা তারা ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ বুঝতে ভুল করেছেন এবং একজন মুসলিম হিসেবে পরধর্ম সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টি ভঙ্গী জানার চেষ্টা করেননি। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ অনুসারে ধর্মের শিক্ষা, প্রচার ও প্রসার বন্ধ করে দিয়ে ধর্মকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ করার অর্থই ধর্মকে উচ্ছেদ করা। ধর্মের প্রভাবই যদি সমাজ জীবনে ক্রিয়াশীল না থাকে, তাহলে মানুষ কি শুধু আইন ও শাস্তির ভয়ে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চুরি-ডাকাতী ও নৈতিকতা বিরোধী এবং অসামাজিক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে?

ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ঐ সকল মুসলিম নেতৃবৃন্দের কাছে আমি বিনয়ের সাথে আবেদন রাখছি, ধর্মের প্রভাব মুক্ত হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ প্রকাশ্যে মদপান, লিভ টুগেদার ও জেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হোক এটা কি কারো জন্যে কাম্য হতে পারে? নারী সমাজ শালীন পোশাক পরিত্যাগ করে অর্ধোলঙ্গ বা সংক্ষিপ্ত পোশাকে চলাফেরা করুক এটা কি কারো কাম্য হতে পারে? ধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী সন্তান-সন্ততি পিতামাতার প্রতি মমতার দৃষ্টি না দিয়ে তাদেরকে বৃদ্ধ বয়সে অসহায় অবস্থায় ফেলে বয় বা গার্ল ফ্রেন্ড-এর সান্নিধ্যে বিভোর থাকুক এটাও কি কারো কাম্য হতে পারে?

আমরা কেউ-ই এমন অকল্পনীয় অবস্থার মুখোমুখি হতে ইচ্ছুক নই এবং আমি বিশ্বাস করি, মুসলিম নামে পরিচিত ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ভাইগণও এমন যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা মেনে নিবেন না। এই মতবাদ মানুষকে পৃথিবীতে আদর্শহীনতা, চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর অবস্থার দিকে নিক্ষেপ করে এবং এটি একটি প্রতারণামূলক মতবাদ, যা মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে, তা আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম মোহাম্মাদ হানিফ তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে প্রকৃত বিষয়টি উপলব্ধি করে অত্যন্ত সাহসীকতার সাথে প্রচার মাধ্যমে কথাগুলো উপস্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সহযাত্রীরা তাঁর বক্তব্যকে নিজস্ব বক্তব্য বলে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন, যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করার সাহস দেখান নি। ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির জন্যে মরহুম মোহাম্মাদ হানীফকে মহান আল্লাহ তা'য়ালা পুরস্কৃত করুন এবং তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থদের সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

বাংলাদেশে যারা ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কথা বলেন, তাদের কাছে আমি বিনয়ের সাথে আরো কিছু কথা আরজ করতে চাই, ভারতে বসে যেসব নেতা আমাদের

কল্যাণের কথা ভাবেন এবং ভারতের যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এদেশ সফরে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় সংযোজনের নসিহত খয়রাত করেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, তারা কি প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ– না ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নির্মূল করে নিজেদের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান?

লক্ষ্য করুন, ভারত তাদের রাষ্ট্রীয় ভবনের নামকরণ করেছে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ত্রিমূর্তি ভবন, যা কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করছে সেগুলোর নামকরণও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় সংগীত রচনা করেছে, জাতীয় পতাকাতেও রয়েছে ধর্মীয় চিহ্ন অশোক চক্র, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসমূহের নামকরণও করেছে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ী ব্যবহার করেন এবং মুখে দাড়িও রেখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতের অধিকাংশ নেতা নিয়মিত পূজা-পার্বন করে কপালে তিলক ব্যবহার, ধর্মীয় রীতিতে দুই হাত জোড় করে নমস্কার জানান এবং ধর্মীয় লেবাস পরিধান করেন। রাখি বন্ধন পালন করেন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মীয় নীতি অনুযায়ীই উদ্বোধন করেন। বিয়েও করেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তারা তাদের ধর্মীয় রীতিতেই তিলক-চন্দন পরিয়ে **'দেশীকোত্তম'** ডিগ্রী দিয়েছিলো।

বিশ্ব বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ভারতের অমিতাভ বচ্চন জ্যোতিষীদের গণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চনের জন্য নির্বাচিত পাত্রী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়ের নিয়তি থেকে অমঙ্গল দূর করার জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ অনুসরণ করে প্রথমে তাকে বৃক্ষের সাথে বিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে নিজের সন্তানের সাথে বিয়ে দেন। মৃত্যুর পরে তাদেরকে ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনা দেবদেবীর বন্দনা দিয়েই শুরু করা হয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় দলীল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্রে দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এবার ইউরোপ-আমেরিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তারা তাদের মুদ্রার ওপর লিখেছে 'আমরা গড-এ বিশ্বাসী' এবং আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। বিয়ের ক্ষেত্রেও তারা ধর্মীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে গির্জায় গিয়ে ধর্মীয় রীতিতেই বিয়ে করেন এবং মৃত্যুর পরেও ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেনো 'টু' শব্দ করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে।

অথচ তারাই চরম সাম্প্রদায়িকতায় উদ্দিপ্ত হয়ে ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে, কবিতা-সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরণের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা করে। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসায় বাধা না থাকলেও মুসলিম মেয়েদের জন্যে হিজাব পরিধান করে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে এদেশে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। এমনকি আমার দেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো? এটাই হলো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা। মুসলমানরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই তারা একে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করছে। আসলে তারা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নানা কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এই ধর্মনিরপেক্ষতার ভয়ঙ্কর অভিশাপে জ্বলছে তুরস্ক পুড়ছে ভারত। জেনে বুঝে এ মহাআপদ আমরা বাংলাদেশে অঙ্কুরিত হতে দিতে পারিনা। ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ দিয়ে ভারত তাদের ধর্মীয় সংখ্যা লঘুদের যথাযথ অধিকার ও মর্যাদা দিতে পারেনি– সে ইতিহাস বড়ই কলঙ্কিত, লোমহর্ষক এবং চরম অমানবিক যা বর্ণনাতীত। বাংলাদেশে আমরা হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও উপজাতী সম্প্রদায় মিলেমিশে সুখে শান্তিতে যার যার ধর্ম সে সে নির্বিঘ্নে পালন করে যাচ্ছি। আমাদের এই সুখ যাদেরকে স্বস্তি দিচ্ছে না এবং ইসলামের নাম শুনলে যাদের গা জ্বালা করে, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ তারাই আমদানী করতে চায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে সত্যকে সত্য বলে জেনে তা মেনে চলার ও অসত্য-বাতিলকে বাতিল হিসেবে জেনে তা বর্জন করার তাওফীক দান করুন– আমীন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে

চলমান রাজনীতিতে এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টরা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের দাবীর পেছনে যুক্তির বহর দেখে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয়না যে এদের ইসলাম সম্পর্কে আদৌ সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব আঁতেলদের পারিবারিকভাবে দ্বীনি প্রশিক্ষণ কপালে জোটেনি, শিক্ষা জীবনে ইসলামের ধারে কাছেও ঘেষেনি, পরিণত বয়সে এসে ইসলামী জীবনাচারণে না ঘরকা না ঘাট্‌কা অবস্থায় লেজে গোবরে অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সেক্যুলারপন্থী এসব মুসিলম নাম ব্যবহারকারীরা আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মারাত্মক তিনটি ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

একঃ এরা ইসলামকে অন্যান্য ধর্মের মতো শুধুমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব গতানুগতিক একটি ধর্ম বলে মনে করে।

দুইঃ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে শুধুমাত্র অন্যান্য ধর্মীয় নেতার মতো একজন ধর্মীয় নেতা মনে করে।

তিনঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ মনে করে।

ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থী ও সেক্যুলার পন্থীদের উপরোক্ত ৩টি মারাত্মক ভুল ধারণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

একঃ মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু উপাসনা সর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলাম একটি সার্বজনীন কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম, যা শুধু মাত্র নামাজ-রোজা হজ্জ-যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের সার্বজনীনতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا-

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসাবে আমি ইসলামকে দান করে সন্তুষ্ট হলাম। (সূরা আল মায়েদা-৩)

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামী অনুশাসন মানুষের জন্ম থেকে কবর

পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিস্তৃত, যা মুসলিম দাবীদার সকল নর-নারী মানতে বাধ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُه اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ–

যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর এ অধিকার নেই যে, তারা সে বিষয়ে কোনো ধরণের ভিন্ন মত পোষণ করবে। (সূরা আহযাব-৩৬)

সমাজতন্ত্রী, কমিউনিষ্ট, সেক্যুলারিষ্ট ও নাস্তিকরা বলে থাকেন– যার ধর্ম তার কাছে– রাষ্ট্রের কি বলার আছে, ইসলাম সেকেলে আধুনিক যুগে অচল, ১৪শ বছরের পুরনো সভ্যতা, বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে চলতে পারে না ইত্যাদি ঢালাও মন্তব্য করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। আর এ ধরনের বিষাক্ত অপপ্রচারে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ নতুন প্রজন্ম অতি সহজেই ইসলাম বিদ্বেষীদের খপপ্ড়ে পড়ে যায়।

পবিত্র কোরআন-হাদীস দ্বারা এ কথা অকাট্য দলীলসহ প্রমাণীত যে, কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলিম তার জীবনের একটি খন্ডিত অংশে কোনো রকম দায়সারা গোছের নামাজ-রোজা ইত্যাদী আদায় করে ধর্ম পালনের ভনিতা করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, আইন ও বিচার এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে মানব রচিত মতবাদের সামনে আত্মসমর্পণ করে ধর্মহীন জীবন-যাপন করবে, এ ধরণের বিন্দুমাত্র অধিকার কোনো মুসলিমকে দেয়া হয়নি। কারণ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক শিশু স্বভাবধর্ম নিয়েই জন্মলাভ করে। তার পিতা-মাতাই তাকে ইয়াহূদী, নাছারা (বা বিভিন্ন ধর্মের) অনুসারী বানায়।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَ لاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ–

এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না যে তুমি মুসলিম নও, অর্থাৎ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা আলে ইমরাণ-১০২)

অতএব বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, মুসলমানদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পরের জগতে প্রবেশ মাত্র যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, তার একটি হচ্ছে, তোমার দ্বীন কি ছিলো?

অর্থাৎ তোমার ধর্ম কি ছিলো? সুতরাং এ কথা সার্বজনীন ও চির প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আর আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান একটি

বিশেষ যুগ, কাল বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ বিধান সর্বকালের সর্বযুগের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত করার লক্ষ্যে যারা এ কথা বলে থাকে যে, 'ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা হলেও তা বিশেষ একটি যুগ ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্যে কল্যাণকর ছিলো। যুগের আবর্তন ও বিবর্তনের কারণে সকল যুগের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে ইসলাম কল্যাণকর নয়। আর এ কারণেই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে'। এ ধরনের বালখিল্য যুক্তি উত্থাপন করে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আব্দার কেবলমাত্র ইসলামের আজন্ম শত্রুরাই জানাতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে সকলকে স্পষ্ট স্মরণে রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক, উগ্র, জঙ্গী, পরধর্ম অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণ, অনুদার ধর্মমতের নাম নয়– ইসলাম জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ, দুর্বল-সবল, শিশু-কিশোর, তরুণ যুবক, প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, কৃষক-শ্রমিক মেহনতী জনতা তথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে শান্তির একমাত্র শেষ আশ্রয় স্থল।

এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নিজেদের ভোগ-বিলাস ও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ার পথে ইসলামকে অন্তরায় মনে করেই রাজনীতি থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার মতলবি দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। আর ঠিক এ কারণেই ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষন করে পরগাছা নেতা সর্বস্ব বাম দলগুলো ও সেক্যুলার পন্থীরা ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে বিশেষ মতলব হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী অব্যাহত রেখেছে এবং দেশে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবী জানাচ্ছেন।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাঁরা নিঃসন্দেহে নিজেকে প্রতারিত করছেন। কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থই হচ্ছে পক্ষেও নয়– বিপক্ষেও নয়।

ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে মুসলমান তো দূরের কথা– অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করার অর্থ নিজের সাথেই নিজেই প্রতারণা করার শামিল। আমার এ কথার স্বপক্ষে বাস্তব কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুনঃ–

একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে নামাবলী ও পৈতা জড়িয়ে, মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাখা পরেন, বার মাসে তের পূজা এবং তেত্রিশ কোটি দেবতায় বিশ্বাস করে প্রত্যেহ মন্দিরে গিয়ে দেবতার পদপাদ্যে অর্ঘ-নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন তিনি কি আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন? তিনি তো ধর্মের পক্ষেই চলে গেলেন।

একজন শিখ যখন গুরু নানকের অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় পাগড়ী পরেন এবং হাতে বালা ও কৃপাণ ধারণ করেন, গুরুদুয়ারায় গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন তখন তো তিনি ধর্মের পক্ষেই থাকলেন। একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরমধর্ম ও জীব হত্যা মহাপাপ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে আত্মার মহানির্বাণ লাভের জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধন করেন, বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে প্যাগোডায় যান তিনিও তো ধর্মের পক্ষই অবলম্বন করলেন।

একজন খৃষ্টান যখন যিশুখৃষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করেন, গলায় ক্রুশ ঝুলান, ত্রিত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাস করেন, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ করে প্রতি রবিবার গির্জায় প্রার্থনা করেন, আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের প্রতিটি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে অূ ঐৃউ ঘঝ কীখওক তখন তারাও তো আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন না, ধর্মের পক্ষেই এলেন।

একজন মুসলিম পুরুষ যখন মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি এবং লম্বা জামা পরেন, নামাজ-রোজা, হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করেন, মুসলিম নারী যখন শালীন পোশাক তথা পর্দা করেন, হিজাব পরিধান করেন, আল্লাহ-রাসূল, কোরআন-হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করেন, তিনিও তো ধর্মের পক্ষেই অবস্থান নিলেন। এটাই যখন অটল বাস্তবতা, তাহলে **'ধর্মনিরপেক্ষ'** রইলো কে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

দুনিয়াব্যাপী ঢাকঢোল পিটিয়ে মুসলিম বিশ্বে একমাত্র কামাল পাশাই সর্বপ্রথম তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। কামাল পাশা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয়ে সারা দেশে আযান নিষিদ্ধ ও আরবী অক্ষর উৎখাত করেছিলো, ফেজটুপি ও বোরকা ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিলো। কোরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার, শিক্ষা, চর্চা নিষিদ্ধ করে অগণিত আলেম-ওলামাকে হত্যা করেছিলো। তুরস্কে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, প্রকাশ্যে মদপান, জেনা-ব্যভিচার বৈধ করে নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিমজ্জিত করা হয়েছিলো।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংযোজন করেছিলো। সংবিধানের শুরুতে **'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'** লেখা প্রয়োজন মনে করেনি এবং ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল করা অবৈধ করেছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কোরআনের বাণী **'রাব্বি যিদ্নী ই'লমা'** বাক্যটি বাদ দেয়া হয়। শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে **'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক'** কোরআনের এই আয়াতটিও বাদ দিয়েছিলো। কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নাম

থেকেও **'ইসলাম'** শব্দ বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খণ্ডিত করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হয়। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে 'ইসলামিক' শব্দ বাদ দিয়ে কলেজটির ইসলামী চরিত্রই ধ্বংস করেছিলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে **'মুসলিম'** শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দেশের অসংখ্য শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে **'ইসলাম ও মুসলিম'** শব্দ মুছে দিয়েছিলো। ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবী যারা করছেন, তারা দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আদর্শহীন হতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা।

দুইঃ বিশ্বমানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বাম ও সেক্যুলার পন্থীদের ধারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা অবশ্যই নন, তিনিই ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের সফল প্রতিষ্ঠাতা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে তাঁকে বিশ্বনবী ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতীক বলা হয়েছে, তাঁর আনীত ও ঘোষিত সকল বিষয়ের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। জীবনে চলার সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কেই 'আদর্শ' হিসেবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম হিসেবে দাবীদার প্রত্যেককেই এ কথায় ঈমান রাখতে হবে যে, রাসূল (সাঃ) শুধুমাত্র নামাজের নেতৃত্বই দেননি। তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্দোলন-সংগ্রাম, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি-নিরাপত্তা, অর্থ-সম্পদ, আইন-বিচার ও আমানত রক্ষায় তথা জীবন পরিচালনার সকল অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এসব ক্ষেত্রে তাঁকে নেতা মেনে তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য দৈনন্দিন জীবনে ফরজ দায়িত্ব। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

(আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা আল হাশর-৭)

সুতরাং বাম-রামপন্থীদের অজ্ঞতা ও মূর্খতা প্রসূত ধারণানুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা নন, তিনি বিশ্বনবী এবং সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং সর্বশেষ নবী। সমগ্র জীবনে তিনি পবিত্র মুখে 'অসত্য' একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অন্যের আমানত খেয়ানত করেননি, অন্যের হক নষ্ট করেননি, কাউকে কথা ও আচরণ দিয়ে কষ্ট দেননি। তিনি

বর্ণ বৈষম্য দূরীভূত করেছেন, নারী ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোটা মানব সভ্যতায় তিনি তুলনাহীন। জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালোবেসে তাঁর আনুগত্য করা মুসলমানদের ঈমানের দাবী।

তিনঃ এ কথা সকলেরই স্মরণে রাখা প্রয়োজন, মহাগ্রন্থ আল কোরআন অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের মতো শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশ সম্বলিত সাধারণ কোনো পুস্তক নয়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ–

(হে নবী) আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। (সূরা নহল-৮৯)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট জীবন বিধান দিয়ে যাচ্ছি যা রাত ও দিনের মতো সুস্পষ্ট। নির্ঘাত ধ্বংসের পথের যাত্রী ছাড়া অন্য কেউ এথেকে বিচ্যুত হবে না'। (আল হাদীস)

আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন–

فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقٰى–

(জীবন পরিচালনার জন্য) আমার (নাযিলকৃত) হিদায়াত যারা অনুসরণ করে চলবে তারা (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে না এবং (আখিরাতে) কোনো কষ্ট পাবে না'। (সূরা ত্বাহা-১২৩)

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'এমন এক সময় আসবে অন্ধকার রাতের মতো ফিত্না-ফাসাদ দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! সে বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কোরআনই বাঁচার একমাত্র পথ, এতে রয়েছে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ মানব গোষ্ঠীর ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ বাণী এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কিয় আইন। বস্তুত কোরআন চূড়ান্ত বিধান, কোনো অবহেলার জিনিস নয়'। (তিরমিযী)

যে কোরআন ছিলো মুসলমানদের শক্তির উৎস, যে কোরআন দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদের বসিয়ে তাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো,

বেদুঈন, রাখাল ও ক্রীতদাসদের ন্যায়পরায়ন শাসক, দিগ্‌বিজয়ী বীর সেনাপতি ও বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলো, সেই কোরআনের সাথে আজকের এক শ্রেণীর মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু সওয়াবের নিয়তে না বুঝে তিলাওয়াত করা। অথচ কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ছিলো এ মহাগ্রন্থের আলোকে মুসলিম উম্মাহ্ তাদের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবে এবং এই কোরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতিসহ জীবনের বিশাল অঙ্গনকে ঢেলে সাজাবে। এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালেক (রাহঃ) বলেছেন, 'মুসলিম জাতি যে জিনিসের বদৌলতে একদিন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছিলো শেষ যুগেও তারই সাহায্যে (অর্থাৎ সেই কোরআনের সাহায্যেই) কল্যাণ লাভ করবে (এর কোনোই বিকল্প নেই)'।

প্রকৃত পক্ষে পবিত্র কোরআন মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশিকা, এতে শুধু নামাজ-রোজার কথাই বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই। এক কথায় জীবন চলার সকল নীতির মূলনীতি বর্ণিত যে কিতাব, তারই নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন। হতভাগ্য বামপন্থীরা এ পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। এ মহা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই সকল বাম ও রামপন্থীরা ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে শুধু ধর্মীয় নেতা আর কোরআন মজীদকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় পুস্তক মনে করে।

এ ত্রিবিধ মহাক্যান্সার ব্যধিতে আক্রান্ত বামরা– সারা দেশে সর্বসাকুল্যে যাদের দুই হাজার কর্মীও নেই, তারাই একটি সেক্যুলার দলের আশ্রয়ে- প্রশ্রয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মতো ইসলামকে ভয় পায় এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার মামা বাড়ির আব্দার তোলে। ১৪ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বামদের এ দুরাশা কোনো দিন পূর্ণ হবে না ইনশাআল্লাহ্।

বাংলাদেশে যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তাদের কাছে আমি বিনয়ের সাথে আরো কিছু কথা আরজ করতে চাই। ভারতে বসে যেসব নেতারা আমাদের কল্যাণের কথা ভাবেন এবং ভারতের যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এদেশ সফরে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় সংযোজনের নসিহত খয়রাত করেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, তারা কি প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ– না ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নির্মূল করে নিজেদের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান?

লক্ষ্য করুন, ভারত তাদের রাষ্ট্রীয় ভবনের নামকরণ করেছে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ত্রিমূর্তি ভবন, যা কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করছে সেগুলোর নামকরণও ধর্মীয় বিশ্বাসের

ভিত্তিতেই করছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় সংগীত রচনা করেছে, জাতীয় পতাকাতেও রয়েছে ধর্মীয় চিহ্ন অশোক চক্র, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসমূহের নামকরণও করেছে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ী ব্যবহার করেন এবং মুখে দাড়িও রেখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতের অধিকাংশ নেতা নিয়মিত পূজা-পার্বন করে কপালে তিলক ব্যবহার, ধর্মীয় রীতিতে দুই হাত জোড় করে নমস্কার জানান এবং ধর্মীয় লেবাস পরিধান করেন। রাখি বন্ধন পালন করেন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মীয় নীতি অনুযায়ীই উদ্বোধন করেন। বিয়েও করেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তারা তাদের ধর্মীয় রীতিতেই তিলক-চন্দন পরিয়ে 'দেশীকোত্তম' ডিগ্রী দিয়েছিলো।

বিশ্ব বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ভারতের অমিতাভ বচ্চন জ্যোতিষীদের গণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চনের জন্য নির্বাচিত পাত্রী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়ের নিয়তি থেকে অমঙ্গল দূর করার জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ অনুসরণ করে প্রথমে তাকে বৃক্ষের সাথে বিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে নিজের সন্তানের সাথে বিয়ে দেন। মৃত্যুর পরে তাদেরকে ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করা হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনা দেবদেবীর বন্দনা দিয়েই শুরু করা হয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় দলীল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্রে দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এবার আমেরিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তারা তাদের মুদ্রার ওপর লিখেছে 'আমরা গড-এ বিশ্বাসী' এবং আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। বিয়ের ক্ষেত্রেও তারা ধর্মীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে গির্জায় গিয়ে ধর্মীয় রীতিতেই বিয়ে করেন এবং মৃত্যুর পরেও ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেনো 'টু' শব্দ করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে।

অথচ তারাই চরম সাম্প্রদায়িকতায় উদ্দিপ্ত হয়ে ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাস্ত করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে, কবিতা-সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরণের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা

করে। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসায় বাধা না থাকলেও মুসলিম মেয়েদের জন্যে হিজাব পরিধান করে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কারণে এদেশে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। এমনকি আমার দেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো? এটাই হলো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা। মুসলমানরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই তারা একে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করছে। আসলে তারা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নানা কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এতক্ষণে দলীল ভিত্তিক আলোচনায় প্রমাণিত হলো, দেশে ধর্মভিত্তিক তথা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কোনো মুসলিমের মুখে অন্তত উচ্চারিত হতে পারে না। যাদের মুখে এ দাবী উচ্চারিত হচ্ছে, তারা বিশেষ মতলবেই এ দাবী উত্থাপন করে চলমান সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে।

দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার মূলনীতি

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছেন। এ জিহাদে সফলতা অর্জনের জন্য যৌথবাহিনী, র‍্যাব, গোয়েন্দা বিভাগ, টাস্কফোর্স, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য অনেকগুলো সংস্থা রাত-দিন পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। প্রশ্ন উঠেছে, বিগত ছয় মাসে দুর্নীতির বিরুদ্ধে পরিচালিত জিহাদের সফলতা কতটুকু? জবাবে কেউ বলতে পারেন ৩৬ বছরের জমে ওঠা জঞ্জাল মাত্র ছয়মাসে পরিচ্ছন্ন করা কিভাবে সম্ভব? ছয় বছরেও সম্ভব নয়। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের এমন কোনো ছিদ্র নেই যে পথে এই দুর্নীতি নামক 'ইঁদুর' প্রবেশ করেনি। নার্সারী, কেজি, প্রাইমারী, মক্তব, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও, হাসপাতাল,

ধর্মীয় উপাসনালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিল্প-কলকারখানা, কোর্ট, কাছারী তথা মুরগীর ফার্ম থেকে শুরু করে দেশের সর্বোচ্চ সম্মানজনক ভবন পর্যন্ত দুর্নীতির রাজত্ব বিস্তৃত। দুর্নীতি নামক দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত আজ গোটা দেশ। শুধু হুমকী-ধমকী, মামলা-মোকদ্দমা বা জেল-জরিমানায় এ মারাত্মক ব্যধি থেকে সমাজদেহ সাময়িক নিরাময় লাভ করেছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সমাজ দেহের রক্ত কণিকা ক্যান্সার মুক্ত নয়। সুযোগ পেলেই এ ব্যধি গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে মরণ দুয়ারের কাছাকাছি পৌঁছে দিবে। কারণ দুর্নীতি নামক ক্যান্সারে সমাজ নামকদেহ এতটা আক্রান্ত যে, ক্যামোথেরাপী গ্রহণের শক্তিও তার বিলুপ্তির পথে।

তবে অপরাধ আর দুর্নীতির এ করাল গ্রাসে শুধু যে বাংলাদেশ আক্রান্ত তা কিন্তু নয়। আমরা যেসব দেশকে সভ্য দেশ বলে আখ্যায়িত করি তারাও কিন্তু আমাদের থেকে কম যায় না। দরিদ্র দেশ বলে আমাদের ছিন্ন বসনের কারণে শরীরের দোষ ত্রুটিসমূহ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে বেশী এই যা। নতুবা আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, এশিয়ার কয়টি দেশ এমনটি পাওয়া যাবে যা দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণতা থেকে শতভাগ মুক্ত? শুধু একটি দৃষ্টান্ত দেখুন, গত কয়েক বছর পূর্বে নিউইয়র্ক শহরে রাতে কয়েক ঘন্টা বিদ্যুৎ ছিল না। দুনিয়া জানে, মাত্র কয়েক ঘন্টার অন্ধকারের সুযোগে পৃথিবীর এই বৃহত্তম শহরে চুরি-ডাকাতী, হত্যা-ধর্ষনসহ অসংখ্য অপরাধ সংঘটিত হয়েছিলো। এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যা রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই জানা আছে। দুর্ভাগ্য এখানে যে, আমাদের দোষসমূহের যেমন ঢাক-ঢোল পেটানো হয় গুণ-বৈশিষ্টসমূহের তেমন প্রচার আদৌ হয় না। যেমন একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করতে চাই, জাতিসংঘ একবার বিশ্বব্যাপী একটি জরিপ চালিয়েছিলো সবথেকে কম দুর্নীতি পরায়ণ দেশ কোন্টি? সে জরীপে জানা গেলো, সারা বিশ্বের মধ্যে সউদী আরবেই দুর্নীতি ও অপরাধ সবথেকে কম। আমেরিকার ৫২টি রাজ্যের শুধু নিউইয়র্ক শহরে ২৪ ঘন্টায় যে চুরি-ডাকাতী, হত্যা-ধর্ষনসহ নানা প্রকারের অপরাধ ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়, সউদী আরবে সারা বছরেও তা হয় না। কারণ সেখানে রাজতন্ত্র থাকলেও দেশ পরিচালনার বহুল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান কার্যকর রয়েছে।

কাজেই অপরাধ ও দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন এটি খুব সহজ বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন একটি উত্তম মডেল। এ রকম অনুসরণীয় একটি মডেল উত্থাপন করাই আমার আজকের আয়োজন। পাঠকদের আমি ইতিহাসের ১৪শত বছর পূর্বের একটি চিত্র দেখাতে চাই। যে সময়টাকে আমরা অন্ধকার ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগ বলে আখ্যায়িত করে থাকি। যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতী, জেনা-ব্যভিচার, হত্যা-ধর্ষন, মিথ্যা-প্রতারণা, হিংসা-বিদ্বেষ কোনোটিকেই পাপ বা অপকর্ম মনে করতো না।

সমস্ত অবৈধ কাজগুলোই ছিলো তাদের কাছে বৈধ। এ রকম একটি পরিবেশে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা সেই সমাজে প্রেরণ করলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান নেতা মহানবী বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে।

তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান ও নিজস্ব উত্তম চরিত্র মাধুর্য দিয়ে গোটা সমাজের চিত্র বদলে দিলেন। মাত্র একটি যুগের সাধনায় সহস্র বছরের মসীলিপ্ত ইতিহাস পরিণত হলো স্বর্ণালী ইতিহাসে। সমাজে যারা ছিলো চোর-ডাকাত, দুর্নীতিবাজ তারা হলেন মানুষের সম্পদের পাহারাদার। যারা ছিলো নারীর সতীত্ব হরণকারী ও হন্তারক তারা হয়ে গেলেন মানুষের জীবন ও নারীর সতীত্বের সংরক্ষণকারী। মরু বেদুঈন রাখালরা হয়ে গেলেন ন্যায় বিচারক, খলীফা, বিচারপতি, সেনাপতি ইত্যাদি। তদানীন্তন সমাজের অধিবাসীদের এ ছিলো চারিত্রিক জীবনে এক মহাবিপ্লব। যে বিপ্লবের মহানায়ক ছিলেন আল্লাহর প্রিয় রাসূল মানবকুল শ্রেষ্ঠ বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর হাতে ছিলো না কোনো যাদুর কাঠি। ছিলো আল্লাহর বাণী আল কোরআন, যার পবিত্র ছোঁয়ায় মৃতপ্রায় জাতি লাভ করলো পুনর্জীবন, চীর অবহেলিত নারীরা পেলেন বেঁচে থাকার সম্মানজনক অধিকার, শ্রমিক, শিশু, সাদা-কালো, ধর্ম-বর্ণ সকল শ্রেণীর মানুষ পেলো খাদ্য-বস্ত্র, শিক্ষা-চিকিৎসা ও আবাসনসহ রাতের আঁধারে দরজা খুলে নিরাপদে ঘুমাবার নিশ্চয়তা।

নবী করীম (সাঃ) তদানীন্তন সমাজের লোকদের এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এই দুনিয়ার জীবনটাই শেষ কথা নয়, আমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারিত জীবনের মেয়াদ শেষ হলে আমাদের মৃত্যু হবে এবং মৃত্যুর পর নির্ধারিত সময় কিয়ামত (বিচার দিবস) অনুষ্ঠিত হবে আর তখন আল্লাহর সম্মুখে আমাদের জীবনের সকল প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তথা কাজ ও লেন-দেনের বিষয়গুলোর পক্ষপাতহীন চুল-চেরা হিসাব হবে এবং এরই ভিত্তিতে ফয়সালা হবে জাহান্নামের কঠোর শাস্তি অথবা জান্নাতের অফুরন্ত সুখ ও শান্তি।

আজীবন মহাসত্যবাদী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এসব ওহী নির্ভর বক্তব্য শুনে সে সমাজের ভাগ্যবান ব্যক্তিরা নিজেদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলামী আদর্শের পতাকাতলে আশ্রয় নিয়েছেন। জীবন পরিচালনা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে লোহা পুড়ে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছেন। এই ছিলো বিশ্বনবীর সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পটভূমি। হযরত আবু বকর, ওমর, উসমান, আলী, খাব্বাব, খুবাইব, আম্মার, বিলাল (রাঃ)-এর মতো অসংখ্য পুতঃ পবিত্র চরিত্রের অধিকারী সাহাবায়ে কেরামের একটি টীম তৈরী হলো। তাঁদের নিয়ে নবী করীম (সাঃ) মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করলেন। প্রতিষ্ঠিত হলো জবাবদীহীমূলক সরকার। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান নীতির ভিত্তিতে সাদা-কালোর ব্যবধান দূরীভূত হলো।

জাতি-ধর্ম, দলমত, নারী-শিশু, বৃদ্ধ সকলেই তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝে পেলো। রইলো না আর মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ, দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও চৌর্যবৃত্তির শেষ ক্ষত চিহ্নটুকুও মুছে গেলো সমাজদেহ থেকে।

ইতিহাস সাক্ষী, পৃথিবীতে সর্বপ্রথম দুর্নীতি মুক্ত সমাজ-রাষ্ট্র উপহার দিয়েছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর ইন্তেকালের পর ক্ষমতায় এলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)। তিনি মদীনা রাষ্ট্রে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-কে প্রধান বিচারপতি পদে নিয়োগ প্রদান করলেন। ঐতিহাসিকরা লিখছেন-

বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের এক বছর পূর্ণ হবার পর হযরত ওমর (রাঃ) খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগের অনুমতি চাইতে গিয়ে বললেন, এ দেশে আদালত বা বিচারপতির কি প্রয়োজন? আমার দায়িত্ব পালনের আজ এক বছর পূর্ণ হলো। এই পুরো এক বছরে আমার কাছে কোনো দুই ব্যক্তি একজনের বিরুদ্ধে আরেকজন মামলা দায়ের করতে আসেনি। সুতরাং আমাকে পদত্যাগ পত্র জমাদানের অনুমতি দিন।

খলীফা প্রশ্ন করলেন, এর কারণ কি বলে মনে হয় আপনার কাছে? পুরো এক বছরে আপনার আদালতে একটি অভিযোগ পত্র বা একটি মামলাও কেনো দায়ের হলো না? জবাবে হযরত ওমর (রাঃ) যা বললেন তা নিম্নরূপ-

'হে খলীফা! আমার চিন্তায় আমি যেটা পেয়েছি তা হচ্ছে আপনি আমাকে এমন একটি জাতির বিচারপতি পদে নিয়োগ দিয়েছেন, যে জাতির দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হচ্ছে, পরস্পরের কল্যাণ কামনা করা। কারোও কোনো ক্ষতি হয়, অধিকার নষ্ট হয়, এমন কাজ এরা কেউ করে না। এমন কথাও এরা কেউ বলে না। আর তাদের সংবিধান হচ্ছে কোরআন। কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর দেয়া সকল আদেশ তারা মেনে চলে এবং কোরআনে বর্ণিত সকল নিষিদ্ধ কর্ম তারা তা বর্জন করে। তাদের রুটিন মাফিক কাজ হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে ভালো কাজের আদেশ দেয়া বা উৎসাহিত করা, আর সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। এ জাতির প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অন্যের অধিকারের সীমানা চেনে, তাই নিজের বা অন্যের অধিকারের সীমানা তারা কোনোক্রমেই অতিক্রম করেনা। এদের একজন অসুস্থ হলে অন্যেরা তার সেবায় এগিয়ে আসে। তাদের কেউ অভাবগ্রস্থ হলে অন্যেরা তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এমনকি সাময়িকভাবে কেউ কোনো সমস্যায় পড়লে তার সাহায্যের জন্যেও এ সমাজে লোকের অভাব হয় না। অতএব এই যখন একটি দেশের জনগণের জাতিয় চরিত্র, তখন কোন্ দুঃখে কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিচারকের দুয়ারে আসবে?'

পাঠক, এতক্ষণ যে বর্ণনা পড়লেন তা কোনো কল্প-কাহিনী নয়, এই ছিলো নবী

করীম (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুফল যা রাসূল (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বিবরণে জানতে পারলেন।

ব্যক্তিগত, দলগত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন লোকেরা আল্লাহ্ ও রাসূল নির্দেশিত আইনের প্রতি উদাসীন হয়, শয়তান তখন তাদেরকে অবৈধ ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপনের প্রতি আকৃষ্ট করে। মানুষ তখন পরকালের জবাবদীহীতা ভুলে গিয়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের সম্পদের ওপর লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করে রাক্ষসের মতো যা পায় অবলীলাক্রমে তাই গিলতে থাকে, বনও খায় জঙ্গলও খায়।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনে সবথেকে সফল রাষ্ট্র প্রধান বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)। তাঁর সফলতার মূল কারণ ছিলো তিনি মানুষকে ওহীর জ্ঞান দিয়ে তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি এবং পরকালে জবাবদীহীমূলক মানসিকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজও যদি সত্যিকার অর্থে আমরা দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র দেখতে চাই তাহলে সকল নাগরিকের এবং প্রশাসনের প্রত্যেক স্তরে কর্মরত লোকদের জন্যে নৈতিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, যেভাবে করেছিলেন নবী করীম (সাঃ)। এ জন্যে কোরআন মজীদে নিম্ন বর্ণিত মাত্র কয়েকটি আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন, অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণ ও চরিত্র গঠনে এ আয়াতসমূহের প্রভাব কতো সুদূর প্রসারী।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ-

নিঃসন্দেহে আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি তার মনের কোণে যে খারাপ চিন্তা উদয় হয় সে সম্পর্কেও আমি অবগত আছি। আমি তার ঘাড়ের রগ থেকেও তার অনেক কাছে (অবস্থান করি)। (সূরা কাফ-১৬)

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

মানুষ (ক্ষুদ্র) একটি শব্দও সে উচ্চারণ করে না যা সংরক্ষণ করার জন্য একজন সদাসতর্ক প্রহরী তার পাশে নিয়োজিত থাকে না। (সূরা কাফ- ১৮)

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحفظِيْنَ كِرَامًا مَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ-

তোমাদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করা আছে, এরা হচ্ছেন সম্মানীত লিখক (ফিরিশ্তা) তারা জানে তোমরা যা করছো। (সূরা ইনফিতর-১০-১২)

وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ، فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ، وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

তোমরা তোমাদের মনের মধ্যে যা কিছু আছে তা যদি প্রকাশ বা গোপন করো আল্লাহ তা'য়ালা (একদিন) তোমাদের কাছ থেকে তা (পুরোপুরি) হিসাব গ্রহণ করবেন, এরপর তিনি যাকে খুশী মাফ করবেন, যাকে ইচ্ছে শাস্তি দিবেন। আল্লাহ তা'য়ালা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (সূরা বাকারাহ্-২৮৪)

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰئِرَهُ فِىْ عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا

প্রত্যেকের ভালো-মন্দ কর্মলিপি আমি তার গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি, আমি তা কিয়ামতের দিন একটি কিতাব আকারে খুলে তার হাতে তুলে দিবো। তাকে বলা হবে আজ নিজের কর্মলিপি (এখন) নিজেই পড়ে দেখো। তুমি নিজেই নিজের হিসাব করার জন্য যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাঈল-১৩, ১৪)

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ–

আজ (কিয়ামতের দিন) আমি তোমাদের মুখের ওপর ছিপি এঁটে দিবো (তখন) তোমাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে, পা-গুলো (আমার কাছে) সাক্ষ্য দিবে এরা কি কাজ করে এসেছে। (সূরা ইয়াসীন-৬৫)

হযরত লূকমান (আঃ) তাঁর সন্তানকে ন'টি উপদেশ দিয়েছিলেন যা কোরআন মজীদে আল্লাহ তা'য়ালা উদ্ধৃত করেছেন। তন্মধ্যে একটি উপদেশ ছিলো এ রকম–

يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الْاَرْضِ يَاْتِ بِهَا اللّٰهُ، اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ–

হে প্রিয় বৎস! যদি তোমার কোনো আমল সরিষার দানা পরিমাণ (ছোটও) হয় এবং

তা যদি কোনো শিলাখন্ডের ভেতরে কিংবা আসমানসমূহেও (লুকিয়ে) থাকে অথবা (যদি তা থাকে) যমীনের ভেতরে তাও আল্লাহ্ তা'য়ালা (সামনে) এনে হাজির করবেন। আল্লাহ্ তা'য়ালা অবশ্যই সুক্ষ্মদর্শী এবং সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা লূকমান-১৬)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَه، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَه–

অতএব যে ব্যক্তি এক অনুপরিমাণ কোনো ভালো কাজ করে (সেদিন) তাও সে দেখতে পাবে। (ঠিক তেমনি) কোনো মানুষ যদি অনুপরিমাণ খারাপ কাজও করে সে তার (চোখের সামনে) তাও দেখতে পাবে। (সূরা যিলযাল- ৭-৮)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ السَّموتِ وَمَا فِى الاَرْضِ، مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوى ثَلْثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ اِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ اَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا، ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيمَةِ، اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ–

তুমি কি কখনো অনুধাবন করোনা যে আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা'য়ালা তা সবই জানেন। কখনো এমন হয় না যে তিন ব্যক্তির মধ্যে কোনো গোপন শলা-পরামর্শ হয় (সেখানে) চতুর্থ হিসেবে আল্লাহ্ উপস্থিত থাকেন না এবং পাঁচজনের মধ্যে (কোনো গোপন পরামর্শ হয় যেখানে) ষষ্ঠ হিসেবে আল্লাহ থাকেন না। (এ শলা-পরামর্শকারীদের সংখ্যা) এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক তারা যেখানেই থাকনা কেনো আল্লাহ্ তা'য়ালা সব সময়ই তাদের সাথে আছেন। অতঃপর কিয়মাতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের (সবাইকে) বলে দিবেন তারা কি কি কাজ করে এসেছে। (সূরা মুজাদিলাহ্-৭)

وَعِنْدَه مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا اِلاَّ هُوَ–وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَّرَقَةٍ اِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِىْ ظُلُمتِ الاَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَّلاَ يَابِسٍ اِلاَّ فِىْ كِتبٍ مُّبِيْنٍ–

অদৃশ্যের কুঞ্জি তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে ও স্থলে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে একটি পাতাও পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না অথবা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কেনো বস্তু নেই যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। (সূরা আনআম-৫৯)

মানব জীবনকে পরিচ্ছন্ন ও দুর্নীতি মুক্ত করার লক্ষ্যে এভাবে পরকালে জবাবদীহীতা এবং মৃত্যু পরবর্তী পরকালীন জীবন সম্পর্কিত যত কথা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন তা একত্রিত করলে গোটা কোরআন মজীদের এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ দশ পারার সমান হবে। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র জবানীতে সাহাবায়ে কেরাম এসব তথ্য জানতে পেরেছেন এবং সেভাবে জীবন গড়েছেন। এ কারণেই নবীর পরেই সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাসম্পন্ন অবস্থান। তাঁরাই ছিলেন বিশ্ব সভ্যতা নির্মাণের এবং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠনের সর্বোত্তম মূল স্থপতি। সমগ্র বিশ্বে তাঁদের কোনো তুলনা নেই। সুতরাং দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের জন্য কোনো দেশের মানব রচিত সংবিধান অনুসরণের চিন্তা-চেতনা হবে চরম আত্মঘাতমূলক নির্বুদ্ধিতা।

আইন যতোই কঠোর থেকে কঠোরতর হোক, শাস্তি যতোই প্রলম্বিত ও লোমহর্ষক হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনের গহীনে আল্লাহভীতি সৃষ্টি না হবে, পরকালে জবাবদীহীতার মানসিকতা সৃষ্টি না হবে ততদিন দুর্নীতি সমূলে নির্মূল করা আদৌ সম্ভব নয়। এখানে অপরাধমুক্ত সমাজ-রাষ্ট্রের স্বর্ণালী ইতিহাসের আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই।

নবী করীম (সাঃ)-এর শেষ যুগে মদীনা থেকে এক সুন্দরী যুবতী মেয়ে কোনো এক আত্মীয় বাড়িতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছে। পথিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। নির্জন মরুভূমিতে একাকিনী যুবতী মেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পদে দ্রুত তার গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। তাঁর মনে শঙ্কা ছিলো যদি এই মুহূর্তে কোনো পর পুরুষের সম্মুখে আমি পড়ে যাই তাহলে আমার অলঙ্কারাদী তো ছিন্তাই হবেই সেই সাথে নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্বও লুণ্ঠিত হবে। হঠাৎ যুবতীর দৃষ্টি গোচর হলো, দূর থেকে এক সুদর্শন যুবক তার দিকেই এগিয়ে আসছে। যুবতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় হতবিহ্বল হয়ে বসে পড়লো। ইতোমধ্যে যুবকটি তাঁর সম্মুখে এসে যুবতীর রক্তশূন্য ফ্যাকাশে ভয়বিহ্বলা চোখের ওপর চোখ রেখে বিনয়ের সাথে বললো, 'মা! তুমি ভয় পাচ্ছো কেনো! তুমি কোথায় যাবে আমাকে বলো মা, আমি নিরাপদে পাহারা দিয়ে তোমাকে তোমার গন্তব্যে পৌঁছে দিবো। আমাকে দিয়ে তোমার কোনো অনিষ্ট হবে না। আমার পরিচয় শোনো, আমি মুসলমান।' এই ছিলো নবী করীম (সাঃ)-এর রক্ত ও সাহাবায়ে কেরামের জীবন দিয়ে গড়া ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস।

ইতিহাসে বর্ণিত এই যুবক আইনের শাসনের প্রতি সম্মান দেখিয়ে বা কঠোর শাস্তির ভয়ে ঐ যুবতীর সাথে অনৈতিক আচরণ করা থেকে বিরত থাকেনি। কারণ সেখানে কোনো অঘটন ঘটলে তার সাক্ষীও কেউ থাকতো না এবং বিচারও হতো না। এ যুবকের হাতের মুঠোয় পাওয়া মহাপাপ থেকে যে শক্তি তাকে রক্ষা করলো তার নাম 'আল্লাহর ভয়'। সুতরাং কেউ না দেখলেও আল্লাহর অতন্দ্র দৃষ্টিকে ফাঁকি দেয়া যাবে না। এই মানসিকতা সৃষ্টির পূর্বে শতভাগ দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ আশা করা আকাশ কুসুম পরিকল্পনা বৈ আর কিছুই নয়।

হযরত আলী (রাঃ) কত সুন্দর কথাই না বলেছেন, 'যখন তুমি একাকীত্বে থাকবে তখন আল্লাহ্ তা'য়ালাকে আরো বেশী ভয় করবে। কারণ ঐ সময় তোমার কৃত অপরাধের যিনি সাক্ষী তিনিই হবেন কিয়ামতে তোমার বিচারক।'

পৃথিবীর ইতিহাস এমন একটি ঘটনাও পেশ করতে পারবে না, যেখানে কোনো আল্লাহভীরু প্রকৃত অর্থে মুসলমান নিজের পক্ষ থেকে হিংসা, জিঘাংসা, রক্তপাত, মারামারি বা যুদ্ধের জন্ম দিয়েছে। মক্কা থেকে হিজরতকারী মুহাজিররা মদীনার আনসারদের সাথে গভীর মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, অথচ ঈমান ব্যতীত তাঁদের মধ্যে অন্য কোনো আত্মীয়তার যোগসূত্র ছিলো না। ইতিহাসে আদর্শের শক্তি ও প্রভাবের এটাই একক ও অসাধারণ দৃষ্টান্ত। মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্র পরস্পরের প্রাণের দুশমন ছিলো। এক গোত্র অপর গোত্রের পরম আপনজনকে হত্যা করেছিলো। অঢেল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেও তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করা সম্ভব ছিলো না এবং মমতার বাগডোরে তাদেরকে বাঁধা সম্ভব ছিলো না। কিন্তু একমাত্র আল কোরআনই তাদের হৃদয় থেকে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও হিংসা দূর করে দিয়ে গভীর মমতার বন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলো। মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনসারদের মধ্যে এবং পরস্পরের প্রতি চরম বৈরীভাবাপন্ন মদীনার আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে শুধুমাত্র কোরআনের কারণে ভ্রাতৃ-সম্পর্ক এমনই শক্তিশালী সম্পর্কের রূপ নিয়েছিলো, যার সামনে রক্তের সম্পর্কও নিষ্প্রভ এবং পৃথিবীর যাবতীয় বন্ধুত্বই ম্লান ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিলো। পৃথিবীর জাতিসমূহের ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় অনুসন্ধান চালালেও এই ধরনের নিঃস্বার্থ প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না।

একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূলের সামনে তাঁদের গোপন ভুল-ভ্রান্তির কথা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য করতো এবং হঠাৎ ঘটে যাওয়া প্রাণদন্ড তুল্য সংঘটিত অপরাধের শাস্তি গ্রহণের জন্য নিজেকে পেশ করতে বাধ্য করতো।

নিজের অজান্তে কোনো সময় শয়তানের কুমন্ত্রণায় তাঁদের দ্বারা ভুল-ভ্রান্তি সংঘটিত হয়েছে আর এর সুযোগ তখন ঘটেছে যখন কোনো মানব চক্ষু তা অবলোকন

করেনি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে আইনের ধারা-উপধারা গ্রেফতার করতে অক্ষম হয়েছে, এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ই তখন তীব্র ভাষায় তাঁকে তিরস্কার করেছে। আল্লাহর ভয়ের রশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পা এমনভাবে বেঁধেছে যে, সে ব্যক্তি চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

আল্লাহর ভয় তাঁর মন-মস্তিষ্কে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাঁর ভেতরে গোনাহর স্মরণ ও পরকালের শাস্তির বিষয়টি এমন পীড়াদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে, তাঁর জীবন থেকে শান্তি ও স্বস্তি বিদায় গ্রহণ করেছে। শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য হয়ে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে সোপর্দ করে গোপনে সংঘটিত অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে কঠিন দন্ড ভোগের জন্য নিজেকে পেশ করেছে। এরপর নির্ধারিত চরম দন্ড সে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়ে এবং হাসি মুখে দন্ড ভোগ করেছে যেন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তির মোকাবেলায় পৃথিবীতেই শাস্তি ভোগ করে হাশরের ময়দানে অপরাধ মুক্ত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে পারে। আল্লাহর ভয়ই ছিলো তাঁদের আমানত, সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা ও মহত্ত্বের প্রহরীস্বরূপ।

প্রকাশ্যে-গোপনে, নীরবে-নির্জনে ও জনসমাবেশে আল্লাহর ভয়ই ছিলো অতন্দ্র প্রহরী। যেখানে দেখার মতো কেউ থাকতো না। এমন নীরব নির্জন স্থান যেখানে একজন মানুষের পক্ষে যা খুশী তাই করার পূর্ণ সুযোগ থাকতো, যেখানে কেউ দেখে ফেলবে এই ভয় ছিলো না, সেখানেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ই তাঁদের নফস তথা প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কামনা-বাসনাকে পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়ের ইতিহাসে সততা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ও নিষ্ঠার এমন সব ঘটনা বিদ্যমান যে, মানবেতিহাসে এর কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহ ও পরকাল ভীতির কারণেই এসব কিছু সম্ভব হয়েছিলো।

ইতিহাসে উল্লেখ করা হয়েছে, মুসলিম বাহিনী পারস্যের তদানীন্তন রাজধানী মাদায়েনে যখন উপস্থিত হয়েছিলো, তখন সাধারণ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। পারস্য সম্রাটের ধন-রত্ন সংগ্রহ করে একজন হিসাব রক্ষকের কাজে জমা দেয়া হচ্ছিলো। একজন মুসলিম সৈন্য সবথেকে মূল্যবান ধন-রত্নের স্তুপ এনে যখন হিসাব রক্ষকের কাছে জমা দিলো তখন উপস্থিত লোকজন তা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, 'এই লোক যে মূল্যবান ধন-রত্ন এনেছে তা আমরা কখনো দেখিনি। আমাদের সকলের সংগ্রহ করা সম্পদের তুলনায় এই লোকের একার সংগ্রহ করা সম্পদ অধিক মূল্যবান।' এরপর একজন লোক সেই লোককে প্রশ্ন করলো, 'ভাই, তুমি এসব মূল্যবান ধন-রত্ন থেকে কোনো কিছু নিজের জন্য কোথাও সরিয়ে রেখে আসনি তো?'

লোকটি আল্লাহর নামে শপথ করে বললো, 'বিষয়টি যদি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত না হতো তাহলে এসব মূল্যবান ধন-রত্ন সম্পর্কে তোমরা কোনো সংবাদই জানতে পারতে না। সবটাই আমি সরিয়ে ফেলতাম।'

লোকজন স্পষ্ট অনুধাবন করতে পারলো, এই লোক যা বলছে তার একটি শব্দও অসত্য নয়। তাঁর নাম-পরিচয় জানতে চাওয়া হলে সে জানালো, 'আমি আমার নাম ও বংশ পরিচয় প্রকাশ করলে তোমরা আমার প্রশংসা করবে, অথচ প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য। তিনি যদি আমার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে কোনো বিনিময় দিতে চান তাহলে আমি তাতেই সন্তুষ্ট।' কথা শেষ করে লোকটি যখন চলে গেলো, তখন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে লোকটির পরিচয় জানা গেলো যে, লোকটি ছিলো আবদে কায়স গোত্রের লোক এবং তাঁর নাম ছিলো আমের। (তারীখে তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬)

আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার পরে তাঁরা মহান আল্লাহর গোলামীর এক সুনির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে এমনভাবে প্রবেশ করেছিলেন যে, তাঁদের জন্য ঈমান যে বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো, সেই বৃত্তের বাইরে আসা কল্পনারও অতীত হয়ে পড়েছিলো।

তাঁরা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর ক্ষমতা মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং অনুগত প্রজা, ভৃত্য ও গোলাম হিসাবে জীবন পরিচালিত করতেন। তাঁরা পরিপূর্ণভাবে মহান আল্লাহর সমীপে নিজেদের আমিত্ব, নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর বিধানের সামনে নিঃশর্তে আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দিয়েছিলেন এবং নিজেদের কামনা-বাসনাকে ঈমানের রঙে রঙিন করে নিয়েছিলেন। তাঁরা এমনভাবে ঈমান এনেছিলেন যে, নিজেদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ, শক্তি-মত্তা, বীরত্ব, নেতৃত্ব, জ্ঞান-বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতার মালিক মনে করতেন না এবং এগুলো নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে ব্যবহারও করতেন না। তাঁদের প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, শত্রুতা, আত্মীয়তা, অনুরাগ-বিরাগ, লেন-দেন, কারো সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ছিন্নকরণ সকল কিছুই মহান আল্লাহর ভয়ের অধীন করে দিয়েছিলেন।

তাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দন ঈমানের দাবি অনুসারে স্পন্দিত হতো। তাঁরা নিশ্বাস গ্রহণ করতেন ঈমানের দাবী অনুসারে এবং তা ছাড়তেনও ঈমান নির্দেশিত পন্থায়। ঈমানের বিপরীত জীবনধারা সম্পর্কে তাঁরা খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, কারণ তাঁরা জাহিলিয়াতের ছায়াতলেই বর্ধিত হয়েছিলেন। এ কারণে তাঁরা ঈমানের মর্ম সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন, ঈমান আনার অর্থই হলো এক জীবন থেকে অন্য জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়া। একদিকে মানুষের প্রভুত্ব ও অন্য দিকে মহান আল্লাহর গোলামী। তাঁরা অুনধাবন করেছিলেন,

ঈমান আনার অর্থই হলো আমিত্বের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে একমাত্র আল্লাহর গোলামীকে কবুল করতে হবে। 'আমি যখনই ঈমানের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তখনই আমার আমিত্ব বা মতামত বলতে অবশিষ্ট কিছু নেই। স্বেচ্ছাচারিতামূলক কোনো কাজ আর করা যাবে না। ঈমান আনার পরে আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় আমার নিজস্ব ক্ষমতা বলতে আর কিছুই নেই'।

ঈমান আনার পরে রাসূলের সিদ্ধান্তের মোকাবেলায় কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা যাবে না। ঈমানের বিপরীত বিধানের সামনে কোনো মামলা-মোকদ্দমা পেশ করা যাবে না বা নিজের ইচ্ছানুসারে কোনো সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহর বিধানের মোকাবেলায় সমাজ ও দেশে প্রচলিত কোনো প্রথার অনুসরণ করা যাবে না। ঈমান আনার পরে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না বা আত্মপূজায় নিমগ্ন থাকা যাবে না। এসব দিক তাঁরা ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন বলেই যখনই তাঁরা ঈমান এনেছিলেন, তখনই জাহিলিয়াতের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, আচার-আচরণ, নীতি-পদ্ধতি ও অভ্যাস পরিত্যাগ করে ইসলামকে তার সর্বপ্রকার বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় বিষয়াদিসহ গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাঁদের জীবনে এক পরিপূর্ণ বিপ্লব সাধিত হয়েছিলো। হযরত ফুযালা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করার পরে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। ইতোপূর্বে তাঁর সাথে এক মহিলার সম্পর্ক ছিলো। পথে সেই মহিলার সাথে দেখা হলে মহিলা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলো। হযরত ফুযালা (রাঃ) সেই মহিলাকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, 'এখন আর সেই সুযোগ নেই, আমি ঈমান এনেছি। আমি আল্লাহর গোলাম, এখন আর তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হবার কোনো অবকাশ নেই।' (যাদুল মা'আদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৩২)

আল্লাহ ও পরকাল ভীতি তাঁদের মধ্যে মানবতার সকল শাখা-প্রশাখা ও সৌন্দর্যের প্রত্যেক দিক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ও দৃশ্যমান করেছিলো। তাঁরা যেখানে যে অবস্থাতেই থাকতেন এবং যেখানেই যেতেন, সেখানে নীতি-নৈতিকতার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। তাঁরা শাসক হিসাবেই থাকুন অথবা রাষ্ট্রের একজন কর্মচারী হিসাবে, তাঁদের সর্বদাই সংযত, শুচি-শুভ্র, চরিত্রবান, আমানতদার, বিনয়ী, সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি হিসাবেই দেখতে পাওয়া যেতো। প্রতিপক্ষ তাঁদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো, 'রাতে তাঁদেরকে দেখতে পাবে যেন পৃথিবীর সাথে তাঁদের কোনো সম্পর্কই নেই এবং ইবাদাত-বন্দেগী ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো কাজই নেই। আর দিনের বেলা দেখতে পাবে, রোযাদার হিসাবে ও প্রতিজ্ঞা পালনকারী হিসাবে। তাঁরা মানুষকে সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখে। নিজেদের বিজিত এলাকায়ও তাঁরা মূল্য প্রদান করে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করে খায়। কোথাও প্রবেশ

করতে হলে সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করে এবং যুদ্ধের ময়দানে এমন দৃঢ় ও সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে যে, শত্রুকে পরাজিত করেই যুদ্ধে বিরতি দেয়। নিজেদের মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার করে আর সাম্যের পরিচয় দেয়। দিনের বেলা তাঁরা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন এবং মনে হবে যে, শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করাই যেন তাঁদের একমাত্র কাজ।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৩)

আল্লাহর ভয়ই এভাবে তাঁদের গোটা জীবনে পরিপূর্ণ এক বিস্ময়কর বিপ্লব সাধন করেছিলো। আল্লাহ ও পরকাল ভীতির ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে সেই কল্যাণ ও মঙ্গলের সৌরভে সুবাসিত মানব সমাজ ও রাষ্ট্র, যে সমাজ ও রাষ্ট্র পৃথিবীর বুকে নবী করীম (সাঃ) মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন। আজও পৃথিবীর মানুষ যাবতীয় দুর্নীতি শোষণ-লুন্ঠন, নির্যাতন-নিপীড়ন, অন্যায়-অত্যাচার, নির্যাতন, নিষ্পেষন থেকে মুক্তি লাভ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী, নিরাপত্তাপূর্ণ, শোষণমুক্ত- ভীতিহীন সমাজ ও রাষ্ট্র লাভ করতে সক্ষম হবে, যদি আল্লাহর ও পরকাল ভীতিকে নিজেদের চারিত্রিক ভূষণে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

আল্লাহ ও রাসূলকে বাদ দিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সেনাবাহিনীই নয়, সমগ্র দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশের সকল বাহিনী একত্রিত হয়ে অভিযান পরিচালিত করলেও দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সেই সমাজ-রাষ্ট্র পাওয়া সম্ভব নয়, যে স্বর্ণালী সমাজ-রাষ্ট্র নবী করীম (সাঃ) শুধু মাত্র আল্লাহ ও পরকাল ভীতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলাবাহুল্য, দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ গঠনের সেটাই একমাত্র সর্বোত্তম মূলনীতি, যে মূলনীতি নবী করীম (সাঃ) বাস্তবায়ন করেছিলেন।

যে কোনো ব্যধির মূল উৎস খুঁজে বের করতে না পারলে এলো-পাথাড়ি চিকিৎসায় রোগ নির্মূল না করে নতুন জটিলতাই সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যধির মূল কারণ নৈতিকতার ধ্বংস। পরকালে জবাবদীহীতার প্রতি উদাসীনতা, আল্লাহ ও রাসূলের বিধান সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা। এ মহাসঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সকল পর্যায়ের পতিটি দায়িত্বশীল তার নিজস্ব পরিমন্ডলে নিজে ভালো হবার ও অন্যকে ভালো বানাবার চেষ্টা অব্যহত রাখতে হবে। সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে নিজে বাঁচতে হবে অন্যকেও দুর্নীতি থেকে বিরত রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা নিরন্তর চালাতে হবে। এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় আনতে হবে আমূল পরিবর্তন, যাতে করে শিশু তার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে নিজের মধ্যে নৈতিক মূলবোধের সৃষ্টি করতে পারে। মনে রাখতে হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। এ ক্ষেত্রে অমুসলিম শিক্ষার্থীদের বেলায় তাদের ধর্ম শিক্ষাও বাধ্যতামূলক করা উচিত।

কারণ ধর্মীয় মূল্যবোধ ছাড়া মানুষের চরিত্র ভালো করার অন্য কোনো পথ খোলা নেই। অন্যথায় নিম্ন বর্ণিত হাদীসের সতর্ক বাণীর প্রতি লক্ষ্য করুন–

হযরত হোযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমরা পরস্পরকে অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ করবেই এবং অন্যায় কাজের নিষেধ বা প্রতিরোধ করবেই। যদি তোমরা এ দায়িত্ব পালন না করো তাহলে তোমাদের মধ্যের সব থেকে দুষ্ট (কঠোর প্রকৃতির) লোকদের তোমাদের শাসক বানিয়ে দেয়া হবে। তখন তোমাদের নেককার লোকেরা এ অবস্থা থেকে নিস্তার লাভের জন্য যত দোয়াই করুক, আল্লাহর দরবারে তা মঞ্জুর হবে না।' (তিরমিযী)

পরিশেষে আমাদের বর্তমান বিপর্যয়ের কারণ সমূহের মধ্যে এখানে আমি মৌলিক তিনটি কারণ উল্লেখ করতে চাই ঃ–

একঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআন থেকে বিচ্যুতিঃ যে কোরআন মুসলমানদের শক্তির উৎস, যে কোরআন মুসলমানদেরকে দুনিয়ার নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে ছিলো, বিগত দুই হাজার বছরের প্রায় ১২শ বছর ধরে পরিচিত বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশী এলাকা শাসন করিয়েছিলো, সেই কোরআনের সাথে তাদের সম্পর্ক শুধু সওয়াবের নিয়তে না বুঝে তিলাওয়াত করা ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।

কোরআনের আলোকে জীবন গঠন, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও রাজনীতিসহ জীবনের বিশাল অঙ্গন থেকে কোরআনকে বিসর্জন দেয়া হয়েছে।

দুইঃ রাসূল (সাঃ)-এর নেতৃত্বের প্রতি দুর্ভাগ্যজনক বিমুখতাঃ আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন–

وَمَا ءَاتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا–

তোমাদের রাসূল তোমাদের জন্য যা কিছু আনয়ন করেছেন তা গ্রহণ করো আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর- ৭)

আল কোরআন থেকে মুখ ফেরানো এবং তাঁর প্রিয় রাসূলকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে অনীহা, যা মুসলিম উম্মাহকে গোমরাহ করে অধঃপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে।

তিনঃ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতি অনীহাঃ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের সকলকেই তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জবাবদীহী করতে হবে।' (বোখারী)

এ হাদীস অনুযায়ী দেশের রাষ্ট্র প্রধান- সরকার প্রধান থেকে শুরু করে গৃহকর্তা পর্যন্ত সকলকেই কিয়ামতের কঠিন বিচার দিবসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালকদের দায়-দায়িত্ব সর্বাধিক। এ বিষয়ে আল্লাহ

তা'য়ালাকে বেশী ভয় করা প্রয়োজন। ক্ষমতা আছে বলেই জনগণকে নিজের ইচ্ছে মতো পরিচালনার এখতিয়ার কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ্ তা'য়ালার অমোঘ বিধানে গতকাল পর্যন্ত যিনি প্রভাবশালী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রী ছিলেন আজ তিনি কয়েদখানার আসামী; এসব দৃষ্টান্ত চোখে দেখার পরও যেসব রঙ্গীন চশমাধারী ক্ষমতা লোভীদের শিক্ষা হয়না, এসব জাত পাগলদের হিদায়াত কি করে হবে?

ইসলামী বিধান অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অথচ এ ক্ষেত্রেও রয়েছে মুসলিম নামধারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে চরম বিতর্ক এবং এসব ব্যক্তিবর্গ হচ্ছেন তাঁরা, যেসব ব্যক্তিবর্গ সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসা-বাণিজ্য ও এনজিওর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং শক্তিশালী মিডিয়াগুলোরও নিয়ন্ত্রণকারী। দেশ ও জাতির এ নৈতিক অবক্ষয়ের ক্রান্তিলগ্নে ক্ষমতাসীনদের উচিৎ দেশের রাজধানী থেকে শুরু করে সকল জেলা-উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যন্ত সকল উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোয় সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভার আয়োজন করে জনগণকে কোরআন-হাদীসের দৃষ্টি ভঙ্গিতে নৈতিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। আর প্রচার মাধ্যমকেও এ কাজে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে।

লক্ষ্যণীয়, যে কোনো মুসলিম দেশের তুলনায় আমাদের দেশের মহিলারা এখনো পর্দা কম করেন না, বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি কিশোর, তরুণ-যুবকদের আদব-কায়দা, ভক্তি-শ্রদ্ধা একেবারে কমে যায়নি। জুমুআ'র দিন মসজিদসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থান সঙ্কুলান হয় না। মানুষের মৌলিক মানবিক গুণাবলী এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। নৈতিক অবক্ষয়ের প্রলয়ঙ্করী ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে এখনো উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ সমাজে অবশিষ্ট থাকার মূল কারণ হলো, দেশের তিন লক্ষাধিক মসজিদের ইমামদের প্রতি জুমুআ'য় প্রদত্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য। মাদ্রসাসমূহে মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা, দেশব্যাপী ওলামা-মাশায়েখদের ওয়াজ মাহফিল, তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল ও সর্বোপরি দ্বীনি সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। কোনো দুষ্ট চক্রের কুপরামর্শে এসব দ্বীনি কর্মতৎপরতা বন্ধ করে দেয়ার চাতুর্য্য অবলম্বন করা হলে তা হবে দেশ ও জাতির জন্য সুদূর প্রসারী আত্মঘাতী।

আমাদের দেশ একেবারেই হত-দরিদ্র দেশ নয়। আমাদের রয়েছে আবাদযোগ্য বিশাল কৃষি ভূমি, গবাদী সম্পদ, বনজ সম্পদ, গ্যাস সম্পদ, পানি সম্পদ, মৎস সম্পদ, খনিজ সম্পদ সর্বোপরি ১৪কোটি মানব সম্পদের ২৮ কোটি কর্মক্ষম হাত। অভাব যা তা শুধু সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের। এ অভাব পূরণ করতে পারলে আমাদের দেশ হতে পারতো মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের মতো।

ওষুধ যতোই খাঁটি হোক সেবন না করলে রোগ নিরাময়ের কোনো সম্ভাবনা নেই। অনুরূপভাবে নসীহত যতোই বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত এবং মণি-মুক্তা সদৃশ মূল্যবান হোক, তা আমল না করলে কোনো লাভ নেই। মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে মহাসত্য অনুধাবন করে তা অনুসরণের তাওফীক দিন— আমীন।

ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সঙ্কটের নেপথ্যে

মানুষ তার হৃদয় অভ্যন্তরে যে চেতনা স্বযত্নে লালন করে বাহ্যিক আচরণ ও বাস্তব কর্মে তারই প্রকাশ ঘটে। সাময়িক এর ব্যতিক্রম ঘটলেও মানুষ তার চেতনার মূলেই ফিরে আসে এবং আসতে সে বাধ্য। কারণ হৃদয় অভ্যন্তরে লালিত চেতনাই মানুষকে তার নিজের অজান্তেই মূলে ফিরিয়ে এনে চেতনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করে। প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতার স্রোত ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাজার শতাব্দীবাহিত পৌত্তলিক চেতনা ভাসিয়ে নিয়ে তদস্থলে পরমত সহিষ্ণুতার ভিত রচনা করবে, ধর্মনিরপেক্ষ দেশসমূহে সাম্প্রদায়িকতার বিভৎস কদাকার চেহারা দেখে উক্ত আশা পোষণকারীদের সম্পূর্ণ নিরাশ হতে হয়েছে। শুধু ভারতেই নয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা গ্রহণকারী দেশসমূহে সাম্প্রদায়িক চেতনা লালনকারীদের হৃদয়ে পরমত সহিষ্ণুতা সামান্য আঁচড়ও কাটতে পারেনি।

যে ইউরোপের মাটিতে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম, সেখানে ইসলাম আর মুসলমানের নাম শুনলেই তাদের গাত্রদাহ শুরু হয়। ডেনমার্কের আদালত নবী করীম (সাঃ) ও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কটুক্তি করা বৈধ বলে রায় দিয়েছে। মুসলিম নারীর হিযাব পরিধানের ব্যাপারে ইউরোপীয়দের প্রবল আপত্তি। ইউরোপের মাটিতে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া হবে না বলে তারা ঘোষণা দিয়েছে।

ইউরোপ ও আমেরিকায় ধর্মভীরু মুসলমানরা বিদ্রুপের পাত্র, মসজিদসমূহেও আক্রমণ করা হয়েছে, গোয়ান্তানামো-বে কারাগারসহ বিভিন্ন স্থানে পবিত্র কোরআনের অবমাননা করা হয়েছে। আমেরিকায় ইয়াহূদী যুবক তার ধর্মের শ্লোগান দিতে গিয়ে খৃষ্টান যুবকদের দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়েছে। সন্ত্রাসের অজুহাতে ইসলামের পক্ষে মুসলমানদের সকল তৎপরতা সঙ্কুচিত করা হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্রুপাত্মক নানা ধরনের কার্টুন ও চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

ভারতে পবিত্র কোরআন বাতিল করার দাবীতে আদালতে মামলা দায়ের করা ও ঈদের মাঠে শূকর ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের অবমাননা করা হয়েছে। মাইকে আযান নিষিদ্ধ করা ও কল্পনা নির্ভর বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে কয়েক শতাব্দীর পুরনো বাবরী মসজিদ প্রবল আক্রশে ধ্বংস করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িক উন্মাদনায় তাড়িত হয়ে প্রায়ই সংখ্যালঘুদের হত্যা, ধর্ষন, লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ ভারতের নিত্য- নৈমিত্তিক ঘটনা। ইসলাম ও মুসলমানদের অবমাননাধর্মী চলচ্চিত্র নির্মাণে আমেরিকার হলিউডের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে ভারতের বলিউড। ময়ূর পুচ্ছের আবরণ দিয়ে কাকের পুঁতিগন্ধময় ভাগাড়ে বিচরণের স্বভাব যেমন পরিবর্তন করা যায় না, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে মুসলিম বিদ্বেষী সাম্প্রদায়িকতার উগ্র চেতনাও

আবৃত রাখা যায়নি। ইউরোপ, আমেরিকা ও ভারত ভূমিতে ইসলাম বিদ্বেষী চেতনা ক্রমশ বিভৎস কদাকার অবয়বে দৃশ্যমান হচ্ছে।

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ নামক এ ভূখন্ডেও বাঙ্গালী চেতনার আড়ালে ধর্মনিরপেক্ষতার ছদ্মাবরণে ইসলাম মূলোৎপাটন তৎপরতা বর্তমানে একটি কঠিন পর্যায় অতিক্রম করছে। এদেশের মানুষকে সরাসরি পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যবাদ গেলানো দুঃসাধ্য অনুভব করে মাসোহারা প্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্বে লিপ্ত স্বজাতিদ্রোহীদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধুনিক সংস্করণ 'বাঙ্গালী চেতনা' বাংলাদেশীদের গেলানোর বিরতিহীন চেষ্টা চালানো হচ্ছে। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ব ও পরবর্তী প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতার প্রত্যেক স্তরে মাসোহারা প্রাপ্ত কাঙ্খিত সেবকদের বসানো হলেও তথাকথিত 'বাঙ্গালী চেতনা' বিজয়ের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে তারা ইসলামী চেতনার হিমালয়সম উচ্চতার সম্মুখে বার বার হোঁচট খেয়েছে।

দেশের বিভিন্ন স্তরে প্রভাব প্রয়োগকারী আসনে উপবিষ্ট উচ্চ ডিগ্রীধারী উচ্ছিষ্ট ভোগীদের মাধ্যমে দেশ ও জাতীয় অনিষ্টকর পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়ে, 'আবহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতির' নামে পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ্যবাদী উলুধ্বনী, মঙ্গল প্রদীপ ও মোমবাতি প্রজ্জ্বলন, রাখি বন্ধন, রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে ধারণ, শিখা চিরন্তন, অগ্নির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যত্রযত্র ভাস্বকর্যের নামে মূর্তি স্থাপন, পহেলা বৈশাখে নারীর নগ্ন বাহুমূলে উল্কি অঙ্কন, ললাট চন্দন চর্চিতকরণ, বাসন্তী রঙের শাড়ী অঙ্গেধারণ, পান্তাভাতের নৈবদ্য সাজিয়ে শঙ্ক ধ্বনি দিয়ে অতিথিরূপী নারায়ণ সেবাকরণ, মৃদঙ্গ, করতাল, ঢোলবাদ্যে পূজা- অর্চনার মাধ্যমে জন্তু- জানোয়ারের মুখোশ পরিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত নারী-পুরুষের ঢলাঢলি ও বেহায়া অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন, পুজারী- পুজারিণীদের দ্বারা বন্দনাগীতির মাধ্যমে আরতি এবং রবীন্দ্র সরোবরে স্নান করিয়েও যখন এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের হৃদয় থেকে ইসলামী ও বাংলাদেশী চেতনা মুছে দিয়ে কথিত 'বাঙ্গালী চেতনা' প্রতিস্থাপন করা গেলো না, তখন তারা সুশীল নামক আরেকটি শ্রেণীর মাধ্যমে কাঙ্খিত কর্মযজ্ঞের সমাপ্তি রেখা টানার উদ্দেশ্যে ২০০৭ সালে ১/১১ এর সূচনা করে বিভিন্ন ধরণের নীতিমালায় দেশ ও জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বিশ্ব মোড়লের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'বাঙ্গালী চেতনা' গেলানোর রোডম্যাপ বাস্তবায়নে পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করার দূরহ কাজে মাসোহারা প্রাপ্ত সেবকদের মঞ্চে নামিয়েছে।

দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান সেবক শ্রেণী মুসলিম চেতনা ধ্বংসের লক্ষ্যে তীক্ষ্ণ দন্ত-নখর বিস্তার করে 'জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী' শক্তিকে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করলো। মুসলিম চেতনা লালনকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বিভ্রান্ত করার

উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী চেতনার ধ্বজাধারীদের গায়ে মাঝে মধ্যে আঁচড় কাটলেও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের কাছে ক্ষমতার মসনদে আসীন ক্রীড়নকদের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন ছিলো না। 'মুসলিম বনাম বাঙ্গালী চেতনার সংঘাতে' উক্ত রোডম্যাপ বাস্তবায়নে সেবক গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী চেতনার ধ্বজাধারীদের বিজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেনাপতির ভূমিকা পালন করবেন, তা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছিলো এবং বর্তমানে তারা অবগুণ্ঠন সরিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশির্বাদধন্য গোষ্ঠীর প্রতি পরম সুহৃদমূলক আচরণ প্রদর্শনে নিজেরা কোন্ পক্ষের তা সমগ্র জাতির কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

ইসলামী মূল্যবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বাংলাদেশী সংস্করণ 'বাঙ্গালী চেতনা'- এ দুই চেতনার মধ্যে একটি মরণপন সংঘাত যে আসন্ন তা বিগত নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় বাম ও ধর্মনিরপেক্ষদের অসহিষ্ণু আচরণেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। স্বকীয় চেতনার পতাকাবাহী জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ২০০৫ সালের ১৫ই মার্চ জাতীয় সংসদে যখন অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছিলেন, 'বাংলাদেশ কারো চোখ রাঙানিকে ভয় করে না, বাংলাদেশ কারো নির্দেশে চলবে না, স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের নিজস্ব আইন ও সংবিধান রয়েছে। রয়েছে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের মতো। এখানে সাহায্য বা পরামর্শের আড়ালে বিদেশীদের নাক গলানো চলবে না।' জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'আমাদের উন্নয়ন কর্মসূচীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পারলে তারা বাংলাদেশ থেকে চলে যেতে পারে।'

স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বজায় রেখে স্বকীয় চেতনায় বলীয়ান হয়ে আত্মমর্যাদা সহকারে পথচলার উক্ত ঘোষণায় বাঙ্গালী চেতনার উদ্‌গাতা এবং ধ্বজাধারীরা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির হিংসাত্মক উপাত্ত উপকরণ সংগ্রহ করে তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে গেলো। পর্দার অন্তরালে অবস্থান করে জোট সরকার ক্ষমতা ছাড়ার পর থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তরণ ঘটানোর ধ্বংসাত্মক উপকরণ যারা সরবরাহ করছিলো, ২০০৫ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তাদের কথা ও তৎপরতার প্রতি দৃষ্টি দিলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায়, বাংলাদেশে তারা কোন্ চেতনার বিজয় এবং কোন্ শক্তিকে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন দেখতে আগ্রহী।

২০০৫ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিসা রাইস ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ অত্যন্ত সমস্যাপূর্ণ রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এ ক্ষেত্রে ভারতকে সহযোগী হিসেবে সাথে রাখবে।' সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের

দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রিষ্টিনা রোকা মার্কিন কংগ্রেসের এক শুনানিতে বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা সমস্যার কথা তুলে ধরে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।' বাংলাদেশে নিযুক্ত তদানীন্তন মার্কিন রাষ্ট্রদুত হ্যারি কে. টমাসও নানা ধরণের কৌশলী কথার মধ্য দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সৃষ্টির ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙ্গালী চেতনা বাস্তবায়নকামী দলটির নেত্রীর সাথে দীর্ঘ বৈঠকও করেছিলেন। সে সময় বিদেশী অর্থে পরিচালিত সুশীলদের কয়েকটি সংগঠন ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত পত্রিকাসমূহও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ইঙ্গিতবহ সংবাদ পরিবেশন করছিলো।

উক্ত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী চেতনার পতাকা বহনকারীদের পরাজিত করে বাঙ্গালী চেতনাকে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠন করানো হলো ১৪ দলীয় মহাজোট। এরপর জরীপ চালিয়ে নির্বাচনে চারদলীয় জোটের মোকাবেলায় তথাকথিত মহাজোটের নিশ্চিত ভরাডুবির রিপোর্ট পাওয়ার পরে ষড়যন্ত্রের কুশী-লবরা অবগুণ্ঠন ছুড়ে ফেলে প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ঘটানো হলো অনেক মায়ের বুক শূন্য করার ২৮শে অক্টোবরের মর্মান্তিক লোমহর্ষক ঘটনা। ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে কন্ডোলিসা রাইস 'ভারতকে সাথে নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে' বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তাদের পদক্ষেপ ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির জন্যে বর্তমানে দৃশ্যমান এমন স্বকরুণ অবস্থার সৃষ্টি করবে, তা বোধহয় দেশ প্রেমিক বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের কেউ কল্পনাও করতে পারেননি।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ব্যাপারে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে ভারতকে সহযোগী শক্তি হিসেবে কেনো নির্বাচিত করলো? এ প্রশ্নের জবাব হলো, সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই এলাকার দেশসমূহে নিজ স্বার্থ উদ্ধারে ভারতকে 'দাদাগীরী' করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে। এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মুখে ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনা কোনো বাধা নয়, বাধা কেবলমাত্র ইসলামী চেতনা এবং স্বাধীনচেতা দৃষ্টিভঙ্গী। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারণাহীন বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ধ্বংস করার জন্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বাঙ্গালী চেতনার মোড়কে ব্রাহ্মণ্যবাদ চমৎকার সহায়ক শক্তি। ঠিক এ কারণেই বাংলাদেশের মুসলমানদের ইসলামী চেতনা ধ্বংস করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণে ভারতকে সহযোগী শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী চেতনা ধ্বংস করার লক্ষ্যে অনির্বাচিত ও অসাংবিধানিক 'সুশীল সরকারের' মাধ্যমে নারীনীতিসহ নানা ধরণের নীতিমালা বাস্তবায়নের

পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কোমলমতি শিশুদেরকে মন-মানসিকতা আল্লাহ-রাসূল শূন্য করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা এনজিওদের কর্তৃত্বে দেয়ার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি মুক্ত নৈতিক চরিত্র গড়ার অন্যতম মাধ্যম দেশের বৃহত্তর ঐতিহাসিক পবিত্র কোরআনের তাফসীর মাহফিলগুলো বন্ধ করে তথাকথিত ওপেন কনসার্টের নামে চরিত্র বিধ্বংসী অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সারের মূল্য বৃদ্ধিসহ কৃষিখাত ধ্বংস ও খাদ্য নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে দুর্ভীক্ষ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবেশী দেশের নানা দাবী মেনে নিয়ে নিজ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দেশের সমুদ্র সীমা, ভূগর্ভস্থ খনিজ সম্পদ তেল-গ্যাস কয়লা বিদেশী কোম্পানীর কাছে লুণ্ঠনভিত্তিক ইজারা দেয়ার পাঁয়তারা চলছে।

এসব ব্যাপারে দেশ প্রেমিকদের কেউ যেনো কোনো প্রতিবাদ করতে না পারে, এ জন্য নানা ধরণের আইন- কানুন জারী করা হয়েছে, প্রতিবাদী কণ্ঠসমূহ কারাগারের চার দেয়ালে বন্দী করা হয়েছে এবং বাইরে যারা আছেন তাদের বিরুদ্ধেও কাল্পনিক অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করে কারারুদ্ধ করার আয়োজন চলছে। নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের কাজে নিবেদিত প্রাণ একশ্রেণীর শিল্পী নামের নটনটীদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে, অপরদিকে নৈতিক চরিত্র গড়ার ও আদর্শ নাগরিক সৃষ্টির কারিগর আল্লাহভীরু দুর্নীতিমুক্ত মানুষদের জেলে পুরে হয়রানী করা হচ্ছে। দীর্ঘ পাঁচ বছর কেবিনেট মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করে সততা ও স্বচ্ছতায় উত্তীর্ণ হলেন যে মাওলানা নিজামী ও মুজাহিদ সাহেব, তাদের সততার স্বীকৃতি না দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কল্পিত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দিয়ে একজনকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিলো এবং অন্যজনকেও হয়রানি করা হচ্ছে।

ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী চেতনার আকাশ চুম্বী বৃক্ষের পত্র-পল্লব ও শাখা- প্রশাখা নিষ্ঠুর হাতে কর্তন এবং মূল শেকড় উপড়ানোর ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে বাঙ্গালী চেতনার ধ্বজাধারীদের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন করার লক্ষ্যে সংবিধান কর্তৃক অর্পিত সংসদ নির্বাচন বাদ দিয়ে অন্যান্য নির্বাচনের আয়োজন চলছে। 'মানবিক বিবেচনার' ধুম্রজালে বাঙ্গালী চেতনাধারী ধর্মনিরপেক্ষ নেত্রীর পদপ্রান্তে দেশের সকল আইন-কানুন অবিশ্বাস্য দ্রুততার সাথে বলী দেয়া হলেও ইসলামী ও জাতীয়তাবাদীদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছে এবং হচ্ছে। প্রচলিত আইনের বিপরীত তিনটি পাসপোর্টের অধিকারিণী হওয়া, নেত্রীর পক্ষে মিছিল- শ্লোগান দেয়া এসবের কোনো কিছুই জরুরী আইনকে স্পর্শ করলো না। আর প্রতিপক্ষের ক্ষেত্রে আইন প্রযোজ্য না হলেও প্রয়োজনে নতুন আইন তৈরী ও প্রয়োগ করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা হচ্ছে।

অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো জাতির ঘাড়ে চেপে বসা অসাংবিধানিক 'সুশীল সরকার' ও তাদের নেপথ্যের পৃষ্ঠপোষকদের দৃষ্টিতে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী চেতনায় বিশ্বাসী মানুষদের জন্যে 'মানবিক বিবেচনা' প্রযোজ্য নয়। এ জন্যেই প্রচন্ড আঘাতে স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং দেশনেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ সন্তান ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের মেরুদন্ডের হাড় ভেঙ্গে এ্যাম্বুলেন্সে এবং ক্যান্সার আক্রান্ত এক নারীকে তাঁর শিশু সন্তানদের সম্মুখে ট্রেচারে করে আদালতে নেয়া হয়েছে। তারেক রহমানের শিশু কন্যা জাইমার করুণ আর্তনাদ ক্ষমতাসীনদের 'মানবিক বিবেচনা' স্পর্শ করতে পারেনি। এভাবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতীক স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী বেগম জিয়া ও তাঁর পরিবারকে ধ্বংস করার যাবতীয় ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছে। এসবই করা হয়েছে এবং আগামীতেও করা হবে বাঙ্গালী চেতনাধারীদের ক্ষমতার মসনদে আসীন করার লক্ষ্যে।

দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দানকারী এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ইজারা প্রদানকারী ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী চেতনার বরকন্দাজদের বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখার জন্যে ষড়যন্ত্রের কুশী-লবরা সকল আয়োজন সম্পন্ন করেও নিজেদের ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। ফলে জোটের নামে মাসোহারা প্রাপ্ত সেবকদের এক প্লাটফর্মে একত্রিত করা হচ্ছে। ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙ্গালী চেতনার চলমান সংঘাত সম্মুখের দিকে ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দ্বীন, ঈমান, আকিদা- বিশ্বাস, দেশ ও জাতির স্বার্থ সর্বোপরি স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রয়োজনে সকল মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দেশ প্রেমিক সকল শক্তিকে এক প্লাটফর্মে একত্রিত হয়ে ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মহীনদের বিরুদ্ধে চলমান সংঘাতে বিজয়ী হতে হবে। নতুবা এ জাতির ভাগ্যাকাশে কাল বৈশাখীর কৃষ্ণকালো মেঘের যে ঘনঘটা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা বিদূরিত করা সুদূর পরাহত বলে মনে হয়। পরিশেষে বিশ্বকবি নজরুল ইসলাম বিরচিত 'কান্ডারী হুঁশিয়ার!' নামক কবিতার দু'টো পংক্তি উল্লেখ করে আজকের প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই–

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি -নিশীতে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

২৮ অক্টোবর' ০৬

ইতিহাসের মানবিক বিপর্যয়ের এক কালো অধ্যায়

২০০১-এর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চরমভাবে ভরাডুবিতে তাদের নেতৃবৃন্দের উচিৎ ছিলো জাতি তাদেরকে কেনো এতো তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করলো তা খতিয়ে দেখে আত্ম-বিশ্লেষণ করে জনগণের নিকট নিজেদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য আ-লীগের, তারা সহজ-সরল পথ ছেড়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থের পথে পা বাড়ালো। পরিণামে দেশ ও জাতি জাহান্নামে যাক তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না এবং দেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও অবকাঠামো নির্মাণ বাধাগ্রস্ত হোক তাতেও তাদের কিছু আসে যায় না। সেই প্রবাদ বাক্যের মতো, 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই'। ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নেয়ার জিঘাংসায় মরিয়া হয়ে উঠলো আওয়ামী লীগ এবং তাদের ঘরানার বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টরা।

জনগণ কর্তৃক ভোটে প্রত্যাখ্যাত আ-লীগ জোট সরকারের সাথে একা পেরে উঠবে না বুঝতে পেরে সেই সব বামদের তারা ফুটপথ থেকে তুলে এনে তিল কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাল বানানোর মতো জোট থেকে তথাকথিত মহাজোটে পরিণত হলো। ছিন্নমূল বামদের নিয়ে জট পাকানোর সময় আ-লীগ কল্পনাও করলো না, এই বামরাই দেশের স্থপতি জনগণের প্রিয় জননেতা মরহুম শেখ মুজিবর রহমানকে বিভ্রান্ত করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে এক দলীয় বাকশালী শাসনের দিকে নিয়ে জনবিচ্ছিন্ন করার মূল নায়ক ছিলো। মরহুম শেখ মুজিবর রহমানের বিশাল জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ধ্বস নামানোর কুশী-লব ছিলো ছিন্নমূল বামরাই। বামরা এদেশের পরগাছা বা শূন্যলতার মতো পরনির্ভর। বামগোষ্ঠীরা ভালো করেই জানে নির্বাচনের মাধ্যমে জীবনেও তারা ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। এর মূল কারণ দু'টি। একঃ বামরা চরম ধর্ম-বিদ্বেষী আর দেশের ৯৯% ভাগ জনগণ ধর্মভীরু। দুইঃ বামদের রাজনীতির মূলশক্তি ষড়যন্ত্র আর গায়ের জোর। তাদের শ্লোগানই হলো, **'বন্দুকের নল থেকেই ক্ষমতা বেরিয়ে আসে'**। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শান্তিকামী।

এই বামরাই সর্বহারা ও জনযুদ্ধ নামক সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টি করে সমগ্র দেশ জুড়ে অসংখ্য মানুষ হত্যা করেছে এবং দেশব্যাপী এ পর্যন্ত নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল হোতাও তারাই। দেশের যে সেক্টরেই অরাজকতা দেখা দিয়েছে, সেখানেই নেপথ্যে বামদের ষড়যন্ত্রের কালোহাত সক্রিয় থেকেছে। সারা দেশে বিভিন্ন ছদ্মনামে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এ যেনো একই বৃক্ষের অনেক শাখা-প্রশাখা। দেশের মাটি

ও মানুষের সাথে তাদের তেমন সম্পর্ক না থাকার কারণে পরগাছার মতো হয়েই কোনো একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দলের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা বামদের মজ্জাগত অভ্যাস ও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র অবলম্বন। তবে তাদের অধিকাংশের কাছে বাংলাদেশী জাতিয়তাবাদী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলের চাইতে ধর্মনিরপেক্ষবাদী দল বেশী পসন্দের। সে হিসেবে বামদের অধিকাংশই সুযোগ বুঝে আওয়ামী লীগের ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো বসে পরিস্থিতি নিজেদের মতো করে বিগ্ড়ে দেয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শুরু করলো।

ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও প্রিন্টিং মিডিয়ার একটি বিরাট অংশ তারা তাদের দখলে নিয়ে দেশকে অকার্যকর ব্যর্থ রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িক, মৌলবাদী, জঙ্গী ইত্যাদি নামে অভিহিত করার সর্বাত্মক দেশ বিরোধী মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়ে ছুটে চললো দেশ-থেকে দেশান্তরে। জনবিচ্ছিন্ন বামদের সকল দলকে নিজেদের মুঠোয় পাওয়ার পরও তাদের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির ওপর নির্ভর করতে না পেরে আ-লীগ আরেকটি বড় শূন্যতায় ভুগছিলো। সে শূন্যতা হলো, আ-লীগ ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শে বিশ্বাসী বলে দেশের কোনো পরিচিত ওলামা-মাশায়েখ তাদের সাথে ছিলো না। কারণ প্রকৃত আলেম সমাজের নিকট ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে একটি সুস্পষ্ট কুফ্রী মতবাদ হিসেবে চিহ্নিত। তাই তাওহীদী জনতা সকল নির্বাচনে আ-লীগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে।

আ-লীগ তাদের এ বিরাট শূন্যতা পূরণের জন্য বহু কিছুর বিনিময়ে দেশের একজন বর্ষিয়ান প্রখ্যাত আলেমে দ্বীনকে ওয়াস্-ওয়াসায় ফেলতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত চরম ধর্মবিদ্বেষী বামদের খুশী করার জন্য আ-লীগ ঐ চুক্তি থেকে তওবা করে এবাউট-টার্ণ করলো– সে কাহিনী দেশবাসীর অজানা নয় এবং এ ঘটনার মধ্য দিয়ে তথাকথিত মহাজোটের ইসলাম বিদ্বেষের মুখোশ আরেকবার উন্মোচিত হলো।

এদিকে আওয়ামী লীগ ঐ বামদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়েই গণতন্ত্র দু'পায়ে দলে সংসদ বর্জন শুরু করলো। সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার পথ পরিহার করে জোট সরকারের উন্নয়নের পথে ধাবমান অর্থনৈতিক চাকা বন্ধ করার লক্ষ্যে পোশাক শিল্প কারখানায় অস্থিরতা সৃষ্টি, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লাগাতার হরতাল, অবরোধ ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে জোট সরকারের ঘুম হারাম করার মহা রোডম্যাপ বাস্তবায়ন শুরু করলো। একটানা পাঁচ বছর তাদের এ দেশ বিরোধী আত্মঘাতী কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার অপরিসীম দয়ায় জোট সরকার সফলভাবেই তাদের মেয়াদকাল পূর্ণ করে ২৮ অক্টোবর শনিবার ৮ম সংসদের পরিসমাপ্তি করলো। ইতোপূর্বে আ-লীগের পল্টন মহাসমাবেশ থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আ-লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সারা দেশ থেকে তাদের নেতা-কর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ২৮ অক্টোবর ঢাকা অবরোধের ঘোষণা দিলেন।

পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিএনপি নয়াপল্টন, আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দান এবং জামায়াতে ইসলামী বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে সমাবেশের প্রস্তুতি নিলো। অন্য দিকে ইসলাম বিদ্বেষী বিভিন্ন এনজিও বিশেষ করে প্রশিকার হাজার হাজার কর্মী এবং বামদের সর্বহারা, জনযুদ্ধ ও আওয়ামী লীগের উচ্ছৃঙ্খল আরও হাজার হাজার কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সকাল ন'টা দশটার দিকে পল্টন ময়দানে জড় হতে থাকলো। পুলিশের তাড়া খেয়ে আ-লীগ তাদের জন্য নির্ধারিত সমাবেশ স্থল পল্টন ময়দান ছেড়ে দিয়ে নিরস্ত্র জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে প্রেসক্লাব থেকে পল্টন মোড় ও বিজয় নগর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকা লগি-বৈঠা বাহিনী দিয়ে ভরে ফেললো। বেলা এগারটার দিকে শুরু হলো আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জামায়াত-শিবিরের নিরস্ত্র কর্মীদের ওপর ইতিহাসের বর্বরোচিত ঘৃণ্য হামলা। আমি সেদিন সকাল ন'টা থেকেই পল্টনস্থ জামায়াতের ঢাকা মহানগরী অফিসে কেন্দ্রীয় এবং মহানগরী নেতৃবৃন্দের সাথে জামায়াতের সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য অবস্থান করছিলাম।

এতো রক্ত জীবনে দেখিনি

২৮ অক্টোবর শেখ হাসিনার লগি-বৈঠাধারী বাহিনীর নির্মম নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত হাত ভাঙা, পা ভাঙা, থেঁতলানো রক্তাক্ত মাথা ও সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত রক্তস্নাত জামায়াত-শিবির কর্মীদের একের পর এক মহানগরী অফিসে বহন করে আনা হচ্ছিলো। আহতদের করুণ আর্তনাদে পরিবেশ বেদনা-বিধুর হয়ে উঠেছিলো। আমি অসহায়ের মতো চোখের সম্মুখে এ ধরণের অমানবিক নির্মম দৃশ্য অবলোকন করছিলাম। বাম ও আ-লীগের লগি-বৈঠা বাহিনীর বর্বর আঘাতে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভাঙা নামাজী মানুষগুলোর যন্ত্রণা কাতর রক্তাক্ত করুণ চেহারার দিকে শুধু অশ্রু সিক্ত চোখে তাকিয়েই ছিলাম, সান্ত্বনা দেয়ার কোনো ভাষা আমি খুঁজে পায়নি। ভাবছিলাম, কি এদের অপরাধ? এরা তো নিজেরা নামাজ-রোজা আদায় করে, কোরআন-হাদীসের বিধান নিজেরা অনুসরণ করার চেষ্টা করে এবং অন্য মানুষদেরও আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর বিধান অনুসরণ করার জন্য আহ্বান জানায়। এটাই কি এদের অপরাধ? ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ এবং নাস্তিক্যবাদী বামরা এ জন্যেই এদেরকে সহ্য করতে পারে না? ইসলামের বিধান অনুসরণকারী এসব মানুষদের অপরাধ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন–

وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلاَّ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ–

তারা এ (ঈমানদার)-দের কাছ থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি যে, তারা এক পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিলো। (সূরা বুরুজ-৮)

সুতরাং এ কথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নাস্তিক্যবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ লাভের চাবিকাঠি কোরআন-হাদীসের বিধান অনুসরণ করাই ছিলো ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিদ্বেষী বামদের কাছে জামায়াত শিবিরের অপরাধ।

সেদিন আমি স্পষ্ট অনুধাবন করলাম, আ-লীগ ও বামরা আজ আল্লাহভীরু মানুষদের রক্ত পিপাসায় লোলুপ জিহ্বা বিস্তার করেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে লাশের স্তুপ জমে যাবে। বন্য হায়েনাদের এই হিংস্র তান্ডব দ্রুত রোধ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী থেকে শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কয়েকবার যোগাযোগ করে সাহায্য চেয়েও তাদের কাছ থেকে কার্যকর কোনো সাড়া পাইনি, অজ্ঞাত কারণে তারা নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। সেদিন আওয়ামী ও বাম সন্ত্রাসীদের বর্বর আক্রমণে শত শত জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মী আহত হলেন, কেউ কেউ সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেলেন। লগি-বৈঠার নিষ্ঠুর ছোবলে প্রকাশ্য রাজপথে জীবন হারালেন হাফেজে কোরআন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী সম্ভাবনাময় ছাত্রসহ ছয়জন নিরীহ আদম সন্তান। (মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করুন) টেলিভিশনের পর্দায় গোটা বিশ্ব সেদিনের সে বর্বর দৃশ্য দেখে বাংলাদেশকে বন্য অসভ্য বলে মন্তব্য করলো, জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে আমরা মর্যাদা হারালাম।

দেশে সংঘটিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ঘটনায় বুদ্ধিজীবী, তথাকথিত সুশীল ও মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ বিবৃতির বহর খুলে দেন। টিভি চ্যানেল গুলোয় টক-শোর মাধ্যমে মুখে ফেনা তোলেন, কিন্তু ২৮ অক্টোবরের বর্বর পশুসুলভ ঘটনায় তাদের মুখ বা কলম থেকে দুঃখ প্রকাশ জনিত একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি। ধিক! শত ধিক এসব সুশীল ও বুদ্ধিজীবীর মানবতা বিবর্জিত জ্ঞান বিবেকের প্রতি। যারা নিজেদের বিবেক পয়সার বিনিময়ে অন্যের কাছে বিক্রি করে ভিন্ দেশের গোলামী করা জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন। আর যাই হোক তারা সভ্য মনুষ্য পদবাচ্যে বিবেচিত হতে পারেন না। আর এ জাতিয় লোকেরাই যদি হন সুশীল তাহলে কুশীলের ব্যাখ্যা কি?

মাস দুয়েক পূর্বে কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় আওয়ামী সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার লেখা 'আমি মা' শির্ষক একটি লেখার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। তাঁর আসন্ন প্রসবা প্রবাসী কন্যা পুতুলের প্রসবকালীন সময় তার সান্নিধ্যে থাকতে পারছেন না এই মানসিক কষ্টের কথা নানাভাবে ঐ লেখায় তিনি উল্লেখ করেছেন।

মা হিসেবে মেয়ের প্রতি এ দরদ ও আকুতি উৎসারিত হওয়া নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, ২৮ অক্টোবরে তাঁরই নির্দেশে তার লগি-বৈঠা বাহিনীর লোকেরা

ছয়জন মায়ের নাড়ীছেঁড়া কলিজার টুক্‌রা বুকের মানিক, সম্ভাবনাময় নিরস্ত্র নিরীহ ছ'টি সন্তানকে রাজপথে দিবালোকে সাপ মারার মতো পিটিয়ে পিটিয়ে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করে মৃত লাশের পিঠের ওপর উঠে পৈশাচিক উল্লাশ করলো, এ লোমহর্ষক দৃশ্য অবলোকন করার পর আ-লীগ নেত্রীর মাতৃস্নেহ কোথায় ছিলো? ওরাও তো ছিলো আপনার মতো কোনো না কোনো মায়ের নয়নের নিধি- কলিজার টুকরা পরম আদরের সন্তান। যে মায়েরা বুকভরা আশা নিয়ে দিনের পর দিন বছরের পর বছর নিজেকে একটু একটু করে কর্পূরের মতো নিঃশেষে ক্ষয় করে ঐ সন্তানগুলোকে যুবক বয়সে পৌছে দিয়েছিলো, আপনার লগি-বৈঠাধারীরা মুহূর্তেই সেই মায়েদের সকল স্বপ্নস্বাদ চিরকালের মতো ভেঙে ধূলিষ্মাৎ করে বুকের মধ্যে সন্তান-বিচ্ছেদের যে অনিবার্ণ অনল শিখা জ্বালিয়ে দিলো, তা নির্বাপিত করা অসম্ভব হলেও পরের দিনের পত্রিকায় আপনি যদি আপনার বাহিনী কর্তৃক নিহত ব্যক্তিদের পিতামাতাদের একটু সমবেদনা জানাতেন এবং যেসব পশু-প্রবৃত্তির মানুষগুলো ওদেরকে হত্যা করলো তাদেরকে ধিক্কার জানাতেন তাহলে আপনার লেখা 'আমি মা' শির্ষক প্রবন্ধটি জাতির বিবেককে অবশ্যই নাড়া দিতো।

সুতরাং মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তনে ২৮ অক্টোবর এ বাংলায় যতবার আসবে ততবার আওয়ামী লীগ ও বাম সংগঠনের নেতা-কর্মীদের জন্য দেশবাসীর পক্ষ থেকে ধিক্কার ও অভিশাপ বর্ষিত হতে থাকবে। এবং ২৮ অক্টোবর চিহ্নিত হয়ে থাকবে ইতিহাসের মানবিক বিপর্যয়ের এক কালো অধ্যায় হিসেবে।

আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি মানবতা বিবর্জিত মানবাধিকার নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের দৃষ্টি নিপতিত না হলেও টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার বিবেকবান মানুষ দেখেছে জামায়াতে ইসলামী নেতৃবৃন্দের শান্তিপ্রিয় মানসিকতা, সহনশীলতা, ধৈর্য্য, মানবতা সর্বোপরি গণতান্ত্রিক চরিত্র। জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীরে জামায়াতসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যে মুহূর্তে মঞ্চে বক্তব্য রাখছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই মঞ্চের পাশ দিয়ে তাদের চোখের সম্মুখ পথেই জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদের আহত রক্তাক্ত দেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সেই সাথে মঞ্চ লক্ষ্য করে নেতৃবৃন্দকে হত্যা করার জন্যে আ-লীগ ও বামদের সশস্ত্র উচ্ছৃংখল সন্ত্রাসীরা অবিরাম বোমা-গুলী ছুড়ছিলো। জীবনের সেই চরম মুহূর্তেও তাঁরা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী জামায়াত-শিবির কর্মীদের শান্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে বক্তব্য দিয়েছেন এবং আক্রমণাত্মক ও উত্তেজক একটি শব্দও তাঁরা বক্তব্যে ব্যবহার করেননি। জামায়াত-শিবিরের এই অতুলনীয় সহনশীলতা, শান্তিপ্রিয়

মানসিকতা ও গণতান্ত্রিক চরিত্র দেখেও যারা সত্য আড়াল করার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক, জঙ্গী ও সন্ত্রাসী হিসেবে অপবাদ দিয়ে জামায়াত শিবিরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অবিরাম চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছেন এখনও সুযোগ পেলেই জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে কলাম লেখা, টিভি চ্যানেলে টক-শোর মাধ্যমে বিবেক-বিবেচনার মাথা খেয়ে জামায়াত-শিবিরের গুষ্ঠি উদ্ধার করে মজা পান তাদের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী কবি, মানবতার কবি ও ইসলামী জাগরণের অনন্য কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি ছত্র উল্লেখ করে আজকের এ প্রসঙ্গের ইতি টানতে চাই–

নিজেদের চারধারে বাঁধ বেঁধে মৃত্যু-জীবাণু যারা জিয়ায়,
তাঁরা কি চিনিবে–মহাসিন্ধুর উদ্দেশ্যে ছোটে স্রোত কোথায়!
স্থাণু গতিহীন প'ড়ে আছে তারা আপনারে ল'য়ে বাঁধিয়ে চোখ
কোটরের জীব, উহাদের তরে নহে উদীচীর ঊষা-আলোক।
আলোক হেরিয়া কোটরে থাকিয়া চেঁচায় প্যাঁচারা, ওরা চেঁচাক।
মোরা গাব গান, ওদের মারিতে আজো বেঁচে আছে দেদার কাক।
জীবনে যাদের ঘনাল সন্ধ্যা, আজ প্রভাতের শুনে আজান
বিছানায় শুয়ে যদি পাড়ে গালি, দিক গালি– তোরা দিস্‌নে কান।
উহাদের তরে হ'তেছে কালের গোরস্থানে রে গোর খোদাই,
মোদের প্রাণের রাঙা জল্‌সাতে জরা জীর্ণের দাওয়াত নাই!
জিঞ্জির পায়ে দাঁড়ে ব'সে টিয়া চানা খায়, গায় শিখানো বোল,
আকাশের পাখী! ঊর্ধ্বে উঠিয়া কণ্ঠে নতুন লহরী তোল!
তোরা ঊর্ধ্বের– অমৃত লোকের, ছুঁড়ুক নীচেরা ধূলাবালি,
চাঁদেরে মলিন [illegible]তে পারে না কেরোসিন ডিবে কালি ঢালি!
বন্য-বরাহ পঙ্ক ছিটাক, পাঁকের ঊর্ধ্বে তোরা কমল,
ওরা দিক কাদা, তোরা দে সুবাস, তোরা ফুল ওরা পশুর দল!
তোদের শুভ্র গায়ে হানে ওরা আপন গায়ের গলিত পাঁক,
যার যা দেবার সে দেয় তাহাই, স্বর্গের শিশু সহিয়া থাক!

কাদিয়ানীরা কেন মুসলমান নয়?

কাদিয়ানী পরিচিতি

ইংরেজরা এদেশে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে এসে ক্রমশ ক্ষমতার শীর্ষ দেশে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। বিষয়টি সচেতন আলিম-ওলামা অনুভব করতে পেরে সর্বপ্রথম ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁরাই সোচ্চার হন। কিন্তু মুসলমানদের দুর্ভাগ্য, জাতির নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিলো, তারাই পার্থিব সঙ্কীর্ণ স্বার্থের বিনিময়ে ইংরেজদের সাথে মিলিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য পলাশীর আম্র কাননে অস্তমিত করা হলো। এরপর থেকেই ইংরেজ আধিপত্যের বিরুদ্ধে আলিম-উলামা প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ার চেষ্টা করতে থাকলেন। ১৮০৫ সনে তদানীন্তন ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা সম্মান-মর্যাদার অধিকারী বুযুর্গ দিল্লীর শাহ্ আব্দুল আযীয (রাহঃ) দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন। সে ফতোয়ায় তিনি ইংরেজদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের দুশমন এবং এদেশকে 'দারুল হর্ব' ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদেরকে সশস্ত্র জিহাদ শুরু করার আহ্বান জানান। ইসলামের দুশমন দখলদার ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন ক্ষীণ গতিতে হলেও চলতে থাকে।

এরপর ইসলামের বীর মুজাহিদ সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদ ও শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (রাহঃ) শত্রুর বিরুদ্ধে ঝড়ের গতিতে মুজাহিদ আন্দোলন শুরু করেন। কিন্তু ইংরেজ শক্তি ও তাদের পা চাটা গোলামেরা বিশ্বাসঘাতকদের সহযোগিতায় বালাকোটের ময়দানে ১৮৩১ সনের ৬ ই মে ইসলামের এই বীর মুজাহিদদ্বয়কে সঙ্গী-সাথীসহ হত্যা করেও ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনকে স্তব্ধ করতে ব্যর্থ হয়। আলিম, ওলামাগণের নেতৃত্বে আন্দোলন চলতে থাকে এবং ১৮৫৭ সনে সিপাহী বিপ্লব বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের কারণে ব্যর্থ হয়। তারপরেও সশস্ত্র আন্দোলন চলতে থাকে, ইংরেজরা দিশাহারা হয়ে মুসলিম নামধারী লোকদেরকে অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করে তাদের মাধ্যমে দখলদার ইংরেজ বিরোধী যে জিহাদ চলছিলো, সে জিহাদ হারাম বলে এসব দালাল গোষ্ঠী ফতোয়া দিয়ে মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা থেকে জিহাদের অনুপ্রেরণা স্তিমিত করার চেষ্টা করে।

শুধু তাই নয়, ইসলামের লেবাসধারী একশ্রেণীর লোকদেরকে রাতারাতি পীর সাজিয়ে তাদের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ও ইংরেজদের পক্ষে ফতোয়া দিতে থাকে। এসব ফতোয়া যখন ব্যাপকভাবে সাধারণ মুসলমানদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হলো, তখন মুসলমানদের মধ্যে ফেত্না শুরু

করার উদ্দেশ্যে তারা বেছে নিলো পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান নামক স্থানের অধিবাসী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মির্জা গোলাম আহ্মাদ নামক এক জাহান্নামের কীটকে। এই লোকটির নিজের বক্তব্য অনুযায়ী সে ১৮৩৯ বা ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং তার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিলো ইংরেজদের রাজকর্মচারী ও তাদের অনুগত ভৃত্য। এই গোলাম আহ্মাদ নামক লোকটি প্রথমে ইসলামের একজন প্রচারক হিসেবে সাধারণ মুসলমানদের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করলো। কিছু দিনপর নিজেকে মুজাদ্দীদ হিসেবে দাবী করলো।

তারপর সে নিজেকে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী হিসেবে দাবি করলো। এরপর সে নিজেকে নবী হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা হারাম বলে ফতোয়া দিলো। মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানী তার শরীয়াতের ভিত্তি স্থাপন করলো ইংরেজদের শর্তহীন আনুগত্যের ওপরে। ইংরেজদের অর্থপুষ্ট এই জাহান্নামী ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা আলিম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ভাষায় গালিগালাজ করে নানা ধরনের বই-পুস্তক রচনা করে প্রচার করলো এবং তার রচিত বই-পত্রে সে ইংরেজদেরকে এদেশে আল্লাহর রহমত হিসেবে ঘোষণা করলো।

তার অপপ্রচারে যারা প্রলুব্ধ হতো, তাদেরকে ইংরেজ রাজশক্তি অর্থ-বিত্ত দিয়ে, উচ্চপদে চাকরীসহ নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে একটি বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করলো। ইংরেজ সৃষ্ট ফেত্না মির্জা গোলাম আহ্মাদ কাদিয়ানীর অনুসারীরাই কাদিয়ানী নামে পরিচিত। ইসলামের দুশমন চরম মুসলিম বিদ্বেষী ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈলের হাইফা শহরেই কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হয় তাদের বিশ্বব্যাপী কার্যক্রম। লন্ডনেও তাদের বিশাল কেন্দ্র রয়েছে। তাদের পৃথক টিভি চ্যানেল রয়েছে। বিজ্ঞাপন ব্যতীত টিভি চ্যানেল-এর কার্যক্রম চালু রাখা অসম্ভব। পক্ষান্তরে এ,এমটিভি চ্যানেল বিজ্ঞাপন ব্যতীতই বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কাদিয়ানীদের টিভি চ্যানেল এ,এমটিভি ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের অর্থে পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এদের আখ্ড়া রয়েছে। ঢাকায় এদের কেন্দ্র বখ্শী বাজারে। কাদিয়ানীরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে নিয়োজিত।

খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

'খত্‌মে নবুয়্যাত' সম্পর্কে কোরআনুল কারীম যে দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা করেছে এবং সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর কিতাবের ঘোষণার যে অর্থ গ্রহণ করেছিলেন, কাদিয়ানী গোষ্ঠী তা বিশ্বাস করে না। তারা খত্‌মে নবুয়্যাত ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে আরো অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে। পক্ষান্তরে নবী করীম (সাঃ) এর পরে যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করেছে, তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান পরিচালনায় সাহাবায়ে কেরাম বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু কাদিয়ানীরা ইসলামের ইতিহাসে সর্বপথম খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে এক অভিনব ও উদ্ভট ব্যাখ্যা আবিষ্কার করে নতুন নবী আমদানীর পথ উন্মুক্ত করেছে। তারা খাতিমুন্নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ করেছে 'নবীদের মোহর'- শেষনবী নয়। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে নবী করীম (সাঃ) এর পরে অগণিত নবী আসবে (নাউযুবিল্লাহ) এবং নবী আগমনের সিলসিলা বন্ধ হবে না।

কাদিয়ানীদের এই দাবী সর্বজন বিদিত। এ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের রচিত গ্রন্থ থেকে মাত্র কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে উল্লেখ করছি। তাদের গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে–

خاتم النّبین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النّبین کے معنی یہ ھے کہ آپ کی مہرکے بغیر کسی کی نبوّت کی تصدیق نہیں ھوسکتی، جب مہر لگ جاتی ھے تووہ کاغزسند ھوجاتاھے اور مصدقہ سمجھا جاتا ھے، اسی طرح آنحضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوّت پرنہ ھو وہ صحیح نہیں ھے،

খাতিমুন্নাবীয়্যীন সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ বলেছেন যে, খাতিমুন্নাবীয়্যীন-এর অর্থ তার মোহর ব্যতীত কারো নবুয়্যাত সত্য বলে স্বীকৃত হতে পারে না। যখন মোহর লেগে যায় তখনই তা প্রামাণ্য হয় এবং সত্যরূপে ও স্বীকৃত বলে বিবেচিত হয়। অনুরূপভাবে হযরতের মোহর এবং সত্য বলে যে নবুয়্যাত স্বীকৃতি লাভ করেনি তা খাঁটি এবং সত্য নয়। (মলফুজাতে আহমাদিয়া ৫ম খন্ড ২৯০ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীরা খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস এভাবে পত্রিকায় প্রকাশ করেছে –

ھمیں اس سے انکارنہیں کہ رسول کریم صلی اللّٰہ علیہ

وسلم خاتم النّبيّن هيں مگر ختم كى معنى وه نهيں جو احسان كاسواد اظم سمجهتاهے اور جو رسول كريم صلى اللّه عليه وآله وسلم كى شان اعلى وارفع كى سراسر خلاف هے، كه آپ نے نبوّت كى نعمت عظمى سے اپنى امّت كو محروم كرديا، بلكه يه هيں كه آپ نبيوں كى مهر هيں، اب وهى نبى هوگا جس كى آپ تصديق كري گے.....انهں معنوں ميں هم رسول كريم كو خاتم النّبيّن سمجهتے هيں،

আমরা একথা অস্বীকার করি না যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাতিমুন্নাবীয়্যীন। কিন্তু 'খাতাম'-এর যে অর্থ ইহসানের অধিকাংশ লোক গ্রহণ করেছে এবং যা রাসূলে করীম (সাঃ) এর মহান মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা এই যে, তিনি নবুয়্যাতের ন্যায় বিরাট নেয়ামত থেকে নিজ উম্মতকে বঞ্চিত করে গিয়েছেন, তা ঠিক নয়। বরং এর অর্থ এই যে, তিনি নবীদের মোহর ছিলেন। এখন তিনি যাকে নবী হিসেবে স্বীকার করবেন সে-ই নবী হিসেবে গণ্য হবে। আমরা এই অর্থে তাকে খাতিমুন্নাবীয়্যীন বলে বিশ্বাস করি। (আল ফজল পত্রিকা, কাদিয়ান, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯)

খত্মে নবুয়্যাত সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখেছে–

خاتم مهر كو كهتے هيں-جب نبى كريم مهر هوئے تو اگر ان كى امّت ميں كسى قسم كانبى نهيى هوگا تووه مهر كس طرح هوئے يا مهر كس پرلگے گى؟

খাতিম মোহরকে বলা হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মোহর তখন তার উম্মতের মধ্যে যদি নবী মোটেই না হয়, তাহলে তিনি মোহর হলেন কিভাবে অথবা তা কিসের ওপরে লাগবে? (আল ফজল, কাদিয়ান, ২২ মে, ১৯২২)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে

কাদিয়ানীরা আল্লাহর কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করেছে এবং ব্যাখ্যা ঘটিত এই বিরোধ শুধু মাত্র একটি শব্দের মধ্যেই তারা সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং অধিক অগ্রসর হয়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে– শুধু একজন নয় হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটতে পারে, এ কথা তাদের বিভিন্ন বিবৃতি এবং ঘোষণার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা করেছে। তারা দাবী করে থাকে–

یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کادروازہ کُھلا ہے،

একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরেও নবুয়্যাতের দরজা খোলা রয়েছে। (হাকিকাতুন্ নবুয়্যাত, ২২৮ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ) কে শেষনবী অস্বীকার করে মির্জা গোলাম আহমাদ লিখেছেন–

انہوں‌نے (یعنی مسلمانوں‌نے) یہ سمجہ لیاہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے، ان کایہ سمجھنا خدا تعالی کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایك نبی کیا میں تو کھتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے،

তারা অর্থাৎ মুসলমানেরা বুঝে নিয়েছে যে, আল্লাহ তা'য়ালার ভান্ডার শূন্য হয়ে গিয়েছে। তাদের এই কথার মূল কারণ হলো, তারা আল্লাহ তায়ালার মর্যাদা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়নি। তা না হলে শুধুমাত্র একজন নবী কেনো, আমি বলবো হাজার হাজার নবীর আগমন ঘটবে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৬২ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ) এর পরে আর কোনো নবী আগমন করবে না, এ কথা যারা বলে তাদেরকে কাফির কাদিয়ানীদের নেতা গোলাম আহমাদ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে। **অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তী সম্মানিত-মর্যাদাবান আলিম-উলামা ও প্রত্যেকটি মুসলমান মিথ্যাবাদী।** এই ব্যক্তি লিখেছে–

اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے

اور مجھے کھاجائے که تم یه کھو که آنحضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد کوئی نبی نهیں آئے گا تو میں اُسے ضرور کھوں گا که تو جھوٹا ھے، کذاب ھے، آپ کے بعد نبی آسکتے ھیں اور ضرور آسکتے ھیں،

আমার ঘাড়ের দু'দিকে তরবারী রেখে আমাকে যদি বলা হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে কোনো নবী আসবে না– তুমি একথা বলো। তখনও আমি বলবো যে, তুমি মিথ্যাবাদী। নবী করীম (সাঃ) এর পরে নবী আসতে পারে, নিশ্চয়ই আসতে পারে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ কর্তৃক নবুয়্যাতের দাবী

নবী করীম (সাঃ) এর পরে আরো অসংখ্য নবীর আগমন ঘটবে, মির্জা গোলাম আহমাদ প্রথমে এই ধারণা প্রচার করলেন। তারপর তিনি স্বয়ং নিজের নবুয়্যাত সম্পর্কে ঘোষণা করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাদিয়ানীরা তাকে সত্য নবী হিসেবে গ্রহণ করলো। এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'মসীহে মওউদ অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী স্বরচিত পুস্তকসমূহে নিজের নবুয়্যাত দাবীর সমর্থনে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি এক স্থানে লিখেছেন যে, আমি নবী এবং রাসূল-এই আমার দাবী। (১৯০৮, ৫ই মার্চ- বদর পত্রিকা)

তিনি অন্যত্র লিখেছেন, আমি খোদার হুকুম অনুসারে একজন নবী। সুতরাং এখন যদি আমি তা অস্বীকার করি, তবে আমার গোনাহ্ হবে। খোদা যখন আমার নাম নবী রেখেছেন তখন আমি কিভাবে তা অস্বীকার করতে পারি। পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত আমি স্থির নিশ্চিতভাবে এই দাবীর ওপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবো। (লাহোরের আখবারে আম পত্রিকার সম্পাদকের কাছে প্রেরিত মির্জা গোলাম আহমদের চিঠি দ্রষ্টব্য)

মৃত্যুর মাত্র তিনি দিন পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৩শে মে তারিখে হযরত মসীহ মওউদ এই পত্রখানা লিখেছেন এবং তার মৃত্যু দিবসে অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৬শে মে আখবারে আম পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। (রিভিউ অব রিলিজিয়নস পত্রিকার ৩য় বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

মির্জা গোলাম আহমাদের অনুসারীরা তার সম্পর্কে লিখেছে–

پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں،

ইসলামী শরীয়তে নবীর যে অর্থ করা হয় তা অনুসারে হযরত সাহেব অর্থাৎ মির্জা গোলাম আহমাদ কোনো মতে মাজাযী নবী নন বরং প্রকৃত নবী। (হাকিকতুন নবুয়্যাত, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ নিজের অবৈধ কর্মকান্ড অজ্ঞ লোকদের নিকট বৈধরূপে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে এ কথা বুঝানোর অপপ্রয়াস পেয়েছে যে, আমি যা কিছুই করি তা সরাসরি ওহীর ভিত্তিতেই করে থাকি। তিনি লিখেছেন–**পরে বৃষ্টির অনুরূপ আমার প্রতি খোদার ওহী অবতীর্ণ হয়। তিনি আমাকে আমার পূর্ববর্তী আকীদা-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দিলেন না। আমাকে স্পষ্টভাবে নবী উপাধি দান করা হলো।** (হাকীকাতুল ওহী-১৪৯ পৃষ্ঠা)

গোলাম লিখেছে– যে ব্যক্তি সূচনা থেকেই মুহাম্মাদের উম্মত, সে নবী হতে পারে। এরই ভিত্তিতে আমি উম্মাতীও এবং নবীও। (তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া-২৪ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ)ই সর্বশেষ শরীআত প্রণেতা– এ কথা কাদিয়ানীরা বিশ্বাস করে না। তারা বিশ্বাস করে নবুওয়্যাতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ লা'নাতুল্লাহি আলাইহিও একজন শরীআত প্রণেতা। কারণ এই অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে শরীআত প্রণেতা হিসেবে দাবী করে বলেছেন, 'আমার ওপরে যে ওহী অবতীর্ণ হয় তার মধ্যে আদেশও রয়েছে এবং নিষেধও রয়েছে।' (আরবাঈন-নম্বর ৪, ৭পৃষ্ঠা)

উক্ত ব্যক্তি আরো দাবী করেছে– আমিই বুরুযীগতভাবে খাতিমুল আম্বিয়া এবং আজ থেকে ২০ বছর পূর্বে খোদা বারাহীনে আহমাদিয়ায় আমার নামও আহমাদ রেখেছেন এবং আমাকে নবী করীম (সাঃ) এরই সত্তা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। (এক গলতী কা ইযালা)

এই লোকটি নিজেকে সমস্ত নবীদের সমষ্টি দাবী করে বলেছেন, পৃথিবীতে এমন কোনো নবীর আগমন ঘটেনি যার নাম আমাকে দেয়া হয়নি। যেমন বারাহীনে আহমাদিয়ায় খোদা বলেছেন–

خدا تعالی نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھرایا ہے اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کئے

هیی میں ادم هوں، میں شیث هوں، میں نوح هوں، میں ابراهیم هوں، میں اسحق هوں، میں اسمعیل هوں، میں یعقوب هوں، میں یوسف هوں، میں موسی هوں، میں داؤد هوں، میں عیسی هوں اور انحضرت صلی اللّٰه علیه وسلم کے نام کا میں مظهر اتم هوں یعنی ظلی طورپر محمد اور احمد هوں–

খোদা তা'য়ালা আমাকে সমস্ত নবীদের সমষ্টি নির্ধারণ করেছেন এবং সমস্ত নবীদের নাম আমার প্রতিই আরোপ করেছেন। সুতরাং আমিই আদম, আমিই নূহ, আমিই ইবরাহীম, আমিই ইসহাক, আমিই ইয়াকুব, আমিই ইসমাঈল, আমিই মূসা, আমিই দাউদ, আমিই ঈসা ইবনে মারিয়াম এবং আমিই মুহাম্মাদ (সাঃ) অর্থাৎ বুরুযীভাবে। (তাতিম্মায়ে হাকীকাতুল ওহী-৭২-৮৪ পৃষ্ঠা)

নিজেকে নবুয়্যাতের উপযুক্ত দাবী করে গোলাম লিখেছে– **এই উম্মাতের মধ্যে আমাকেই নবীর পদবি দেয়ার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। অন্য সমস্ত লোক এ পদবি লাভের উপযুক্ত নয়।** (হাকীকাতুল ওহী, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে শেষনবী দাবী করে বলেছেন– প্রতিশ্রুত মসীহ ব্যতীত আমার পরে আর কোনো নবী অথবা রাসূল আসবে না। (তাশহীযুল ইযহান-৯ম খন্ড, সংখ্যা-৩, পৃষ্ঠা-৩০)

মহান আল্লাহ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাদেরকে একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নামায-রোযা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘুম তো দূরবর্তী বিষয়, মহাগ্রন্থ আল কোরআনে যা আয়াতুল কুরসী নামে পরিচিত, তাতে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে বলেন–

لَاتَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ–

তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে। (সূরা বাকারা-২৪৫)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে বলেন– আল্লাহ তা'য়ালা কখনো ঘুমান না, তাঁর জন্য নিদ্রা শোভনীয় নয়। (মুসলিম, ইবনে মাজাহ্, দারেমী)

অথচ কাদিয়ানীদের দাবী হলো, **আল্লাহ তা'য়ালা নামায-রোযা আদায় করেন এবং তিনি নিদ্রাও উপভোগ করেন। তারা লিখেছে, আল্লাহ বলেন– আমি নামায-রোযা আদায় করি, জেগে থাকি এবং নিদ্রাও উপভোগ করি।** (আল বুশরা, ১২ খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে আল্লাহ তা'য়ালা নিজের সম্পর্কে বলেছেন–

وَ مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا–

তিনি কখনো ভুল করেন না এবং তিনি কোনো কিছু ভুলে যান না। (সূরা মারিয়াম- ৬৪)

হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম তৎকালীন ফিরাউনের এক প্রশ্নের উত্তরে মহান আল্লাহর গুণাবলী এভাবে প্রকাশ করেছেন–

لاَ يَضِلُّ رَبِّىْ وَ لاَ يَنْسَى–

আমার রব না ভুল করেন, না ভুলে যান। (সূরা ত্বাহা- ৫২)

অথচ মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী দাবী করেছেন, **আল্লাহ তা'য়ালা তাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তিনি ভুল করেন। এই ব্যক্তি মহান আল্লাহ সম্পর্কে লিখেছে– আমি আল্লাহ রাসূলদের কথা কবুল করি, আমি ভুলও করি এবং সঠিকও করি।** (আল বুশরা, ২ খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তা'য়ালার সত্বা সম্পর্কে অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী লিখেছেন– একবার আমি কাশ্‌ফের অবস্থায় খোদার সামনে অনেকগুলো কাগজ রাখলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, খোদা তা সত্যায়িত করবেন এবং নিজের হাতে স্বাক্ষর করবেন। অর্থাৎ যা কিছু হওয়ার জন্য আমি ইচ্ছা পোষণ করেছি তা যেন হয়ে যায়। এরপর খোদা লাল কালি দিয়ে কাগজগুলোয় স্বাক্ষর করে কলমের নীবের কালি ঝেড়ে ফেলে দিলেন এবং সে কালি আমার ও আব্দুল্লাহর (মির্জার এক শিষ্য) পরিধেয় বস্ত্রে এসে পড়লো। কাশ্‌ফের অবস্থার অবসান হলে আমার ও আব্দুল্লাহর কাপড়ে লাল কালির চিহ্ন দেখলাম। (তিরয়াকুল কুলুব- ২২ পৃষ্ঠা)

জাহান্নামী মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী আল্লাহর আকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন–

ایک ایسا وجود اعظم جس کے بیشمار ہاتھ بیشمار پیر
ہیں اور ہر ایک عضواس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے

خارج اور لاانتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تیندوے کی طرح اس کی تاریں بھی ہیں،

আমরা কল্পনা করে নিতে পারি যে, এই মহাবিশ্বের চিরস্থায়ী সত্ত্বার এমন এক প্রকান্ড দেহ রয়েছে যাতে অসংখ্য হাত-পা রয়েছে। তার অগণিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে। এগুলোর দৈর্ঘ ও প্রস্থ সীমাহীন। তার প্রকান্ড দেহে তারের অসংখ্য যোগসূত্র রয়েছে যা সব দিকে ছড়িয়ে রয়েছে এবং তা যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ দিচ্ছে। (তাওহীদুল মারাম-৭৫ পৃষ্ঠা)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি মারাত্মক অপবাদ দিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর এক শিষ্য কাযী ইয়ার মুহাম্মাদ লিখেছে– হযরত মসীহ মওউদ গোলাম আহমাদ নিজের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কাশ্‌ফের অবস্থা তার ওপর এমনভাবে চেপে বসলো যে, তিনি যেন একদল স্ত্রী লোক। আর আল্লাহ তা'য়ালার সঙ্গমেচ্ছা তার ওপর চাপিয়ে দিলেন। (ইসলামী কোরবানী, ৩৪ পৃষ্ঠা)

মির্জা গোলাম আহমাদ নিজেকে খোদার সন্তান দাবী করে লিখেছেন– **আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, তুমি আমার পানিতে (বীর্যে) তৈরী হয়েছো আর অন্যরা ভীরুতা থেকে তৈরী হয়েছে। শোন হে আমার পুত্র! হে সূর্য! হে চাঁদ! তুমি আমার থেকে এবং আমি তোমার থেকে। আমি তোমার হেফাজত করবো। খোদা তোমার মাঝে নেমে এসেছেন। তুমি আমার এবং সমস্ত সৃষ্টির মাধ্যম**। (আনজামে আতহাম, ৫৫ পৃষ্ঠা, তাযকিরা, ২৪২ পৃষ্ঠা, আল বুশরা, প্রথম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, কিতাবুল বিরবিয়া, ৭৫ পৃষ্ঠা)

গোলাম আহমাদ কর্তৃক খোদা দাবী এবং খোদার পুত্র বলে ঘোষণা

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে মির্জা গোলাম আহমাদ বলেছে– আমি কাশফের অবস্থায় অনুভব করলাম, আমি একজন যুবতী নারীতে পরিণত হলাম আর আল্লাহ হলেন এক বলিষ্ঠ দেহের যুবক। তিনি আমাকে ব্যবহার করলেন। আল্লাহ আমাকে বলেছেন, তিনিই আমার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমি যা করতে চাইবো, কুন বা হও বললেই তাই হয়ে যাবে। সুতরাং আমিই স্বয়ং খোদা।'

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পর্কে এমন অসংখ্য ঘৃণ্য উক্তি করেছে মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তার এসব উক্তি একত্রিত করলে এক বিশাল গ্রন্থ রচিত হবে। আল্লাহ তা'য়ালা সম্পর্কে যে কাদিয়ানী গোষ্ঠীর এমন জঘন্য ধারণা, এরপরও কি তাদেরকে মুসলিম সমাজের অন্তর্গত একটি সম্প্রদায় হিসেবে গণ্য করা যাবে?

শুধুতাই নয়, এই গোলাম নিজেকে খোদা দাবী করেছে এবং খোদা নাকি তাকে নিজের পুত্র বলে উল্লেখ করে তার কাছে ওহী অবতীর্ণ করেছে। এ সম্পর্কে গোলাম তার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে লিখেছে–

رايتني فى المنام عين الله وتيقنت انني هو دخل ربى على وجودى وكان كل غضبى و حلمى وحلوى ومرى....اسمع ولدى..انت منى بمنز لة ولدى.....

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি স্বয়ং খোদা এবং বিশ্বাস করলাম যে, আমি খোদাই হচ্ছি। খোদা আমার দেহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তুমি শোন! হে আমার পুত্র। তুমি আমার নিকট আমার সন্তানের তুল্য। (আইনায় কামালাত, ৪৪৯-৪৫০ পৃষ্ঠা, তাওজিহে মারাম, ৫০ পৃষ্ঠা, হাকিকাতুল ওহী, ৮৬ পৃষ্ঠা)

কোরআন-হাদীস সম্পর্কে কাদিয়ানীদের ধারণা

ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার সাথে কাদিয়ানীদের ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের যোজন যোজন পার্থক্য রয়েছে। গোলাম আহমাদ দাবী করেছে, **তার কাছে হযরত জিবরাঈল ওহীসহ আগমন করে থাকেন এবং তার প্রতি যে কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার নাম আল কিতাবুল মুবীন এবং এই কিতাব ২০ পারায় বিভক্ত। এই কিতাবের মর্যাদা পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের তুলনায় অধিক এই কিতাব অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও তিলাওয়াত করা জরুরী। তার সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তার (গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী) প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের বরকত ও কল্যাণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোরআনের মত এতই অধিক যে, কোনো নবীর প্রতি অবতীর্ণকৃত কিতাবের তুলনায় কম নয়। বরং তাদের অধিকাংশের কিতাবের চেয়ে অধিক বেশী।** (আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯১৯)

কাদিয়ানীরা লিখেছে– **গোলাম আহমাদের প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করে যে স্বাদ, বরকত ও কল্যাণ লাভ করা যায় তা অন্য কোনো কিতাব অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াত করেও লাভ করা যায় না। যারা কাদিয়ানীদের কিতাব তিলাওয়াত করবে তারা হতাশায় পতিত হবে না।** (আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান, ৩ এপ্রিল-১৯২৮)

শুধু তাই নয়, কাদিয়ানীদের নেতা মির্জা গোলাম আহমাদ কোরআন হাদীসকে বাতিল করে দিয়েছে। তার দাবী হলো, তার প্রতি যে ওহী অবতীর্ণ হয়, তার মোকাবেলায় নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসের কোনো গুরুত্ব নেই। কোরআন যে আল্লাহ নাযিল করেছেন, সেই আল্লাহকে যখন কেউ দেখেনি, সুতরাং সেই কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করা গুরুত্বহীন বিষয়। যেসব সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মৃত মানুষের বর্ণনার কোনো মূল্য নেই। এই অভিশপ্ত লোকটি লিখেছে–

هَلِ النَّقْلُ شَيْئٌ بَعْدَ اِيْمَاءِ رَبِّنَا......................وَاَنْتُمْ عَنِ الْمَوْتَى رَوَيْتُمْ فَفَكِّرُوْا–

আমার প্রতি আমার খোদা যে ওহী অবতীর্ণ করে থাকেন, তার মোকাবেলায় হাদীসের কি গুরুত্ব থাকতে পারে? আর হাদীস তো খন্ড-বিখন্ড হয়ে গিয়েছে। তুমি আমার কাছে এমন অবতরণকারীর কথা বলছো, যাকে তুমি দেখোনি। তুমি জানো কল্পিত বিষয় কোনো দলিল-প্রমাণ নয়। আমি তোমাদের মত কল্পনায় বিশ্বাস করি না। আমি সেই অমর খোদার কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। আর তোমরা মৃত মানুষের বর্ণনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছো। সুতরাং তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। (ইযাজে আহমাদী-৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ) কে যেসব মহান ব্যক্তি নিজের চোখে দেখেছেন, তাঁর প্রতি ঈমান এনে তাঁকে নিজের সমগ্র সত্বা দিয়ে অনুসরণ করেছেন, সেসব মহান ব্যক্তিদেরকেই সাহাবায়ে কেরাম বলা হয়েছে এবং তাঁদের সর্বাধিক সম্মান-মর্যাদার কথা আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেছেন। পক্ষান্তরে মির্জা গোলাম আহমাদ লিখেছে– তাকে যারা দেখেছে, তার মতবাদ গ্রহণ করে তাকে অনুসরণ করেছে, তারাও সাহাবী। (খুতবায়ে ইলহামিয়া-১৭১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ) এর কথা, কাজ ও সম্মতিকেই ইসলামী শরীয়াতে হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল যা কিছুই করেছেন ও বলেছেন এবং যে ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করেছেন, তার প্রতি মহান আল্লাহর সমর্থন ছিল। সুতরাং কোরআনের পরেই হাদীসের গুরুত্ব, সম্মান ও মর্যাদা। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীদের অনুসারীদের মতে হাদীস নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ আমরা আল্লাহর রাসূলকে চোখে দেখিনি এবং তাঁর হাদীস নিজের কানেও শুনিনি। যা কিছু শুনেছি ও পেয়েছি তা অন্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। সুতরাং অন্যের মাধ্যমে যা কিছু

এসেছে তা অবশ্যই সংশয়পূর্ণ। পক্ষান্তরে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে আমরা চোখে দেখেছি, তার কথা নিজের কানে শুনেছি। অতএব নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসের তুলনায় আল্লাহর রাসূল গোলাম আহমাদের কথা বা হাদীস অধিক বিশুদ্ধ। (আল ফযল, ২৯ এপ্রিল, ১৯১৫)

মক্কা-মদীনা ও হজ্জ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

মক্কা ও মদীনা মুসলমানদের কলিজার টুকরা। একজন মুসলমানের আজন্ম স্বপ্ন যে, সুযোগ আসা মাত্রই সে হজ্জে গমন করে আল্লাহর ঘর যিয়ারত করবে এবং মদীনায় প্রাণ প্রিয় রাসূলের রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে হৃদয়ের সবটুকু প্রেম, ভালোবাসা উজাড় করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাবে। অথচ কাফির কাদিয়ানীরা মুসলমানদের এই কলিজা ধরেই টান দিয়েছে। তারা লিখেছে– কাদিয়ান নামক স্থানের সম্মান-মর্যাদা মক্কা-মদীনার তুলনায় অধিক। এটা জান্নাতের একটি টুকরা। এখানে যে কবরস্থান রয়েছে সেখানে নবী করীম (সাঃ) কে প্রেরণ করে থাকেন। কাদিয়ানের উপাসনালয়গুলো মক্কা-মদীনা ও বাইতুল মুকাদ্দাসের চেয়ে উত্তম এবং এটা মুসলমানদের কিবলা। এটা খোদার সিংহাসন এবং এখানে খোদার নূর অবতীর্ণ হয়। এখানকার প্রত্যেক ইটে খোদার নিদর্শন রয়েছে। এখানকার যমীন প্রাচুর্যময় এবং এখানে বরকত অবতীর্ণ হয়। কাদিয়ান নামক এই স্থান পৃথিবীর নাভি এবং এটা সমস্ত পৃথিবীর মা। এই স্থান থেকেই সমস্ত দুনিয়া বরকত ও ফায়েয লাভ করতে পারে। এই স্থানে যে ব্যক্তি আগমন করবে না, তার ঈমান নেই। এই স্থান থেকেই নবী করীম (সাঃ) মিরাজে গিয়েছেন। এখন মক্কা-মদীনার দুধ শুকিয়ে গিয়েছে, এখন কাদিয়াননের দুধ সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও সতেজ রয়েছে। (আল ফযল পত্রিকা, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯২৯, ৩ জানুয়ারী, ১৯২৫, ১ জানুয়ারী, ১৯২৯, ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩২, আনোয়ারে খিলাফত, ১১৭ পৃষ্ঠা, খুতবায়ে ইলহামিয়া, ২২ পৃষ্ঠা, বারাহীনে আহমাদিয়া, ৫৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদেরকে মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্জ আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক সচ্ছল মুসলমানের জীবনে অন্তত একবার মক্কায় গিয়ে হজ্জ আদায় করতে হবে। কোনো ব্যক্তি যদি সামর্থ থাকার পরেও জীবনে হজ্জ আদায় না করে তাহলে বড় ধরনের গোনাহ্গার হিসেবে সাব্যস্ত হবেন। আর কেউ যদি হজ্জকে অস্বীকার করে তাহলে সে আর মুসলমান থাকবে না। কারণ হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের একটি। পক্ষান্তরে মির্জা গোলাম আহমাদের অনুসারীরা কাদিয়ান নামক স্থানে প্রত্যেক বছর যে সম্মেলন করে থাকে, এটাকেই তারা হজ্জ

হিসেবে পরিগণিত করে। **তারা বলে থাকে, মির্জা গোলাম আহমাদকে বাদ দিয়ে যে ইসলাম থাকে তা শুষ্ক ও প্রাণহীন। অনুরূপভাবে কাদিয়ানের এই হজ্জকে বাদ দিয়ে মক্কায় গিয়ে যে হজ্জ করা হয় সেটাও শুষ্ক ও প্রাণহীন।** হজ্জের সময় যেমন স্ত্রীসহবাস, দুষ্কর্ম ও ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ, অনুরূপভাবে কাদিয়ানের এই হজ্জে আগমন করেও ঐসব কর্ম করা নিষেধ। (বরকতে খিলাফত, পয়গামে সুলেহ, ১৯ এপ্রিল, ১৯৩৩, আল ফযল, ৫ জানুয়ারী, ১৯৩৩)

কাদিয়ানীদের হজ্জ নেই

ইসলামের সামগ্রীক রূপ অনুধাবন করতে অক্ষম হয়ে অথবা সাধারণ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ না করার কারণে মুসলমানদের মধ্যে কতক ক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা ও তাঁর গুণাবলী তথা তাওহীদ, রিসালাত-খাত্মে নবুয়্যাত, আখিরাত, আসমানী কিতাব, ফেরেশ্তা, নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়– যা সম্পূর্ণ ঈমান-আকিদার সাথে জড়িত, এসব বিষয়ে কোনো মুসলমানের মধ্যে মতপার্থক্য নেই। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীরা যাবতীয় মৌলিক বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিপথগামী করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তারা যেসব বিষয়ে বিভ্রান্তি করেছে, তা সম্পূর্ণ ঈমান-আকীদার সাথে জড়িত। এসব মৌলিক কারণে অধিকাংশ মুসলিম দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়েছে। **তারা মক্কায় উপস্থিত হয়ে হজ্জ আদায় করাকে সঠিক মনে করে না। মক্কার তুলনায় মির্জা গোলাম আহমাদের জন্মস্থান কাদিয়ানকেই অধিকতর উত্তম বলে বিবেচিত করে এবং সেখানে যে সম্মেলন করে থাকে, সেটাকেই তারা হজ্জ বলে বিবেচনা করে। কাদিয়ানীরা পবিত্র মক্কা-মদীনা ও আরাফাতের ময়দানের চাইতে তাদের নবী (?) গোলামের জন্মস্থান কাদিয়ানকে বেশী পবিত্র বলে বিশ্বাস করে।**

কোরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে ঈমান-আকীদাগতভাবে অমুসলিম হওয়ার কারণে সউদী আরবের বিশ্ব-বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামদের ফতোয়া অনুযায়ী সউদী সরকার কাদিয়ানীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করে তাদেরকে মক্কা-মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সুতরাং যাদের জন্য মুসলমানদের কলিজা মক্কা-মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ, তারা অবশ্যই অমুসলমান এবং বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে মুসলামনদেরকে [illegible] করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্তভাবে জরুরী। কারণ এরা মুসলিম

পরিচয়ে, মুসলিম নাম ও বেশ-ভূষা ধারণ করে ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদের ঈমান হরণ করার কাজে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, কাদিয়ানীরা এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধেও সুগভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। এ জন্য দেশের স্বার্থে সরকারীভাবে তাদের পরিচয় নির্ধারণ করতে হবে এবং এ ব্যাপারে সময় ক্ষেপণ করলে ক্ষতির মাত্রা বৃদ্ধিই পেতে থাকবে।

কাদিয়ানীদের পৃথক খোদা

সাধারণ মুসলমানদের সাথে কাদিয়ানীদের শুধু মির্জা গোলাম আহমাদের নবুয়্যাত দাবীর ভিত্তিতেই নয় বরং তাদের স্পষ্ট ঘোষণা অনুযায়ী সকল বিষয়ে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। কাদিয়ানীদের মুখপত্র আল ফজল পত্রিকায় ১৯১৭ সালে ২১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'তোলাবা কো নাছায়েহ' শীর্ষক কাদিয়ানী খলিফার বক্তৃতা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কাদিয়ানী ছাত্রদের সামনে আহমাদীদের সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের পার্থক্য কতটা তা ব্যাখ্যা করেছিলেন। উক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন–

ورنہ حضرت مسیح موعودنے تو فرمایا ھے کہ أن کا (یعنی مسلمانوںکا) اسلام اور ھمارا اور، ان کا خدا اور ھے اور ھمارا اور، ھمارا حج اور ھے ان کا حج اور، اسی طرح ان سے ھربات میں اختلاف ھے–

নতুবা হযরত মসীহে মওউদ তো এই কথাও বলেছেন যে, তাদের অর্থাৎ মুসলমানদের ইসলাম পৃথক, আমাদের ইসলাম পৃথক, তাদের খোদা পৃথক, আমাদের খোদা পৃথক, আমাদের হজ্ব পৃথক, তাদের হজ্ব পৃথক, এভাবে তাদের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে কাদিয়ানীদের বিশ্বাস

জিহাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। এ সম্পর্কে আমি আমার লেখা 'শাহাদাতই জান্নাত লাভের সর্বোত্তম পথ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। জিহাদ হচ্ছে ইসলামী জীবনের স্পন্দন, প্রাণশক্তি, অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। জিহাদই মুসলমানদের উন্নতির সোপান, এই কাজ থেকে বিরত থাকার অর্থই হলো, মুসলিম হিসেবে পৃথিবী থেকে নিজের নাম-নিশানা মুছে দেয়া। বর্তমানে মুসলমানরা জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে বলেই গোটা দুনিয়ার

অমুসলিম শক্তির দাসত্ব করতে তারা বাধ্য হচ্ছে। ঈমানদার ব্যক্তি মাত্রকেই জিহাদে লিপ্ত থাকতে হয়, এই জিহাদে আন্তরিকভাবে লিপ্ত না থাকলে কোন মুসলমানের পক্ষে ঈমানদার থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। একজন মানুষ যে মুহূর্তে ইসলাম গ্রহণ করে তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনে, সেই মুহূর্ত থেকেই জিহাদ করা তার ওপরে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তখন থেকেই শুরু হয় তার জিহাদী জীবন। এই জিহাদ নিরবচ্ছিন্নভাবে মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। ঈমান আনার মুহূর্ত থেকে আল্লাহ বিরোধী শক্তির সাথে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সূচনা ঘটে, যে সংগ্রামমুখর জীবনের সূত্রপাত হয়, এই সংগ্রামী জীবন থেকে ঈমানদারের অবসর ঘটে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এই সংঘাত ও সংগ্রাম থেকে মুমিন জীবনে মুহূর্তের জন্যেও বিশ্রাম গ্রহণ করার সামান্যতম অবকাশ নেই। নেই শৈথিল্য প্রদর্শনের কোন সুযোগ। কারণ যখনই সে জিহাদের ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে, আল্লাহ বিরোধী তাগুতী শক্তি সেই মুহূর্তেই তার ঈমান হরণ করার লক্ষ্যে চথুরমুখী আক্রমন শুরু করবে।

জিহাদের তিনটি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ হলো, চূড়ান্ত প্রচেষ্টা–অর্থাৎ প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে প্রাণ দেয়ার মতো পর্যায়ে উপনীত হওয়া। আরেকটি অর্থ হলো, বড় ধরনের প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিজের যাবতীয় উপায়-উপকরণ নিয়োজিত করা। জিহাদান কাবিরা তথা বড় ধরনের জিহাদের আরেকটি অর্থ হলো, ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো। অর্থাৎ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কোন একটি দিকও অপূর্ণ না রাখা এবং প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় ময়দান ত্যাগ না করা। প্রতিপক্ষের অনুকুল শক্তি ময়দানে যেসব স্থানে সক্রিয় রয়েছে, ময়দানের সেসব স্থানে নিজের শক্তি নিয়োজিত করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেসব ক্ষেত্রে কাজ করার প্রয়োজন হয়–সেসব দিকে কাজ করা। যেখানে নিজের ব্যবহার ও মধুর আচরণ দিয়ে জিহাদ করার প্রয়োজন, সেখানে তা প্রয়োগ করা। যেখানে কথা দিয়ে বা বক্তৃতা দিয়ে জিহাদ করা প্রয়োজন, সেখানে তা করা। যেখানে লেখনী দিয়ে জিহাদ করার ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে লেখনী শক্তি প্রয়োগ করা। যেখানে অস্ত্র ধারণ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়, সেখানে অস্ত্র ধারণ করা। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঈমানদারকে জিহাদ করতে হবে তার নিজের নফসকে আল্লাহর বিধানের অনুগত বানানো এবং নফসের যাবতীয় অবৈধ কামনা-বাসনা থেকে তাকে বিরত রাখার জন্য। তারপর শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে তার প্ররোচনা প্রতিহত করার লক্ষ্যে। জিহাদ করতে হবে মানবীয় প্রভুত্ব তথা জালিমদের বিরুদ্ধে তাদের জুলুম

বন্ধ করার জন্য এবং জিহাদ করতে হবে আল্লাহ বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাদের কুফরী কর্মকান্ড প্রতিরুদ্ধ করার লক্ষ্যে। জিহাদ করতে হবে আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম ঈমান সহকারে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে–আল্লাহর নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণের মাধ্যমে। জিহাদের বিষয়ে একটি কথা স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ যে বিকৃত ধারণা পৃথিবী ব্যাপী প্রচার করেছে এবং করছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা, তাদের চিন্তার জগৎ ইসলামের জিহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং এর অন্তর্নিহিত ভাবধারা সম্পর্কিত যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্য থেকে মুক্ত। তারা রক্তক্ষয়ী অকারণ যুদ্ধ আর ইসলামের জিহাদকে সমান্তরাল দৃষ্টিতে অবলোকন করে থাকে। পক্ষান্তরে ইসলাম যুদ্ধ নয়-জিহাদের বিধান মানব জাতির সামনে পেশ করেছে।

এ কথা আমি সূচনাতেই উল্লেখ করেছি যে, কাদিয়ানী মতবাদ পরিপুষ্টি লাভ করেছে ইংরেজদের ছত্রছায়ায় এবং ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরাই এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এই অমুসলিম শক্তির অন্যায় কার্যাবলীর বিরুদ্ধে কোনো মুসলমান যেন জিহাদে অবতীর্ণ না হয়, এ জন্যই তারা মুসলমানদের মধ্যে একটি দালাল গোষ্ঠী তৈরী করেছিল, যারা জিহাদ হারাম বলে ফতোয়া জারী করেছিল। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীও মুসলমানদেরকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার জন্য ঘৃণ্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। যে বৃটিশ শাসনের ছত্রছায়ায় কাদিয়ানীরা ধীরে ধীরে বর্তমানে দুশ্চিন্তা করার মত দীর্ঘ সংখ্যায় পৌছেছে সেই খৃস্টান বা ইংরেজ শাসনের প্রতি তারা সব সময়ই উচ্ছ্বসিত ও কৃতজ্ঞতাপ্রবণ। ইংরেজ শাসনের আনুগত্য প্রকাশ করতে গিয়ে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী বৃটিশ সরকারের প্রতি নিজ কাজের ফিরিস্তি দিয়ে বলেছে, 'আমার জীবনের বৃহত্তর অংশ বৃটিশ সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতায় ব্যয় হয়েছে। আমি জিহাদের বিরুদ্ধে এবং ইংরেজদের আনুগত্যের পক্ষে এতবেশী বই-পত্র লিখি ও ইশতেহার প্রচার করি, যদি সেগুলো একত্রিত করা হয়, তাহলে ৫০টি আলমারি তা দ্বারা পূর্ণ করা যাবে। এ বইগুলো আমি সমস্ত আরব দেশ, মিসর, সিরিয়া, কাবুল ও রোম পর্যন্ত পৌঁছে দেই।' (তিরয়াকুল কুলূব-১৫ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের রক্তে যাদের হাত রঞ্জিত এবং ইসলামের অগণিত আলিম-উলামা এবং স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদেরকে যে ইংরেজরা গাছের ডালে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছে, সেসব লাশ দাফন করতে না দিয়ে দিনের পর সেভাবেই ঝুলিয়ে রেখেছে, সেই ইংরেজদের গোলামীর চরম প্ররাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গোলাম লিখেছে–

میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جوقریباً ساٹھ برس کی

عمر تك پهنچا هوں اپنی زبان اور قلم سے اس اهم كام
میں مشغول هوں تا كه مسلمانوں كےدلوں كوگر نمنٹ
انگلشیه كی سچّی محبت اور خیر خواهی اور همدردی كی
طرف پهیراوں اور ان كے بعض كم فهموں كے دلوں سے غلط
خیال جهاد و غیره كو دُور كروں جو ان كو دلی صفائی اور
مخلصانه تعلقات سے روكتے هیں،

জীবনের প্রারম্ভকাল থেকে আজ প্রায় ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত আমার কলম ও জিহ্বাকে আমি নিয়োজিত রেখেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে। সেটা হল বৃটিশ সরকারের প্রতি সহানুভূতি, শুভেচ্ছা এবং সত্যিকারের ভালবাসা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করা এবং তাদের মধ্যে কম মেধাসম্পন্ন লোকদের হৃদয় থেকে জিহাদের চেতনাকে নিশ্চিহ্ন করা, যা তাদেরকে আন্তরিকতা ও অকৃত্রিম সম্পর্কের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। **আমি বিশ্বাস করি আমার অনুসারীদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই জিহাদী চেতনায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। কেননা আমাকে মাসীহ ও মাহদী হিসাবে গ্রহণ করা মানেই জিহাদী উদ্দীপনাকে প্রত্যাখ্যান করা।**' (শাহাদাতুল কোরআন- ১০-১৭পৃষ্ঠা)।

খৃস্টান বা ইংরেজ শক্তির বন্ধুরূপে জিহাদের বিপরীতে দীর্ঘদিন শ্রমদানকারী এই কাদিয়ানীদের আক্বীদা বা কার্যাবলী এদেরকে প্রকাশ্যে মুসলমানদের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড় করেছে এবং এরা কাফির শক্তির সাথে হাত মিলিয়েছে। সুতরাং এ কথা তরলের মতো সহজ হয়ে গেছে যে, মুসলমান বা কোরআন-হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থানরত কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিঃসন্দেহে এরা অভিশক্ত এবং শয়তানের অনুচর।

ইংরেজদের গোলামী ও কাদিয়ানী গোষ্ঠী

মির্জা গোলাম আহমাদ ইংরেজ প্রীতিতে গদগদ হয়ে লিখেছে–

بلكه اس گورنمنٹ كے هم پر اس قدر احسان هیں كه اگر
هم یهاں سے نكل جائی تونه همارا مكّه میں گزارا هو
سكتاهے اور نه قسطنطیه میں-توپهر كس طرح هو

سکتاھے کہ ھم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں

رکھیں-

প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রতি এই সরকারের অনেক বেশী অনুকম্পা রয়েছে। কারণ, এখান থেকে আমরা যদি বাইরে কোথাও যাই তবে আমাদের স্থান না মক্কায় হবে না কনস্ট্যান্টিনোপলে। এ অবস্থায় আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার বিরূপ ধারণা কিভাবে পোষণ করবো, এমন করা কিভাবে সম্ভব। (মলফুজাতে আহমাদীয়া, ১ম খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা)

যে মুহূর্তে ভারত বর্ষের মুসলমানরা কলিজার রক্ত ঢেলে দিয়ে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লক্ষ্যে আন্দোলন করছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে মির্জা গোলাম আহমাদ বৃটিশ সরকারের শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্যে কিভাবে দোয়া করেছেন দেখুন–

میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلاسکتاھوں نہ

مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل

میں مگراس گورنمنٹ ھیں جس کے اقبال کے لیے

دعاکرتاھوں،

আমি আমার কাজ না মক্কায় ভালোভাবে চালাতে পারি, না মদীনায়, না রোমে, না সিরিয়ায়, না ইরানে, না কাবুলে, কিন্তু এই সরকারের এলাকার মধ্যেই তা চলতে পারে, যে সরকারের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমি দোয়া করছি। (তাবলীগে রিসালাত, ৬ খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

স্বাধীন বাংলার শেষ নবাবকে হত্যা করে যারা ২০০ বছরের জন্য ভারত বর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতা হরণ করেছিল, সেই ঘৃণ্য ইংরেজদের রাজত্বকে মির্জা গোলাম আহমাদ খোদার নেয়ামত বলে গণ্য করে নিজের কাফির অনুসারীদেরকে উপদেশ দিয়ে লিখেছে–

یہ توسوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باھر نکل

جاؤ تو پھر تمھارا ٹھکانا کھاں ھے-ایسی سلطنت کابھلا نام

تولوجوتمھیں اپنی پناہ میں لے لے گی-ھر ایك اسلامی

سلطنت تمھیں قتل کرنے کے لے دانت پیس رھی ھے-کیونکہ

ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھیر چکے ہو-سو تم اس

خداداد نعمت کی قدرکرو اور تم یقیناً سمجھ لوکہ خداتعالی نے سلطنت انگریز میں تمھاری بھلائی کےلیے ہی اس ملك میں قائم کی ھیے اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تووہ آفت تمھیں بھی نابود کردےگی-اورکسی اور سلطنت کے زیرسا یہ رہ کر دیکہ لوکہ تم سےکیاسلوك کیاجاتا ہے-سنو،انگریزی سلطنت تمھارے لیے ایك رحمت ہے، تمھارے لیے ایك برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمھاری وہ سپرہے-پس تم دل وجان سے اس سپر کی قدرکرو-اور ہمارے مخالف جو مسلمان ھیں ھزاروں درجہ اُن سے انگریز بھتر ھیں کیونکہ وہ ھمیں واجب القتل نہیں سمھجتے-وہ تمھیں بے عزّت نہیں کرناچاہتی-

একটু ভেবে দেখো তোমরা যদি এই সরকারের আশ্রয় থেকে বাইরে চলে যাও, তবে তোমাদের স্থান কোথায় হতে পারে? এমন একটি রাষ্ট্রের নাম বলো, যারা তোমাদেরকে আশ্রয় দিবে। প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্রই তোমাদের হত্যার জন্য দাঁত বের করে রয়েছে। কেননা তাদের মতে তোমরা কাফির এবং মুরতাদ। অতএব খোদা প্রদত্ত এই নেয়ামতের যত্ন করো এবং তোমরা নিশ্চিতভাবে এ কথা বুঝে নাও যে, খোদা তা'য়ালা তোমাদের মঙ্গলের জন্যই এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যদি এই সরকারের ওপরে কোনো বিপদ দেখা দেয় তবে তা তোমাদেরকে ধ্বংস করবে। তোমরা একটু অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে কিছুদিন সেখানে বসবাস করে দেখো যে, তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয়? শুনো! ইংরেজদের রাজত্ব তোমাদের জন্য একটি বরকত এবং খোদার পক্ষ থেকে তা তোমাদের জন্য ঢাল স্বরূপ। অতএব তোমরা নিজেদের জান প্রাণ দিয়ে ঢালের যত্ন করো, হেফাজত করো, সম্মান করো। এবং আমাদের বিরোধী মুসলমানদের তুলনায় তারা অধিক শ্রেষ্ঠ। কারণ তারা আমাদেরকে হত্যার যোগ্য মনে করে না। তারা তোমাদেরকে অপদস্ত করতে চায় না। (তাবলীগে রেসালাত, ২য় খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

অগণিত আলিম-উলামা এবং পীর-মাশায়েখ হত্যাকারী ইংরেজদেরকে কাদিয়ানীরা নিজেদের জন্য খোদার রহমতের ছায়া হিসেবে উল্লেখ করে পত্রিকায় লিখেছে—

ایرانی گورنمنٹ نے جوسلوك مرزا علی محمد باب بانی فرقہ باھایہ اور اس کے بیکس مریدوں کےساتہ محض مذھبی اختلاف کی وجہ سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے وہ ان دانش مندلوگوں پر مخفی نہیں ھیں جوقوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ھیں-اور پھر سلطنت ٹرکی نےجوایك یورپ کی سلطنت کہلاتی ہے برتا ؤبہاء اللّٰہ بانی فرقہ باھایہ اور اس کے جلا وطن شدہ پیرووسے ۱۸٦۳ سے لے کر ۱۸۹۳ تك پھلے قسطنطنیہ پھر ایڑ ریانوپل اور بعد ازاں مکہ کے جیل خا نے میں کیا وہ بھی دنیا کے اھم داقعات پر اطّلاع رکھنے دالوں پر پوشیدہ نہیں ھے، دنیا میں ھمیں بڑی سلطنتیں کہلاتی ھیں..................لھزا تمام سچے احمدی جو حضرت مرزا صاحب کو مامور من اللّٰہ اور ایك مقدس انسان تصوّر کر تے ھیں بغیر کسی خوشامد اور چاپلوسیی کےدل سے یقین کرتے ھیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کےلیے فضل ایزدی اور سایئہ رحمت ہے اور اس کی ھستی کودہ اپنی ھستی خیال کرتے ھیں-

ইরান সরকার বাবিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আলী মোহাম্মাদ বাব এবং তার অসহায় অনুসারীদের সাথে ধর্মীয় মতবিরোধের কারণে যে ব্যবহার করেছে এবং এই সম্প্রদায়ের ওপরে যে অনাচার অত্যাচার করেছে তা সেসব জ্ঞানী লোকদের অজানা নেই, যারা জাতিসমূহের ইতিহাস পাঠে অভ্যস্ত। তাছাড়া তুর্কি রাজ্য, যা

ইউরোপের একটি রাজ্য নামে পরিচিত, বাহাই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বাহাউল্লা এবং তার নির্বাসিত অনুগামীদের সাথে ১৮৬৩ সাল থেকে ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত প্রথমে কুস্তুনতুনিয়ায় পরে আদ্রিয়ানোপলে এবং সর্বশেষে আক্কা জেলখানায় যে ব্যবহার করেছে তা দুনিয়ার উল্লেখযোগ্য ঘটনা সম্পর্কে যারা খোঁজ রাখেন তাদের কাছে অজানা নয়। দুনিয়ার বুকে তিনটি বড় রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত তিনটি রাষ্ট্রই সংকীর্ণতা এবং বিদ্বেষভাবের যে নমুনা বর্তমান সভ্যতার যুগে প্রদর্শন করেছে, তা আহমাদি জাতিকে নিশ্চিতভাবে এ কথা না বুঝিয়ে পারেনি যে, আহমাদিয়াদের স্বাধীনতা বৃটিশ সাম্রাজ্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং যেসব নিষ্ঠাবান আহমাদি হযরত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী সাহেবকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং একজন পবিত্র মহাপুরুষ হিসেবে মনে করে, অকুণ্ঠিতভাবে এবং শঠতা ব্যতীত তারা বিশ্বাস করে যে, বৃটিশ সরকার তাদের জন্য খোদার রহমতের ছায়া। সুতরাং বৃটিশ সরকারের অস্তিত্বকে তারা নিজেদের সত্বা বলে গণ্য করে, বিশ্বাস করে। (আল ফজল পত্রিকা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯১৪)

উপরোক্ত উদ্ধৃতি স্পষ্টভাষায় এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, মুসলমানদের জন্য যা চরম বিপদ, তাই নবুয়্যাতের দাবীদার এবং তাদের ভক্ত অনুরক্তদের জন্য সঠিক রহমত ও খোদার মেহেরবানী বলে বিবেচিত হয়। কারণ তারা ইংরেজদের ছায়াতলে থেকে মুসলমানদের মধ্যে নিত্য-নতুন নবুয়্যাতের আপদ এবং বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির নিরংকুশ স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র মুসলমানদের কাছে যা আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ রহমত, কাদিয়ানীদের কাছে তাই মহাবিপদ। কেননা, সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো মুসলমান সমাজ কোনো অবস্থায় আল্লাহ, রাসূল, কোরআন তথা ইসলামের অবমাননা অথবা সমাজ সংস্থাকে শতধাছিন্ন করার অপচেষ্টা সহ্য করতে পারে না।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি কাদিয়ানীদের অপবাদ

নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন মহান আল্লাহর একজন সম্মানীত নবী-রাসূল এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাঁকে আপন কুদরতে পিতা ব্যতীতই মাতৃগর্ভে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁকে বিশেষ ব্যবস্থায় পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং কিয়ামতের পূর্বে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী হয়ে আগমন করবেন। অথচ মহান আল্লাহর একজন সম্মানিত, পূত ও পবিত্র নবী-রাসূল সম্পর্কে কাদিয়ানীদের নেতা অভিশপ্ত গোলাম আহমাদ তাঁর সম্পর্কে কি জঘন্য মন্তব্য করেছে দেখুন, 'আমার তুলনায় ঈসা (আঃ)-এর মর্যাদা নগণ্য। ঈসা (আঃ)

মদ পান করতেন, তাঁর বংশধারা ছিল অপবিত্র। কারণ তাঁর তিনজন দাদী ও নানী ছিল যেনাকারিণী। বেশ্যাবৃত্তি করে তারা অর্থোপার্জন করতো। এ কারণে তিনিও বেশ্যাদের সাথে সময় অতিবাহিত করতেন এবং তাদেরকে ভোগ করতেন। তিনি বেশ্যাদের সেবা গ্রহণ করতেন, দুশ্চরিত্রা নারীরা তাঁর মাথায় তেল দিয়ে ও শরীরে আতর মেখে দিতো। কথায় কথায় তিনি অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করতেন। মিথ্যা কথা বলতেন, অধিক যেনা করার কারণে তাঁর পুরুষত্ব হ্রাস পেয়েছিল, ফলে তিনি স্ত্রীদের জৈবিক কামনা পূরণে ছিলেন অক্ষম। তার অভ্যাসই ছিল, আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত থাকা, তিনি ছিলেন আল্লাহর ইবাদাত বিমুখ খোদায়ী দাবীদার এক ব্যক্তি। এই লোকটি ছিল দুর্বল এবং তার মধ্যে জন্মের উৎস থেকেই অপবিত্রতা মিশ্রিত ছিল। (হাকীকাতুল ওহী, ১৪৮ পৃষ্ঠা, কিশতিয়ে নূহ, ৬৫ পৃষ্ঠা, সিত বচন, ১৭২ পৃষ্ঠা, রিভিউ অব রিলিজিয়ানস, প্রথম খন্ড, ১২৪ পৃষ্ঠা, নাসীমে দাওয়াত, ৬৭ পৃষ্ঠা, আনজামে আতহাম-এর পরিশিষ্ট, ৫ ও ৭ পৃষ্ঠা, নূরুল কোরআন, ২ য় খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা, নূরুল কোরআন, সংখ্যা ২, ৯ ও ৪৫ পৃষ্ঠা, বারাহীনে আহমাদিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা কাফির

নবুয়্যাত দাবীর স্বাভাবিক পরিণতি এই যে, যদি কোনো ব্যক্তি নবীর প্রতি ঈমান না আনে, তবে সে ব্যক্তি কাফির বলে গণ্য হতে বাধ্য। সুতরাং কাদিয়ানীরা তাই করেছে। যে সমস্ত মুসলমান মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে স্বীকৃতি দেয়নি, তাদেরকে তারা প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে কাফির হিসেবে ঘোষণা করেছে। তারা লিখেছে–

کل مسلمان جو حضرت مسیح موعودکی بعیت میں شامل نہیں ہو ئے، خواہ انہوں نےحضرت مسیح موعود کانام بھی سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ھیں-

যে সকল মুসলমান হযরত মসীহে মওউদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করেনি এমন কি যারা হযরত মসীহে মওউদের নাম পর্যন্ত শুনেনি তারাও কাফির, ইসলামের বাইরে। (মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমাদ প্রণীত আইনায়ে সাদাকাত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

সারা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে এই অভিশপ্ত কাদিয়ানী গোষ্ঠী কাফির বলার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। তারা লিখেছে–

ہرایك ایسا شخص جو موسی كومانتاہے مگرعیسی کو نہی

مانتا یا عیسی کومانتا ھے مگر محمد کونھی مانتا، یامحمد کو مانتا ھے مگر مسیح موعود کو نھی مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکّا کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ھیں–

যে ব্যক্তি মুসাকে স্বীকার করে অথচ ঈসাকে স্বীকার করে না, অথবা ঈসাকে স্বীকার করে কিন্তু মুহাম্মাদকে স্বীকার করে না, কিংবা মুহাম্মাদকে স্বীকার করে কিন্তু মসীহে মওউদকে স্বীকার করে না, সে ব্যক্তি শুধু কাফির নয় বরং পরিপূর্ণ কাফির এবং ইসলামের গন্ডী বহির্ভূত। (কালেমাতুল ফযল, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ১১০ পৃষ্ঠা)

পৃথিবীতে যারা কাদিয়ানী নয়, তারা কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে কোনোক্রমেই মুসলমান হতে পারে না। তারা লিখেছে–

ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ھیں اور غیر احمدی آپ کونبی نھی مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی نبی کاانکار بھی کفر ھیں غیر احمدی کافر ھیں–

আমরা যেহেতু মির্জা সাহেবকে নবী হিসেবে স্বীকার করি এবং যারা কাদিয়ানী নয় তারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে না, এই কারণেই কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একজন নবীকেও অস্বীকার করা যদি কুফরী হয়, তবে যারা আহমাদী নয় তারাও কাফির। (গুরুদাসপুর সাব জজের এজলাসে মির্জা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমাদ কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি ঃ ২৬-২৯শে জুন ১৯২২ প্রকাশিত আল ফযল পত্রিকা দ্রষ্টব্য)

অভিশপ্ত কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমান নারী-পুরষদের অশালীন ভাষায় গালি দিয়ে লিখেছে–যে ব্যক্তি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর আনুগত্য করবে না, তার কাছে বাইয়াত হবে না বরং বিরোধিতা করবে, সে খোদা ও রাসূলের অমান্যকারী এবং জাহান্নামী। যারা তাকে মানে না, অস্বীকার করে তারা বনের শূকর এবং তাদের স্ত্রীরা কুকুরীর অধম। (নজমূল হুদা, তাবলীগে রিসালাত, ৯ খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পেছনে নামায আদায় করা নিষেধ

কাদিয়ানীরা মুসলমানদের সাথে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করে একটি পৃথক সম্প্রদায় হিসেবে নিজেদের সমাজ-সংগঠনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা লিখেছে–

حضرت مسیح موعود علیہ السّلام نے سختی سے تاکید فرماتیٔ ہے کہ کسی احمدی کوغیراحمدی کے پسچھے نماز نھی پڑھنی چاہیے-باہرسے لوگ اس کے متعلق باربار پوچھتے ھیں-میں کھتاھوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ بھی میں یہی جواب دوںگا........کہ غیر احمدی کے پسچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، جائز نہیں،جائز نہیں،

হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) অত্যন্ত কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন যেন কোনো আহমাদী অন্যের পিছনে নামায না পড়ে। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক বার বার এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করছে। আমি বলছি, তোমরা যতবার জিজ্ঞাসা করবে ততবার আমি এই উত্তর দিব যে, অ-কাদিয়ানীদের পিছনে নামায পড়া জায়েয নেই, জায়েয নেই, জায়েয নেই। (আনওয়ারে খেলাফত-৮৯ পৃষ্ঠা)

মুসলমানদের পিছনে নামায আদায় না করার ব্যাপারে তারা আরো লিখেছে-

ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کومسلمان نہ سمجھیی اور ان کے پچھیے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیك وہ خدا تعالے کے ایك نبی کے منکر ھیں-

অ-কাদিয়ানীদেরকে মুসলমান মনে না করাই আমাদের উচিত। তাদের পিছনে নামায পড়াও আমাদের উচিত নয়। কারণ তারা খোদা তা'য়ালার একজন নবীকে অস্বীকার করে। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯০ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমান শিশুরাও কাফির-জানাযা পড়া যাবে না

মুসলমানদেরকে কাদিয়ানীরা কাফির মনে করে। এ কারণে কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তারা জানাযায় অংশগ্রহণ করে না। পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চৌধুরী জাফরুল্লাহ খান ছিলেন কাদিয়ানী। মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ তথা কায়েদে আযম ইন্তেকাল করলে তিনি মৃতদেহের পাশে ছিলেন, কিন্তু জানাযায় অংশগ্রহণ করেননি। কাদিয়ানীরা লিখেছে-

اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مرجائے تو اس کاجنازہ

کیوں نہ پڑھا جائے، وہ تو مسیح موعودکا منکر نہیں؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندو اور عیسائیوں کے بچوں کاجنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ غیراحمدی کابچہ بھی غیراحمدی ہوا، اس لیے اس کاجنازہ بھی نہی پڑھنا چاہئے-

কাদিয়ানী নয় এমন কোনো ছোট শিশু-সন্তান মারা গেলে তার জানাযার নামায কেনো পড়া হবে না? কারণ শিশুটি তো আর মসীহে মওউদকে অস্বীকার করে না। আমি এই প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যদি এ কথা সত্যই হবে, তাহলে হিন্দু এবং খৃষ্টান শিশুদের জানাযা পড়া হয় না কেনো? অ-কাদিয়ানীদের সন্তানও অ-কাদিয়ানীই পরিগণিত হবে। এই কারণে তাদের জানাযা পড়া উচিত নয়। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩ পৃষ্ঠা)

যারা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকার করে না, তারা কাফির এবং তাদের জানাযা পড়া যাবে না। স্বয়ং গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী তার বড় পুত্র মৃত্যুবরণ করলে পুত্রের জানাযায় তিনি অংশগ্রহণ করেননি। কারণ তার পুত্র তাকে নবী হিসেবে স্বীকার করতো না। (আল ফযল, ৯ খন্ড, সংখ্যা ৪৭, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯২১)

যারা কাদিয়ানী নয়, তাদের কাফির হওয়ার বিষয়টি দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং কাফিরদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা জায়েয নেই। (আল ফযল, ৮ খন্ড, সংখ্যা ৭৯, ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯২১)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমান ও খৃষ্টানদের মধ্যে পার্থক্য নেই

নবী করীম (সাঃ) খৃষ্টানদের সাথে যেমন ব্যবহার করতেন, হযরত মসীহে মওউদ অ-কাদিয়ানীদের সাথে ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করতেন। অ-কাদিয়ানীদের সাথে আমাদের নামায পৃথক করা হয়েছে। তাদেরকে আমাদের কন্যা দান হারাম করা হয়েছে। তাদের জানাযা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। এখন আর অবশিষ্ট থাকলো কি? যে বিষয়ে আমরা তাদের সাথে একত্রে থাকতে পারবো? পারস্পরিক যোগাযোগ দু'প্রকারের। একটি ধর্মীয় আর অপরটি পার্থিব। ধর্মীয় যোগাযোগ স্থাপনের মূলসূত্র হলো ইবাদতের ঐক্য। আর পার্থিব সম্পর্কের বুনিয়াদ হলো আত্মীয়তা স্থাপন। কিন্তু এই উভয় প্রকারের সম্পর্ক আমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে। যদি বলো যে, তাদের কন্যা গ্রহণের অনুমতি তোমাকে দেয়া হলো কেনো?

তার উত্তর হলো, হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক সময় নবী করীম (সাঃ) ইয়াহূদীকেও সালামের জবাব দিয়েছেন। (কালেমাতুল ফযল, রিভিউ অব রিলিজিয়নস, ১৬৯ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের সাথে বিয়ে হারাম

কাদিয়ানী সম্প্রদায় মুসলমানদেরকে অমুসলিম কাফির মনে করে বিধায় তারা তাদের মেয়েকে কোনো মুসলমানের সাথে বিয়ে দেয়া হারাম মনে করে। তাদের নিজেদের একটি ঘটনা সম্পর্কে তারা লিখেছে–

حضرت مسیح موعود نے اُس احمدی پرناراضگی کا اظہارکیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کودی، آپ سے ایك شخص نے باربار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کویہی فرمایا کہ لڑکی کوبٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو،آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو لڑکی دےدی تو حضرت خلیفة اوّل نے اس کواحمدیوں کی امامت سے ہٹادیا اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کےچھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجود یکہ وہ باربار توبہ کرتا رھا-

যে কোনো আহমাদী নিজের মেয়েকে অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিবে তার সম্পর্কে হযরত মসীহে মওউদ অত্যন্ত রুষ্টভাব প্রকাশ করেছেন। এক ব্যক্তি তার কাছে বার বার একথা জিজ্ঞেস করলো এবং বিভিন্ন অসুবিধার কথা জানলো। কিন্তু তিনি সেই লোকটিকে বললেন যে, মেয়েকে অবিবাহিত রাখো, তবুও অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিও না। মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর মৃত্যুর পরে সেই লোকটি নিজের মেয়েকে অ-কাদিয়ানীর সাথে বিয়ে দিলে প্রথম খলিফা তাকে ইমামের পদ থেকে অপসারণ করেন, তাকে আহমাদী জামায়াত থেকে বহিষ্কার করেন; এবং তার খেলাফতের ৬ বছর সময়ের মধ্যে লোকটির তওবা পর্যন্ত কবুল করেননি; যদিও লোকটি বার বার তওবা করেছিল। (আনওয়ারে খেলাফত, ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠা)

যারা কাদিয়ানী নয় তাদের সাথে নিজের মেয়েকে বিয়ে দেবে না। দিলে গোনাহ্গার

হবে। তবে তাদের মেয়েকে বিয়ে করায় কোনো দোষ নেই। (আল হাকাম, ১৪ এপ্রিল সংখ্যা, ১৯০৮)

কাদিয়ানীদের পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

১৯৩১ সালের ৩০শে জুলাই আল ফজল পত্রিকায় কাদিয়ানী খলিফার অন্য একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, গোলাম আহমাদের জীবদ্দশায় কাদিয়ানীদের জন্য পৃথক একটি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন সম্পর্কে যে আলোচনা চলছিল তার উল্লেখ রয়েছে। তখন এই প্রশ্ন নিয়ে কাদিয়ানীদের মধ্যে বিশেষ মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একদল কাদিয়ানীর মতে পৃথক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তারা বলতো যে, আমাদের সাথে সাধারণ মুসলমানদের পার্থক্য মাত্র কয়েকটি বিষয়ে, কিন্তু হযরত মসীহে মওউদ তার সমাধান করেছেন। তিনি সে সকল বিষয়ে প্রমাণাদি বলে দিয়েছেন। অন্যসব বিষয়ে সাধারণ মাদ্রাসাসমূহে শিক্ষা লাভ করা যায়!

কাদিয়ানীদের একটি দল এই মতের বিরোধিতা করছিল। ইতোমধ্যে মির্জা গোলাম আহমদ সাহেব সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি সব কথা শুনার পরে নিজের রায় দিলেন। উক্ত রায় সম্পর্কে খলিফা সাহেব উল্লেখ করেছেন, একথা ভুল যে, অন্যান্যদের সাথে আমাদের বিরোধ শুধু ওফাতে মসীহ্ অথবা মাত্র কয়েকটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেছেন যে, আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা, রাসূলে করীম (সাঃ), কোরআন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি মোটকথা তিনি বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তাদের (মুসলমানদের) সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদের বিরোধ রয়েছে।

মাওঃ শাহ্ আতাআল্লাহ্ বোখারীর সাথে কাদিয়ানী নেতার কথোপকথন

এই ঘৃণ্য ব্যক্তির সাথে একবার মাওলানা শাহ্ আতাআল্লাহ্ বোখারী (রাহঃ)-এর বিতর্ক হয়েছিলো। শাহ্ আতাআল্লাহ (রাহঃ) মির্জা গোলাম আহমাদকে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি নিজেকে যে নবী বলে দাবী করছো, এই সাহস তুমি কোথায় পাচ্ছো?

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, ঐ অভিশপ্ত লোকটিকে তিনি একথা বলেননি যে, তুমি যে নবী তার প্রমাণ কি? কারণ ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বলেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী হিসেবে দাবী করবে, তার কাছে তার নবুয়্যাতের প্রমাণ চাওয়াও জায়েয নেই। কারণ আল্লাহর রাসূল ঘোষণা করেছেন, আমার পরে আর

কোনো নবী আসবে না। প্রমাণ চাওয়ার অর্থই হলো, রাসূলের কথার প্রতি সন্দেহ পোষণ করা এবং এ কথা প্রতিষ্ঠিত করা যে, প্রমাণ দিতে পারলে তাকে নবী হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ জন্য শাহ্ আতাআল্লাহ বোখারী (রাহঃ) প্রমাণ দাবী না করে প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি নবুয়্যাত দাবী করার সাহস কোথায় পাচ্ছো। গোলাম আহমাদ জবাবে কোরআনের সূরা আস-সাফ-এর ৬ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিল–

يَأْتِيْ مِنْ م بَعْدِي اسْمُه اَحْمَدُ–

আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহ্মাদ।

অর্থাৎ আমার কথা তো কোরআনেই বলা হয়েছে যে, তোমার (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পরে যিনি নবী হিসেবে আগমন করবেন, তার নাম হবে আহমাদ।

মাওলানা শাহ্ আতাআল্লাহ বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা একথা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে বলেছিলেন যে, তোমার পরে যিনি নবী-রাসূল হিসেবে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ। তিনি তাঁর জাতিকে এ সম্পর্কে যা কিছু বলেছিলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তা এভাবে পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করেছেন–

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يبَنِيْ اسْرَاءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْ بَعْدِيْ اسْمُه اَحْمَدُ–

এবং স্মরণ করো মরিয়ম পুত্র ঈসার সেই কথা, যা সে বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, সত্যতা বিধানকারী সেই তওরাতের যা আমার পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর সুসংবাদ দাতা এমন একজন রাসূলের যে আমার পরে আসবে, যার নাম হবে আহ্মাদ। (সূরা সাফ-৬)

হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমন সম্পর্কে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি তো গোলাম আহমাদ। অর্থাৎ শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আরেকটি নাম আহ্মাদ। তুমি হলে সেই আহমাদের গোলাম।

অভিশপ্ত লোকটি কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে বললো, আমার নাম গোলাম আহমাদ। নামের প্রথম অংশ ছেড়ে দিলে আমিই তো আহমাদ হই।

মাওলানা বললেন, তোমার যুক্তি অনুসারেই তোমাকে বলছি, আমার নাম হলো আতাআল্লাহ্। আমার নামের প্রথম অংশ আতা ছেড়ে দিলে অবশিষ্ট থাকে আল্লাহ। আমি তোমার যুক্তি অনুসারে সেই ভিত্তিতেই বলছি, তোমার মতো অভিশপ্ত গাধাকে আমি নবী হিসেবে প্রেরণ করিনি।

পরবর্তীতে অভিশপ্ত মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয় এবং মল ত্যাগের সময় মলমূত্রের কূপে পড়ে গিয়ে মলমূত্র গলধকরণ করে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে যায়। পায়খানায় পড়ে যাবার বিষয়টি তার অনুসারীরা তৎক্ষণাত জানতে পারেনি। ফলে তার অনুসারীরা নিজেদের নবীর অনুসন্ধান করতে থাকে। তিনদিন পর তাকে দুর্গন্ধময় পায়খানার মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এভাবেই অপমানের সাথে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী লা'নাতুল্লাহি আলাইহি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করে জাহান্নামে পৌঁছে যায়।

কাদিয়ানী রাষ্ট্র গঠনের প্রত্যাশা

'বৃটিশের জুলুমশাহীকে খোদার রহমত এবং মুসলমানদের স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহকে আপদ মনে করেই কাদিয়ানীরা বিরত থাকেনি। বরং তাদের মধ্যে পাকিস্তানের কোনো এলাকায় একটি কাদিয়ানী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের তীব্র আকাঙ্খা দেখা দিয়েছে। ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর মাত্র এক বছর পর ১৯৪৮ সালের ২৩শে জুলাই কাদিয়ানীদের মুখপত্র আল ফজল পত্রিকার ১৩ই আগস্ট সংখ্যায় লেখা হয়েছে, বৃটিশ-বেলুচিস্তান এখন যা পাক-বেলুচিস্তান নামে পরিচিত, এখানের লোকসংখ্যা মাত্র পাঁচ লক্ষ। যদিও এর জনসংখ্যা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনেক কম, তথাপি একটি ইউনিট হিসেবে এর গুরুত্ব অনেক। পৃথিবীতে যেমন মানুষের মর্যাদা, তেমনি মর্যাদা ইউনিটেরও। উদাহরণ হিসেবে মার্কিন শাসনতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। সেখানে সিনেট সভার সদস্যগণ স্টেটের জনসংখ্যা ১০ কোটি-না, এক কোটি। সকল স্টেটের পক্ষ হতে সমান সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করা হয়। মোটকথা পাক-বেলুচিস্তানের জনসংখ্যা মাত্র ৫/৬ লক্ষ। এই সংগে যদি বেলুচিস্তানের দেশীয় রাজ্যগুলোও ধরা হয়, তবে লোকসংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ১১ লক্ষ। কিন্তু যেহেতু এটা একটি ইউনিট, এই কারণে তার গুরুত্ব অনেক। জনসাধারণের অধিকাংশকে আহমাদি মতে দীক্ষিত করা কঠিন; কিন্তু অল্পসংখ্যক লোককে আহমাদি মতে দীক্ষিত করা তেমন কঠিন নয়। সুতরাং আহমাদি জামায়াত যদি এই বিষয়ের প্রতি পূর্ণরূপে গুরুত্বারোপ করে, তবে এই প্রদেশটিকে অতি শীঘ্রই কাদিয়ানী বানানো সম্ভব হবে। তোমরা একথা স্মরণে রেখো যে, আমাদের

ঘাঁটি বা ভিত্তিমূল মজবুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের প্রচার সফল হতে পারে না। প্রথমে যদি ভিত্তিমূল বা ঘাঁটি মজবুত হয়, তবেই প্রচার-প্রসার লাভ করে। এখন তোমরা নিজেদের ঘাঁটি নির্মাণ করো, যে কোনো দেশে হোক না কেনো। আমরা যদি গোটা প্রদেশটিকে আহমাদি বানাতে পারি, তাহলে অন্তত একটি প্রদেশতো এমন হবে যাকে আমরা নিজেদের প্রদেশ বলে ঘোষণা করতে পারবো। আর এই কাজ অতি সহজেই হতে পারে।'

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে কাদিয়ানীদের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়। ক্ষমতা দখলের মাধ্যমে কাদিয়ানীরা পাকিস্তানকে কাদিয়ানী রাষ্ট্রে পরিণত করার যে নীল নকশা প্রণয়ন করেছিল, উলামায়ে হক্কানীর সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপের কারণে তা ভন্ডুল হয়ে যায়।

কাদিয়ানীদের বক্তৃতা, বিবৃতি, কার্যাবলী ও গ্রন্থ থেকে উদ্ধতি দিতে গেলে বিশাল আকারের এক গ্রন্থ রচিত হবে। আমি তাদের গ্রন্থ থেকে যেসব উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছি, তা পাঠ করলে ইসলাম সম্পর্কে নূন্যতম জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির কাছেও একথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নয় এবং কেনো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। এখন আমি খাত্‌মে নবুয়্যাত ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কোরআন-হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করবো। আশা করি এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, কাদিয়ানীবাদ মুসলিম নামধারী একটি কাফির সম্প্রদায়ের নাম। শুধু তাই নয়, মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে একটি অঘোষিত চ্যালেঞ্জ। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে একটি দুষ্টক্ষত, এক মহামারী, ইসলাম ও নবীদ্রোহী অপশক্তি। তাই তাদের মরণ ছোবল থেকে ভাবী প্রজন্মকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবং মুসলিম মিল্লাতের ঈমান রক্ষার্থে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গীন জিহাদে শরীক হওয়া ঈমানদীপ্ত প্রতিটি মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। কাদিয়ানীরা মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করছে এবং যারা তাদের সমর্থনে বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছে বা তাদের পক্ষাবলম্বন করেছে, তারা মুসলমান হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করতে পারে কি না– এই আলোচনা থেকে এ কথাও স্পষ্ট প্রতিভাত হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

বিশ্বনবীই খাতিমুন নাবিয়্যীন

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ–وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا–

(হে লোকেরা!) মুহাম্মাদ তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে কারোর পিতা নন কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী আর আল্লাহ সব জিনিসেরই জ্ঞান রাখেন। (সূরা আহযাব-৪০)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে কোরআনুল কারীমের বহুস্থানে উল্লেখ করেছেন যে, তিনিই কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমরা এখানে পবিত্র কোরআন থেকে মাত্র দুটো আয়াত উল্লেখ করছি।

قُلْ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا–

হে রাসূল! আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল। (আল কোরআন)

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا–

আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির নিকট সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। (আল কোরআন)

বর্তমান পৃথিবীতে একটি জনগোষ্ঠী যারা কাদিয়ানী নামে পরিচিত, তারা খত্‌মে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে ফেতনা সৃষ্টি করেছে। তারা সূরা আহযাবের উল্লেখিত আয়াতের 'খাতামান নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ করে থাকে 'নবীদের মোহর'। তারা বুঝাতে চায়, নবী করীম (সাঃ) এর পরে তাঁর মোহরাঙ্কিত হয়ে আরো অনেক নবী পৃথিবীতে আগমন করবেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো নবুয়্যাত বিশ্বনবীর মোহরাঙ্কিত না হয় ততক্ষণ তিনি নবী হতে পারবেনা না। পক্ষান্তরে উল্লেখিত আয়াতটি যে ঘটনা পরম্পরায় বিবৃত হয়েছে, তাকে সেই বিশেষ পরিবেশে রেখে বিচার করলে, তা থেকে ঐ অর্থ গ্রহণ করার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট থাকে না।

কিন্তু যারা উল্লেখিত অর্থ গ্রহণ করেছে, যদি সে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যে উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তাই বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রকৃত উদ্দেশ্যেরও পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। এটা কি নিতান্ত অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথা নয় যে, হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) এর তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) সাথে নবী করীম (সাঃ) এর বিয়ের বিরুদ্ধে উত্থিত প্রতিবাদ এবং তা থেকে সৃষ্ট নানা ধরণের সংশয়-সন্দেহের উত্তর দিতে গিয়ে সূরা আহযাবের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয় সহসা সে আয়াতের মাঝে বলে দেয়া হলো যে, 'মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন নবীদের মোহর।

অর্থাৎ ভবিষ্যতে যত নবী আগমন করবেন তারা সবাই মুহাম্মাদ (সাঃ) এরই মোহরাঙ্কিত হবেন।' হযরত যয়নব (রাঃ) এর ঘটনার মাঝখানে এ কথাটির আকস্মিক আগমন শুধু অবান্তরই নয়, এ থেকে উক্ত বিয়ের প্রতিবাদ কারীদেরকে যে যুক্তি পেশ করা হচ্ছিলো তাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকারীদের হাতে একটা চমৎকার সুযোগ আসতো এবং তারা সহজেই নবী করীম (সাঃ) কে বলতে পারতো যে, 'আপনি যয়নবকে বিয়ে করে পালক পুত্রের প্রথা রহিত করতে না-ও পারতেন, এ প্রথা রহিত করতে গিয়ে আজ যে অপবাদের মোকাবিলা আপনাকে করতে হচ্ছে, এ থেকে অন্তত নিষ্কৃতি পেতেন। কেননা এই অর্থহীন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী প্রথাটা যদি একান্তই বাতিল করার প্রয়োজন হতো, তাহলে আপনার পরে আপনার মোহরাঙ্কিত হয়ে যেসব নবী আসবেন, তারাই তো এই প্রথাটি বাতিল করতে পারতেন।'

কিন্তু আরবী ভাষার অধিকারী আরববাসী এ ধরণের কোনো প্রশ্ন নবী করীম (সাঃ) এর সামনে উত্থাপন করেনি। 'খাতমুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ যদি বর্তমানে মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবিদারদের অনুরূপ হতো, তাহলে আরবের লোকজন নবী করীম (সাঃ) এর সম্মুখে তেমন কোনো প্রশ্ন অবশ্যই উত্থাপন করতো। আরবদের তুলনায় বর্তমানের কাদিয়ানী গোষ্ঠী কি আরবী ভাষায় অধিক দক্ষ? এই কাদিয়ানী গোষ্ঠী কোরআনের উক্ত আয়াতের আরেকটি অর্থ করেছে যে, 'খাতামুন নাবিয়্যীন'–এর অর্থ হলো, 'আফজালুন নাবিয়্যীন' অর্থাৎ নবুয়্যাতের দরোজা উন্মুক্তই রয়েছে, তবে কিনা নবুয়্যাত পূর্ণতা লাভ করেছে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওপর।

কিন্তু তাদের এ অর্থ গ্রহণ করতে গিয়েও পূর্বোল্লিখিত বিভ্রান্তির পুনরাবির্ভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মূল ঘটনার অগ্রপশ্চাতের সাথে এ ধরনের কোনো ব্যাখ্যার সাদৃশ্য নেই। বরং তাদের সে ব্যাখ্যা পূর্বাপরের ঘটনা পরম্পরার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থই প্রকাশ করে। তদানীন্তন কালের কাফির ও মুনাফিকরা নবী (সাঃ) কে বলতে পারতো, 'হে মুহাম্মাদ (সাঃ)! আপনার চেয়ে কম মর্যাদা সম্পন্ন নবী যখন আপনার পরে আসতেই থাকবে, তখন এ পালক পুত্র রহিতকরণের কাজটা তাদের ওপরই ছেড়ে দিতেন, এই প্রথার ইতি যে আপনাকেই ঘটাতে হবে এমন বাধ্যবাধকতা তো নেই।'

আভিধানিক অর্থে খাতামুন শব্দ

আরবী ভাষায় এই শব্দটি খাতাম-ও হয় আবার খাতিম-ও হতে পারে। এ শব্দটি ক্রিয়াবাচক হতে পারে আবার শেষ অর্থে নাম ও পদ-ও হতে পারে। যা দিয়ে শেষ

করা হয় এ শব্দটি সে অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। অর্থাৎ এই শব্দ ব্যবহার করে নবুয়্যাতের দ্বার চিরতরে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন পত্র লেখা শেষ করে খাম বন্ধ করার পর পত্রের ওপরে গালা লাগিয়ে সীল মেরে পত্রের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়, যেন যার উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করা হলো, সেই প্রাপক ব্যতীত অন্য কেউ উক্ত পত্র খুলতে সক্ষম না হয়। পক্ষান্তরে সূরা আহযাবে ব্যবহৃত খাতাম শব্দটির মাত্র একটি অর্থই হতে পারে। সে অর্থ হলো, নবুয়্যাতের দ্বার কিয়ামত পর্যন্ত রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর পরে কোনো নবী আগমনের অবকাশ নেই, অবকাশ নেই রিসালাতের। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম ও তাঁদের পরবর্তীকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রচিত কোরআনের অভিধান, তাফসীর ও ইতিহাসের এ বিষয়ে এটাই শেষ কথা। এ সম্পর্কে দুইজন গবেষকও দ্বিমত প্রকাশ করেননি।

যে ঘটনা উপলক্ষে কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল, তার পূর্বাপর ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, এখানে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নবুয়্যাতের ক্রমধারার পরিসমাপ্তি ঘোষণা অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) এর পর আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু শুধু পূর্বাপর সম্পর্কের দিক দিয়েই নয়, আভিধানিক অর্থের দিক দিয়েও এটিই একমাত্র সত্য। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ বাক্য অনুযায়ী 'খতম' শব্দের অর্থ হলো, মোহর লাগানো, বন্ধ করা, শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং কোনো কাজ শেষ করে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি লাভ করা। যেমন 'খাতামাল আমাল' শব্দের অর্থ হলো, 'ফারাগা মিনাল আমাল' অর্থাৎ কাজ শেষ করে ফেলেছে।

'খাতামাল ইনায়া' শব্দের অর্থ হলো, পত্র বন্ধ করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে আসতে এবং বাইরে থেকে ভেতরে যেতে না পারে। 'খাতামাল আলাল কাল্‌ব' শব্দের অর্থ হলো, দিল বা হৃদয়ের ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে। এরপর কোন কথা আর সে অনুধাবন করতে পারবে না এবং তার ভেতরে জমে থাকা কোনো কথা বাইরে বের হতে পারবে না। 'খিতামু কুল্লি মাশরুব' শব্দের অর্থ হলো, কোন পানীয় পান করার পর শেষে যে স্বাদ অনুভূত হয়।

'খাতিমাতু কুল্লি শাইয়িন আকিবাতুহু ওয়া আখিরাতুহু' বাক্যের অর্থ হলো, প্রত্যেক জিনিসের 'খাতিমা' অর্থ হলো তার পরিণাম এবং শেষ। 'খাতামাশ্‌ শাইয়্যি বালাগা আখিরাহ' কথার অর্থ হলো, কোনো জিনিসকে খতম করার অর্থ হলো তার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া। 'খত্‌মে কোরআন' বলতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং এ

অর্থের ভিত্তিতে প্রত্যেক সূরার শেষ আয়াতকে বলা হয় 'খাওয়াতিম।' খাতামুল কওমে আখেরুহুম-শব্দের অর্থ হলো, খাতামুল কওম অর্থ জাতির শেষ ব্যক্তি। (লিসানুল আরব, কামুস এবং আকরাবুল মাওয়ারিদ)

ঠিক এ কারণেই সমস্ত অভিধান বিশারদ এবং মুফাস্‌সিরীনে কেরাম 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন, আখিরুন নাবিয়্যীন অর্থাৎ নবীদের শেষ। আরবী অভিধান এবং প্রবাদ অনুযায়ী 'খাতাম'–এর অর্থ ডাক ঘরের মোহর নয়, যা চিঠির ওপর লাগিয়ে চিঠি ডাকে দেয়া হয়, বরং সেই মোহর যা খামের মুখে এ উদ্দেশ্যে লাগানো হয় যে, তার ভেতর থেকে কোনো জিনিস বাইরে বের হতে পারবে না এবং বাইরের কোন জিনিস ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে খত্‌মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা বা কাদিয়ানী গোষ্ঠী আল্লাহর দ্বীনের সুরক্ষিত ঘরে ছিদ্র করার জন্য এসব আভিধানিক অর্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলেছে। তারা বলতে চায়, কোনো ব্যক্তিকে 'খাতামুশ শো'য়ারা' 'খাতামুল ফোকাহা' অথবা 'খাতামুল মুফাস্‌সিরীন' বললে এ অর্থ গ্রহণ করা হয় না যে, যাকে ঐ পদবী দেয়া হয়, তারপরে আর কোনো কবি, আইনবিদ ও ব্যাখ্যাকারী সৃষ্টি হননি। বরং এর অর্থ এই হয় যে, ঐ ব্যক্তির ওপরে উল্লেখিত বিদ্যা অথবা শিল্পের পূর্ণতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অথবা কোনো বস্তুকে অত্যধিক ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ ধরণের পদবী ব্যবহারের ফলে কখনো খতম–এর আভিধানিক অর্থ 'পূর্ণ' অথবা 'শ্রেষ্ঠ' হয় না এবং 'শেষ' অর্থে এর ব্যবহার ত্রুটিপূর্ণ বলেও গণ্য হয় না।

একমাত্র ব্যাকরণ-রীতি সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিই এ ধরণের কথা বলতে পারেন। কোন ভাষারই নিয়ম এটা নয় যে, কোনো একটি শব্দ তার আসল অর্থের পরিবর্তে কখনো কখনো দূর সম্পর্কের অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হলে সেটাই তার প্রকৃত অর্থে পরিণত হবে এবং প্রকৃত আভিধানিক অর্থে তার ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। একজন আরবী ভাষী আরেকজনকে যখন বলবে, 'জাআ খাতামুল কওম' তখন কখনো সে মনে করবে না যে, গোত্রের শ্রেষ্ঠ অথবা কামিল ব্যক্তি এসেছে। বরং সে মনে করবে যে, গোত্রের সবাই এসে গেছে, এমনকি অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্তও এসেছে।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোনো মানুষকে যখন তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'খাতামুশ শো'য়ারা', 'খাতামুল ফুকাহা' ও 'খাতামুল মুহাদ্দিসীন' ইত্যাদি উপাধি দান করা হয়, এ ধরণের উপাধি মানুষ কর্তৃকই আরেকজন মানুষকে দেয়া হয়। আর মানুষ যে ব্যক্তিকে কোনো গুণের ক্ষেত্রে 'শেষ' বলে দিচ্ছে তারপরে ঐগুণ সম্পন্ন আর কেউ জন্মাবে কিনা তা সে কখনোই জানতে পারে না। তাই

মানুষের কথায় এ ধরণের উপাধির অর্থ নিছক বাড়িয়ে বলা এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার স্বীকৃতি ছাড়া আর বেশী কিছু হয় না। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা যখন কারো ব্যাপারে বলে দেন যে, অমুক গুণটি অমুক ব্যক্তি পর্যন্ত শেষ হয়েছে তখন তাকে মানুষের কথার মতো উপমা বা রূপক মনে করে নেয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা যদি কাউকে শেষ কবি বলে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিন্তভাবে তারপর আর কোনো কবি হতে পারে না। আর তিনি যাকে শেষনবী বলে দিয়েছেন তাঁর পরে আর কোনো নবী হওয়াই অসম্ভব। কারণ, মহান আল্লাহ হচ্ছেন আলিমুল গায়িব এবং মানুষ আলিমুল গায়িব নয়। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুন নাবিয়্যীন বলে দেয়া এবং মানুষের পক্ষ থেকে কাউকে খাতামুশ শোয়ারা বা খাতামুল ফুকারা বলে দেয়া কোনোক্রমেই একই পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না এবং তা কখনোই সম্ভব নয়।

হাদীসের আলোকে খত্‌মে নবুয়্যাত

খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দটির পূর্বাপর সম্পর্ক এবং আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে যে অর্থ হয়, এ সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ) এর বিভিন্ন বক্তব্যও তা সমর্থন করে। দৃষ্টান্ত হিসেবে হাদীসের বর্ণনাগুলো সামনে রাখা দরকার। স্বয়ং বিশ্বনবী (সাঃ) খত্‌মে নবুয়্যাত সম্পর্কে বলেন–বনী ইসরাঈলীদের নেতৃত্ব দিতেন আল্লাহর রাসূলগণ। যখন কোনো নবী ইন্তেকাল করতেন, তখন অন্য কোনো নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন (সেই শূন্যতা পূরণ করতেন)। কিন্তু আমার পরে কোনো নবী হবে না, শুধু খলীফা। (বোখারী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের দৃষ্টান্ত হলো, এক ব্যক্তি একটি দালান নির্মাণ করলো এবং তা খুব সুন্দর ও শোভনীয় করে সজ্জিত করলো। কিন্তু তার এক কোণে একটি ইঁটের স্থান শূন্য ছিল। দালানটির চতুর্দিকে মানুষ ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য দেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং বলছিল, এ স্থানে একটি ইঁট রাখা হয়নি কেনো? বস্তুত আমি সেই ইঁট এবং আমিই শেষনবী। (অর্থাৎ আমার আসার পর নবুয়্যাতের দালান পূর্ণতা লাভ করেছে, এখন এর মধ্যে এমন কোনো শূন্যস্থান নেই যাকে পূর্ণ করার জন্য পুনরায় কোনো নবীর প্রয়োজন হবে।) (বোখারী)

এই একই ধরণের বক্তব্য সম্বলিত চারটি হাদীস মুসলিম শরীফে কিতাবুল ফাযায়েলের বাবু খাতামুন নাবিয়্যানে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং শেষ হাদীসটিতে কিছু অংশ বেশী উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'এরপর আমি এলাম এবং আমি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিলাম।' হাদীসটি তিরমিজী শরীফে একই শব্দসহ কিতাবুল

মানাকিবের বাবু ফাদলিন নাবী এবং কিতাবুল আদাবের বাবুল আমসালে বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আবু দাউদ তিয়ালাসীতে হাদীসটি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত হাদীসের সিলসিলায় উল্লেখ করা হয়েছে এবং এর শেষের অংশ হলো 'আমার মাধ্যমে নবীদের সিলসিলা খতম হলো।'

মুসনাদে আহ্‌মাদে সামান্য শাব্দিক পার্থক্যের সাথে একই বক্তব্য সম্বলিত হাদীস হযরত উবাই ইবনে কা'ব, হযরত আবু সাঈদ খুদরী এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) আজমাঈন থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) বলেন, ছয়টি ব্যাপারে অন্যান্য নবীদের ওপর আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। (১) আমাকে পূর্ণ অর্থব্যক সংক্ষিপ্ত কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে। (২) আমাকে শক্তিমত্তা ও প্রতিপত্তি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ আমার জন্য হালাল করা হয়েছে। (৪) পৃথিবীর যমীনকে আমার জন্য মসজিদ (অর্থাৎ আমার শরীয়াতে নামাজ কেবল বিশেষ ইবাদাতগাহে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে আদায় করা যেতে পারে) এবং মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে (শুধু পানিই নয়, মাটির সাহায্যে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা হাসিল অর্থাৎ অজু এবং গোসলের কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে) পরিণত করা হয়েছে। (৫) সমগ্র পৃথিবীর জন্য আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে এবং (৬) আমার ওপর নবীদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। (মুসলিম)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেন, রিসালাত এবং নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। আমার পর আর কোনো রাসূল এবং নবী আসবে না। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ। আমি আহ্‌মাদ। আমি বিলুপ্তকারী, আমার সাহায্যে কুফ্‌রকে বিলুপ্ত করা হবে। আমি সমবেতকারী, আমার পরে লোকদেরকে হাশরের ময়দানে সমবেত করা হবে (অর্থাৎ আমার পরে শুধু কিয়ামতই বাকি আছে) আমি সবার শেষে আগমনকারী (এবং সবার শেষে আগমনকারী হলো সেই) যার পরে আর নবী আসবে না। (বোখারী, মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, আল্লাহ নিশ্চয়ই এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি তাঁর উম্মাতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। (কিন্তু তাদের যুগে সে বহির্গত হয়নি) এখন আমিই শেষ নবী এবং তোমরা শেষ উম্মাত। দাজ্জাল নিঃসন্দেহে এখন তোমাদের মধ্যে বহির্গত হবে। (ইবনে মাজাহ্)

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আ'সকে বলতে শুনেছি, একদিন আল্লাহর রাসূল নিজের ঘর থেকে বের হয়ে

আমার মধ্যে এলেন। তিনি এভাবে এলেন যেন আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তিনবার বললেন, আমি উম্মী নবী মুহাম্মাদ। তারপর বললেন, আমার পর আর কোনো নবী নেই। (মুসনাদে আহমাদ)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই। আছে সুসংবাদ দানকারী ঘটনাবলী। জানতে চাওয়া হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সুসংবাদ দানকারী ঘটনাগুলো কি? জবাবে নবী করীম (সাঃ) বললেন, উত্তম স্বপ্ন-কল্যাণময় স্বপ্ন। (অর্থাৎ ওহী অবতীর্ণ হবার এখন আর কোনো সম্ভাবনা নেই। খুব বেশী একথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যদি কাউকে কোনো ইঙ্গিত দেয়া হয়, তাহলে শুধু ভালো স্বপ্নের মাধ্যমেই তা দেয়া হবে) (মুসনাদে আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আল'ইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার পরে যদি কোনো নবী হতো, তাহলে ওমর ইবনে খাত্তাব সে সৌভাগ্য লাভ করতো। (তিরমিযী)

নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো। কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবী নেই। (বোখারী, মুসলিম)

বোখারী এবং মুসলিম তাবুক যুদ্ধের বর্ণনা প্রসংগেও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্মাদে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত দুটো হাদীস হযরত সা'দ ইবনে আবি ওযাক্কাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর মধ্যে একটি বর্ণনার শেষাংশ হলো, 'কিন্তু আমার পরে আর কোনো নবুয়্যাত নেই।' আবু দাউদ তিয়ালাসি, ইমাম আহ্মাদ এবং মুহাম্মাদ ইসহাক এ সম্পর্কে যে বিস্তারিত বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) কে মদীনা নগরীর তত্ত্বাবধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রেখে যাবার সিদ্ধান্ত করেন। এ ব্যাপারটি নিয়ে মুনাফিকরা বিভিন্ন ধরণের কথা বলতে থাকে। হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে শিশু এবং নারীদের মধ্যে ছেড়ে যাচ্ছেন? আল্লাহর নবী তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার সাথে তোমার সম্পর্ক মূসার সাথে হারুনের সম্পর্কের মতো।' অর্থাৎ তূর পর্বতে যাবার সময় হযরত মূসা (আঃ) যেমন বনী ইসরাঈলীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হযরত হারুনকে রেখে গিয়েছিলেন অনুরূপভাবে মদীনার হেফাজতের জন্য আমি তোমাকে পেছনে রেখে যাচ্ছি। কিন্তু সাথে সাথে রাসূল (সাঃ) এর মনে এই সন্দেহও জাগে যে, হযরত হারুনের সাথে এভাবে তুলনা করার ফলে হয়তো পরে এ থেকে কোনো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং পর মুহূর্তেই তিনি কথাটি স্পষ্ট করে দেন এই বলে যে, আমার পর আর কোনো ব্যক্তি নবী হবে না।

হযরত সাওবান বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, আমার উম্মাতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী হবে। তাদের প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমার পর আর কোনো নবী নেই। (আবু দাউদ)

এ বিষয়বস্তু সম্পর্কিত আরেকটি হাদীস আবু দাউদ কিতাবুল মালাহেমে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযীও হযরত সাওবান এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে এ হাদীস দুটো বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনা হলো–এমন কি ত্রিশ জনের মতো প্রতারক আসবে। তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকেই দাবী করবে যে, সে আল্লাহর রাসূল। নবী করীম (সাঃ) বলেন, তোমাদের পূর্বে অতিবাহিত বনী ইসরাঈল জাতির মধ্যে অনেক লোক এমন ছিলেন যে, যাঁদের সাথে কথা বলা হয়েছে, অথচ তাঁরা নবী ছিলেন না। আমার উম্মতের মধ্যে যদি এমন কেউ হয়, তাহলে সে হবে ওমর। (বোখারী)

মুসলিমে এই বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে 'ইউকাল্লিমুনা' শব্দের পরিবর্তে 'মুহাদ্দিসুনা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু মুকাল্লাম এবং মুহাদ্দাস শব্দ দুটো সমার্থক। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন অথবা যার সাথে পর্দার পেছন থেকে কথা বলা হয়। এ থেকে জানা যায় যে, নবুয়্যাত ছাড়াও যদি এই উম্মাতের মধ্যে কেউ আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতেন তাহলে তিনি একমাত্র হযরত ওমরই হতেন। আল্লাহর রাসূল বলেন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই এবং আমার উম্মাতের পর আর কোনো উম্মাত নেই। (বাইহাকী, তাবারাণী)

নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমি শেষনবী এবং আমার মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদে নববী শেষ মসজিদ)। (মুসলিম)

খত্মে নবুয়্যাত অস্বীকারকারীরা এ হাদীস থেকে প্রমাণ করে যে, রাসূল (সাঃ) যেমন তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ বলেছেন, অথচ এটিই শেষ মসজিদ নয়, এরপরও পৃথিবীতে অগণিত মসজিদ নির্মিত হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি বলেছেন যে, তিনি শেষনবী। এর অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরেও নবী আসবেন। অবশ্য শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে তিনি হলেন শেষনবী এবং তাঁর মসজিদ শেষ মসজিদ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ধরণের বিকৃত অর্থই এ কথা প্রমাণ করে যে, এ লোকগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টাও করেনি। মুসলিম শরীফের এ সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্মুখে রাখলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আল্লাহর রাসূল তাঁর মসজিদকে শেষ মসজিদ কোন্ অর্থে বলেছেন।

এখানে হযরত আবু হুরাইরা, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং হযরত মাইমুনা (রাঃ) এর যে বর্ণনা ইমাম মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন, সেখানে বলা হয়েছে, পৃথিবীর মাত্র তিনটি মসজিদ এমন রয়েছে যেগুলো সাধারণ মসজিদগুলোর ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। সেখানে নামাজ আদায় করলে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী সওয়াব পাওয়া যায় এবং এ জন্য একমাত্র এ তিনটি মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য ভ্রমণ করা জায়েজ। পৃথিবীর অবশিষ্ট মসজিদগুলোর মধ্যে সমস্ত মসজিদকে বাদ দিয়ে বিশেষ করে একটি মসজিদে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ নয়। এর মধ্যে মসজিদুল হারাম হলো প্রথম মসজিদ। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হলো মসজিদুল আক্সা, হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এটি নির্মাণ করেছিলেন এবং তৃতীয়টি হলো মদীনা নগরীর মসজিদে নববী। এটি নির্মাণ করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। রাসূলের কথার অর্থ হলো, এখন যেহেতু আমার পর আর কোনো নবী আসবে না, সেহেতু আমার মসজিদের পর পৃথিবীর আর চতুর্থ এমন কোনো মসজিদ নির্মিত হবে না, যেখানে নামাজ আদায় করার সওয়াব অন্যান্য মসজিদের তুলনায় বেশী হবে এবং সেখানে নামাজ আদায় করার জন্য সেদিকে ভ্রমণ করা জায়েজ হবে।

আল্লাহর নবীর কাছ থেকে বহু সংখ্যক সাহাবী এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং বহু মুহাদ্দিস অত্যন্ত শক্তিশালী এবং নির্ভযোগ্য সনদসহ এ হাদীসগুলো বর্ণনা করেছেন। এগুলো অধ্যয়ন করার পর স্পষ্ট জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, তিনিই শেষনবী। তাঁর পর কোনো নবী আসবে না। নবুয়্যাতের ক্রমধারা তাঁর ওপর খতম হয়ে গেছে এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি রাসূল অথবা নবী হবার দাবী করবে, সে হবে দাজ্জাল এবং মিথ্যুক। পবিত্র কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী, নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণ্য ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? রাসূলের বক্তব্যই এখানে চরম সনদ এবং প্রমাণ। উপরন্তু যখন রাসূলের বক্তব্য কোরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে তখন তা আরো অধিক শক্তিশালী প্রমাণে পরিণত হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক আর কে কোরআন বুঝেছে এবং তাঁর চেয়ে অধিক কোরআনের ব্যাখ্যার অধিকার কোন্ ব্যক্তির রয়েছে? এমন কে আছে যে, খত্মে নবুয়্যাতের অন্য কোনো অর্থ বর্ণনা করবে এবং তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করতেও ইসলামের অনুসারীরা প্রস্তুত থাকবে?

খত্‌মে নবুয়্যাতে অবিশ্বাসীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের বিপরীতে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বলে কথিত একটি বর্ণনা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে। সে বর্ণনা হলো, 'বলো নিশ্চয়ই তিনি খাতামুন নাবিয়্যীন, এ কথা বলো না যে তাঁর পর নবী নেই।'

এ হাদীসের ব্যাপারে ইসলামী চিন্তাবিদদের কথা হলো, প্রথমত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট আদেশকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার উদ্ধৃতি দেয়া একটা চরম ধৃষ্টতা। অধিকন্তু হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহার বলে কথিত হাদীসটি মোটেই হাদীস নয়। এ বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। হাদীস শাস্ত্রের কোন প্রামাণিক গ্রন্থেই হযরত আয়েশার বলে কথিত হাদীসটির কোনো উল্লেখ নেই। কোনো বিখ্যাত হাদীস লিপিবদ্ধকারী হাদীস নামে বর্ণিত সে বর্ণনা উল্লেখ করেননি। হযরত আয়েশার বর্ণনা বলে কথিত বর্ণনাটি শুধু 'দুররি মানসুর' নামক তাফসীরে এবং 'তাকমিলাহ মাজমা-উল-বিহার' নামক অপরিচিত সংকলন থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু এর উৎপত্তি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনোই ধারণা পাওয়া যায় না। নবী করীম (সাঃ) এর সুস্পষ্ট হাদীস যা বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারীরা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে বর্ণনা করেছেন অতি সতর্কতার সাথে, তাকে অস্বীকার করার জন্য হযরত আয়েশার বলে কথিত একেবারেই দুর্বল সূত্রে বর্ণিত হাদীস নামে কথিত বাক্য দিয়ে প্রমাণ পেশ করতে যাওয়া চরমতম ধৃষ্টতা এবং হযরত আয়িশা (রাঃ) এর ওপরে মদীনার মুনাফিকদের ন্যায় কলঙ্ক আরোপের শামিল।

শেষনবী প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য

কোরআন ও হাদীসের প্রমাণের পর অবশিষ্ট থাকে সকল সাহাবায়ে কেরামের মতামত এবং সাহাবায়ে কেরামের মতামতই হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহাবায়ে কেরামের মতামতের সামনে তাঁদের পরবর্তী কোনো মানুষের মতামতের কানাকড়ি মূল্যও নেই। সমস্ত নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই যেসব লোক নবুয়্যাতের দাবী করে এবং যারা তাদের নবুয়্যাত স্বীকার করে নেয়, তাদের সকলের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরাম সম্মিলিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। এ সম্পর্কে মুসাইলামা মিথ্যাবাদীর বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। এই লোকটি নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাত অস্বীকার করেনি, বরং সে দাবী করেছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবুয়্যাতে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে অংশীদার করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর ইন্তেকালের

পূর্বে এই মিথ্যাবাদী মুসাইলামা আল্লাহর রাসূলের কাছে যে পত্র প্রেরণ করেছিল তাতে সে উল্লেখ করেছিল– আল্লাহর রাসূল মুসাইলামার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সমীপে। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনি জেনে রাখুন, আমাকে আপনার সাথে নবুয়্যাতের কার্যক্রমে অংশীদার স্থাপন করা হয়েছে।

এ ছাড়াও ঐতিহাসিক তাবারী একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মুসাইলামা যে আযান প্রথার প্রচলন করেছিল তাতে 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'–ও বলা হতো। এভাবে স্পষ্ট করে রিসালাতে মুহাম্মাদীকে স্বীকার করে নেবার পরও তাকে কাফির ও ইসলামী উম্মত বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে। ইতিহাস থেকে এ কথাও প্রমাণ হয় যে, বনু হোনায়ফা সরল অন্তকরণে তার ওপর ঈমান এনেছিল। অবশ্য তারা এই বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) নিজেই তাকে তাঁর নবুয়্যাতের কাজে অংশীদার স্থাপন করেছেন। এ ছাড়াও আরেকটি কথা হলো, মদীনা থেকে এক ব্যক্তি কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করেছিল এবং বনু হোনায়ফার কাছে গিয়ে সে কোরআনের আয়াতকে মুসাইলামার প্রতি অবতীর্ণ আয়াত বলে বর্ণনা করেছিল। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর)

পক্ষান্তরে সাহাবায়ে কেরাম এই মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে সামান্য অনুকম্পা প্রদর্শন করেননি। বরং তার বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই যে, ইসলাম বহির্ভূত হবার কারণে সাহাবায়ে কেরাম মুসাইলামা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি বরং বিদ্রোহ ঘোষণা করার কারণেই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছিল। ইসলামী যুদ্ধ আইনের দৃষ্টিতে বিদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হলেও তাদের যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসে পরিণত করা যেতে পারে না বরং শুধু মুসলমানই নয় ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, গ্রেফতার করার পর তাকে দাসে পরিণত করা জায়েজ নয়।

কিন্তু মুসাইলামা এবং তার অনুসারীদের বিরদ্ধে যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ঘোষণা করেন যে, তাদের মেয়েদের এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে দাসে পরিণত করা হবে এবং গ্রেফতার করার পর দেখা গেলো, প্রকৃত অর্থেই তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) তাদের মধ্য থেকেই জনৈক যুদ্ধ বন্দিনীর মালিক হন। এই যুদ্ধ বন্দিনীর গর্ভজাত পুত্র মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়াই হলেন পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে সর্বজন পরিচিত ব্যক্তি। (আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর)

এই ঘটনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম যে অপরাধের কারণে মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, তা কোনো বিদ্রোহের অপরাধ ছিল না বরং সে অপরাধ ছিল, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) এর পরে নবুয়্যাতের দাবী করে এবং কিছু লোকজন তার প্রতি ঈমান আনে। আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের অব্যবহিত পরেই সকল সাহাবা এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দান করেন হযরত আবু বকর এবং সাহাবায়ে কেরামের গোটা দলটি একযোগে তাঁর নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। নবী করীম (সাঃ) ই শেষনবী এবং তাঁর পরে কোনো ধরণের ছায়া নবী বা যে কোনো নবীর যে আসার আর অবকাশ নেই, সকল সাহাবায়ে কেরামের এই পদক্ষেপই তো সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী দলের মতামত

ইসলামী আইনে সাহাবায়ে কেরামের মতামতের পরে চতুর্থ পর্যায়ের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ হলো সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী কালের ইসলামী চিন্তাবিদগণ। বিষয়টি এদিক দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিজরীর প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রত্যেক শতাব্দীর–যুগের এবং গোটা মুসলিম জাহানের প্রত্যেক এলাকার ইসলামী চিন্তাবিদগণই সর্বদা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ঐকমত্য রয়েছেন যে, 'মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরে কোনো ব্যক্তি নবী হতে পারে না। এবং তাঁর পর যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করবে এবং যে ব্যক্তি এই মিথ্যা দাবীকে মেনে নেবে বা সমর্থন দেবে, সে সর্বসম্মতভাবে কাফির এবং ইসলামের সীমানায় তার স্থান নেই।' বিখ্যাত আলেমগণ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখায় কি লিখেছেন, তা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর অভিমত

হযরত ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে বলেছিল, 'আমাকে সুযোগ দাও, আমি যে নবী তা প্রমাণ করে দেবো এবং নবুয়্যাতের চিহ্ন পেশ করবো।'

এ কথা শুনে খত্মে নবুয়্যাতের অতন্দ্র প্রহরী হযরত ইমামে আজম আবু হানিফা (রাহঃ) দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, **'নবী করীম (সাঃ) এর পরে যারা নবুয়্যাতের দাবী করবে আর যে ব্যক্তি তাদের কাছে নবী হওয়ার প্রমাণ দাবী করবে সে-ও কাফির হয়ে যাবে।** কারণ আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে আর কোনো নবী নেই।'

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে জারীর তাবারী (আঃ) (২২৪-৩১০ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত কোরআনের তাফসীরে খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন–যে নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছে এবং তার ওপর মোহর লাগিয়ে দিয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত এর দরোজা আর কারো জন্য খুলবে না। (তাফসীরে ইবনে জারীর, খন্ড-২২, পৃষ্ঠা নম্বর ১২)

আল্লামা ইমাম তাহাবী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (২৩৯-৩২১ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত আকীদাতুস সালাফীয়া গ্রন্থে সালাফে সালেহীন অর্থাৎ প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ নেককারগণ এবং বিশেষ করে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আকিদা বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে নবুয়্যাত সম্পর্কিত এ বিশ্বাস লিপিবদ্ধ করেন যে, 'আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হচ্ছেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দাহ, নির্বাচিত নবী ও পছন্দনীয় রাসূল এবং শেষনবী, মুত্তাকীদের ইমাম, রাসূলদের সরদার ও রাব্বুল আলামীনের বন্ধু। আর তাঁর পর নবুয়্যাতের প্রত্যেকটি দাবী পথভ্রষ্টতা এবং প্রবৃত্তির লালসার দাসত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। (শারহুত তাহাবীয়া ফিল আকীদাতিস সালাফিয়া, দারুল মা'আরিফ মিশর, ১৫-১০২ পৃষ্ঠা)

আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে হাজাম আন্দালুস (রাহঃ) (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) লিখেছেন, 'নিশ্চয়ই রাসূল (সাঃ) এর ইন্তেকালের পর ওহীর সিলসিলা খতম হয়ে গেছে। এর সপক্ষে যুক্তি এই যে, ওহী আসে একমাত্র নবীর কাছে এবং মহান আল্লাহ বলেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন। কিন্তু তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।' (আল মুহাল্লা, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ)-এর অভিমত

মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ) (৪৫০-৫০৫ হিঃ) এ সম্পর্কে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সে ব্যাখ্যা মিথ্যা নবীর দাবীদাররা বিকৃত করে কোথাও কোথাও পেশ করে এ কথা প্রমাণ করতে চেয়েছে, ইমাম গাজ্জালী বিশ্বাস করতেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে আরো নবী আসবে। এটা তাঁর ওপরে স্পষ্ট মিথ্যা অপবাদ বৈ আর কিছু নয়। অথচ তিনি লিখেছেন–যদি এ দরজাটি (অর্থাৎ ইজমাকে প্রমাণ হিসেবে মানতে অস্বীকার করার দরজা) খুলে দেয়া হয় তাহলে বড়ই ন্যক্কারজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। যেমন যদি কেউ বলে, আমাদের

নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরে অন্য কোনো নবীর আগমন অসম্ভব নয়, তাহলে তাকে কাফির বলার ব্যাপারে দ্বিধা করা যেতে পারে না। কিন্তু বিতর্কের সময় যে ব্যক্তি তাকে কাফির আখ্যায়িত করতে দ্বিধা করাকে অবৈধ প্রমাণ করতে চাইবে তাকে অবশ্যই ইজমার সাহায্য নিতে হবে। কারণ নিরেট যুক্তির মাধ্যমে তার অবৈধ হবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। আর কোরআন ও হাদীসের বাণীর ব্যাপারে বলা যায়, এ মতে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তি 'আমার পরে আর কোনো নবী নেই' এবং 'নবীদের মোহর' এ উক্তি দুটোর নানা রকম চুলচেরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম হবে না। সে বলবে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' মানে হচ্ছে অতীব মর্যাদাবান নবীদের আগমন শেষ হয়ে যাওয়া। আর যদি বলা হয়, 'নবীগণ' শব্দটি দ্বারা সাধারাণভাবে সকল নবীকে বুঝানো হয়েছে, তাহলে এই 'সাধারণ' থেকে 'অসাধারাণ ও ব্যতিক্রমী' বের করা তার জন্য মোটেই কঠিন হবে না। 'আমার পর আর নবী নেই' এ ব্যাপারে সে বলে দেবে, 'আমার পর আর রাসূল নেই' এ কথা তো বলা হয়নি। রাসূল ও নবীর মধ্যে পার্থক্য আছে। নবীর মর্যাদা রাসূলের চেয়ে বেশী।

মোটকথা এ ধরণের অর্থহীন উদ্ভট কথা অনেক বলা যেতে পারে। আর নিছক শাব্দিক দিক দিয়ে এ ধরণের চুলচেরা ব্যাখ্যাকে আমরা একেবারে অসম্ভবও বলি না। বরং বাহ্যিক উপমার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা এরচেয়েও দূরবর্তী সম্ভাবনার অবকাশ স্বীকার করি। আর এ ধরণের ব্যাখ্যাকারীদের সম্পর্কে আমরা এ কথাও বলতে পারি না যে, কোরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্য সে অস্বীকার করছে। কিন্তু এ অভিমতের প্রবক্ততার বক্তব্য খন্ডন করে আমি বলবো, মুসলিম উম্মাহ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এ শব্দ (অর্থাৎ আমার পর আর কোনো নবী নেই) থেকে এবং নবী করীম (সাঃ) এর ঘটনাবলীর প্রামাণাদি থেকে এ কথাই বুঝেছে যে, নবী করীম (সাঃ) এর উদ্দেশ্য ছিল এ কথা বুঝানো যে, তাঁর পরে আর কখনো কোনো নবী আসবে না এবং রাসূলও আসবে না। এ ছাড়া মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারেও একমত যে, এর মধ্যে কোন তাবীল, ব্যাখ্যা ও বিশেষিত করারও কোনো অবকাশ নেই। সুতরাং এহেন ব্যক্তিকে ইজমা অস্বীকারকারী ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না।

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগভী (রাহঃ)-এর অভিমত

ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগভী (রাহঃ) (ইন্তেকাল-৫১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মা'আলিমুত তানজীলে লিখেছেন, রাসূল (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহ নবুয়্যাতের সিলসিলা খতম করেছেন। সুতরাং তিনিই সর্বশেষ নবী এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর কোন নবী নেই। (তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৮)

আল্লামা যামাখশারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা যামাখশারী)রাহঃ) (৪৬৭-৫৩৮ হিঃ) তাফসীরে কাশ্‌শাফে লিখেছেন, যদি তোমরা বলো, রাসূল (সাঃ) শেষনবী কেমন করে হলেন, কারণ হযরত ঈসা (আঃ) শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন, তাহলে আমি বলবো, নবী করীম (সাঃ) শেষনবী হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পরে আর কাউকে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না। হযরত ঈসা (আঃ) কে নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে নবী বানানো হয়েছে। অবতীর্ণ হবার পর তিনি নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী হবেন এবং তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন। অর্থাৎ তিনি হবেন মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উম্মাতের মধ্যে শামিল। (দ্বিতীয় খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা কাজী ইয়ায (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা কাজী ইয়ায (রাহঃ) (ইন্তেকাল-৫৪৪ হিঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি নিজে নবুয়্যাতের দাবী করে অথবা এ কথাকে বৈধ মনে করে যে, যে কোনো ব্যক্তি নিজের প্রচেষ্টায় নবুয়্যাত লাভ করতে পারে এবং অন্তত পরিশুদ্ধির মাধ্যমে নবীর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে (যেমন কোনো কোনো দার্শনিক এবং বিকৃতমনা সূফী মনে করেন) এবং এভাবে যে ব্যক্তি নবুয়্যাতের দাবী করে না অথচ এ কথার দাবী জানায় যে, তার ওপর আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হয়–এ ধরণের সমস্ত লোক কাফির এবং তারা নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। কারণ তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি শেষনবী এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না এবং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ সংবাদ পৌছেছেন যে, তিনি নবুয়্যাতকে খতম করে দিয়েছেন এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। সমগ্র মুসলিম সমাজ এ ব্যাপারে একমত যে, এখানে কথাটির বাহ্যিক অর্থটিকেই গ্রহণীয় এবং এর দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ করার সুযোগই এখানে নেই। সুতরাং উল্লেখিত দলগুলোর কাফির হওয়া সম্পর্কে কোরআন, হাদীস এবং ইজমার দৃষ্টিতে কোন সন্দেহ নেই। (শিফা, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১)

আল্লামা শাহারিস্তানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শাহরিস্তানী (রাহঃ) (ইন্তেকাল-৫৪৮) তাঁর বিখ্যাত কিতাব আল মিলাল ওয়ান নিহালে লিখেছেন, এবং যে এভাবেই বলে, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরও নবী আসবে (হযরত ঈসা ব্যতীত) তার কাফির হওয়া সম্পর্কে যে কোনো দু'জন ব্যক্তির মধ্যেই কোনো মতবিরোধ থাকতে পারে না। (তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৪৯)

ইমাম রাযী (রাহঃ)-এর অভিমত

ইমাম রাযী (রাহঃ) (৫৪৩-৬০৬) তাঁর তাফসীরে কবীরে 'খাতামুন নাবিয়্যীন' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, এ বর্ণনায় খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দ এ জন্য বলা হয়েছে, যে নবীর পর অন্য কোনো নবী আসবেন তিনি যদি উপদেশ এবং নির্দেশাবলীর ব্যাখ্যার ব্যাপারে কিছু অতৃপ্তি রেখে যান, তাহলে তাঁর পর আগমনকারী নবী তা পূর্ণ করতে পারেন। কিন্তু যার পর আর কোনো নবী আসবে না, তিনি নিজের উম্মাতের ওপর অত্যন্ত বেশী স্নেহশীল হন এবং তাদেরকে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দান করেন। কারণ, তাঁর দৃষ্টান্ত এমন এক পিতার ন্যায় যিনি জানেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর পুত্রের দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক এবং পৃষ্ঠপোষক থাকবে না। (তাফসীরে কবীর ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮১)

মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত নবীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। তাঁর আগমনের পর নবীদের আগমন শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে হযরত ঈসার অবতরণের পর তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারী হবেন এ কথা মোটেও অযৌক্তিক নয়। (তাফসীরে কবীর, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৩)

আল্লামা বায়যাবী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা বায়যাবী (রাহঃ) (ইন্তেকাল-৬৮৫ হিঃ) তাঁর তাফসীরে আনওয়ারুত তানজীল-এ লিখেছেন. অর্থাৎ তিনিই শেষনবী। তিনি নবীদের সিলসিলা খতম করে দিয়েছেন। অথবা তাঁর কারণেই নবীদের সিলসিলার ওপরে মোহর লাগানো হয়েছে। এবং তাঁর পর হযরত ঈসার নাযিল হবার কারণে খত্‌মে নবুয়্যাতের ওপর কোন দোষ আসছে না। কেননা তিনি নবী করীম (সাঃ) এর দ্বীনের মধ্যেই নাযিল হবেন। (চতুর্থ খন্ড, ১৬৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা তাফ্‌তাযানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা তাফ্‌তাযানী (রাহঃ) (৭২২-৭৯২ হিঃ) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী–এ কথা প্রমাণিত সত্য। যদি বলা হয়, তাঁর পর হাদীসে হযরত ঈসা (আঃ) এর আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে সত্য, তবে তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শারিয়াত বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবেনা এবং তিনি নতুন বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন। (শারহে আকায়েদে নাসাফী পষ্ঠা ১৩৫)

আল্লামা হাফেজ উদ্দীন নাসাফী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা হাফেজ উদ্দীন নাসাফী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ৮১০ হিঃ) তাঁর তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল-এ লিখেছেন, এবং নবী করীম (সাঃ) খাতামুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ তিনিই সর্বশেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো ব্যক্তিকে নবী করা হবে না। হযরত ঈসার ব্যাপার হলো, তাঁকে নবী করীম (সাঃ) এর পূর্বে নবীর পদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এবং পরে যখন তিনি নাযিল হবেন, তখন তিনি হবেন নবী করীম (সাঃ) এর শারিয়াতের অনুসারী। অর্থাৎ তিনি হবেন নবী করীম (সাঃ) এর উম্মত। (তাফসীরে মাদারেকুত তানজীল, পৃষ্ঠা ৪৭১)

আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা আলাউদ্দীন বাগদাদী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ৭২৬ হিঃ) তাঁর তাফসীরে 'খাজিন'-এ লিখেছেন, ওয়া খাতামান নাবিয়্যীন অর্থাৎ আল্লাহ নবী করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাত খতম করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পর আর কোনো নবুয়্যাত নেই এবং এ ব্যাপারে কেউ তাঁর অংশীদারও নয়। ওয়া কানাল্লাহু বিকুল্লি শাইয়িন আলিমা অর্থাৎ আল্লাহ এ কথা জানেন যে, তাঁর পর আর কোনো নবী নেই। (তাফসীরে খাজিন-৪৭১-৪৭২)

আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে কাসীর (রাহঃ) (ইন্তেকাল, ৭৭৪ হিঃ) তাঁর বিখ্যাত তাফসীর-তাফসীরে ইবনে কাসীরে লিখেছেন, এরপর আলোচ্য আয়াত থেকে এ কথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, যখন নবী করীম (সাঃ) এর পর কোনো নবী নেই, তখন অপর কোনো রাসূলেরও প্রশ্ন উঠতে পারে না। কারণ রিসালাত একটা বিশেষ পদমর্যাদা এবং নবুয়্যাতের পদমর্যাদা এর চেয়েও বেশী সাধারণধর্মী। প্রত্যেক রাসূল নবী হন কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল হন না। নবী করীম (সাঃ) এর পর যে ব্যক্তিই এই পদমর্যাদার দাবী করবে, সেই হবে মিথ্যাবাদী, প্রতারক, দাজ্জাল এবং পথভ্রষ্ট। যতোই সে আলৌকিক ক্ষমতা ও যাদুর ক্ষমতাসম্পন্ন হোক না কেনো, তার দাবী গ্রহণীয় নয়। কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি এই পদমর্যাদার দাবী করবে, তাদের প্রত্যেকেরই অবস্থা হবে এই ধরণের। (তাফসীরে ইবনে কাসীরে তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৩-৪৯৪)

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা জালালুদ্দীন সূয়ূতী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ৯১১ হিঃ) তাঁর তাফসীরে জালালাঈন-এ লিখেছেন, অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, নবী করীম (সাঃ) এর

পর আর কোনো নবী নেই এবং ঈসা (আঃ) নাযিল হবার পর নবী করীম (সাঃ) এর শরীয়াত মোতাবেকই আমল করবেন। (তাফসীরে জালালাঈন পৃষ্ঠা ৭৬৮)

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা ইবনে নুজাইম (রাহঃ) (ইন্তেকাল ৯৭০ হিঃ) উসুলে ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে কিতাবুস সিয়ারের বাবুর রুইয়ায় লিখেছেন, যদি কেউ এ কথা মনে না করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষনবী, তাহলে সে মুসলমান নয়। কেননা, কথাগুলো জানা এবং স্বীকার করে নেয়া দ্বীনের অপরিহার্য আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে শামিল। (আল ইশবাহ ওয়ান নাযায়েরে কিতাবুস সিয়ারের বাবুর রুইয়া পৃষ্ঠা ১৭৯)

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা মুল্লা আলী কারী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ১০১৬) শারহে ফিকহে আকবার-এ লিখেছেন, আমাদের নবী করীম (সাঃ) এর পর অন্য কোন ব্যক্তির নবুয়্যাতের দাবী করা সর্ববাদী সম্মতভাবে কুফ্র। (শারহে ফিকহে আকবার পৃষ্ঠা ২০২)

আল্লামা শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ১১৩৭ হিঃ) তাফসীরে রুহুল বয়ান-এ উল্লেখিত ব্যাখ্যা প্রসংগে লিখেছেন, আলেম সমাজ খাতাম শব্দটির 'তা' অক্ষর-এর ওপর জবর দিয়ে পড়েছেন। এর অর্থ হয় খতম করবার যন্ত্র। যার সাহায্যে মোহর লাগানো হয়। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) সমস্ত নবীর শেষে এসেছেন এবং তাঁর সাহায্যে নবীদের সিলসিলার ওপর মোহর লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ফারসীতে আমরা একে বলবো মোহরে পয়গম্বর–অর্থাৎ তাঁর সাহায্যে নবুয়্যাতের দরজা মোহর লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং পয়গম্বরদের সিলসিলা খতম করে দেয়া হয়েছে। কিছু সংখ্যক পাঠক খাতাম শব্দের 'তা' অক্ষরের নীচে জের দিয়ে পড়েছেন, খাতিমুন নাবিয়্যীন। অর্থাৎ নবী করীম (সাঃ) ছিলেন মোহর দানকারী। অন্য কথায় বলা যাবে পয়গম্বরদের ওপর মোহরকারী। এভাবে এ শব্দার্থ খাতাম-এর সমার্থক হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে নবী করীম (সাঃ) এর পর তাঁর উম্মাতের আলেম সমাজ তাঁর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাবেন একমাত্র তাঁর প্রতিনিধি। তাঁর ইন্তেকালের সাথে সাথেই নবুয়্যাতের উত্তরাধিকারেরও পরিসমাপ্তি ঘটেছে এবং তাঁর পরে হযরত ঈসার নাযিল হবার ব্যাপারটি তাঁর নবুয়্যাতকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। কেননা খাতমুন নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তাঁর পর আর কাউকে নবী বানানো হবে না এবং হযরত ঈসা (আঃ) কে তাঁদের পূর্বেই নবী বানানো হয়েছে।

সুতরাং তিনি নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারীদের মধ্যে শামিল হবেন। তাঁর কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবেন এবং তাঁরই উম্মতের অন্তরভুক্ত হবেন। তখন হযরত ঈসা (আঃ) এর কাছে ওহী অবতীর্ণ হবে না। তিনি কোনো নতুন আইন-কানুনও জারী করবেন না। বরং তিনি হবেন তাঁর প্রতিনিধি। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত এ ব্যাপারে একমত যে, আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) ই শেষনবী। এবং নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার পরে কোনো নবী নেই। সুতরাং এখন যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর নবী আছে, তাকে কাফির বলা হবে। কারণ সে কোরআনকে অস্বীকার করেছে এবং এবং অনুরূপভাবে সে ব্যক্তিকেও কাফির বলা হবে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। কেননা সুস্পষ্ট যুক্তি প্রমাণের পর হক বাতিল থেকে পৃথক হয়ে গেছে। এবং যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নবুয়্যাতের দাবী করবে, তার দাবী বাতিল হয়ে যাবে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান ২২ খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

ফতোওয়ায়ে আলমগিরীর অভিমত

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীরের নির্দেশে ১২ শত হিজরীতে পাক-ভারতের বিশিষ্ট আলেমগণ সম্মিলিতভাবে ফতোওয়ায়ে আলমগিরী নামে যে কিতাবটি লিপিবদ্ধ করেন তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) শেষনবী নন, তাহলে সে মুসলমান নয় এবং যদি সে বলে যে, আমি আল্লাহর রাসূল অথবা পয়গম্বর, তাহলে তার ওপর কুফরীর ফতোওয়া দেয়া হবে। (ফতোওয়াতে আলমগিরী, দ্বিতীয় খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

আল্লামা শওকানী (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা শওকানী (রাহঃ) (ইন্তেকাল ১২৫৫ হিঃ) তাফসীরে ফাতহুল কাদির-এ লিখেছেন, সমগ্র মুসলিম সমাজ খাতিম শব্দটির তা অক্ষর-এর নীচে জের দিয়ে পড়েছেন এবং একমাত্র আসেম জবর দিয়ে পড়েছেন। প্রথমটার অর্থ হলো এই যে, নবী করীম (সাঃ) সমস্ত পয়গম্বরকে খতম করেছেন অর্থাৎ তিনি সবার শেষে এসেছেন এবং দ্বিতীয়টির হলো এই যে, তিনি সমস্ত পয়গম্বরদের জন্য মোহর স্বরূপ। এবং এর সাহায্যে নবীদের সিলসিলা মোহর এঁটে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাঁদের দলটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। (তাফসীরে ফাতহুল কাদির, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭৫)

আল্লামা আলুসি (রাহঃ)-এর অভিমত

আল্লামা আলুসি (রাহঃ) (মৃত্যু ১২৮০ হিঃ) তাফসীরে রুহুল মা'আনী-তে লিখেছেন, নবী শব্দটি রাসূলের চেয়ে বেশী ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক। সুতরাং বিশ্বনবীর খাতিমুন

নাবিয়্যীন হবার অর্থ হলো এই যে, তিনি খাতিমুল মুরসালীনও। তিনি শেষনবী এবং শেষ রাসূল–এ কথার অর্থ হলো এই যে, এ পৃথিবীতে তাঁর নবুয়্যাতের গুণে গুণান্বিত হবার পরেই মানুষ এবং জিনের মধ্য থেকে এ গুণটি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নবী করীম (সাঃ) এর পরে যে ব্যক্তি ওহীর দাবী করবে তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে। এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তিনিই শেষনবী–এ কথাটি কোরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে, রাসূলের সুন্নাত এটিকে সুস্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করেছে এবং সমগ্র মুসলিম সমাজ এর ওপর আমল করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি এর বিরোধী কোন দাবী করবে, তাকে কাফির বলে গণ্য করা হবে। ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের আগের পদমর্যাদা থেকে তো অপসারিত হবেন না। কিন্তু নিজের পূর্বের শরীয়াতের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যসব লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে খুঁটিনাটি ব্যাপার পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াতের অনুসারী হবেন। কাজেই তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হবে না এবং তিনি শরীয়াতের বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতিনিধি এবং তাঁর উম্মাতের মধ্যস্থিত মুহাম্মাদী মিল্লাতের শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন। (তাফসীরে রুহুল মা'আনী ২২ খন্ড পৃষ্ঠা ৩২-৩৮-৩৯)

সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলামী আইনবিদ, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরীনে কেরামের ব্যাখ্যা এবং মতামত হলো নবী করীম (সাঃ) ই হলেন শেষনবী। তাঁর পরে আর কোনো নবী আসার পথ উন্মুক্ত নেই। আর এসব মতামত থেকে এ কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরামের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলামী চিন্তাবিদগণ একযোগে আল কোরআনের খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের অর্থ নিয়েছেন শেষনবী। প্রত্যেক যুগের মুসলমানই এই একই আকীদা পোষণ করেছেন যে, বিশ্বনবীর পর নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। এ কথা তাঁরা একযোগে স্বীকার করে নিয়েছেন, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর নবী অথবা রাসূল হবার দাবী করে এবং যে তার দাবীকে মেনে নেয়, সে কাফির হয়ে যায়, এ ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো যুগে সামান্যতম মতবিরোধও সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেক বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিই ফায়সালা করতে পারেন যে, খাতামুন নাবিয়্যীন শব্দের যে অর্থ আরবী অভিধান থেকে প্রমাণিত হয়, কোরআনের আয়াতের পূর্বাপর বর্ণনা থেকে যে অর্থ প্রতীয়মান হয়, নবী করীম (সাঃ) স্বয়ং যা ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম যে সম্পর্কে

মতৈক্য পোষণ করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমগ্র মুসলিম সমাজ একযোগে দ্ব্যর্থহীনভাবে যা স্বীকার করে আসছেন, তার বিপক্ষে দ্বিতীয় কোনো অর্থ গ্রহণ অর্থাৎ কোনো নতুন দাবীদারের জন্য নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার অবকাশ ও সুযোগ থাকে কি? এবং এই ধরণের লোকদেরকে কেমন করে মুসলমান বলে স্বীকার করা যায়, যারা নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত করার নিছক ধারণাই প্রকাশ করেনি বরং ঐ দরজা দিয়ে এক ব্যক্তি নবুয়্যাতের দালানে প্রবেশ করেছে এবং তারা তার নবুয়্যাতের ওপর ঈমান পর্যন্ত এনেছে? **আর ঐসব লোকদেরকেই বা কোন্ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করা যাবে, যারা ভন্ডনবীর অনুসারীদেরকে সমর্থন করে এবং তাদের অনুষ্ঠান বা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেয় অথবা তাদেরকে সমর্থন করে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করে?**

ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা

ইসলামে নবুয়্যাতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা কোরআনের দৃষ্টিতে ইসলামের বুনিয়াদী বিশ্বাসের একটি। এর প্রতি স্বীকৃতি দেয়া বা অস্বীকার করার ওপর মানুষের ঈমান ও কুফ্রী একান্তভাবেই নির্ভরশীল। কোনো ব্যক্তি যদি নবী হয় এবং লোকজন তাকে নবী বলে অস্বীকার করে, তাহলে তারা কাফির হয়ে যায়। আবার কোনো ব্যক্তি নবী নয় কিন্তু যারা তাকে নবী বলে স্বীকার করে, তারাও কাফির হয়ে যায়। এ ধরণের জটিল পরিস্থিতিতে আল্লাহর কাছ থেকে কোন প্রকার অসতর্কতার আশা করা যায় না বা আল্লাহ তা'য়ালা এ ব্যাপারে সঠিক দিক নির্দেশনা দেবেন না, তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ ব্যাপারে অস্পষ্টতার মধ্যে ছেড়ে দেবেন, এমনটি কল্পনাও করা যায় না। যদি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরে কোনো নবী আসার সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে আল্লাহ নিজেই কোরআনে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তা ব্যক্ত করতেন এবং নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে প্রকাশ্যভাবে তা ঘোষণা করতেন। কেননা, তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন যে, যাবতীয় ব্যাপারে বান্দাকে পথপ্রদর্শন করার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ–

মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব আমার। (সূরা আন্ নাহ্ল-৯)

এবং নবী করীম (সাঃ) কখনো এই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না তিনি সমগ্র উম্মাতকে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে অবগত করতেন যে, তাঁর পর আরো

নবী আসবেন এবং আমরা সবাই তাঁদের প্রতি স্বীকৃতি দিতে ও তাঁদের আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবো। এটা কিভাবে সম্ভব যে, নবী করীম (সাঃ) এর পর নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত থাকবে এবং এই দরজা দিয়ে কোনো নবী প্রবেশ করবে, যার ওপর ঈমান না আনলে আমরা মুসলমান থাকতে পারি না। অথচ আমাদের এ সম্পর্কে শুধু অজ্ঞই রাখা হয়নি বরং আল্লাহ তা'য়ালা এবং তাঁর রাসূল একযোগে এমন সব কথা বলেছেন, যার ফলে নবী করীম (সাঃ) এর বিদায়ের পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত উম্মাত এ কথা মনে করে আসছে যে, মুহাম্মাদ (সাঃ) ই শেষনবী এবং তাঁর পর আর কোনো নবী আসবেন না? আমাদের সাথে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ব্যবহার কেনো এমন হবে? আমাদের দ্বীন ও ঈমানের বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের তো কোনো শত্রুতা নেই। পৃথিবীতে মুসলমান থাকা না থাকা এবং পরকালে মুক্তি বা গ্রেফতার হওয়া যে বিষয়টির ওপর নির্ভরশীল, সেই বিষয়টি সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা ও তাঁর রাসূল মানুষকে অন্ধকারে রাখবেন, এ কথা কিভাবে চিন্তা করা যেতে পারে?

যদি এ কথা তর্ক সাপেক্ষে গ্রহণ করা হয় যে, নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত রয়েছে এবং কোনো নবী আসার পর আমরা যদি সন্দেহাতীতভাবে, অসংকোচে, নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করি, তাহলে সংশয় থাকতে পারে একমাত্র মহান আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদেরকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পেশকৃত খত্‌মে নবুয়্যাতের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করবো। তাহলে অন্তত প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাতই আমাদেরকে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পরবর্তী নবীকে অস্বীকার করার এই কুফ্‌রীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে গ্রেফতার করবেন না। কিন্তু যদি প্রকৃতপক্ষেই নবুয়্যাতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে (অবশ্যই বন্ধ হয়ে গিয়েছে) এবং কোনো নতুন নবী যদি না আসতে পারে (অবশ্যই আসতে পারে না) এবং এসব সত্ত্বেও কেউ কোনো নবুয়্যাতের দাবীদারের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তাহলে তার ভয় করা উচিত যে, খত্‌মে নবুয়্যাতের ব্যাপারে যাবতীয় দলিল-প্রমাণ মওজুদ থাকার পরে আরেকজনকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে যে কুফ্‌রীর অপরাধে নিজেকে জড়িত করলো, এই অপরাধের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ পাবার জন্য সে মহান আল্লাহর দরবারে এমন কি দলিল-প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হবে!

পৃথিবীর এই ক্ষণিকের জীবন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই জীবন শেষ হবার পূর্বে এবং মহান আল্লাহর আদালতে উপস্থিত হবার আগেই তার নিজের জবাবদিহির জন্য যদি কোনো দলিল-প্রমাণ সংগ্রহ করে থাকেনও তাহলে সে দলিল-প্রমাণ কোরআন-সুন্নাহর মানদন্ডে যাচাই করে নেয়া উচিত এবং আমরা কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে যেসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে তার চিন্তা করা প্রয়োজন যে, নিজের জন্য যে ঠুন্‌কো যুক্তির ওপর নির্ভর করে সে নবুয়্যাতের দাবী করেছে এবং তার ওপরে যারা ঈমান এনেছে, তার এবং তার অনুসারীদের অবৈধ কার্যক্রম, সভা-সমাবেশ, সম্মেলন ও প্রকাশনার প্রতি যারা আচার-আচরণ, বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে সমর্থন যুগিয়েছে, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি কি এসব ঠুন্‌কো, অসত্য বিষয়াবলীর ওপর নির্ভর করে আদালতে আখিরাতে কুফ্‌রীর শাস্তি ভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে সম্মত হবে? পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি যাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে, তাদের পক্ষে রাজনৈতিক স্বার্থে অথবা রাষ্ট্রক্ষমতার লোভে এই ধরনের হঠকারিতা করা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

বিশ্বনবীর পরে আর নবুয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা নেই

বোখারী হাদীসে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, একজন ইয়াহূদী হযরত ওমর (রাঃ) কে বলেছিলেন, হে ওমর! তোমাদের কোরআনে এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, ঐ আয়াতটি যদি আমাদের ওপরে অবতীর্ণ হতো, তাহলে সেই অবতীর্ণের দিনটিকে আমরা ঈদের দিন হিসেবে উদযাপন করতাম। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, হে ইয়াহূদী! আমার স্পষ্ট স্মরণে রয়েছে, সেই আয়াতটি কোন্ আয়াত, তা কখন কোথায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং নবী করীম (সাঃ) তখন কোথায় অবস্থান করছিলেন। সেদিনটি ছিলো আরাফাতের দিন, ৯ই জিলহজ্জ। আল্লাহর রাসূল আরাফাতে মসজিদে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। সে সময় ঐ আয়াতটি অবতীর্ণ হলো–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا–

আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থাকে) তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) হিসেবে কবুল করে নিয়েছি। (সূরা মায়িদা-৩)

ইয়াহূদী বললো, 'হে ওমর! তোমরা তো একটি ঈদ উদযাপন করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ঘোষণা আসার পরে তোমাদের তো দুটো ঈদ উদযাপন করা উচিত।' হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, 'আমরা দুটো ঈদই উদযাপন করি। আল্লাহর কোরআন যে রাতে নাযিলের সূচনা হয়েছিল সে রাত ছিল লাইলাতুল কদরের রাত। অর্থাৎ অগণিত রাতের চেয়ে সে রাতটি উত্তম। কোরআন নাযিলের সূচনা হওয়ার কারণে আমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করি। আর কোরআন যেদিন অবতীর্ণ হওয়া শেষ হলো, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নি'মাতকে তথা ইসলামকে যেদিন পরিপূর্ণ করে দেয়ার ঘোষণা দিলেন, সেদিনটি ছিলো ৯ই জিলহজ্জ। এ কারণে আমরা তারপরের দিনই ঈদ উদযাপন করেছি। সে ঈদটি হলো ঈদুল আজহা। সুতরাং আমরা দুটো ঈদই উদযাপন করে থাকি।'

বিষয়টি এখানে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, নতুনভাবে কোনো নবী-রাসূল বা মানুষের জন্য জীবন ব্যবস্থা আসার অবকাশ নেই। শেষনবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা তা পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। মানবজাতী কিয়ামত পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান লাভ করেছে, এ কারণে আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর বান্দাদেরকে আনন্দ-উৎসব করার আদেশ দিয়েছেন। সেই আনন্দ-উৎসবের দিন হলো ঈদের দিন। অর্থাৎ জীবন বিধান নাযিলের সূচনা করা হলো যে মাসে, সেই মাসে একটি আনন্দ-উৎসব করতে হবে এবং যে মাসে তা পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সেই মাসে আরেকটি আনন্দ-উৎসব করতে হবে। এ কারণেই মুসলমানদের জন্য দুই ঈদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, নবুয়্যাত চেয়ে নেয়ার কোনো জিনিস নয়। সাধনা করে লাভ করারও কোনো জিনিস নয়। গোটা জীবন ব্যাপী আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার মতো কাজ করেও নবুয়্যাত লাভ করা যায় না। সে ব্যক্তির ভেতরে নবীর গুণাবলী সৃষ্টি হতে পারে না। নবুয়্যাতের যোগ্যতা কোনো অর্জন করার জিনিস নয়। কোন বিরাট খেদমতের পুরস্কার স্বরূপ মানুষকে নবুয়্যাত দান করা হয় না। সারা দুনিয়ার মানুষ কোনো ব্যক্তি বিশেষকে ভোট দিয়ে বা তার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেও নবী-রাসূল নির্বাচিত করতে পারে না। বরং বিশেষ প্রয়োজনের সময় যখন উপস্থিত হয়েছিল তখনই হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আল্লাহ তা'য়ালা নবুয়্যাতের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যখন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি, তখন শুধু শুধু আল্লাহ তা'য়ালা নবীর পর নবী প্রেরণও করেননি। আল্লাহর কোরআন থেকে যখন আমরা এ কথা অবগত হবার চেষ্টা করি যে, কোন্ পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে নবী প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, তখন সেখানে নবী-রাসূল প্রেরণের চারটি অবস্থা বর্তমান বিরাজিত ছিল। সে চারটি অবস্থা হলো–

(১) কোনো বিশেষ জাতির মধ্যে নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে ইতোপূর্বে কোনো নবী-রাসূল আসেনি এবং অন্য কোনো জাতির মধ্যে প্রেরিত নবীর শিক্ষাও তাদের কাছে পৌঁছেনি।

(২) নবী প্রেরণের প্রয়োজন এ জন্য দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট জাতি ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের শিক্ষা ভুলে যায় অথবা তা বিকৃত হয়ে যায় এবং তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(৩) ইতোপূর্বে প্রেরিত নবী-রাসূলের মাধ্যমে জনগণের শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি এবং দ্বীনের পূর্ণতার জন্য অতিরিক্ত নবীর প্রয়োজন হয়।

(৪) কোনো নবী-রাসূলের সাথে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য আরেকজন নবীর প্রয়োজন হয়।

সুতরাং এখন এ কথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে কোনো একটি অবস্থাও আর নবী করীম (সাঃ) এর পরে বিদ্যমান নেই। কোরআন স্বয়ং ঘোষণা করেছে, মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সমগ্র পৃথিবীর জন্য হিদায়াতকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস এ কথা বলে যে, তাঁর নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর থেকে সমগ্র পৃথিবীতে এমন অবস্থা বিরাজ করছে যে, যাতে করে তাঁর নবুয়্যাত সবসময় পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে পৌঁছতে পারে। এরপরে আর প্রত্যেক জাতির মধ্যে পৃথক পৃথক নবী প্রেরণের প্রয়োজন থাকে না। কোরআন, হাদীস ও সীরাতের যাবতীয় বর্ণনাও এ কথার সাক্ষ্যবহন যে, নবী করীম (সাঃ) এর শিক্ষা সম্পূর্ণ নির্ভুল এবং নির্ভেজাল কাঠামো ও অবয়বে সংরক্ষিত রয়েছে। এর মধ্যে কোনো প্রকার বিকৃতি বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি। তাঁর ওপরে যে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল তার ভেতরে আজ পর্যন্ত একটি অক্ষর বা শব্দেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি এবং কিয়ামত পর্যন্তও তা হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিয়েছেন, সেসব আদেশ-নিষেধ আজ আমরা এমনভাবে পেয়ে যাচ্ছি, যেন আমরা তাঁরই যুগে বাস করছি। সুতরাং নবী আসার কোনো প্রয়োজনই থাকতে পারে না।

মহাগ্রন্থ আল কোরআন এ কথা ঘোষণা করেছে, নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের পূর্ণতা দান করা হয়েছে। সুতরাং দ্বীনের পূর্ণতার জন্যও কোনো নতুন নবী আসার আর প্রয়োজন নেই। তাঁর কাজের সহযোগিতা করার জন্য যদি কোনো সাহায্যকারী নবীর প্রয়োজন হতো, তাহলে সেটা তাঁর জীবনকালেই আল্লাহ তা'য়ালা প্রেরণ করতেন। এ ধরণের কোনো প্রয়োজন ছিল না বিধায় মহান আল্লাহ

তা'য়ালা তা করেননি। বর্তমানে এমন কি কারণ থাকতে পারে যে, নবীকে পৃথিবীতে আসতেই হবে? কেউ যদি যুক্তি প্রদর্শন করে, মুসলিম জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে এ কারণে তাদের সংস্কারের জন্য একজন নতুন নবীর প্রয়োজন। এই যুক্তি যারা দিতে চায় তাদের কাছে ইসলামী চিন্তাবিদদের জিজ্ঞাসা, নিছক সংস্কারের জন্য পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কি কোনো নবী এসেছে যে– শুধু এই উদ্দেশ্যেই আর একজন নতুন নবীর আগমন ঘটলো? ওহী অবতীর্ণ করার জন্যই তো নবী প্রেরণ করা হয়। কেননা, নবীর কাছেই ওহী অবতীর্ণ করা হয়। আর ওহীর প্রয়োজন পড়ে কোনো নতুন পয়গাম দেয়ার অথবা পূর্ববর্তী পয়গামকে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আল্লাহর কোরআন এবং নবী করীম (সাঃ) এর আদর্শ সংরক্ষিত হয়ে যাবার পর যখন আল্লাহর দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং ওহীর সমস্ত সম্ভাব্য প্রয়োজন খতম হয়ে গিয়েছে, তখন সংস্কারের জন্য একমাত্র সংস্কারের প্রয়োজনই অবশিষ্ট রয়েছে, নতুন কোনো নবীর নয়। আর এই সংস্কারের মহান কাজটি আঞ্জাম দেয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগের প্রয়োজনে এমন ধরনের হক্কানী আলিম-উলামা, মাশায়েখদের উত্থান ঘটান যে, তাঁদের মাধ্যমেই শির্ক বিদ্আতের পূঞ্জিভূত আবর্জনা অপসারিত হয়ে থাকে।

নতুন নবীর আগমন– বুনিয়াদী মতবিরোধ

যখন কোনো জাতির মধ্যে নতুন নবী-রাসূলের আগমন ঘটবে, তখনই সেখানে প্রশ্ন উঠবে কুফ্র ও ঈমানের। যারা ঐ নবী-রাসূলের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার আনুগত্য করবে, তারা এক সম্প্রদায় ভুক্ত হবে এবং যারা তার প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তার আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে, তারা অবশ্যই একটি পৃথক সম্প্রদায়ে পরিগণিত হবে। এই দুই সম্প্রদায়ের মতবিরোধ কোনো আংশিক মতবিরোধ বলে গণ্য হবে না বরং এটি এমন একটি বুনিয়াদী মতবিরোধের পর্যায়ে নেমে আসবে, যার ফলে তাদের একটি দল যতদিন না নিজের আকিদা-বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে, ততদিন পর্যন্ত তারা দু'দল কখনো একত্র হতে পারবে না। এ ছাড়াও বাস্তবে তাদের প্রত্যেকের জন্য জীবন ব্যবস্থা এবং আইনের উৎস হবে বিভিন্ন। কেননা একটি দল তাদের নিজেদের নবীর ওহী এবং সুন্নাত থেকে আইন প্রণয়ন করবে এবং দ্বিতীয় দলটি এ দুটোকে তাদের আইনের উৎস হিসেবেই মেনে নিতে প্রথমত অস্বীকার করবে। সুতরাং এই দুই দলের মিলনে একটি সমাজ বা জাতি কোনোক্রমেই গঠিত হতে পারে না। নবী-রাসূলদের যুগের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করছে যে, নবী-রাসূলের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী ও তাঁদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী– এই দুই দল সম্মিলিতভাবে কোনো সমাজ বা জাতি গঠন করতে পারেনি।

এই চরম সত্যগুলো পর্যবেক্ষণ করার পর যে কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, খত্‌মে নবুয়্যাত মুসলিম জাতির জন্য মহান আল্লাহর বিরাট রহমত স্বরূপ। এর বিনিময়েই সমগ্র মুসলিম জাতি একটি চিরন্তন বিশ্বব্যাপী ভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভূক্ত হতে পেরেছে। এই খত্‌মে নবুয়্যাতের বিষয়টি মুসলমানদেরকে এমন সব মৌলিক মতবিরোধ থেকে সুরক্ষা করেছে, যা তাদের মধ্যে চিরন্তন বিচ্ছেদের বীজ বপন করতো। সুতরাং যে ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ) কে হিদায়াত দানকারী এবং একমাত্র অনুসরণীয় নেতা বলে স্বীকার করে এবং তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হিদায়াতের উৎসের দিকে অগ্রসর হতে চায় না, সে বর্তমানে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভূক্ত হতে পারবে। নিজেকে মুসলিম মিল্লাতের একজন বলে ঘোষণা দিতে সক্ষম হবে। নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ না হয়ে গেলে মুসলিম মিল্লাত কখনো এই ঐক্যের সন্ধান পেতো না। কারণ প্রত্যেক নতুন নবীর আগমনের পরে এই ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতো। সাধারণ স্থুলভাবে চিন্তা করলেও মানুষের বিবেক বুদ্ধিও এ কথার প্রতিই সমর্থন করে যে, একটি বিশ্বজনীন এবং পরিপূর্ণ দ্বীন তথা জীবন বিধান অবতীর্ণ করার পর এবং সে জীবন বিধানকে সকল প্রকার বিকৃতি ও পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত করার পর নবুয়্যাতের দরজা রুদ্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। এর ফলে সম্মিলিতভাবে এই শেষনবীর অনুগমন করে সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান চিরকালের জন্য একই উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারবে এবং প্রয়োজন ব্যতীত নতুন নতুন নবী-রাসূল আগমনে মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে বার বার বিভেদ সৃষ্টি হতে পারবে না। নতুন নবুয়্যাতের দাবীদারদের ভাষায় নবী 'যিল্লী অর্থাৎ ছায়া নবী' হোক অথবা বুরুজী নবী হোক, উম্মাতের অধিকারী হোক, শরীয়াতের অধিকারী হোক বা কিতাবের অধিকারী হোক–যে কোনো অবস্থায়ই যিনি নবী হবেন এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে যাকে প্রেরণ করা হবে, তাঁর আগমনের অবশ্যম্ভাবী ফল যা দাঁড়াবে তাহলো, তাঁর প্রতি ঈমান এনে যারা তাঁর অনুসরণ করবে, তারা একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে শামিল হবে। আর যারা তাকে অবিশ্বাস করে তাঁর আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকবে, তারা কাফির বলে গণ্য হবে। অতীতে যখন নবী প্রেরণের সত্যিকারের প্রয়োজন হয়েছিল, তখনই–শুধু মাত্র তখনই এই বিভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়েছিল, বর্তমানে হয়নি।

পক্ষান্তরে যখন নতুন নবী আগমনের কোনো প্রয়োজন থাকে না, তখন আল্লাহর হিক্‌মাত এবং তাঁর রহমতের কাছে কোনক্রমেই আশা করা যায় না যে, তিনি নিজের বান্দাদেরকে শুধু শুধু কুফ্‌র ও ঈমানের সংঘর্ষে লিপ্ত করবেন এবং তাদেরকে সম্মিলিতভাবে একটি সম্প্রদায়ভুক্ত হবার সুযোগ দিবেন না। সুতরাং কোরআন, সুন্নাহ

এবং সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ও সমস্ত আলিমদের ঐকমত্য থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয়, মানুষের বিবেক, বুদ্ধিও তাকে নির্ভুল বলে স্বীকার করে এবং তা থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে বর্তমানে নবুয়্যাতের দরজা বন্ধ রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এই দরজা উন্মুক্ত হবার কোনো সম্ভাবনা আল্লাহ তা'য়ালা রাখেননি। **সুতরাং কেউ যদি নতুন কোনো নবীর অনুসারী হয় এবং 'কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়- এ বিষয়টি আল্লাহ নির্ধারণ করবেন' এ ধরনের কথা বলে রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের প্রতি সমর্থন দেয়, তাহলে তাদের উচিত নিজেদেরকে মুসলিম মিল্লাত বহির্ভূত জনগোষ্ঠী হিসেবে ঘোষণা করা।**

একদিকে ভন্ডনবীর অনুসারী কাদিয়ানীদের সমর্থনে বিবৃতি দেয়া হবে, অপরদিকে নিজেকে মুসলিম হিসেবে দাবী করে মুসলিম সমাজ থেকে যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করা হবে, মক্কা-মদীনায় গমন করে মাথায় পট্টি আর হাতে তস্‌বীহ্ ধারণ করে মুসলিম মিল্লাতের সাথে প্রতারণা করা হবে, এই প্রতারণা মুসলিম মিল্লাত কোনোক্রমেই বরদাস্‌ত করবে না। যথা সময়ে তারা এসব প্রতারকদের মুখোশ উন্মোচন করে ছাড়বে ইন্‌শাআল্লাহ।

খত্‌মে নবুয়্যাত এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্

যারা নবী করীম (সাঃ) এর পরে নবী আসবে বলে ধারণা করে এবং বর্তমানে যারা নতুন নবুয়্যাতের দিকে আহ্বান জানায়, তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানদেরকে বলে থাকে যে, হাদীসে বলা হয়েছে 'প্রতিশ্রুত মসীহ' আসবেন। আর মসীহ কোনো নবী ছিলেন না। সুতরাং তার আগমনের ফলে খত্‌মে নবুয়্যাতের বিশ্বাস কোনোভাবেই প্রভাবিত হচ্ছে না, বরং খত্‌মে নবুয়্যাত এবং প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আগমন দুটোই সমপর্যায়ের। হযরত ঈসা ইবনে মরিয়াম প্রতিশ্রুত মসীহ নন, কারণ তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে। আর হাদীসে যার আগমনের সংবাদ দেয়া হয়েছে তিনি হলেন, মাসীলে মসীহ বা হযরত ঈসা (আঃ) এর অনুরূপ একজন মসীহ এবং তিনিই হলেন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী। তাকে মেনে নিলে খত্‌মে নবুওয়াতে অবিশ্বাস করা হয় না।

এই প্রতারকদের প্রতারণার আবরণ ছিন্ন করার জন্য নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসসমূহ শাণিত তরবারীর ন্যায় কোষমুক্ত হয়ে রয়েছে। রাসূলের এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ প্রত্যক্ষ করে যে কোনো ব্যক্তিই বুঝতে পারবেন যে, নবী করীম (সাঃ) কি বলেছেন, আর এই কাদিয়ানী তথা আহমাদিয়া জামায়াত তা বিকৃত করে কিভাবে প্রচার করছে।

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়াম ন্যায় বিচারক শাসকরূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং যুদ্ধ শেষ করে দেবেন। (বর্ণনান্তরে যুদ্ধের পরিবর্তে জিযিয়া শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে অর্থাৎ জিযিয়া শেষ করে দেবেন)। তখন সম্পদের পরিমাণ এতো বৃদ্ধি পাবে যে, তা গ্রহণ করার লোক থাকবে না এবং (অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছাবে যে, মানুষ আল্লাহর জন্য) একটি সিজ্দা করাকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করবে। (বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

এ হাদীসে ক্রুশ ধ্বংস করার ও শূকর হত্যা করার অর্থ হলো, একটি পৃথক ধর্ম হিসেবে খৃষ্টান ধর্মের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। খৃষ্টান ধর্মের সমগ্র কাঠামো এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, আল্লাহ্ তাঁর একমাত্র পুত্র সন্তানকে অর্থাৎ হযরত ঈসাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে অভিশাপে পরিপূর্ণ মৃত্যু দিয়েছেন। আর এতেই সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য নবীদের উম্মাতের সাথে খৃষ্টানদের পার্থক্য হলো এই যে, এরা শুধু আকীদাটুকু গ্রহণ করেছে, এরপর মহান আল্লাহর সমস্ত আইনই নাকচ করে দিয়েছে। এমনকি শূকরকেও এরা হালাল করেছে, যা সমস্ত নবীর শরীয়াতে হারাম। সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ) নিজে এসে যখন বলবেন, আমি আল্লাহর পুত্র নই, আমাকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়নি এবং আমি কারো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিনি, তখন খৃষ্টান ধর্মবিশ্বাসের বুনিয়াদই সমূলে উৎপাটিত হবে। অনুরূপভাবে যখন তিনি বলবেন, আমার অনুসারীদের জন্য আমি শূকর হালাল করিনি এবং তাদেরকে শরীয়াতের বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তিও দেইনি, তখন খৃষ্টানদের ধর্মের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যও নির্মূল হয়ে যাবে। আর জিযিয়া শেষ হয়ে যাবে বলতে বুঝায়, তখন ধর্মের বৈষম্য ঘুচিয়ে মানুষ একমাত্র ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করবে। এর ফলে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না এবং কারো কাছ থেকে জিযিয়াও আদায় করা হবে না।

আরেকটি হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, ঈসা ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ না পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না।' এসব হাদীসের অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে বোখারী শরীফের কিতাবুল মাজালিম, বাবু কাসরিস সালিব–ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান, বাবু ফিতনাতিদ দাজ্জাল। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে–হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে ইবনে মারয়াম অবতীর্ণ হবেন এবং তোমাদের ইমাম নিজেদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত হবেন। (বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

অর্থাৎ হযরত ঈসা নামাযে ইমামতি করবেন না। মুসলমানদের পূর্ব নিযুক্ত ইমামের পেছনে তিনি নামাজ আদায় করবেন। আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন। এরপর তিনি শূকর হত্যা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। তাঁর জন্য একাধিক নামায এক ওয়াক্তে আদায় করা হবে। তিনি এতো ধন-সম্পদ বিতরণ করবেন যে, অবশেষে তার গ্রহীতা পাওয়া যাবে না। তিনি খিরাজ মওকুফ করে দেবেন। রওহা (মদীনা থেকে ২৫ মাইল দূরে একটি স্থানের নাম) নামক স্থানে অবস্থান করে তিনি সেখান থেকে হজ্ব অথবা ওমরাহ করবেন অথবা দুটোই করবেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ) (কাদিয়ানীরা মীর্জা গোলাম আহ্‌মদকে এ যুগের মাসীলে মাসীহ্ বলে থাকে, অথচ এই মীর্জা সাহেব জীবনে কখনো হজ্জ বা উমরাহ্ করেনি।)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, দাজ্জালের আবির্ভাব বর্ণনার পর আল্লাহর রাসূল বলেন, মুসলমানরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকবে, সারিবদ্ধ হতে থাকবে এবং নামাযের জন্য একামাত পাঠ করা শেষ হবে, তখন ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন। আল্লাহর দুশমন দাজ্জাল তাঁকে দেখেই এমনভাবে গলিত হতে থাকবে যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। যদি ইবনে মারিয়াম তাকে এই অবস্থায় ছেড়ে দেন, তাহলেও সে বিগলিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাকে ইবনে মারিয়ামের হাতে কতল করবেন তিনি দাজ্জালের রক্তে রঞ্জিত নিজের বর্শাফলক মুসলমানদের দেখাবেন। (মুসলিম)

হযরত আবু হুরাইরা বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, আমার এবং তাঁর (ঈসার) মাঝখানে আর কোনো নবী নেই এবং তিনি অবতীর্ণ হবেন। তাঁকে দেখা মাত্রই তোমরা চিনে নিয়ো। তিনি মাঝারি ধরণের লম্বা হবেন। বর্ণ লাল-সাদায় মেশানো। পরনে দুটো হলুদ রঙের কাপড়। তাঁর মাথার চুল থেকে মনে হবে এই বুঝি পানি টপকে পড়লো। অথচ তা মোটেও সিক্ত হবে না। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের সাথে যুদ্ধ করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়া কর রহিত করবেন। তাঁর যুগে মহান আল্লাহ ইসলাম ব্যতীত সমস্ত আদর্শকেই নির্মূল করে দিবেন। তিনি মসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং পৃথিবীতে ৪০ বছর অবস্থান করবেন। তারপর তাঁর ইন্তেকাল হবে এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা আদায় করবে। (আবু দাউদ, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছি, ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁকে বলবেন, আসুন, আপনি

নামায পড়ান। কিন্তু তিনি বলবেন, না তোমরা নিজেরাই একে অপরের নেতা। মহান আল্লাহ এই উম্মাতকে যে ইজ্জত দান করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এ কথা বলবেন। (মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) ইবনে সাইয়াদ প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, যদি এ সেই ব্যক্তি (অর্থাৎ দাজ্জাল) হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা এর হত্যাকারী নও, বরং ঈসা ইবনে মারয়াম একে হত্যা করবেন এবং যদি এ সেই ব্যক্তি না হয়ে থাকে, তাহলে জিম্মীদের মধ্য থেকে কাউকে হত্যা করার তোমার কোনো অধিকার নেই। (মিশকাত)

হযরত জাবের ইবেন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, (দাজ্জাল প্রসঙ্গে আল্লাহর রাসূল বলেছেন) সেই সময় ইবনে মারয়াম হঠাৎ মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। লোকেরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তাঁকে বলা হবে, হে রুহুল্লাহ! অগ্রসর হন। কিন্তু তিনি বলবেন, না, তোমাদের ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া উচিত। তিনিই নামায পড়াবেন। এরপর ফজরের নামাযের পর মুসলমানরা দাজ্জালের মোকাবেলায় বের হবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন সেই মিথ্যাবাদী হযরত ঈসাকে দেখবে তখন বিগলিত হতে থাকবে যেমন লবণ পানিতে গলে যায়। এরপর তিনি দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। তখন অবস্থা এমন হবে যে, বৃক্ষ-তরুলতা এবং প্রস্তর খন্ড চিৎকার করে বলবে, হে রুহুল্লাহ! ইয়াহূদী এই আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। দাজ্জালের অনুগামীদের কেউ বাঁচবে না, সবাইকে হত্যা করা হবে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন কেলাবী দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল বলেছেন, দাজ্জাল যখন এসব করতে থাকবে, ইতোমধ্যে আল্লাহ ইবনে মারয়ামকে প্রেরণ করবেন। তিনি দামেশ্কের পূর্ব অংশে সাদা মিনারের কাছে দুটো হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে হাত রেখে নামবেন। তিনি মাথা নীচু করলে পানি টপকাচ্ছে বলে মনে হবে। আবার মাথা উঁচু করলে মনে হবে যেন বিন্দু বিন্দু পানি মোতির মতো চমকাচ্ছে। তাঁর নিশ্বাস ইসলাম বিরোধি যে ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করবে, এবং এর গতি হবে তাঁর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত (অর্থাৎ আল্লাহর কুদরতে তাঁর নিশ্বাস এতদূর পর্যন্ত পৌঁছবে) সে জীবিত থাকবে না। ইবনে মারয়াম দাজ্জালের পশ্চাদ্ধাবন করবেন এবং লুদের দ্বারপ্রান্তে তাকে গ্রেফতার করে হত্যা করবেন। (মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্)

হাদীসে লুদ নামে যে জায়গার কথা বলা হয়েছে, বর্তমানে সে জায়গা ইসরাঈলের রাজধানী তেল আবীব থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। ইহুদীরা এখানে একটি বিশাল বিমান বন্দর নির্মাণ করেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস বর্ণনা করেন, বলেছেন, দাজ্জাল আমার উম্মাতের মধ্যে বের হবে এবং চল্লিশ (হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না ৪০ দিন, ৪০ মাস না ৪০ বছর) অবস্থান করবে। এরপর আল্লাহ ঈসা ইবনে মার্‌য়ামকে পাঠাবেন। তাঁর চেহারা উরওয়া ইবনে মাসউদের (একজন সাহাবী) মতো। তিনি দাজ্জালের পশ্চাদ্বাবন করবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। এরপর সাত বছর পর্যন্ত মানুষ এমন অবস্থায় থাকবে যে, দু'জন লোকের মধ্যে শত্রুতা থাকবে না। (মুসলিম, তিরমিযী)

হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ আল গিফারী বর্ণনা করেন, একবার নবী করীম (সাঃ) আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় লিপ্ত ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আলোচনা করছিলে? লোকজন বললো, আমরা কিয়ামতের কথা আলোচনা করছি। তিনি বললেন, দশটি নিশানা প্রকাশ না হবার পূর্বে তা কখনো কায়েম হবে না। এরপর তিনি দশটি নিশানা বললেন। ধোঁয়া, দাজ্জাল, দাব্বাতুল আরদ; পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়, ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের অবতরণ, ইয়াজুজ-মাজুজ, তিনটি প্রকান্ড ভূমিধ্বস একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে, আর একটি আরব উপদ্বীপে, সর্বশেষ একটি প্রকান্ড অগ্নি ইয়েমেন থেকে উঠবে এবং মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে হাশরের ময়দানের দিকে। (মুসলিম, আবু দাউদ)

আল্লাহর রাসূলের আজাদকৃত গোলাম হযরত সাওবান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের দুটো সেনাদলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একটি হলো, যারা হিন্দুস্তানের ওপর আক্রমণ করবে আর দ্বিতীয়টি ঈসা ইবনে মার্‌য়ামের সাথে অবস্থানকারী। (নাসায়ী, মুসনাদে আহমাদ)

মুজাম্মে' ইবনে জারিয়া আনসারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, ইবনে মার্‌য়াম দাজ্জালকে লুদের দ্বারপ্রান্তে হত্যা করবেন। (তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, ফজরের নামায আদায় করানোর জন্য মুসলমানদের ইমাম যখন অগ্রবর্তী হবেন, ঠিক তখনই ঈসা ইবনে মার্‌য়াম তাদের ওপর অবতীর্ণ হবেন। ইমাম পিছনে সরে আসবেন ইবনে মারিয়ামকে অগ্রবর্তী করার জন্য কিন্তু তিনি তাঁর কাঁধে হাত রেখে

বলবেন, না, তুমিই নামায পড়াও। কেননা, এরা তোমার জন্যই দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তিনিই (ইমাম) নামায পড়াবেন। সালাম ফেরার পর ইবনে মারিয়াম বলবেন, দরজা খোলো। দরজা খোলা হবে। বাইরে দাজ্জাল ৭০ হাজার সশস্ত্র ইয়াহূদী সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করবে। তার দৃষ্টি ইবনে মারিয়ামের প্রতি পড়া মাত্রই সে এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায় এবং সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। ইবনে মারিয়াম বলবেন, আমার কাছে তোর জন্য এমন এক আঘাত আছে যার হাত থেকে তোর কোনোক্রমেই নিষ্কৃতি নেই। এরপর তিনি তাকে লুদের পূর্ব দ্বারদেশে গিয়ে গ্রেফতার করবেন এবং আল্লাহ ইয়াহূদীদের পরাজিত করবেন এবং যমীন মুসলমানদের দ্বারা এমনভাবে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, যেমন পাত্র পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সবাই একই কালেমায় বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করা হবে না। (ইবনে মাজাহ্)

উসমান ইবনে আবিল আস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, এবং ঈসা ইবনে মার্‌য়াম ফজরের নামাযের সময় অবতরণ করবেন। মুসলমানদের নেতা তাঁকে বলবেন, হে রুহুল্লাহ! আপনি নামাজ পড়ান! তিনি জবাব দেবেন, এই উম্মাতের লোকেরা নিজেরাই নিজেদের নেতা। তখন মুসলমানদের নেতা অগ্রবর্তী হয়ে নামায আদায় করাবেন। এরপর নামায আদায় করে ঈসা (আঃ) নিজের সেনাবাহিনী নিয়ে দাজ্জালের দিকে অগ্রসর হবেন। সে যখন তাঁকে দেখবে তখন এমনভাবে বিগলিত হতে থাকবে যেমন সীসা গলে যায়। তিনি নিজের অস্ত্র দিয়ে দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং এবং তার দলবল পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। কিন্তু কোথাও তারা আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না। এমনকি বৃক্ষ ও প্রস্তর খন্ড চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন! এখানে কাফির লুকিয়ে আছে। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত সামুরা ইবেন জুনদুব (রাঃ) এক দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এরপর প্রভাতে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম মুসলমানদের মধ্যে আসবেন এবং মহান আল্লাহ্ দাজ্জাল ও তার বাহিনীকে পরাজিত করবেন। এমনকি প্রাচীর এবং বৃক্ষের কান্ডও চিৎকার করে বলবে, হে মুমিন! এখানে কাফির আমার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে। এসো একে হত্যা করো। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত ইমরাণ ইবনে হাস্নীন (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেন, আমার উম্মাতের ওপর মধ্যে সর্বদা একটি দল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং তারা বিরোধী দলের ওপর প্রতিপত্তি করবে। অবশেষে আল্লাহর ফায়সালা এসে যাবে এবং ঈসা ইবনে মার্‌য়াম (আঃ) অবতীর্ণ হবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত আয়িশা (রাঃ) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, ঈসা ইবনে মারিয়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি ৪০ বছর ইন্‌সাফকারী ইমাম এবং ন্যায়নিষ্ঠ শাসক হিসেবে পৃথিবীতে অবস্থান করবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

আল্লাহর রাসূলের আজাদকৃত গোলাম হযরত সাফীনা (রাঃ) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) বলেন, এরপর ঈসা (আঃ) অবতীর্ণ হবেন এবং আল্লাহ আফিয়েকের পার্বত্য পথের কাছে তাকে (দাজ্জালকে) হত্যা করবেন। (মুসনাদে আহমাদ)

হাদীসে যে আফিয়েকের কথা বলা হয়েছে সে স্থানের নাম বর্তমানে ফায়েক। সিরিয়া এবং ইসরাঈল সীমান্তে বর্তমানে সিরিয়া রাষ্ট্রের সর্বশেষ শহর। এরপরে পশ্চিমের দিকে কয়েক মাইল দূরে তাবারিয়া নামক হ্রদ আছে। এখানেই জর্দান নদীর উৎপত্তি স্থল। এর দক্ষিণ-পশ্চিমে পাহড়ের মধ্যভাগে নিম্ন ভূমিতে একটি রাস্তা রয়েছে। এই রাস্তাটি প্রায় দেড় হাজার ফুট গভীরে নেমে গিয়ে সেই স্থানে পৌছায় যেখান থেকে জর্দান নদী তাবারিয়ার মধ্য হতে নির্গত হচ্ছে। এ পার্বত্য পথকেই বলা হয় আকাবায়ে আফিয়েক বা উফায়েকের নিম্ন পার্বত্য পথ।

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল বলেন, যখন মুসলমানরা নামাযের জন্য প্রস্তুত হবেন তখন তাদের চোখের সম্মুখে ঈসা ইবনে মার্‌য়াম অবতীর্ণ হবেন। তিনি মুসলমানদের নামায পড়াবেন এরপর সালাম ফিরিয়ে লোকদের বলবেন, আমার এবং আল্লাহর এই দুশমনের মাঝখান থেকে সরে যাও এবং আল্লাহ দাজ্জালের দলবলের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করবেন। (মুস্তাদরাকে হাকিম)

হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য

এ ধরণের অনেকগুলো হাদীস রয়েছে হাদীস গ্রন্থসমূহে। এ সমস্ত হাদীস একত্রিত করতে গেলে ভিন্ন একটি গ্রন্থই রচনা করতে হয়। যে কোনো ব্যক্তি হাদীসগুলো পড়ে নিজেই বুঝতে পারবেন যে, নতুন নবুয়্যাতের দাবীদার কাদিয়ানীদের দাবী অনুযায়ী এসব হাদীসে কোনো 'প্রতিশ্রুত মসীহ বা মাসীলে মসীহ, বুরুজী মসীহ'–এর কোনোই চিহ্ন নেই। এমন কি বর্তমানকালে কোনো পিতার ঔরসে মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কোনো ব্যক্তির এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, নবী করীম (সাঃ) যে মসীহ সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন, তিনিই সেই মসীহ। পিতা

ব্যতীত হযরত ঈসা (আঃ) যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এ হাদীসগুলোর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য থেকে তাঁরই অবতরণের সংবাদ দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন না জীবিত অবস্থায় কোথাও রয়েছেন, এ আলোচনা সম্পূর্ণ অবান্তর। তর্কের খাতিরে যদি এ কথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও বলা যায় যে, মহান আল্লাহ্ তাঁকে জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন। উপরন্তু আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর এক বান্দাকে তাঁর এ বিশাল সৃষ্টি জগতের কোনো একস্থানে হাজার হাজার বছর জীবিত অবস্থায় রাখার পর নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো সময় তাঁকে এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে পারেন। আল্লাহ্ তা'য়ালার অসীম ক্ষমতার প্রেক্ষিতে এ কথা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। মহান আল্লাহ্ তাঁর পুনরুজ্জীবনের ক্ষমতা সম্পর্কে সূরা বাকারার ২৫৯ আয়াতে এমন একটি ঘটনার কথা তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়েছেন।

বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি হাদীসকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাকে অবশ্যই ভবিষ্যতে আগমনকারী ব্যক্তিকে উল্লেখিত ঈসা (আঃ) বলে স্বীকার করতেই হবে। তবে যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে সে প্রকৃতপক্ষে কোনো আগমনকারীর অস্তিত্বই স্বীকার করতে পারে না। কারণ আগমনকারীর আগমন সম্পর্কে যে বিশ্বাস জন্ম নিয়েছে হাদীস ব্যতীত আর কোথাও তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এ অদ্ভূত ব্যাপারটি শুধু এখানেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, আগমনকারীর আগমন সম্পর্কিত ধারণা-বিশ্বাস গ্রহণ করা হচ্ছে হাদীস থেকে কিন্তু সেই হাদীসগুলোই আবার যখন সুস্পষ্ট করে এ বক্তব্য তুলে ধরছে যে, উক্ত আগমনকারী কোনো 'মসীলে মসীহ্ বা মসীহর ন্যায় ব্যক্তি' নন বরং তিনি হবেন স্বয়ং হযরত ঈসা ইবনে মার্‌য়াম (আঃ) তখন তা মানতে অস্বীকার করা হচ্ছে। নিজেদের মিথ্যা বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণ করা জন্য হাদীসের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু নিজেদের মিথ্যা দাবীর বিপরীতে যেসব হাদীস রয়েছে, তা গ্রহণ করা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী স্বয়ং স্বীকৃতি দিয়ে লিখেছে–

هم خدا تعالی کی قسم کھاکر بیان کر تے هیی که میرے اس
دعوی کی حدیث بینیاد نهیے بلکه قران اور وه وحی هے
جو میرے پر نازل هوئی، هان تائیدی طورپر هم وه حدیثین
پیش کرتے هیے جو قران شریف کے مطابق هیی اور مسری

وحی ے معارض نہی اور دوسری حیوں کو ہم ردی کیطرح پھینك دیتے ھیی، اگر حدثوں کا دنیا میے موجود بھی نہ ھوتا تب بھی میرے اس رعوی کو کپحہ جرس نہ پھو نپحتا تھا-

আমি খোদা তা'য়ালার শপথ করে বলছি যে, আমার এই দাবীর মূলে হাদীস নয় বরং কোরআন এবং আমার প্রতি অবতারিত ওহী। হ্যাঁ, সমর্থন লাভের জন্য আমি উক্ত হাদীসগুলো পেশ করে থাকি যেসব হাদীস কোরআনের অনুকূল ও আমার প্রতি অবতারিত ওহীর বিপরীত না হয়। এ ছাড়া আমি অন্যান্য সমস্ত হাদীস পরিতাজ্য বস্তুর ন্যায় ফেলে দিয়ে থাকি। যুদি পৃথিবীতে হাদীসগুলোর অস্তিত্ব না থাকতো তবুও আমার এই দাবীর কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতো না। (ইযাযে আহমাদী, ৩০-৩১ পৃষ্ঠা)

নবী করীম (সাঃ) এর হাদীসের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। হযরত ঈসা দ্বিতীয় বার নবী হিসেবে অবতরণ করবেন না। তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হবে না। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তিনি কোনো নতুন বিধান আনবেন না। আল্লাহর রাসূলের আদর্শে তিনি হ্রাস-বৃদ্ধি করবেন না। দ্বীন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের জন্যও তাঁকে প্রেরণ করা হবে না এবং তাঁর প্রতি যারা ঈমান আনবে তাদেরকে নিয়ে একটি পৃথক উম্মাতও তিনি গড়ে তুলবেন না। তাঁকে কেবল মাত্র একটি পৃথক দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠানো হবে। অর্থাৎ তিনি দাজ্জালের ফিত্নাকে সমূলে বিনাশ করবেন। এ জন্য তিনি এমনভাবে অবতরণ করবেন যার ফলে তাঁর অবতরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যেসব মুসলমানের মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন তারা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারবে যে, নবী করীম (সাঃ) যে ঈসা ইবনে মারয়াম সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন তিনিই সেই ব্যক্তি এবং রাসূলের কথা অনুযায়ী তিনি যথা সময়ে অবতরণ করেছেন। তিনি এসে মুসলমানদের দলে শামিল হবেন। মুসলমানদের তদানীন্তন নেতার পেছনে তিনি নামায পড়বেন।

(যদিও কতক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) অবতরণ করার পর প্রথম নামায নিজে পড়াবেন। কিন্তু অধিকাংশ এবং বিশেষ করে শক্তিশালী কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি নামাযে ইমামতি করতে অস্বীকার করবেন এবং মুসলমানদের তৎকালীন ইমাম ও নেতাকে অগ্রবর্তী করবেন। মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরীনে কেরাম সর্ব সম্মতভাবে এই মতটিই গ্রহণ করেছেন)

সে সময়ে মুসলমানদের যিনি নেতৃত্ব দিবেন তিনি তাঁকেই অগ্রবর্তী করবেন যাতে এ ধরণের সন্দেহের কোনো অবকাশই না থাকে যে, তিনি নিজের নবুয়্যাতী পদমর্যাদা সহকারে পুনর্বার নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার জন্য ফিরে এসেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে কোনো দলে মহান আল্লাহর নবীর উপস্থিতিতে অন্য কোনো ব্যক্তি ইমাম বা নেতা হতে পারেন না। সুতরাং নিছক এক ব্যক্তি হিসেবে মুসলমানদের দলে তাঁর অন্তর্ভুক্ত স্বতষ্ফূর্তভাবে এ কথাই ঘোষণা করবে যে, তিনি নবী হিসেবে আগমন করেননি। এ জন্য তাঁর আগমনে নবুয়্যাতের দরজা উন্মুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। নিঃসন্দেহে তাঁর আগমন বর্তমান ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের আগমনের সাথে তুলনীয়। এ অবস্থায় প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধানের অধীনে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বোধ সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি সহজেই এ কথা বুঝতে পারেন যে, এক রাষ্ট্রপ্রধানের আমলে অন্য একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনেই আইন ভেঙ্গে যায় না।

তবে দুটো অবস্থায় আইনের বিরুদ্ধাচরণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এক, প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান এসে যদি আবার নতুন করে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেন। দুই, কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা ও দায়িত্ব অস্বীকার করেন। কারণ এটা হবে তাঁর রাষ্ট্রপ্রধান থাকাকালে যেসব কাজ হয়েছিল সেগুলোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার নামান্তর। এ দুটো অবস্থার কোনো একটি না হলে প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধানের নিছক আগমনই আইনগত অবস্থাকে কোনো প্রকারে পরিবর্তিত করতে পারে না। হযরত ঈসা (আঃ) এর দ্বিতীয় আগমনের ব্যাপারটিও অনুরূপ। তাঁর নিছক আগমনেই খত্মে নবুয়্যাতের দুয়ার ভেঙ্গে পড়ে না। তবে তিনি এসে যদি নবীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন অথবা কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর প্রাক্তন নবুয়্যাতের মর্যাদাও অস্বীকার করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আল্লাহর নবুয়্যাত বিধি ভেঙ্গে পড়ে।

হাদীসে এ দুটো পথই পরিপূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। হাদীসে একদিকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, নবী করীম (সাঃ) এর পরে কোনো নবী নেই এবং অন্যদিকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, তাঁর এ দ্বিতীয় আগমন নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালন করার উদ্দেশ্যে হবে না। অনুরূপভাবে তাঁর আগমনে মুসলমানদের মধ্যে কুফ্র ও ঈমানের কোনো নতুন প্রশ্ন দেখা দেবে না। আজও কোনো ব্যক্তি তাঁর পূর্বের নবুয়্যাতের ওপর ঈমান না আনলে কাফির হয়ে যাবে। স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও

হযরত ঈসার নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সমস্ত উম্মাত শুরু থেকেই কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ওপর ঈমান রাখবে। হযরত ঈসার পুনর্বার আগমনের সময়ও এই একই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। মুসলমানরা কোনো নতুন নবুয়্যাতের প্রতি ঈমান আনবে না, বরং আজকের ন্যায় সেদিনও তারা ঈসা ইবনে মারয়ামের পূর্বের নবুয়্যাতের ওপরই ঈমান রাখবে। এ অবস্থাটি বর্তমানে যেমন খত্‌মে নবুয়্যাত বিরোধী নয়, তেমনি সেদিনও বিরোধী হবে না।

আল্লামা তাফ্‌তাযানী (রাহঃ) শারহে আকায়েদে নাসাফী গ্রন্থে লিখেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) সর্বশেষ নবী- এ কথা প্রমাণিত সত্য। যদি বলা হয়, তারপর হাদীসে হযরত ঈসার আগমনের কথা বর্ণিত হয়েছে, তাহলে আমি বলবো, অবশ্যই তাঁর আগমনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অনুসারী হবেন। কারণ তাঁর শরীয়াত বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হবে না এবং তিনি নতুন কোনো বিধানও নির্ধারণ করবেন না। বরং তিনি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে কার্যক্রম পরিচালিত করবেন। (শারহে আকায়েদে নাসাফী-১৩৫ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলুসী (রাহঃ) তাঁর রুহুল মাআনী নামক তাফসীরে লিখেছেন, এরপর ঈসা (আঃ) আগমন করবেন। তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব প্রদত্ত নবুয়্যাতের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। কারণ তিনি নিজের পূর্বের পদমর্যাদা থেকে অপসারিত হবেন না। নিজের পূর্বের আইন-কানুনের অনুসারী হবেন না। কারণ তা তাঁর নিজের ও অন্যান্য লোকদের জন্য বাতিল হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে তিনি মূলনীতি থেকে সুক্ষ বিষয় পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী হবেন। বরং তিনি নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিনিধি এবং উম্মাতের মধ্যস্থিত শাসকদের মধ্য থেকে একজন শাসক হবেন। (রুহুল মাআনী, ২২ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩২)

ইমাম রাযী (রাহঃ) তাফসীরে কবীর-এ লিখেছেন, মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পরে নবীদের আগমন শেষ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং বর্তমানে ঈসা (আঃ) এর আগমনের পর তিনি নবী করীম (সাঃ) এর অনুসারী হবেন, এ কথা কোনোক্রমেই অযৌক্তিক নয়। (তাফসীরে কবীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৩)

ইয়াহূদী দাজ্জাল ও বর্তমান পৃথিবী

সমস্ত প্রামাণ্য হাদীস থেকেই জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আঃ) কে যে দাজ্জালের বিশ্বব্যাপী ফিত্‌না নির্মূল করার জন্য পাঠানো হবে সে হবে ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত। সে নিজেকে মসীহ রূপে ঘোষণা করবে। ইয়াহূদীদের ইতিহাস ও তাদের ধর্মীয়

চিন্তাধারা ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনবহিত কোনো ব্যক্তি এ বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। হযরত সুলাইমান (আঃ) এর ইন্তেকালের পর যখন বনী ইসরাঈল ক্রমাগত অবক্ষয় ও পতনের শিকার হতে থাকলো এমন কি অবশেষে ব্যবিলন ও আসিরিয়া অধিপতিরা তাদেরকে পরাধীন করে দেশ থেকে বিতাড়িত করলো এবং পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্ত করে দিলো, তখন বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাদেরকে সুসংবাদ দিতে থাকলেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন মসীহ্‌ এসে তাদেরকে এ চরম লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দেবেন। এসব ভবিষ্যৎ বাণীর প্রেক্ষিতে ইয়াহূদীরা একজন মসীহের আগমনের প্রতীক্ষারত ছিল। তিনি হবেন বাদশাহ্‌। তিনি যুদ্ধ করে দেশ জয় করবেন। বনী ইসরাঈলকে বিভিন্ন দেশ থেকে এনে ফিলিস্তিনে একত্রিত করবেন এবং তাদের একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু তাদের এসব আশা-আকাংখাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে যখন ঈসা ইবনে মার্‌য়াম (আঃ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মসীহ্‌ হয়ে আসলেন এবং কোনো সেনাবাহিনী ব্যতীত আগমন করলেন, তখন ইয়াহূদীরা তাকে মসীহ্‌ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলো। তারা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হলো।

সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত ইয়াহূদী জগত সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র প্রতীক্ষা করছে, যার আগমনের সুসংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সেই কাংখিত যুগের সুখ-স্বপ্ন-কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ। তালমূদ ও রাব্বীর সাহিত্য গ্রন্থসমূহে এর যে ছবি তারা অঙ্কন করেছে তার কল্পিত স্বাদ আহরণ করে শত শত বছর থেকে ইয়াহূদী জাতি জীবন ধারণ করছে। তারা বুক ভরা আশা নিয়ে বসে আছে যে, এ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ হবেন একজন শক্তিশালী সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা। তিনি নীলনদ থেকে ফেরাত নদী পর্যন্ত গোটা এলাকা ইয়াহূদীরা নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এলাকা বলে মনে করে, সে এলাকা পুনরায় ইয়াহূদীদের দখলে আনবেন এবং সারা পৃথিবী থেকে ইয়াহূদীদেরকে এনে এখানে একত্রিত করবেন।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নবী করীম (সাঃ) এর ভবিষ্যৎ বাণীর আলোকে ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, নবী করীম (সাঃ) এর কথা অনুযায়ী ইয়াহূদীদের প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র ভূমিকা পালনকারী প্রধানতম দাজ্জালের আগমনের জন্য মঞ্চ সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। ফিলিস্তিনের বৃহত্তর এলাকা থেকে মুসলমানদেরকে বিতাড়িত করা হয়েছে। সেখানে ইসরাঈল নামে একটি অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীরা এসে সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলেছে। আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স

তাকে একটি বিরাট সামরিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ইয়াহূদী পুঁজিপতিদের সহায়তায় ইয়াহূদী বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতিগণ তাকে দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর বড় বড় ব্যবসা আজ ইয়াহূদীদের হাতে। এক কথায় বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইহুদী শক্তি। ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক পারমানবিক অস্ত্রের অধিকারী ও আবিষ্কারক তারা। জাতি সংঘকে পরিণত করা হয়েছে ইয়াহূদীদের গোলামে। জাতি সংঘ তাদের আজ্ঞাবহ দাসের ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছে। মুসলিম নামধারী নেতাদের দিয়ে ইয়াহূদী রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর জন্য ইহুদীদের অস্ত্র ভান্ডার এক মহাবিপদে পরিণত করেছে।

যেসব মুসলিম দেশ ভবিষ্যতে ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে, জাতি সংঘের মাধ্যমে সেসব মুসলিম দেশের সামরিক শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলন ও মুসলিমদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য ইয়াহূদীরা সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে যে কোনো সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। ইয়াহূদী রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ তাদের ধর্মীয় কল্পনার ফানুস 'উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দেশ' দখল করার আকাংখা মোটেও গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিয়েছে। পৃথিবীর যে কোনো মুসলিম দেশে তারা যখন তখন হামলা পরিচালনা করছে। দীর্ঘকাল থেকে ভবিষ্যতে ইয়াহূদী রাষ্ট্রের যে নীল নক্শা তারা প্রকাশ করে আসছে তাতে করে গোটা মধ্যপ্রাচ্যই তাদের দখলে তারা নিয়ে নেবে। তাদের ধর্মীয় নক্শায় রয়েছে সিরিয়া, লেবানন, জর্দানের সমগ্র এলাকা, ইরাক, তুরস্কের ইস্কান্দারুন, মিশরের সিনাই ও ব-দ্বীপ এলাকা এবং মদীনাসহ আরবের অন্তরগত হিজায ও নজদের উচ্চভূমি পর্যন্ত তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করার ধর্মীয় আদেশ বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

এসব কাজে ইয়াহূদীরা স্বঘোষিত বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা ও তার পোষ্য বৃটেন এবং অন্যান্য খৃষ্টান ও অমুসলিম দেশসমূহকে ব্যবহার করছে। নিজেরা আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংস করে এর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসার কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী এর যাবতীয় সম্পদ আটক করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তারা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে আফগানিস্থান ও ইরাককে দখল করে ইরান ও সিরিয়া দখল করার পথে অগ্রসর

হচ্ছে। মুসলমানরা যেন আত্মরক্ষার মত কোনো অস্ত্র রাখতে না পারে, সে ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। ইয়াহূদীদের এসব কার্যক্রমে মুসলিম নামধারী সরকারসমূহ রোবটের ন্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আগামীতে সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে অথবা বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে তারা ঐসব এলাকা দখল করার চেষ্টা অবশ্যই করবে এবং কথিত প্রধানতম দাজ্জাল তাদের প্রতিশ্রুত মসীহরূপে আগমন করবে। নবী করীম (সাঃ) শুধু তার আগমন সংবাদ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং সেই সাথে একথাও বলেছেন যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে এবং এক একটি দিন তাদের কাছে এক একটি বছর বলে প্রতীয়মান হবে। এ জন্য তিনি নিজে মসীহ দাজ্জালের ফিত্না থেকে সাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় চেয়েছেন এবং মুসলমানদেরকেও আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন।

এই মসীহ দাজ্জালের মোকাবিলা করে তার ঘৃণ্য গতিরোধ করার জন্য মহান আল্লাহ কোনো মসীলে মসীহকে প্রেরণ করবেন না বা প্রেরণ করেননি। বরং মহান আল্লাহ প্রকৃত মসীহ হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রেরণ করবেন। ইয়াহূদীরা সে সময়ে যে প্রকৃত মসীহ হযরত ঈসাকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল এবং তাদের জানা মতে তারা তাঁকে শূলবিদ্ধ করে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। এই প্রকৃত মসীহ ভারতের পাঞ্জাবের কাদিয়ান নামক গ্রামে অথবা আফ্রিকায় বা আমেরিকায় অবতরণ করবেন না, বরং তিনি অবতরণ করবেন দামেশ্কে। কারণ তখন সেখানেই মুসলমানদের সাথে ইয়াহূদীদের যুদ্ধ চলতে থাকবে। আর ইয়াহূদী রাষ্ট্র ইসরাঈল থেকে দামেশ্ক মাত্র ৫০ থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

দাজ্জাল সম্পর্কিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু থেকে সহজেই একথা বোধগম্য হয় যে, মসীহ দাজ্জাল ৭০ হাজার ইয়াহূদী সেনাদল নিয়ে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে এবং দামেশ্কের সামনে উপস্থিত হবে। ঠিক সেই মুহূর্তে দামেশ্কের পূর্ব অংশের একটি সাদা মিনারের কাছে সুব্হে সাদিকের পর হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন এবং ফজর নামায শেষে মুসলমানদেরকে নিয়ে দাজ্জালের মোকাবিলায় বের হবেন। তাঁর প্রচন্ড আক্রমনে দাজ্জাল পশ্চাদপসরণ করে আফিয়েকের পার্বত্য পথ দিয়ে ইসরাঈলের দিকে ফিরে যাবে। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) পিছু না হটে তার পেছনেই যেতে থাকবেন। অবশেষে লিড্ডা বিমান বন্দরে দাজ্জাল হযরত ঈসার হাতে নিহত হবে। এরপর ইয়াহূদীদেরকে প্রতিটি স্থান থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে

হত্যা করা হবে ফলে ইয়াহূদী জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। হযরত ঈসা (আঃ) এর পক্ষ থেকে সত্য প্রকাশের পর খৃষ্টান ধর্মও বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে সমস্ত মিল্লাত একীভূত হয়ে যাবে।

এসব হাদীসের একস্থানে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন বর্শা দিয়ে। আর দাজ্জাল হলো একজন ইয়াহূদী। পক্ষান্তরে বর্তমান পৃথিবীতে ইয়াহূদীরাই হলো সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের অধিকারী। ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের আবিষ্কারকও তারা। ভবিষ্যতে তারা আরো ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার করবে। তাহলে হযরত ঈসা (আঃ) তরবারী আর বর্শা দিয়ে কিভাবে কম্পিউটারাইজ্‌ড মারণাস্ত্রের মোকাবিলা করবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো, দুটো বিশ্বযুদ্ধে বর্তমানে আবিষ্কৃত মারণাস্ত্রের ধ্বংস যজ্ঞ দেখে মানুষ এতটাই ভীতগ্রস্থ যে, গোটা পৃথিবী জুড়ে চিৎকার করা হচ্ছে 'অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি করতে হবে।' যে কথাটা মাত্র এক শতাব্দী পূর্বেও কল্পনা করা যায়নি। তৃতীয় বা চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের বিভিষীকা দেখে এই মানুষই চিৎকার করে 'অস্ত্র নির্মূলকরণ' চুক্তির জন্য দাবী করতে থাকবে। অবস্থার প্ররিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী এক সময় আধুনিক মারণাস্ত্রের তান্ডব থেকে মুক্তি লাভ করবে। তখন যদি কারো সাথে যুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে সেই সাবেক আমলের তরবারী আর বর্শা ব্যতীত যুদ্ধের উপকরণ তো আর থাকবে না। সুতরাং ঈসা (আঃ) তরবারী বর্শা দিয়ে যে যুদ্ধ করবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। মহান আল্লাহ সে সময়ে সেই পরিবেশ সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই ভালো জানেন।

কাদিয়ানী কর্তৃক মসীহের নামে প্রতারণা

সামান্যতম সন্দেহ, সংশয়, জড়তা ও অস্পষ্টতা ব্যতীতই এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য ও চরম সত্য হাদীস থেকে ফুটে উঠেছে যে, নবী করীম (সাঃ) ই শেষনবী এবং তাঁর পরে আর কোনো নতুন নবীর আগমন ঘটবে না। সেই সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, কেউ যদি নবী হওয়ার দাবী করে এবং যারা তার অনুসারী ও সমর্থক হবে, তারা অবশ্যই অমুসলিম হিসেবে পরিগণিত হবে। সেই সাথে এই সুদীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, প্রতিশ্রুত মসীহর নামে কাদিয়ানী গোষ্ঠী কর্তৃক যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, তা একটি বড় ধরণের প্রতারণা ও জালিয়াতি ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এই প্রতারণার সবচেয়ে হাস্যকর দিকটি হলো, যে অভিশপ্ত ব্যক্তি নিজেকে হাদীসে উল্লেখিত মসীহ বলে

দাবী করেছে, সেই গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী নিজেই তার লিখিত পুস্তকে নিজেকে ঈসা ইবনে মার্য়াম হওয়ার দাবী করে এক অদ্ভূত গল্প ফেঁদেছে। সে লিখেছে–'তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) বারাহীনে আহমাদীয়ার তৃতীয় অংশে আমার নাম রেখেছেন মার্য়াম। এরপর যেমন বারাহীনে আহমাদীয়ায় প্রকাশিত হয়েছে, দু'বছর পর্যন্ত আমি মার্য়ামের গুণাবলী সহকারে লালিত হই, এরপর মার্য়ামের ন্যায় ঈসার রুহ আমার মধ্যে ফূৎকারে প্রবেশ করানো হয় এবং রূপকার্থে আমাকে গর্ভবতী করা হয়। কয়েকমাস পরে, যা দশ মাসের চেয়ে বেশী হবে না, সেই এলহামের মাধ্যমে, যা বারাহীনে আহমাদীয়ার চতুর্থ অংশে উল্লেখিত হয়েছে, আমাকে মার্য়াম থেকে ঈসায় পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং এভাবে আমি হলাম ঈসা ইবনে মার্য়াম।' (কিশ্তীয়ে নূহ, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮-৮৯)

এই অভিশপ্ত লোকটির বক্তব্য অনুসারে প্রথমে সে মরিয়াম হলো তারপর নিজে নিজেই গর্ভবতী হলো। তারপর নিজের পেট থেকে নিজেই ঈসা ইবনে মার্য়াম রূপে জন্ম গ্রহণ করলো। তার এ বক্তব্য যে কতটা বালখিল্য, তা একটি শিশুও অনুভব করতে পারে। পবিত্র হাদীসের বক্তব্য অনুসারে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন দামেশ্কে। দামেশ্ক কয়েক হাজার বছর থেকে সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ ও সর্বজন পরিচিত শহর। পৃথিবীর মানচিত্রে আজও এই শহরটি এই নামেই চিহ্নিত। ঈসা মসীহ্ হবার দাবীদার দেখলো যে, তার জন্ম যেহেতু কাদিয়ান নামক গ্রামে। আর সত্যিকারের ঈসা (আঃ) এর আসার কথা হাদীসে বলা হয়েছে দামেশ্কে। এই জালিম তখন কাদিয়ানকেই দামেশ্ক শহর বানিয়ে ছাড়লো। সে লিখেছে, 'উল্লেখ্য যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দামেশ্ক শব্দের অর্থ আমার কাছে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, এ স্থানে এমন একটি শহরের নাম দামেশ্ক রাখা হয়েছে যেখানে এজিদের স্বভাব সম্পন্ন ও অপবিত্র এজিদের অভ্যাস ও চিন্তার অনুসারী লোকদের বাস। এই কাদিয়ান শহরটি এখানকার অধিকাংশ এজিদী স্বভাব সম্পন্ন লোকের অধিবাসের কারণে দামেশ্কের সাথে সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক রাখে।' (এযালায়ে আওহাম, ফুটনোট, ৬৩-৭৩)

এরপরও এই প্রতারক মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী লা'নাতুল্লাহি আলাইহির সামনে সমস্যা দেখা দিল সাদা মিনারের। হাদীসের বক্তব্য অনুসারে ঈসা ইবনে মার্য়াম একটি সাদা মিনারের কাছে অবতরণ করবেন। এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এভাবে যে, প্রতারক এই লোক নিজেই তার গ্রামে একটি সাদা মিনার বানিয়ে দেখিয়েছে যে, হাদীসের বক্তব্য অনুসারে সেই হলো ঈসা মসীহ।

এই অভিশপ্ত জাহান্নামীকে কে বুঝাবে যে, হাদীসের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা (আঃ) আসার পূর্বেই দামেশ্‌কে সাদা মিনার মওজুদ থাকবে। হাদীসে বলা হয়েছে, হযরত ঈসা লিড্ডায় প্রবেশ করে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। এ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ নানা ধরণের ভিত্তিহীন গল্প ফেঁদেছে। কখনো সে লিখেছে, বায়তুল মুকাদ্দাসের একটি গ্রামের নাম হলো লিড্ডা। (এযালায়ে আওহাম, আন্‌জুমানে আহমদীয়া, লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত, ক্ষুদ্রাকার, ২২০ পৃষ্ঠা)

আবার কখনো সে লিখেছে, লিড্ডা শব্দের অর্থ হলো, এমন সব লোক যারা অনর্থক ঝগড়া করে। যখন দাজ্জালের অনর্থক ঝগড়া চরমে পৌছবে তখন প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাব হবে এবং ঝগড়া শেষ করে দেবে। (এযালায়ে আওহাম, ৭৩০ পৃষ্ঠা)

আবার সে লিখেছে, লিড্ডা বা লুদ মানে হলো ভারতের এই পাঞ্জাবের লুধিয়ানা শহর। আর লুধিয়ানার প্রবেশ দ্বারে দাজ্জালকে হত্যা করার অর্থ হলো, দুষ্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মীর্জা গোলাম আহমাদের হাতে এখানেই সর্বপ্রথম বাইয়াত হয়। (আলহুদা, ৯১)

নবুয়্যাতের দাবীদার এই অভিশপ্ত কাদিয়ানী গোষ্ঠী ইসলাম বিরোধী অমুসলিমদের সাহায্য সহযোগিতায় পরিপুষ্ট হয়েছে এবং পৃথিবীতে মুসলমানদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য তারা প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশেই তাদের অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। কোনো কোনো দেশে তারা মুসলিম নামধারী সরকার ও রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। অবশ্য গোটা বিশ্বের সমস্ত আলিম-উলামা, মাশায়েখ এদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কতক দেশে মুসলিম জনতার দাবীর মুখে সরকার তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের জন্য মক্কা ও মদীনায় কিয়ামত পর্যন্ত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরা ইসলামের পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করে সাধারণ মুসলমানদেরকে যেভাবে ধোকা দিচ্ছে, এর মোকাবিলায় মুসলমানদের জিহাদী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সরকারীভাবে অবশ্যই কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে ওআইসি-এর ফতোয়া

ওআইসি'র অধীন বিশ্ব ফিকাহ্ একাডেমী, বিশ্ব মুসলিম লীগ ও বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেস তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ১৯৭৪ সালে বিশ্বের ১৪৪টি রাষ্ট্রের ফিকাহ্‌বিদগণ পবিত্র মক্কায় রাবিতা আলম আল ইসলামীর উদ্যোগে সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বলে ঘোষণা করেছে এবং সকল মুসলিম দেশকে

অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য পরামর্শ দিয়েছে। এ কারণে অনেক মুসলিম দেশই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এ সম্মেলনে কাদিয়ানীদের সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব পাস করা হয়। সে প্রস্তাবগুলো হলো-'কাদিয়ানীয়াত' একটি বাতিল ধর্ম। নিজেদের কলুষ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা ইসলামের ভিত্তিসমূহকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়। এরা ইসলামের দুশমন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলো থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মীর্জা গোলাম আহমাদ নিজেকে নবী দাবী করেছে। কোরআনের আয়াতসমূহ বিকৃতি করেছে। জিহাদের বিধান বাতিল হওয়ার ফতোয়া দিয়েছে। তারা ইসলামের মৌলিক আক্বীদা-বিশ্বাসের পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন এবং মূলোৎপাটন করার জন্য বিভিন্ন পন্থায় তৎপর রয়েছে। ইসলামের শত্রু-শক্তির সহায়তায় মসজিদের নামে মুরতাদদের আড্ডাখানা তৈরী করে যাচ্ছে। মাদ্রাসা, স্কুল, এতিমখানা এবং সাহায্য শিবিরের নামে অমুসলিম শক্তির সহায়তায় নিজেদের বিকৃত উদ্দেশ্য সাধন করছে। দুনিয়ার বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের বিকৃত সংস্কারণগুলোর প্রচার করছে ইত্যাদি। তাদের এসব কার্যকলাপকে সামনে রেখে সম্মেলনে প্রস্তাব পাস করে-

(১) বিশ্বব্যাপী ইসলামী সংগঠনগুলোর দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে-তারা যেন কাদিয়ানীদের ইবাদাতখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা এবং অন্যান্য যেসব এলাকায় তারা রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এদের ছড়ানো ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বাঁচার জন্য ইসলামী দুনিয়ার সামনে পূর্ণাঙ্গভাবে কাদিয়নীদের মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

(২) এ সম্প্রদায় কাফির এবং ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত (মুরতাদ) হওয়ার কথা ব্যাপকভবে প্রচার করতে হবে। এ জন্যই তাদেরকে মক্কা-মদীনায় প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হচ্ছে না।

(৩) মুসলমানগণ কাদিয়ানীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে বয়কট করতে হবে। তাদের মরদেহ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে দেয়া যাবে না।

(৪) এ সম্মেলন সকল মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে এ দাবী করছে যে, নবুয়্যাতের মিথ্যা দাবীদার ভন্ড মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর অনুসারীদের যে কোনো প্রকারের তৎপরতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হোক এবং তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করা হোক। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদসমূহে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক।

(৫) কাদিয়ানীরা কোরআন মজিদে যে বিকৃতি করেছে, এর চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এদের অনূদিত কোরআনের কপিগুলো সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করতে হবে এবং এসব অনুবাদের প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে।

এসব প্রস্তাব পরবর্তী সময়ে মুসলিম বিশ্বসহ বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। দিল্লীর সাপ্তাহিক 'আল-জমিয়াত' (২৯ এপ্রিল, ১৯৭৪), কলিকাতার উর্দু দৈনিক 'আসরে জাদীদ' (৯ মার্চ, ১৯৭৫), কাদিয়ানের সাপ্তাহিক 'বদর' (৯ মে, ১৯৭৪) প্রভৃতি ভারতীয় পত্রিকাতেও এ প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

কাদিয়ানীদের সম্পর্কে সারা বিশ্বের আলিম-উলামাদের ফতোয়া

১৯৩৫ সালে তুর্কী ওলামায়ে কেরাম একযোগে কাদিয়ানীদের অমুসলিম-মুরতাদ ঘোষণা দেন। তখন সে দেশে একজন কাদিয়ানীকে ফাঁসি দেয়া হয়। ১৩৯৭, ১৩৯৮ এবং ১৩৯৯ হিজরী সনে মক্কা শরীফে অনুষ্ঠিত বিশ্ব মুসলিম মসজিদ পরিষদ-এর দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল সভায় কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কাদিয়ানীদের দ্বারা পবিত্র কোরআন-হাদীসের বিকৃত অর্থকরণ এবং এর অপপ্রচার ও অপপ্রয়োগ, বিশ্বব্যাপী ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের প্রতি তাদের সহযোগিতা ও সাম্রাজ্যবাদী ইসলাম বিরোধী শক্তির সাহায্য গ্রহণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর কাদিয়ানীদেরকে 'অমুসলিম-কাফির' বলে ঘোষণা করা হয়।

ইসলামী জ্ঞানের পীঠস্থান আল-আজহারের ফতোয়া বিভাগ মুসলিম উম্মাহ্র সর্বসম্মত ইজমা অনুসারে আহ্মাদী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির' ইসলাম হতে বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে।

সউদী আরবের মদীনা শরীফে অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফতোয়া বিভাগ ১৯৬৬ সালে কোরআন-হাদীসের আলোকে প্রমাণ করে যে, কাদিয়ানী ধর্মের প্রবর্তক মীর্জা গোলাম আহমাদ নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে মিথ্যা রটনাকরী। সুতরাং গোলাম আহমাদ ও তার অনুসারীরা কাফির, ইসলাম হতে খারিজ।

বিশ্ব মুসলিম যুব সংসদ, ইসলামিক গবেষণা, ইফতা ও প্রচার সংস্থা এবং ইসলামিক ছাত্র সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক ফেডারেশন কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের জঘন্য নিন্দা করেছে। এসব সংস্থা কাদিয়ানীদেরকে ইসলাম বহির্ভূত বলে ঘোষণা দিয়েছে। এদেশের সর্বশ্রেণীর আলিম-উলামা, হক্কানী পীর-মাশায়েখ, ইসলামী চিন্তাবিদ, ফিকাহ্বিদ ও শিক্ষাবিদদের দৃষ্টিতে কাদিয়ানীদের ইসলাম বিরোধী

বাতিল ধর্ম প্রচার ধরা পড়ার পর থেকে তারা ব্যক্তিগতভাবে এবং দলবদ্ধভাবে এর বিরোধিতা করেন এবং কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে ঘোষণা দেন। বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণা দিয়েছে। দেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। এদেশের কাদিয়ানীদেরকে অন্যান্য দেশের মত আইনগত ও শাসনতান্ত্রিকভাবে অমুসলিম ঘোষণা করার জন্য তারা সরকারের কাছে আবেদন করেছে এবং তজ্জন্য আন্দোলন করছে। ১৯২৩ সালে দিল্লীতে সর্বভারতীয় উলামা সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ'-এর অধিবেশনে ভারতের সকল প্রদেশের আলিম-উলামার উপস্থিতিতে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের আক্বীদা-বিশ্বাস ইসলাম বহির্ভূত। সুতরাং আহমাদী জামাতের অনুসারীরা কাফির।

১৯২৫ সালে আহলে হাদীসের অমৃতসর কেন্দ্র হতে একটি ফতোয়া 'ফসখে নিকাহে মির্যাই' নামে প্রচারিত হয়। এতে অবিভক্ত ভারতের সকল শীর্ষস্থানীয় আলিমগণের স্বাক্ষর রয়েছে। সকলে একবাক্যে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম, কাফির বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

১৯১২ সনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, আল কালুছ ছহি ফী আকায়িদিল মসীহ্ নামের পুস্তকটিতে তদানীন্তন ভারতের প্রতিটি প্রদেশ ও জেলার শত শত আলিমের দরখাস্ত রয়েছে। এতে সকল আলিমই সর্বসম্মতভাবে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

১৩৪১ হিজরীর সফর মাসে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষকগণ ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা মুরতাদ, ঝিন্দীক, মুলহিদ ও কাফির। মীর্জা কাদিয়ানীর জীবদ্দশাতেই দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক কুতুবে আলম মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (১৮২৮-১৯০৫)-এর নেতৃত্বে ভারতের অনেক আলিম বুযুর্গ ব্যক্তিগণ গোলাম আহমাদকে কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

মিসরের আলিমদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম শায়খ মুহাম্মদ হাসনাইন মাখলুফের নেতৃত্বে মিসরীয় উলামা সমাজ মীর্জা গোলাম আহমাদের আক্বীদা অনুযায়ী সকল কাদিয়ানী দলের কাফির হওয়া সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন। সিরিয়ার উলামাদের প্রতিনিধি মুফতী-এ-আজম ফতোয়া দেন যে, কাদিয়ানীরা শর্তহীনভাবে নবী করীম (সাঃ) কে শেষনবী মানে না, তাই তারা কোরআন অস্বীকারকারী ও ইসলামী আকীদা অস্বীকারকারী। সুতরাং তারা অমুসলিম কাফির।

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত

আফগানিস্তানে সরকারীভাবে কাদিয়ানীদেরকে মুরতাদ ও হত্যাযোগ্য বলে আদেশ জারি করা হয়েছে। তারা বহু পূর্বে ১৯৯৯ সালেই কাদিয়ানীদের প্রতি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিল। সে দেশে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচার নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সউদী আরব সরকারের ইসলামী গবেষণা, ইফতা, দাওয়া ও ইরশাদ বিভাগ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম-কাফির বলে সিদ্ধান্ত জারি করেছে। ১৯৫৭ সালে সিরিয়া সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করে সে দেশে তাদের প্রচার বন্ধ করে দেয়। ১৯৫৮ সালে মিসরীয় সরকার আল-আজহারের ফতোয়া অনুসারে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ও ইসলাম বহির্ভুত একটি বাতিল ধর্মাবলম্বী বলে ঘোষণা দেয়।

১৯৭৩ সালে আজাদ কাশ্মীর সংসদ সর্বসম্মতিক্রমে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা দিয়ে একটি বিল পাস করে। প্রেসিডেন্ট সরকার আব্দুল কাউয়ুম খান সে বিলে সম্মতি দিলে তা আইনে পরিণত হয়।

১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাদেশিক পরিষদ, 'জমিয়তে উলামা-ই-ইসলাম'-এর তৎকালীন সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী মাওলানা মুফতী মাহমুদ সাহেবের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ মাসব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর এবং কাদিয়ানীদের অবস্থান ব্যাখ্যা করার পূর্ণ সুযোগ দিয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, কাদিয়ানীরা কাফির ও ইসলাম বহির্ভূত। সে অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধন করা হয়। এতে তাদেরকে খৃষ্টান ও হিন্দুদের মত অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা দেয়া হয়।

মালয়েশিয়ার 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইসলামিক এফেয়ার্স' (সরকারী সংস্থা) কাদিয়ানীদের সম্পর্কে Qadiani Teachings নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। এই পুস্তিকার ৩য় পৃষ্ঠায় ঘোষণা করা হয়েছে– কাদিয়ানী/আহমাদী সম্প্রদায় ইসলাম বহির্ভুত একটি সম্প্রদায়। অতএব তারা মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট পরিভাষা ও অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারবে না এবং তাদের লাশ মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করতে পারবে না।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনগোষ্ঠীর দেশ ইন্দোনেশিয়া কাদিয়ানীদের অমুসলিম বলে বিবেচনা করেছে। সেখানে অমুসলিম ধর্মের প্রচার নিয়ন্ত্রিত করে একটি আদেশ

জারি করা হযেছে। সে আদেশের অধীনে কাদিয়ানী ও খৃষ্টানরা মুসলিমদের নিকট তাদের ধর্ম প্রচার করতে পারে না। **ওআইসি'র অন্যতম সদস্য নাইজেরিয়া আফ্রিকার বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। সে দেশ হতে সউদী আরব গমনের সময় ভ্রমণকারীকে অবশ্যই 'অ-আহমাদী সনদ' সংগ্রহ করে সাথে বহন করতে হয়। দেশী-বিদেশী সমস্ত পর্যটকই এ নিয়মের অধীনে সরকারের নিকট হতে এ সনদ সংগ্রহ করে থাকে। কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম বিবেচনা করেই সরকার তাদেরকে সউদী আরব বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা শরীফাইনে যেতে দেয়া হয় না।**

মুসলিম দেশ তুরস্কে কাদিয়ানী ধর্ম প্রচারিত হওয়াতে মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মুসলিম ও কাদিয়ানীদের মধ্যে যে কোনো প্রকারের সহিংসতা ও ভুল বোঝাবুঝির অবসানকল্পে সরকার কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত বহুদিন যাবৎ বৃটিশ কলোনী থাকার কারণে কাদিয়ানীরা এখানে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পায়। খত্‌মে নবুয়্যাতের চরম শত্রু এ দলটি বাতিল ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত থাকায় সরকার এদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করেছে। ঘোষণাতে বলা হয়, এরা এত সূক্ষ্মভাবে ও গোপনে তাদের মতবাদ পোষণ করে যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও এদেরকে মুসলিম হিসেবে ভুল হয়। কারণ, এদের নাম, লেবাস, বিয়ে, খাদ্যবস্তু সবকিছুই মুসলমানদের অনুরূপ। তাই এদেরকে অমুসলিম হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজনে এ সরকারী ঘোষণা জারি করা হলো।

গাম্বিয়ার রাজধানী বানজুল থেকে সম্প্রতি গাম্বিয়ান সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সরকারী নির্দেশে বলা হয় যে, সে দেশে কাদিয়ানীরা ইসলাম বিরোধী অনৈতিক কার্যকলাপ এতটা বাড়িয়ে দিয়েছে যাতে মুসলিম সমাজে প্রচন্ড ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কাদিয়ানীরা মুসলিম সমাজকে ইসলামের নীতি-পরিপন্থী বিপথে আহ্বান করছিল। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও অসন্তোষের প্রেক্ষিতে সরকার তাদের কার্যকলাপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

১৯৫৩ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজধানী লাহোরে খতমে নবুয়্যাতের মহান আদর্শকে সমুন্নত রাখার জন্য সামরিক আইন লংঘন করে অসংখ্য মুসলমান শাহাদাত বরণ করে প্রমাণ করেন যে, আক্বীদায়ে খত্‌মে নবুয়্যাতের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম। এরপর ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তাকে সমূলে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে

অমুসলিম ঘোষণার দাবী ও আন্দোলন চলতেই থাকে। এ সময়ের মধ্যে সচেতন মুসলমানরা তাদের আসল রূপ চিনতে সক্ষম হয়। ফলে অধিকাংশ মুসলিম দেশ তাদেরকে মুরতাদ-কাফির বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং তাদের কর্মকান্ড ও প্রচারণা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। উপমহাদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ কাদিয়ানীদেরকে অমুলিম ও ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ-খৃষ্টান ও কাদিয়ানীদের মধ্যে পার্থক্য

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। মহান আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা, সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে সারা পৃথিবীতে এই দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রয়েছে এবং আল্লাহর রহমতে আগামীতেও থাকবে। এদেশে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা স্বাধীনভাবে তাদের ধর্ম পালন করেন, মুসলমানদের সাথে একত্রে মিলেমিশে পাশাপাশি বসবাস করেন এবং দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তারা অবদান রাখছেন। কর্মক্ষেত্রে কোথাও তাদের প্রতি কোনো বৈষম্য করা হয় না। এদেশে বসবাসরত হিন্দু-বৌদ্ধ ও খৃষ্টানদের আমরা চিনি। তারা কখনো কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের ধর্মমত মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন না। দেশের একজন মুসলমান নাগরিক যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান নাগরিকও সেই একই সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। মুসলমানদের সাথে তাদের কোনো বিরোধ নেই। কারণ তারা নিজেদের পরিচয় গোপন করে না বা ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের প্রতি আঘাত করে না।

পক্ষান্তরে কাদিয়ানী গোষ্ঠী তাদের ধর্ম বিশ্বাস গোপন করে, মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামের ছদ্মাবরণে মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ করে দিচ্ছে। সাধারণ মুসলমানরা তাদেরকে চিনতে পারে না বিধায় তারা সহজেই বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে। কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিনষ্ট করছে। তাদের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের এখানেই পার্থক্য এবং এই পার্থক্যের কারণেই মুসলমানদের দাবী হলো, তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণা করতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুরূপ তারাও যদি নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে বাংলাদেশে বসবাস করে তাহলে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এদেশে মুসলমানদের ন্যায় যে নাগরিক সুবিধা ভোগ করে থাকে, কাদিয়ানীরাও তাই ভোগ করবে। কিন্তু মুসলিম নাম ধারণ করে ইসলামী লেবাস পরিধান করে ইসলামের গোড়া কাটার

চেষ্টা করবে, এটা এদেশের তওহীদী জনতা প্রাণ থাকতে বরদাস্ত করবে না। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যেভাবে এদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নিজ নিজ ধর্ম পালন করছে, কাদিয়ানীরা ঠিক তাই করতে পারে। তখন কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলন করবে না, তাদের ধর্ম পালনে কেউ কোনো হস্তক্ষেপও করবে না। কাদিয়ানীরা মুসলিম দাবী করলে মির্জা গোলাম আহমাদকে অস্বীকার করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী মেনে নিতে হবে অথবা অমুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে বাস করতে হবে।

প্রসঙ্গ কাদিয়ানীঃ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা

১৯৫২ সালে কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গার পর লাহোরে মামলা চলাকালে মুসলমানদের পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে মামলা পরিচালনা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক আদর্শ মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তাকে মামলার খরচ গ্রহণ করার অনুরোধ করা হলে তিনি বলেছিলেন, **'নবী করীম (সাঃ) এর শাফায়াত লাভের জন্য এ কাজও তো ওসীলা হতে পারে। আমি কোনো জাগতিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করার জন্য এই মামলা পরিচালনা করছি না।'** মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান খত্মে নবুয়্যাত আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন। ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করার পর হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় কাদিয়ানী প্রসঙ্গে মুফতি মাহমুদ (রাহঃ)-এর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, **কাদিয়ানীরা যে মুসলমান নয়, এটা আমার ছাত্রজীবন থেকেই জানা। আমার নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করে আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন, আমরা তা থেকে বিচ্যুত হবো না। সুতরাং এ থেকে আপনারা ধরে নিতে পারেন যে, কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে আমরাও আপনাদের সাথে রয়েছি। কাদিয়ানীরা কখনোই মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না।** (কাদিয়ানী ধর্মমত-৯৩ পৃষ্ঠা)

কাদিয়ানীদের ব্যাপারে বাংলাদেশ হাইকোর্টের মতামত

কাদিয়ানীদের রচিত 'ইসলামে নবুয়্যাত' নামক গ্রন্থটি বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে আপত্তিকর বিবেচনা করে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কাদিয়ানীরা সরকারী এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সুপ্রীম কোর্টে মামলা দায়ের করে। এই মামলার রায়ে সুপ্রীম

কোর্টের হাইকোর্টে ডিভিশনের বিচারপতি সুলতান হোসেন খান ও বিচারপতি এ, এম, মাহমুদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ তাঁদের রায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে কোনো নতুন নবী আগমনের দাবীকে ভ্রান্ত ও কুফ্‌রী বিশ্বাস বলে অভিহিত করেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন আদালতের রায়ে কাদিয়ানীরা যে অমুসলিম ঘোষিত হয়েছে, সে প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। ১৯৯৩ সালেও কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরেকটি মামলায় হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতি মুহাম্মাদ আব্দুল জলিল ও বিচারপতি মুহাম্মাদ ফজলুল করীম-এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম হিসেবে রায় ঘোষণা করেন। বর্তমান চারদলীয় জোট সরকার কাদিয়ানীদের যাবতীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পর কাদিয়ানীরা উচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়। পক্ষান্তরে আদালত তাদের দাবী বাতিল করে দেন।

বাংলাদেশের সংবিধান ও কাদিয়ানী গোষ্ঠী

বাংলাদেশের সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে বলা হয়েছে, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি।' সুতরাং সংবিধান অনুসারে ইসলাম হলো রাষ্ট্রধর্ম এবং সরকারী যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালিত হবে মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা সহকারে। পক্ষান্তরে কাদিয়ানী গোষ্ঠী ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী একটি সম্প্রদায় বিশেষ। আর এই সংবিধান প্রণেতা ও সংশোধকদের কেউ-ই কাদিয়ানী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না বিধায় একথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, সংবিধানে ইসলাম বলতে আল্লাহর কোরআন ও নবী করীম (সাঃ) এর সুন্নাহ্‌কেই বুঝানো হয়েছে। অতএব যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখিত কথাগুলো অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোরআন-সুন্নাহ্‌কে বিকৃত করে পেশ করার কোনো অবকাশ কারো নেই। শুধু তাই নয়, **দেশের সংবিধান অনুসারে ইসলামকে কটাক্ষ করে বা হেয় প্রতিপন্ন করে বক্তৃতা, বিবৃতি, গ্রন্থ রচনা বা প্রবন্ধ রচনা করার অধিকারও কারো নেই। কেউ যদি তা করে তাহলে তা হবে নিঃসন্দেহে সংবিধান লংঘনের শামিল।**

কিন্তু অবাক বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, কাদিয়ানী গোষ্ঠী প্রত্যেক পদক্ষেপে বাংলাদেশের সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্টি প্রদর্শন করে আল্লাহ, রাসূল, মুসলমান ও ইসলামকে অপমান করে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি যেনার অপবাদ দিয়েছে, নিজেদের ধর্মীয় কিতাবকে কোরআনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেছে, রাসূলের হাদীসকে মিথ্যা বলেছে, খত্‌মে নবুয়্যাত অস্বীকার করে নবী দাবী করেছে এবং

সর্বোপরি মুসলমানদেরকে তারা কাফির ঘোষণা করেছে। এরপরও দেশের পরিচালকগণ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘনের কোনো অভিযোগ আনেনি। সুতরাং সরকারের উচিত, দেশের স্বার্থে, সংবিধানের পবিত্রতা রক্ষার্থে অবিলম্বে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে আদালতে সংবিধান লংঘনের অভিযোগ দায়ের করে তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা।

কতিপয় চিহ্নিত গোষ্ঠী কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করাকে সংবিধান বিরোধী বলে আখ্যায়িত করেছেন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা ইত্যাদি স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আমদের প্রশ্ন, ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে, বাক স্বাধীনতার নামে কোনো ধর্মের মূল বিষয়কে পরিবর্তনের অধিকার কি কেউ দাবী করতে পারে? একজন ব্যক্তি খত্‌মে নবুয়্যাতকে অস্বীকার করে নিজেকে নবী দাবী করবে এবং তার ভ্রান্ত ও কুফ্‌রী আকিদা-বিশ্বাস অনুসারে নতুন সম্প্রদায় গঠন করবে আবার মুসলমানও থাকতে চাইবে- এটি কি আমাদের সংবিধান অনুমোদন করে? নতুন কোনো ধর্ম কেউ প্রচার করলে করতে পারেন; কিন্তু একটি নতুন ধর্মকে ইসলাম বলে চালিয়ে দেয়ার কি কোনো অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান দিয়েছে? ইসলামের নামে ইসলামের পরিভাষা ব্যবহার করে কাদিয়ানী সম্প্রদায়ই সংবিধান লংঘন করছে। ইসলামী আকিদা-বিশ্বাসের বিরোধিতা করা হবে আবার তার অনুসারীও দাবী করা হবে– এটা কোন্ ধরণের অধিকার? পৃথিবীর কোনো ধর্ম ও সংবিধানের দোহাই দিয়ে কি এ ধরণের অধিকার ভোগ করা যাবে?

মানবাধিকার লংঘনের ভিত্তিহীন অভিযোগ

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকার রয়েছে যে, সে তার ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে, কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না। রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব হচ্ছে, তার অধিকার নিশ্চিত করা। ইসলামও অন্য ধর্মাবলম্বীর এই অধিকার নিশ্চিত করেছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্ম চর্চার অধিকার দিয়েছে, কিন্তু এক ধর্মাবলম্বী হয়ে অন্য ধর্মের নামধারণ করা এবং ঐ ধর্মের সাধারণ লোকদের সাথে প্রতারণা করার অধিকার দেয়া হয়নি। একজন লোক বা একটি সম্প্রদায় অমুসলিম হয়ে ইসলামের নাম ব্যবহার করবে, নিজেদের মুসলিম বলে পরিচয় দেবে, এর নাম ধর্মীয় অধিকার নয়। এটা অন্যের অধিকারে সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ। কোনো ধর্ম বা সে ধর্মের স্বাধীনতা মানে এই নয় যে, ইসলাম ধর্মের মূলনীতি ও বিশ্বাস পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হবে, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে

সে ধর্মের লোকদের বিভ্রান্ত করা হবে এবং মুসলমানদের সমান্তরাল সম্প্রদায় গঠন করা হবে। এগুলো ধর্মীয় স্বাধীনতা নয়, স্বাধীনতার নামে ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর হস্তক্ষেপমাত্র- যা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়।

মুসলমানরা কাদিয়ানীদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চায় বাধা দিচ্ছে না; বরং কাদিয়ানী গোষ্ঠী কর্তৃক মুসলমানদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা রোধ করার আন্দোলন করছে। কাদিয়ানী ধর্মের অনুসারীরা যদি নিজেদের ধর্মকে ইসলাম না বলে এবং নিজদেরকে মুসলিম বলে পরিচয় না দেয় তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এবং কোনো আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাও আর থাকবে না। সুতরাং যারা কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করাকে মানবাধিকার লংঘন বলে মন্তব্য করছেন, হয় তারা জেনে বুঝে নিজেদের স্বার্থে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করছেন, না হয় তারা অজ্ঞতার কারণেই মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। **আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মূল কথাই হলো, নিজের আকিদা-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা বা অধিকার ও স্বাধীনতার নামে কেউ অন্যের অধিকার, স্বাধীনতা ও আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আঘাত করতে পারবে না। বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মৌলিক মানবাধিকার এবং মৌলিক অধিকারের মূলনীতি অনুযায়ী কারো আকিদা বিশ্বাসের ওপর আঘাত করার অধিকার কারো নেই। কিন্তু কাদিয়ানী গোষ্ঠী বাংলাদেশের ১৪ কোটি মুসলমানসহ সারা পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাসের ওপর আক্রমণ করে শতকোটি মানুষের মৌলিক অধিকার, মানবাধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। সেই সাথে বাংলাদেশের সংবিধানও তারা লংঘন করেছে।**

মাত্র গুটি কয়েক কাদিয়ানী পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে। ধৃষ্টতার চরম সীমা তারা লংঘন করেছে। সবথেকে প্রয়োজনীয় বিষয় হলো, কাদিয়ানীদের স্বার্থেই তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করা একান্ত জরুরী। তাহলে বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে বাংলাদেশ সরকার তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। যেমন নিরাপত্তা দিতে বাধ্য হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের। কিন্তু যতদিন কাদিয়ানীরা নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেবে এবং পৃথিবীর ১৪০ কোটি মুসলমানদেরকে কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করবে, ততদিন তারা বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত নিরাপত্তা লাভের অধিকার ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে। কারণ বাংলাদেশের

সংবিধানে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে যেসব ধারা রয়েছে, তা একমাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং বাংলাদেশের সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে হলে বাংলাদেশের কাদিয়ানীদের নিজেদের উদ্যোগেই নিজেদেরকে অমুসলিম হিসেবে ঘোষণা করা উচিত।

কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছে কারা?

বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে কাদিয়ানদেরকে অমুসলিম সংখ্যা লঘু ঘোষণা করার পর বাংলাদেশে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামে তওহীদী জনতার রক্ত ঝরানোর পরে **বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকার আহমাদিয়া মুসলিম জামাত নামধারী কাদিয়ানী গোষ্ঠীর সকল প্রকাশনা ও প্রচারণা গত ৮ জানুয়ারি '০৪ তারিখে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জোট সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশে কাদিয়ানীদের ওপর একটি কালির আঁচড় পড়েছে মাত্র। তওহীদী জনতার প্রাণের দাবী, কাদিয়ানীদেরকে রাষ্ট্রীয়ভাবে অমুসলিম ঘোষণা করা। সে দাবী এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন হয়নি। পক্ষান্তরে কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ হওয়ায় ৯ জানুয়ারী '০৪ তারিখ থেকে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, বাংলাদেশের সেই মুখচেনা মহল অমুসলিমদের পদলেহী, ইসলাম বিদ্বেষী নাস্তিক, মুরতাদ, ধর্মহীন-ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, বাম-রামপন্থীরা কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করে মানবাধিকার, সংবিধান ও ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে মাঠ গরম করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে।**

অপরদিকে কাদিয়ানী গোষ্ঠীর সকল প্রকাশনা নিষিদ্ধ করায় খুব স্বাভাবিকভাবেই এদেশের ১৪ কোটি তওহীদী জনতা আন্তরিকভাবে খুশী হয়েছে। দলীয় ও নির্দলীয় নাগরিক এবং রাজনীতিবিমুখ লোকজনসহ সর্বস্তরের মানুষ কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। এজন্যে যে, এদেশের দল-মত ও পক্ষ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মুসলিম জনসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী হলো, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা হোক।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য ও নাট্যশিল্পী আসাদুজ্জামান নূর, কবীর চৌধুরী, বদর উদ্দিন ওমর, রাশেদ খান মেনন, মনজুরুল আহসান খান, শাহরিয়ার কবির, তাসমিনা হোসেন, বিচারপতি কে, এম, সোবহান, ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ ও কিছু কিছু মগজবিকৃত বুদ্ধিজীবী, নামসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কতিপয়

নেতা– যাদের ঈমান-আকীদা সম্পর্কিত জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব, এছাড়া ইসলাম বিদ্বেষী একশ্রেণীর সংবাদপত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের দুশমন কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করেছে।

বামনেতা জনাব বদরুদ্দীন উমর ইসলাম বিদ্বেষী এক চিহ্নিত পত্রিকায় বিশাল এক কলাম লিখেছেন। তিনি তার লেখার শুরুতেই জাতীয় মসজিদের সম্মানীত খতীবকে 'কুখ্যাত খতীব' বলে চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন। বাম ১১ দল প্রতিবাদ জানিয়েছে সরকারের এ সিদ্ধান্তের। তারা বলেছে, কাদিয়ানীরা আইনের আশ্রয় নেবে। **এক মতবিনিময় সভায় বিরোধীদলীয় নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কাদিয়ানীদের বইপুস্তক নিষিদ্ধ করে সরকার ধর্মের নামে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে চায়। তিনি বলেছেন, কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন। এটা মানুষের ঠিক করার অধিকার নেই। তাহলে খোদার ওপর খোদাগিরি করা হবে। (দৈনিক ইনকিলাব, ১২ জানুয়ারি সংখ্যা)।**

কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার ক্ষেত্রে মূলত আপত্তি রয়েছে কেবল ঐসব চিহ্নিত বাম-রামপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর, যারা ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও রাখেন না এবং আল্লাহ্-রাসূল, ইসলাম তথা মুসলমানদের ঈমান-আকিদার ওপর আঘাত হানাকেই নিজেদের দায়িত্ব ও কতর্ব্য জ্ঞান করে। এরা ভিন্ন দেশের উচ্ছিষ্ট ভোগী, নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা ইসলামের শত্রুদের কাছে অর্থ লালসায় বিক্রি করে দিয়েছে বিধায় ইসলামের বিরুদ্ধে কটাক্ষ করাকে এরা নিজেদের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করে। কাদিয়ানীরা তাদেরই অনুরূপ আল্লাহ্-রাসূল, কোরআন, হাদীস তথা ইসলাম-মুসলমানদের প্রতি আঘাত করে থাকে, এ কারণেই এসব ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন নাস্তিক গোষ্ঠী কাদিয়ানীদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করবে, এটাই স্বাভাবিক। **কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মন্তব্য নিয়ে। তিনি একটি বিশাল দলের নেত্রী, সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ- বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তার দলের অধিকাংশ সদস্যই মুসলমান হিসেবে পরিচিত। তিনি কিভাবে কাফির কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করলেন?**

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ কাদিয়ানী সমর্থক অন্যান্যদের প্রতি প্রশ্ন, শেখ হাসিনা কি ভন্ড গোলাম আহমাদের প্রচারিত আহমাদী মুসলিম জামায়াত নামধারী কাদিয়ানীদের অনুসারী–না শেষনবী জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুসারী?

বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ অন্যান্যরা যদি নিজেদেরকে কাদিয়ানীদের দলভুক্ত স্বীকার না করেন তবে গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর ভাষায় শেখ হাসিনাসহ অন্যরা মুসলমান নয়– কাদিয়ানীদের এই বক্তব্য কি তিনি মেনে নেবেন? শেখ হাসিনাসহ কাদিয়ানীদের প্রকাশনা বাতিলের বিরোধিতা ও নিন্দাকারীদের নিকট প্রশ্ন রাখতে চাই- কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ঈমান-আক্বীদা বিধ্বংসী এসব প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করা কি মানবাধিকার পরিপন্থী হয়েছে?

শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সে সময় ১৯৯৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী ধানমন্ডির ৩২ নম্বরস্থ শেখ মুজিবের বাড়ির কাছে সোবহানবাগ মসজিদে এক বিশাল সমাবেশে পবিত্র মসজিদে নববীর সম্মানিত খতীব আল্লামা ডক্টর আব্দুর রহমান বিন হোজাইফি বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'কাদিয়ানীরা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মনগড়া ব্যাখ্যা দিচ্ছে এবং মির্জা গোলাম আহমাদকে নবী বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে। সুতরাং তারা কাফির, তাদের যারা মুসলমান মনে করে তারাও কাফির।' সেদিনের সমাবেশে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহ্মদসহ দেশের কর্ণধারগণ উপস্থিত ছিলেন। বিরোধী দলীয় নেত্রী কি সেদিনের কথা বিস্মৃত হয়েছেন? **যাঁর মরহুম পিতা শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁর রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সাহেব জঘন্য কাফির কাদিয়ানীদের বিপক্ষে আজীবন অবস্থান করেছেন, তিনি কিভাবে কাদিয়ানীদের পক্ষাবলম্বন করলেন?**

শেখ হাসিনা তাঁর শাসনামলে একজন কাদিয়ানী সমর্থক ব্যক্তিকে ইসলামী ফাউন্ডেশানের ডিজি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন এবং উক্ত ব্যক্তিকে ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমীতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে তার নাম প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি কাদিয়ানী সমর্থক হওয়ার কারণে ওআইসি ফিকাহ্ একাডেমী তার নাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিরোধী দলীয় নেত্রী কি সে কথা ভুলে গিয়েছেন? **তিনি স্বয়ং কাদিয়ানীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, তাঁকে কাদিয়ানীরা মুসলমান মনে করে কিনা এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তারা তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করবে কিনা। তাঁর কোনো মুসলমান আত্মীয়-স্বজনের সাথে কাদিয়ানীরা নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেবে কিনা।** অবশ্যই কাদিয়ানীরা বিরোধী দলীয় নেত্রীকে মুসলমান বলে স্বীকার করেনা– কাফির বলে মনে করে। **যে গোষ্ঠী তাকে কাফির হিসেবে মনে করে, সেই গোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসের পক্ষে তিনি কিভাবে অবস্থান নিলেন?**

জোট সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার সমালোচনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন, **'কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারণ করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এটা মানুষের ঠিক করার অধিকার নেই। তাহলে খোদার ওপর খোদাগিরি করা হবে।'** শেখ হাসিনা ঠিকই বলেছেন যে, কে মুসলমান কে অমুসলমান তা নির্ধারিণ করার দায়িত্ব আল্লাহর। কোনো মানুষ তা নির্ধারণ করতে পারবে না। এ অধিকার মানুষের নেই। শেখ হাসিনার নিশ্চয়ই এটি অজানা নয় যে, স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ও তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাধ্যমে মানুষকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর ঈমান আনলে মুসলমান হওয়া যাবে। কোন্ কোন্ বিষয় অস্বীকার করলে অমুসলমান হয়ে যাবে। কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে সহজেই জানা যায় যে, ঈমান আর কুফ্‌র কি? বস্তুত নীতিগতভাবে মুসলমান কে আর মুসলমান কে নয় স্বয়ং আল্লাহ তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোরআন-হাদীস থেকে তা স্পষ্টই জানা যায়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে মুসলমানের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, মূলনীতি প্রদান করেছেন, সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন, কোন্ কোন্ আমল-ইলেমের অনুশীলন করলে, কিভাবে নিজের জীবন পরিচালিত করলে মুসলমান বলা যায়।

কোরআন-সুন্নাহ্য় এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ থাকার পরও কি বলা যাবে না, কোন্ ব্যক্তি মুসলমান, কোন্ স্বভাবের মানুষ মুনাফিক, কোন্ মানুষ কাফির, কোন্ মানুষ ফাসিক, কোন্ মানুষ মুরতাদ? এ ব্যাপারে তো মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এবং তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেড় হাজার বছর পূর্বে আমাদেরকে কোরআন-সুন্নাহ্‌র মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। তাহলে মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রদর্শিত নিয়ম-বিধি এবং আদেশ-নিষেধ প্রয়োগে শেখ হাসিনা বাধ সাধছেন কেনো? **কাদিয়ানীদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার বিষয়টি যদি শেখ হাসিনার ভাষায় খোদার ওপর খোদাগিরি হয়, তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘোষণা করেছেন, তাঁর পরে কোনো নবী হবে না, যারা নবী দাবী করবে তারা মিথ্যাবাদী দাজ্জাল। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম আজমাঈনসহ অগণিত সাহাবায়ে কেরাম, সারা পৃথিবীর ইসলামী আইনবীদগণ, হাদীস বিশারদগণ, কোরআনের মুফাস্‌সির ও গবেষকগণ ভন্ডনবীদের ব্যাপারে কাফির ফতোয়া দিয়ে ঐকমত্য পোষণ করে খোদার**

ওপর খোদাগিরি করেছেন? বরং আপনি এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রসূত মন্তব্য করে নিজের অজ্ঞতাই প্রকাশ করেছেন।

আপনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রীত্বের অভিলাষী এবং বর্তমানে বিরোধী দলীয় নেত্রী। আপনার বক্তব্যে দেশের অগণিত তওহীদী জনতা তো বটেই, স্বয়ং আপনার দলের তৃণমূল পর্যায়ের কর্মী-সমর্থকরা পর্যন্ত হতাশা ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং সকল রাজনৈতিক দলের কাছে অনুরোধ, মুসলমান দাবী করার পরে এমন কোনো মন্তব্য করবেন না, যে কারণে ঈমানের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয়। আর সামান্য গুটি কয়েক অমুসলিম কাদিয়ানীর ভোটের জন্য ইসলাম প্রিয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন হারানো অবশ্যই বোকামীর শামিল হবে। জাতীয় পর্যায়ে কাদিয়ানীরা বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করে তাদের মতবাদ প্রচারের সাথে সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও তাদের নেতাদের প্রভাবিত করে তাদের পক্ষে কথা বলাতে চেষ্টা করছে এবং ক্ষেত্রে বিশেষে সফলও হয়েছে। কিন্তু কাদিয়ানীদের ব্যাপারে কথা বলার ক্ষেত্রে নেতা-নেত্রীদেরকে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে। কেননা কাদিয়ানীদের বিষয়টির সাথে ঈমান ও কুফ্‌রের সম্পর্ক জড়িত।

মুসলমানদের প্রতি কাদিয়ানীদের প্রকাশ্যে হুমকি

পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে নতুন ইসলাম গ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ঈমান নষ্ট করা তাদের প্রধান দায়িত্ব। বিভিন্ন মুসলিম দেশে মন্ত্রী, সচিব, সামরিক ও বেসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামিস্ট ও বুদ্ধিজীবীদের নিজেদের দলে টেনেই প্রথম কাদিয়ানীরা কাজ শুরু করে। ধীরে ধীরে সাধারণ নাগরিকদের মাঝেও তারা প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশেও উচ্চ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী মহলে বেশকিছু কাদিয়ানী রয়েছে। যারা সবসময়ই এ ছদ্মবেশী অমুসলিম সম্প্রদায়টিকে মুসলিমরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা চালায়। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার বখশীবাজারে কাদিয়ানীদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবস্থিত। রাজধানী ঢাকা শহরেই তারা মসজিদের নামে ৭টি উপাসনালয় স্থাপন করেছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে তাদের ১৩০টি কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্র থেকে সংবিধান বিরোধী ও মুসলমানদের ঈমান-আকিদা বিধ্বংসী কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে।

সরাসরি ইয়াহূদী ও বৃটিশ পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এ বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের সকল ষড়যন্ত্র থেকে মুসলমানদের ঈমান রক্ষার আন্দোলন চলছে। খত্‌মে নবুয়্যাত তথা নবী

করীম (সাঃ) এর নবুয়্যাতের শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব ও চূড়ান্ত হওয়ার ব্যাপারে এদেশের বিএনপি সমর্থক মুসলমান আর আওয়ামী লীগ সমর্থক মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এ বিষয়ে একজন স্বঘোষিত নাস্তিক বা মুরতাদের কোনো কথা থাকতে পারে, একজন ইয়াহূদীর মতামত থাকতে পারে, কথা থাকতে পারে উপমহাদেশের মুসলমানদের কৌশলে অমুসলিম বানানোর ষড়যন্ত্রের হোতা বৃটিশ বেনিয়াদের। কিন্তু একজন বিশ্বাসী মুসলমানের মনে কাদিয়ানীদের এ অপকর্মের পক্ষে কথা বলার কোন ইচ্ছা কিছুতেই জাগ্রত হওয়া উচিত নয়। কাদিয়ানীদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ বা তাদের মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ এটি নয়। এ হচ্ছে মুসলিম জনগণের ঈমান ও ধর্মীয় অনুভূতিতে অব্যাহতভাবে আঘাত করা একটি সম্প্রদায়ের খারাপ কাজগুলো প্রতিরোধ করা। মুসলিম নাগরিকদের ধর্মীয় ও নাগরিক অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা।

১৭/০১/০৪ তারিখের জনকণ্ঠ পত্রিকায় একটি উদ্বেগ জনক সংবাদ ছাপা হয়েছে। বাংলাদেশের কাদিয়ানী গোষ্ঠী একটি সম্মেলন করেছে এবং সেই সম্মেলনে এদেশের বাম-রামপন্থী, ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিল। এসব নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কাদিয়ানীরা বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি হুমকি প্রদর্শন করে বলেছে, 'সন্ত্রাস মোকাবেলা করা হবে।'

আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা করতে চাই, এদেশের তওহীদী জনতা, যারা নিজেদের প্রাণপ্রিয় আদর্শ ইসলামকে বিকৃতির কবল থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে খত্‌মে নবুয়্যাত আন্দোলন করছেন, তাঁরা কেউ কখনো সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিলেন না এবং তাঁদের অভিধানে সন্ত্রাস শব্দটি অনুপস্থিত। বরং বিশ্ব সন্ত্রাসী ইয়াহূদীদেরকে নিজেদের প্রভু হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়ে কৃত্রিম সন্ত্রাসের আবহ তৈরী করে কাদিয়ানীরাই ইসরাঈলের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী হিসেবে দেশের বুকে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করে এক রক্তাক্ত পরিবেশ তৈরীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে না অথবা তাদের দুর্গম আস্তানা, প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত উপাসনালয়ে যে ভয়াবহ অশান্তি, অরাজকতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির কোনো নীল নক্‌শা প্রণয়ন করছে না, এর নিশ্চয়তা কে দেবে? সুতরাং সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থাকে কাদিয়ানীদের গতিবিধির ওপর কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বাম-রামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর হুমকী-ধমকীর কানা-কড়িও মূল্য নেই।

সরকারের নিকট দেশবাসীর দাবী হচ্ছে, কাদিয়ানীদের শুধু বই-পত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করাই যথেষ্ট নয়– পৃথিবীর ৪০ টি মুসলিম দেশের অনুকরণে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে জঘন্য কাফির কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

কোরআনুল কারীম, তাফসীরুল জামিউল আহকামুল কোরআন, তাফসীরুল জামিউল বায়ান, তাফসীরে দুররুল মানসুর, তাফসীরে ফাতহুল কাদির, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে রুহুল মাআ'নী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে বাগ্‌বী, তাফসীরে ফখ্‌রুর রাযী, তাফসীরে তাবারী, তাফহীমুল কুরআন–আল্লামা মওদুদী (রাহঃ), ফী যিলালীল কোরআন– শহীদ সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ), বোখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌, নাসায়ী, বায়হাকী, রিয়াদুস্‌ সালিহীন, তাবারানী, মুসনাদে আহমাদ, যাদুল মাআ'দ, কাদিয়ানী সমস্য– আল্লামা মওদুদী (রহঃ), নবুয়্যাত ও রিসালাত, মাওলানা আঃ রহীম (রহঃ), সীরাতে সরওয়ারে আলম– আল্লামা মওদুদী (রহঃ), কাদিয়ানী রদ– আল্লামা রুহুল আমীন বশিরহাটী (রহঃ), কাদিয়ানী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ– আবু খালিদ।

Siratun-Nababiya by Abul Hasan Ali Nadvee. Siratun-Nabee by Allama Shibli Noomani., Al-Zihad by Allama Moududee, The Life of Muhammad by Muhammad Hosain Heykal., Encyclopeadia of Religion and Ethics, বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাসমূহ।

অমুসলিম কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী ও পত্রিকা

মলফুজাতে আহমদিয়া, হাকিকাতুন নবুয়্যাত, আনওয়ারে খিলাফত, কালিমাতুল ফজল, আইনায়ে সাদাকাত, তাবলীগে রিসালাত, ইযাজে আহমাদী, সীরাতুল মাহদী, মুনকিরীনে খিলাফাত কা আনজাম, কিতাবুল বিররিয়া, ইযালায়ে আওহাম, আইয়ামুস সুলহি, কামারুল হুদা, মসীহ মাওউদ আওর খতমে নাবুয়্যাত, হুমামাতুল বুশরা, তাওদীদে মারাম, আনজামে আতহাম, আরবাঈন, চশমায়ে মসীহী, আল বুশরা, তিরয়াকুল কুলুব, তাযকিরা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ইসলামী কোরবানী, ওহী মুকাদ্দাস, আন নবুয়্যাতু ফিল ইসলাম, খুতবায়ে ইলহামিয়া, বরকতে খিলাফাত, হাকীকাতুর রুইয়া, যমীমা তোহ্‌ফা, বারাহীনে আহমাদিয়া, কিশতীয়ে নূহ, সিত বচন, নাসীমে দাওয়াত, মাকতুবাতে আহমাদীয়া, নূরুল কুরআন, আকায়াদে আহমাদীয়া, নাহ্‌জুল মুসাল্লী, আল ফযল পত্রিকা, কাদিয়ান।

মাওলানা সাঈদী
রচনাবলী
২